

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৫৬শ বর্ষ

}

ফাল্গুন, ১৪১০

{

১ম সংখ্যা



বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে সেবিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্গিম্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সংগ্রহ-সম্পাদক—ত্রিদিগ্গিম্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ

—ঃ কার্য্যালয় :—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ৫ ২৫৫৫-৮৯৭৩

২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৮

E-Mail : vedantasamiti@vsnl.net

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ
ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত তপস্বী মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিত্বূষণ
শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদক—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[মাসিক]

পঞ্চাষষ্টিতম বর্ষ [১ম সংখ্যা-১২শ সংখ্যা]

[শ্রীগৌরান্দ ৫১৮ বিষ্ণু হইতে ৫১৯ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৪১০ ফাল্গুন হইতে ১৪১১ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ২০০৪ মার্চ হইতে ২০০৫ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সম্প্রপতি—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সম্প্র—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত মধুসূদন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরীকেশ মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ. বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

প্রচার সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সাধু মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত তপস্বী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্তৃক
শ্রীদেবানন্দ-গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ-নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রেস হইতে মুদ্রিত।

ছাপান বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অদ্বৈতাচার্য্য—শ্রী [পদ্য]	১/৩০
২। অদ্বৈতাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং]	১১/৪৪৩
৩। অপরাধ ভঞ্জন [পদ্য]	৬/২৫৫
৪। অভক্তি-মার্গ—[শ্রীল প্রভুপাদ]	১০/৪০৪, ১১/৪৪৯
৫। অভাব	৯/৩৬৫
৬। অভাব ও স্বভাব [পদ্য]	৭/৩০৫
৭। অর্থ ও অনর্থ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯/৩৫৯
৮। আজব দুনিয়া [পদ্য]	১১/৪৬০
৯। আচার্য্য কেশরী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ	১২/৫১
১০। আমার প্রভুর মহিমা	১২/৫৩১
১১। ইন্দ্রদ্যুম্ন-দেবগণ-কৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতি—শ্রী	১/৩
১২। উপনিষদ্ বাণী ৩/১০৬, ৪/১৪৭, ৫/১৯৫, ৬/২৩৬, ৭/২৮০, ৮/৩২১, ৯/৩৬২, ১০/৪০৭, ১১/৪৫৪	
১৩। উড়ুপী-দর্শন [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫/১৮৪
১৪। ঐকান্তিক হরিভজন [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪/১৪০
১৫। কলির অমুকুল—ভক্তির প্রতিকূল	৮/৩৩১
১৬। কামনা [পদ্য]	৫/২১৮
১৭। কৃষ্ণচেত্যান্যের দয়া—শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী]	৬/১০২
১৮। কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য—শ্রী	২/৫০, ৩/৯৩
১৯। কৃষ্ণাষ্টকম্—শ্রী [সানুবাদং]	২/৪৭
২০। গদাধরাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং]	১০/৩৯৯
২১। গুরুকৃপা—শ্রী	১২/৫৬৯
২২। গুরুদেবে পাদ্য-অর্ঘ্য—শ্রী	১২/৫৫৫
২৩। গুরুপদাশ্রয়—শ্রী	১২/৫১৫
২৪। গুরুপূজায় গুরু-কীর্তন—শ্রী	১২/৫২৬
২৫। গুরুপাদপদ্মে বিরহ পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল [পদ্য]	১১/৪৭৪
২৬। গুরুপাদপদ্মের আরতি—শ্রী [পদ্য]	১২/৫৬৮
২৭। গুরুপ্রের্তের (শ্রীভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের) মহাপ্রয়াণ	১০/৪৩
২৮। গুরুভক্তি—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২/৪৯০
২৯। গুরুমহারাজের পত্র—শ্রীল	৫/১৯৩
৩০। গুরুমহারাজের হরিকথা—শ্রীল	১/৩৫, ২/৭৯, ৩/১২৩, ৪/১৬৯, ৭/২৮৩, ১১/৪৫৩

৩১। গুরুস্বরূপ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২/৪৯৩
৩২। গোপাল তাপনী	১/২৩, ২/৫৮
৩৩। গৌরকিশোরাস্তিকম্—শ্রীল [সানুবাদং]	৬/২২৩
৩৪। গৌড়ীয় পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—শ্রী [বিজ্ঞপ্তি]	৫/২১
৩৫। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে শ্রীব্যাসপূজা ও নবাচার্য্য অভিষেক—শ্রী	১২/৫৬২
৩৬। গৌড়ীয়ের ষট্পঞ্চশং বর্ষ—শ্রী	১/৩৯
৩৭। চৈতন্যচন্দ্রামৃত	৭/২৮৭, ৯/৩৭২, ১০/৪১৭
৩৮। ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা?	১/২৬, ২/৬৬, ৪/১৫৪
৩৯। জাগরণ	৬/২৪২
৪০। জীবই ঈশ্বর, এটি কল্পনা না শাস্ত্রবাক্য?	৮/৩৩৪, ৯/৩৭৭
৪১। জীবে নয় ঈশ্বরেই প্রেম	১১/৪৬২
৪২। তুর্য্যশ্রমী মহারাজের আশীর্বাদ-পত্র—শ্রীমৎ	১২/৫০৫
৪৩। তুলসীদাসের বৈরাগ্য [পদ্য]	৪/১৫৯
৪৪। দৃশ্য দৃষ্টো ভগবান্ অনুমেয়	১/১৬
৪৫। ধর্ম ও বিজ্ঞান [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০/৪০১, ১১/৪৪৫
৪৬। নবদ্বীপ স্তোত্রম্—শ্রী [সানুবাদং]	৭/২৬৭
৪৭। নবদ্বীপধামের পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৩/১২৮
৪৮। নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয় [নিমন্ত্রণ]	২/৮৫
৪৯। নরোত্তম প্রভুবারাস্তিকম্—শ্রী [সানুবাদং]	৩/৯১
৫০। নারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভুর নির্য্যাণ—শ্রী	৫/২১৪
৫১। নিত্য নূতন	১০/৪২১
৫২। নিত্যানন্দাস্তিকম্—শ্রীশ্রী	১২/৪৮৭
৫৩। নৃগ উপাখ্যান	১০/৪৩৪
৫৪। পরমারাধ্যতম জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ	১০/৪২৪
৫৫। পাঠান বৈষ্ণব	১/৩১
৫৬। পাষণ্ডরাজ	৮/৩৪৭
৫৭। পুষ্কর তীর্থ—শ্রী	৬/২৫১
৫৮। প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯/৩৫৬
৫৯। প্রভুপাদের উপদেশামৃত—শ্রীশ্রীল	১/৯, ২/৫৪
৬০। প্রভুপাদের বাণী—শ্রীল	১২/৫২৪
৬১। প্রহ্লাদেশ শ্রীনৃসিংহদেব [পদ্য]	৩/১২১
৬২। বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটি ও তৎসংশোধন চেষ্টা	১/১৩
৬৩। বর্ষান্তে নিবেদন	১২/৫৭৩
৬৪। বাসুদেব ঘোষের গৌরদর্শন—শ্রী	৩/১১৪

৬৫। বিজয়ার সম্ভাষণ	৯/৩৯১
৬৬। বিজ্ঞপ্তি	৫/২১৮, ৮/৩৫৩, ১১/৪৮০
৬৭। বেঁচে মরা	৭/৩০২
৬৮। বেদতন্ত্রে ক্রিয়াযোগ	১১/৪৭০
৬৯। বেদস্তুতি	২/৭৩
৭০। বেদান্তে শব্দবাদ [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী]	৪/১৪২, ৫/১৯০, ৬/২৩২
৭১। বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮/৩১৭
৭২। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা	৪/১৩৭, ৫/১৮১, ৬/২২৫
৭৩। ব্যাসপূজা—শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী]	১২/৫০০
৭৪। ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরুপ্রণামঃ—শ্রী	১২/৫২১
৭৫। ব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীশ্রীল [নিমন্ত্ৰণ]	১১/৪৮১
৭৬। ব্যাসপূজা মহোৎসব ও নবাচার্য্য অভিষেক [নিমন্ত্ৰণ]	১০/৪৩৭
৭৭। ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারবৈশিষ্ট্য-আলোচনা	১২/৫৩৭
৭৮। ব্যাসপূজায় শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা	১২/৫০৮
৭৯। ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশামৃত	৮/৩২৮, ৯/৩৭৪, ১০/৪১৯
৮০। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পত্র—শ্রীশ্রীল	৮/৩২০, ৯/৩৬২, ১০/৪০৬
৮১। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীশ্রীল	১১/৪৫২, ১২/৫০০
৮২। ভক্তিবিনোদ-দশকম্	৫/১৭৯
৮৩। ভক্তিবিনোদ বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধি-মন্দির—শ্রীশ্রী [চিত্র]	১০/৪২৩
৮৪। ভয় হয়	৫/২১০
৮৫। ভাই কুতর্কিক [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭/২৭২
৮৬। ভাগবত-ধর্ম শিক্ষার্থীগণের কর্তব্য—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩/৯৭
৮৭। ভৃগুপদচিহ্ন [পদ্য]	৫/২০৪
৮৮। ভ্রম-সংশোধন	৮/৩৫০
৮৯। মঙ্গলময় ভগবান্ [পদ্য]	৯/৩৭৬
৯০। মাৎস্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১/৬
৯১। মানদান ও হানি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬/২২৮
৯২। যোগমায়া ও মহামায়া [পদ্য]	১/১৮, ২/৭৬
৯৩। যোগিদের পাঠ্য “গীতার” আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভক্তিবিরোধী	৮/৩৪২, ৯/৩৮২, ১১/৪৬৫
৯৪। রক্ষা [পদ্য]	৬/২৫৯
৯৫। রাধাগোবিন্দের বুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব [নিমন্ত্ৰণ]—শ্রীশ্রী	৬/২৬০
৯৬। রাধার ভাবে গোরা—শ্রী	৮/৩৩৩
৯৭। রামদাস শ্রীগোপাল	৪/১৬৫

- ৯৮। লিগ্যাল নোটিশ ৬/২৬২
- ৯৯। লোকনাথ প্রভুবরাস্তকম্ [সানুবাদং] ৪/১৩৫
- ১০০। শিষ্যব্রতের গুরুসেবা ও হরিভজন
[শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী] ৮/৩২৪, ৯/৩৬৮, ১০/৪১১
- ১০১। শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম [শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী] ৬/২৫৬
- ১০২। শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে নবনির্মিত মন্দিরে
শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয় [বিবরণ] ৪/১৭৪
- ১০৩। শ্রীবাসাস্তকম্—শ্রী [সানুবাদং] ৯/৩৫৫
- ১০৪। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি পূজায়
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ১২/৫১৭, ৫২২, ৫৩০, ৫৩৬, ৫৫৩, ৫৬০, ৫৬৬
- ১০৫। ষড়্গোস্বাম্যাস্তকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং] ৮/৩১১
- ১০৬। সদাচার ১১/৪৭৫
- ১০৭। সবার নাথ শ্রীজগন্নাথ [নাটিকা] ৫/২০৫, ৬/২৪৬, ৭/২৯২
- ১০৮। সভাপতি ও আচার্য্য-পদে অভিষেক-কালে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা ১২/৫১২
- ১০৯। সময় নাই ৯/৩৮৭
- ১১০। স্বাতন্ত্র্য সম্প্রদায় ১/২০
- ১১১। সাধুজন সঙ্গ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৭/২৬৯, ৮/৩১৩
- ১১২। সাধুসঙ্গের মহিমা ৫/১৯৯, ৬/২৩৯, ৭/২৮৯
- ১১৩। সাময়িক প্রসঙ্গ [বিবরণ] ৪/১৭২
- ১১৪। সেবা ৭/২৯৮, ৮/৩৩৮
- ১১৫। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ—উভয়ই অনিষ্টকারক ও পরিত্যজ্য ৩/১০৯, ৪/১৫১
- ১১৬। স্বধামে শ্রীক্ষীরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ ১১/৪৭৯
- ১১৭। হরিনাম পরম সাধন ও পরম সাধ্য—শ্রী ২/৬২
- ১১৮। হারাধান কবে হারাধন পাবে ৪/১৬০
- ১১৯। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ
[শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী] ৭/২৭৬
- ১২০। Statement about ownership and particulars
about newspaper ১/৪২

卐	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	卐
ধর্মঃ সনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ ।		নোংপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
卐	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	卐

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
--	---

৫৬শ বর্ষ }	৮ বিষ্ণু, বাসুদেব, ৫১৮ শ্রীগৌরান্দ ৩০ ফাল্গুন, রবিবার, ১৪১০, ইং ১৪/৩/২০০৪	{ ১ম সংখ্যা
------------	--	-------------

সানুবাদং

শ্রীহ্রদ্যুম্ন-দেবগণকৃতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তুতিঃ

[স্কান্দে উৎকলখণ্ডে চতুর্বিংশশেধ্যায়ে]

১-২। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।

প্রণতার্ত্তিবিনাশায় চতুর্বর্গৈকহেতবে ॥

হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥১॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি প্রণতজনের অশুভবিনাশক ও চতুর্বর্গলাভের একমাত্র নিদান ; যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রধান ও অব্যক্তরূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥১॥

৫-৬। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষাঃ সহস্রাক্ষাঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং সর্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥

যঃ পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমায়েতি গীয়তে ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ সর্বং পুরুষ এব তৎ ॥২॥

যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কন্মেন্দ্রিয় সেই নিখিল পার্থিব-দেহব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির উর্দ্ধভাগে দশাঙ্গুলি স্থান অতিক্রমণপূর্বক অর্থাৎ হৃদয়পদ্মमध्ये বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন । তিনিই পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালত্রয়-গোচর ॥২৥

৭-৮। এতাবনস্য মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ ।

পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

ছন্দাংসি জজিরে ত্তত্তত্ততো যজ্ঞপুমানপি ।

তত্তোহশ্বাশ্চ ব্যজায়ন্ত গাবো মেঘাদয়স্তথা ॥৩৥

এইরূপ সর্বদেশ-সর্বকালব্যাপী তাঁহারা মহিমা, এই কারণে সেই প্রভু সর্ব-জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ । নিখিলপঞ্চভূত ইঁহার একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম—এই বেদ-ত্রয় ইঁহার অপর তিনপাদ । ইঁহার সেই বেদত্রয়াত্মক সূর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তির দ্বার-স্বরূপ । হে দেব! আপনি সেই সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ, আপনা হইতেই ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা হইতে যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনা হইতে অশ্ব-গো-মেঘাদি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩৥

৯-১২। ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব ।

বিশস্তবোরুজাঃ পদ্ভ্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ ॥

মনসশ্চন্দ্রমাজাতশ্চক্ষুষা দিবাকরঃ ।

কর্ণাভ্যাং শ্বসনঃ প্রাণৈর্জিহ্বায়া হব্যবাড়পি ॥

নাভিতো গগনং দৌশ্চ মুদ্ধস্তে সমবর্তত ।

পাদাভ্যাং তে ধরা জাতা দিশশ্চাষ্টৌ শ্রুতের্গতাঃ ॥

সপ্তাসন্ পরিধয়ন্তুস্ত একবিংশৎসমিচ্চ বৈ ।

চরাচরাঃ সর্বভাবাস্তুস্ত এব হি জজিরে ॥৪৥

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণযুগল হইতে শ্রবণাদি পঞ্চবায়ু, জিহ্বা হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ হইতে অষ্টদিকের উৎপত্তি হইয়াছে । আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনার পরিধি (যজ্ঞ-ভূমি বেষ্টনদ্রব্য) হইয়াছিল ; একবিংশতি ছন্দ আপনার সমিধ্ হইয়াছিল । এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৥

১৩-১৪। ত্বমেব জগতাং নাথস্ত্বমেব পরিপালকঃ ।

উগ্ররূপশ্চ সংহর্তা ত্বমেব পরমেশ্বর ॥

ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশঃ পরাৎপরঃ ।

শব্দব্রহ্ম পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্ ॥৫॥

হে পরমেশ্বর! আপনি জগতের নাথ, আপনিই আপন স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, জগতের পালনকর্তা, আপনিই ইহার সংহর্তা হইয়া উগ্র-মূর্তি ধারণ করেন । আপনি পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরমশব্দব্রহ্ম, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্ ॥৫॥

১৫-১৬। স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিরাড়সি জগৎপতে ।

অধশ্চোদ্ধৃৎ তির্য্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময় ॥

প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ ।

ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনাং ত্বং ফলপ্রদঃ ॥৬॥

হে জগন্ময়! আপনি অধঃ, উদ্ধৃৎ ও তির্য্যকপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন । যাজ্ঞিকগণ আপনার উপাসনা করিয়াই পরমস্থান প্রাপ্ত হয় । আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা, আপনিই হবি, হোতা ও ফলপ্রদ ফলস্বরূপ ॥৬॥

১৭-১৮। সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাত্মকঃ প্রভো ।

সর্ব্বকর্ম্মোপকরণং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ ॥

কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদঃ ।

ত্বামৃতে মুক্তিদঃ কোহন্যো হবীকেশ নমোহস্ত তে ॥৭॥

হে প্রভো! আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা এবং সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ ; আপনি নিখিল কর্ম্মের উপকরণ, আপনিই নিখিল কর্ম্মের ফলপ্রদ ; আপনি সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন ; আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন । হে হবীকেশ! আপনি ব্যতীত আর কে মুক্তি প্রদান করিতে পারে—তোমায় নমস্কার করি ॥৭॥

১৯। নমোহস্তনস্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাস্ত্রেতে সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ ॥৮॥

সেই অনন্ত ও সহস্র মূর্ত্তি, সহস্র পাদ, সহস্র চক্ষু, শির এবং উরু ও বাহু-ধারী, সহস্র নামধেয়, শাস্ত্র পুরুষ, সেই সহস্রকোটি যুগধারী পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি ॥৮॥

২০। বয়ং চ্যুতাদিকারাত্মাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো ।

ব্রাহ্মি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব ॥৯॥

প্রভো! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমরা অগতি, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমা-দিগকে রক্ষা করুন ॥৯॥

২১-২২ । সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোন্তং শরণং প্রভো ।

ত্বৎসৃষ্টৌ ত্বাদৃশো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ ॥

দীননাথৈকশরণং পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো ।

পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্বাপদ্বিনিবারকঃ ॥১০॥

হে প্রভো! আপনিই সংসার-সাগরে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়; আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীনপালক আর কেহই নাই। আপনি দীন-অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়; প্রভো! আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর! আপনি জগতের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালন-কর্তা; আপনি সকল আপদের নিবারক ॥১০॥

২৩-২৪ । ত্রাহি বিষ্ণে জগন্নাথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর ।

ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে ॥

অন্তর্যামিনমন্তেহস্ত সর্ববর্তেজোনিধে নমঃ ॥১১॥

হে বিষ্ণে! হে জগন্নাথ! আমাদের রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! হে কমলাকান্ত আপনি ব্যতিরেকে আর কে আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? হে অন্তর্যামিন! আপনি নিখিল তেজের আধারস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি ॥১১॥

মাৎস্য

‘মাৎস্য’-শব্দের অর্থ ও নির্ম্মৎসর প্রেমধর্ম্মের অধিকারী নির্ণয়

‘মাৎস্য’-শব্দটি অনেকস্থানে অনেক অর্থ সংযুক্ত হয়। পরশুভ-দেব, পরশ্রী-কাতরতা, অসূয়া ও ঈর্ষা ইত্যাদি নানা অর্থ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে যে-যে স্থলে মাৎস্য-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্বত্রই তদ্বারা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবকে বুঝিতে হয়। “ধর্ম্মঃ প্রোজ্জিত-কৈতবোহত্র পরম-নির্ম্মৎসরাণং সতাম্”—এই ভাগবত-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম ধর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম-রসই ঐ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পরম ধর্ম্ম। যিনি নির্ম্মৎসর, তিনি ঐ ধর্ম্মের অধিকারী। মাৎস্যশূন্যতার নাম নির্ম্মৎসরতা। যদিও টীকাকার মহোদয় পরের সুখে দুঃখী ও পর-দুঃখে সুখী হওয়াকে মৎসরতা বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, তথাপি উক্ত শব্দের বিস্তৃতরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কাম-ক্রোধাদি ষড়্ভবগ এবং তাহাদের পরম্পর উৎপত্তির কারণ

অবিদ্যাবদ্ধ জীব ষড়্ভবগরূপ রজ্জ্বদ্বারা জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্য—এই ছয়টিকে ষড়্ভবগ বলে। ইহারা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও ঘেষ্ণরূপ পঞ্চ ক্রেশের অবস্থান্তর। জড়বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি। কাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে,—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (গীতা ২।৬২-৬৩)

বিষয়াভিনিবেশ-রূপ সঙ্গ হইতে কাম উৎপত্তি হয়। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিষয় লোভ, বিষয় লোভ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম অর্থাৎ মোহ, মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মদ, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের স্বরূপ-বিকৃতিরূপ মাৎসর্য্য হয়।

রিপু-দমনের উপায়

উপদেশ-স্থলে কথিত হইয়াছে ;—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ (গীতা ৩।৪৩)

বুদ্ধির অতীত যে চিন্মন জীব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা সিদ্ধান্ত-দ্বারা মনকে বশীভূত করত দুর্দ্বর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

অন্য সমস্ত রিপুই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত

এই সমস্ত উপদেশদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে কাম-রূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া ‘জৈবধর্ম্ম’ যে প্রেম, তাহাকে সুদূরবর্তী করিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটিই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভূত। ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মোহতে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদ-শব্দে ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি ছয় প্রকার মদই বুঝিতে হইবে।

যাবতীয় ক্রেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত ও ‘জীবে দয়া’-হীন ব্যক্তি মাৎসর্য্যপর

জীবের সমস্ত ক্রেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ, তথা অবিদ্যা, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। ‘জীবে দয়া’, ‘নামে রুচি’, ‘বৈষ্ণবসেবা’-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য একদিকে অবস্থিতি করে। যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না। ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরস ভাব উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে।

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিই ‘তৃণাদপি’ শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ

যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষুজ্ঞা।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক ৩)

মাৎস্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ ও জড়ীয় বল-মদ থাকে না ; অতএব তিনি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। মাৎস্যশূন্য ব্যক্তির ক্রোধ, তীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না। অতএব তিনি বৃক্ষ হইতেও সহিষু অর্থাৎ পরম দয়ালু। জাতি-বিদ্যা-মদাদি-রহিত নির্ম্মৎসর পুরুষ সমস্ত গুণ-সম্পন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য, অতএব তিনি অমানী। নির্ম্মৎসর পুরুষ পর-সুখে সুখী ও পর-দুঃখে দুঃখী ; অতএব সর্ব্বজীবে তিনি যথাযোগ্য মান বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দয়াদ্বারা সর্ব্বজীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-প্রায়-ভদ্রজীবে তর্পণ ও চরণ-পূজাদ্বারা বৈষ্ণবসেবা বিধান করেন।

নির্ম্মৎসর পুরুষের ১০টী লক্ষণ

- ১। নির্ম্মৎসর পুরুষ স্বভাবতঃ সাধুনিন্দা করেন না।
 - ২। কৃষৈকান্তিক বুদ্ধিসহকারে অন্যদেবে পৃথগীশ্বর জ্ঞানশূন্য হইয়াও তত্ত-দেবের প্রতি অবজ্ঞা করেন না।
 - ৩। গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করেন।
 - ৪। শ্রুত্যাди ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মান করেন।
 - ৫। বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম ও নামীর একত্ব বিশ্বাসে নামকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন।
 - ৬। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি করেন না।
 - ৭। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতি অন্য শুভ কর্ম্মকে নামের তুল্য শুভ মনে করেন না।
 - ৮। শ্রদ্ধা-শূন্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার যত্ন করেন, কিন্তু যতদিন শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাকে নামোপদেশ করেন না।
 - ৯। নাম-মাহাত্ম্য যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।
 - ১০। জড় সম্বন্ধে অহংতা-মমতা-শূন্য থাকেন।
- হে পাঠকবর্গ! নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎস্যশূন্য জীবের বন্ধন। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—
- চৈতন্য-চরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি’।
- মাৎস্য ছাড়িয়া, মুখে বল ‘হরি’ ‘হরি’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩৬।১)
- জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬০ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই কি মুখ্য ভজন?

উঃ—শ্রীমদ্বাহপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তনুসারে শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ; শ্রবণ-স্মরণাদি শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের অধীন। শ্রীনামের কৃপা না হইলে লীলাস্বফূর্তি হয় না। কীৰ্ত্তন ছাড়িয়া পৃথগ্ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা মাত্র।

মানুষের কল্লিত বা রচিত ছড়াকীৰ্ত্তন শ্রীনামকীৰ্ত্তন নহে, উহা নামাপরাধ কীৰ্ত্তন ; উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা ভজন নহে ; উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র।

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণ শ্রীনামসঙ্কীৰ্ত্তনই ভজন, তাহাই প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সাধুজন-নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটী ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্থায়ী মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও এই সিদ্ধান্তই কীৰ্ত্তন করিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০)

প্রঃ—প্রকৃত কৃষ্ণসেবা কি ক’রে হয়?

উঃ—কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা হয়। সহজিয়াগণ এটা বুঝতে পারে না। তা’রা মনে করে—যে কৃষ্ণের সেবাপূজা করে, সে-ই খুব বড় ; তাই তা’রা নিজে বৈষ্ণব-অভিমান করে, অপরের সেবা নেয়, নিজে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও গোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যাঁ’রা, তাঁ’রা জানেন—কৃষ্ণের ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই সত্যি সত্যি কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণভক্তের সেবা ছেড়ে কৃষ্ণসেবার ছলনার কোন মূল্য নাই।

যাঁ’রা সাধু-গুরুর সেবা ও আনুগত্য ছেড়ে কৃষ্ণসেবা ও নামভজনের অভিনয় করে, তা’দের প্রতি পদে পদে অপরাধ হয়। অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণ-সেবা হ’ল না। কিন্তু যে-সব শরণাগত ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও সেবা করে, গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় তা’দেরই কৃষ্ণসেবা ও নাম হয়। কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা যারা আদর ও প্রীতির সহিত করে, তাদের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।

যখন আমার ধারণা ছিল—আমি গণিত-শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শন-শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত, তখন ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের দর্শন পেলাম। আমার মহা-সত্যবাদিতা, নিম্নল-নৈতিকজীবন, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জেনে ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝলাম—যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল! তিনি যে ধাক্কা দিলেন তাতে বুঝতে পারলাম—আমার ন্যায় হীনব্যক্তি, ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই, এইটাই আমার স্বরূপ। আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক-চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে করছি, এই মহাত্মা সে-সকল বস্তুর কোন মূল্যই দিচ্ছেন না। তখন বুঝলাম—এই মহান ব্যক্তিতে কি অমূল্য জিনিষই না আছে! তখন বিচার করলাম—হয় ইনি অত্যন্ত দয়ালু, না হয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। তখন আমি দীনভাবে ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হ'লাম। তৎপরে ভগবৎ-কৃপায় জান্তে পারলাম যে—এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা ও সেবা ছাড়া আমার মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই। যখন আমার এরূপ সুবুদ্ধি হ'ল, তখন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ও অজস্র কৃপা পেয়ে আমি কৃতার্থ হ'লাম।

শ্রীগুরুদেবের কাছে আমি যে ধাক্কা পেয়েছি, তাতে বুঝেছি পৃথিবীর লোককে সেরূপ ধাক্কা না দিলে তাদের চৈতন্য হ'বে না—চেতনতা আসবে না। তাই সকলকে বলছি—আমি সকলের চেয়ে—পৃথিবীতে যত লোক আছে, সব চেয়ে মূর্থ—তোমরা আমার মত মূর্থ হ'য়ে যেও না, মেপে নেওয়ার কথার মধ্যে তোমরা থেকো না—বৈকুণ্ঠ-কথার মধ্যে ঢোক, খুব বড় লোক হ'য়ে যাবে। আমি ভগবৎ-কৃপায় যাকে পরমমঙ্গল বুঝেছি, তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথাই বলছি।

প্রঃ—সাধুর সঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই। সাধুর সঙ্গ অপরিহার্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধিকার অনুসারে সঙ্গ হয়। নিকটে থাকিলেই যে সঙ্গ হয় তাহা নহে; অতিদূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয়। আবার একঘরে বাস করিয়াও সঙ্গ হয় না। আবার নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, দূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গের সুযোগ প্রদানের জন্যই মঠে উৎসবদির ব্যবস্থা। গৃহব্রত-ধর্ম ধ্বংস করিয়া কৃষ্ণব্রত করিবার জন্য—জীবে দয়া, নামে রুচি ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ প্রদানার্থ উৎসবের অনুষ্ঠান।

মঠে যে উৎসবাদি করা হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা হয়, হরিকথা আলোচনা করা হয়, তাহার মূল উদ্দেশ্য—চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করা। সংসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা চেতনের উন্মেষ হয়—জীবের মঙ্গল লাভ হ'য়ে থাকে।

ভক্তই সাধু। ভোগী বা ত্যাগী সাধু নহে। ভক্ত-সাধুর সঙ্গ করলে জানা যায়

যে—ভোগের পথ যেরূপ কুপথ, ত্যাগের পথও সেরূপ বিপথ। ফল্গু-বৈরাগী মধ্যপথে দিশেহারা হইয়া ত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে। জড় জগতের প্রতি প্রীতি বা প্রীতি-রাহিত্য উভয়ই ঈশবিমুখতা। ভোগ ও ত্যাগ—এই দুইপ্রকার ঈশ-বিমুখতা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির পূর্ণ আশ্রয় লাভ হয় না। শুদ্ধভক্তির বিচার বুঝিতে না পারিলে হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইতে হইবে।

প্রঃ—গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা কি করিয়া পাওয়া যাইবে?

উঃ—আমি বাহাদুর—এই বিচার পরমার্থের বিচার নহে। আমার ন্যায় দীন-হীন, অযোগ্য পৃথিবীতে আর নাই—এই অনুভব থাকিলে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা হয়।

যদি শ্রীগুরুদেবের নিকট থাকবার অভিনয় করি, তা' হলেও অসুবিধা হ'য়ে যাবে ; আবার যদি দূরে থাকি, তা' হ'লেও অসুবিধা হ'য়ে যাবে। কিন্তু যদি গুরু-বৈষ্ণবে আপনজ্ঞান, শ্রদ্ধা বা প্রীতি থাকে, তা' হ'লে দূরে বা নিকটে থাকলেও সুবিধা হ'বে।

একদিন একটা ভদ্রলোকের ছেলে এণ্ট্রান্স পাশ, কঠোর বৈরাগ্য, হাঁটুর উপর কাপড়, মলিন বসন, সে হঠাৎ আমার কাছে এলো। সে দু'চার দিন ভাসা ভাসা থাকে ও চলে যায়। আমি তখন শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া জমিদারীর কার্য দেখা-শুনা করি, বিষয়কার্য্য করি। এসব দেখে আমার প্রতি তা'র অশ্রদ্ধা এসে গেল এবং অন্যত্র গিয়ে অসৎসঙ্গফলে সে অধঃপতিত হ'ল। সদুদ্দেশ্য না বুঝে সাধুর বাহ্য ক্রিয়াকলাপ দেখে তা'কে মাপ্তে গেলে এইরূপ সর্ব্বনাশই হয়।

প্রঃ—যাঁহাদের অর্থ আছে, সেই সব গৃহস্থ ভক্ত ও মঠবাসী ভক্তগণ যদি অর্থের দ্বারা ভালভাবে ঠাকুরের সেবা না করেন, তবে কি তাঁহাদের অপরাধ হয়?

উঃ—জগদগুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—
“যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং তু অর্চনামার্গে এব মুখ্যঃ।”

ভাঃ ১০।৮৪।৩৭ বলেন,—

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পস্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।

যচ্ছুদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্রেনেজ্যেত পুরুষঃ॥

গৃহস্থ-ভক্তগণ অর্থদ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীহরির সেবা-পূজা করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন-ভক্তবৎ কেবল শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি-নিষ্ঠ হইলে বিত্বশাঠ্য অপরাধ হইবে। সুতরাং গৃহস্থ-ভক্ত ও মঠবাসী ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি করিয়াও কৃপণতা ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাদিদ্বারা যথাসাধ্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবেন। কারণ শঠতা ও কৃপণতা দেখিলে ভগবান্ শ্রীহরি অপসন্ন হন। তা'তে সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত হয়।

ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দদেবও গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহেন,—‘কৃষ্ণসেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবন’।

নিরন্তর কর ‘কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্তন’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)

প্রঃ—জীবের মঙ্গল কিভাবে হয়?

উঃ—ভগবজ্-জ্ঞানের অভাববশতঃ স্বতন্ত্রতাই জীবকে বিপন্ন করে। বহিরঙ্গা মায়া বিমুখ জীবকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া তোলে—ভোক্তা-অভিমান প্রমত্ত করে। তখন সে নিজ-স্বরূপের কথা ভুলিয়া বিরূপগ্রস্ত হয় এবং মায়িক অভিমানে কষ্ট পায়। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় ভক্তের সঙ্গ পাইয়া যখন ভগবৎ-সেবায় রুচিবিশিষ্ট হন, তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তুর শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা-ক্রমে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করেন।

সদগুরু-চরণাশ্রয়পূর্বক সাধুসঙ্গফলে জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্নবিগ্রহ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখনই তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল হয়। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রীতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্মুখ জীবের বিপদ হয়।

ভাগ্যক্রমে যে-সব জীব ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়ের সৌভাগ্য পায়, তাহারাই শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে জড়াভিনিবেশ আসিয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে চ্যুত করিয়া আপাতমধুর ভোগপথে বা ত্যাগপথে বিচরণ করায়। তজ্জন্যই ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন প্রয়োবিচার তাহাদের আর রুচিকর হয় না বা ভাল লাগে না।

প্রঃ—ভক্তগণ গৃহে বা মঠে কিভাবে থাকিবেন?

উঃ—কি মঠবাসী ভক্ত, কি গৃহস্থ-ভক্ত সকলেই বাহিরে বিষয়ি-প্রায় থাকিয়া অন্তরে ভক্তিনিষ্ঠা রাখিবেন। বাহিরে ভক্ত সাজিয়া অন্তরে বিষয়াসক্ত, গৃহাসক্ত, অর্থাসক্ত, প্রতিষ্ঠাকামী বা বিষয়ী হইবেন না। ইহা কপটতা এবং ভীষণ ভক্তি-বাহক। মর্কটবৈরাগ্য খুব ঘৃণিত ব্যাপার। ইহা জীবকে ভক্তিপথ হইতে ছুটি করাইয়া অধঃপতিত করে। মহাপ্রভুর আদর্শ ও শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাএগ।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ’ অনাসক্ত হএগ ॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।

অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৯)

প্রঃ—সন্ন্যাসী হইলেই কি সংসার হইতে মুক্তি হয়?

উঃ—না। সন্ন্যাসী সাজা ও প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া এক নয়। ভুক্তি ও মুক্তির সহিতই সন্ন্যাস করিতে হইবে। যিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবাকে জীবন ও সার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া ব্যাপারটি মহাজনের অনুসরণ ও পরাভিনিষ্ঠা ; আর সন্ন্যাসী সাজা জিনিষটা অনুকরণ বা ঢে ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

পরাত্ননিষ্ঠা-মাত্র বেষ্ণ-ধারণ।

মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ (ঐঃ চঃ মঃ ৩।৮)

সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কায়, মন, বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয় প্রভৃতি দিয়া প্রীতির সহিত কৃষ্ণের সেবা করিলেই সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং ভক্ত হওয়া যায়। সেবা ব্যতীত মঙ্গল লাভ অসম্ভব। কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী—সকলকেই প্রাণ দিয়া সেবা করিতে হইবে—তবেই মঙ্গল হইবে, ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। কার্পণ্য ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবাপ্রাণ হইতে পারিলেই মঙ্গল হইবে—এই জন্মেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটি ও তৎসংশোধন-চেষ্টা

দেশের শিক্ষা-প্রণালী বিলাতী ধরণের করিতে গিয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই! নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি মামুলী কথা আছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাতা-পিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বরং বালকগণের চিত্তে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে থাকে, ততই তাহারা ভগবদ্ বিশ্বাসটী পর্য্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চালচলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা এত বৃদ্ধি পায় যে, বাপ-মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতী-শিক্ষালব্ধ গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতা-

মাতার নিত্য অর্চনীয় শালগ্রাম-শিলা-পূজাকে পুতুল-পূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষুদাসের চিরুস্বরূপ তুলসী-মালা, উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাহার মতে কুসংস্কার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয় ; শুদ্ধভক্তগণ-সঙ্গে হরি-কীর্তনাদিতে যোগ-দান করা অপেক্ষা গার্ডেন-পার্টি, ইভিনিং ক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা-চুরুট, পান-তামাক প্রভৃতি কলির সেবাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্য ভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সংস্কারের অভাব। শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রকারগণ-প্রবর্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিক্য ভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্র-গণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা তাহাদের হৃদয়ে এমন একটা বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে-সংস্কার পরে শত চেষ্টাতেও যাইতে চাহে না। ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি-কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিদ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্র-গণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ, বহুদিন ধরিয়া একটী পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

তখন ছাত্রগণকে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহে যাইতে হইবে এবং গুরু-সেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশ মত ব্রহ্মচর্যাাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে—কথাটির মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না ; কেননা তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদ-বেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বধর্মে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্ম-নিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতাদিকার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে, আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্য্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন সৌভাগ্যবান্ যুবক বর্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কারগুলি তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না ; হয় তাঁহাকে ভোগী, কর্মী, না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা যোগী করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ সাত্বত-শাস্ত্র-প্রচারকগণের আনুগত্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের উন্নত-জীবনের আশা করা যায়। বর্তমানে যে শিক্ষাপ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্তন দু'এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে ; তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকবর্গ যদি শিশুকাল

হইতেই সন্তানগণকে সাত্ত্ব-শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সদগুরু-চরণাশ্রয়ে সাত্ত্ব-শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে সুকুমারমতি বালকগণ সচ্চরিত্রবান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্রগণদ্বারাই ভারতের ধর্ম্মাকাশ অধর্ম্মমেঘ-মুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে সংশিক্ষা-লাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয় হয়। সাত্ত্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বহুল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্ম্মের ভাণ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটি শান্তিময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটি কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্থ করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্দীষ্ট আচারহীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্তমানে ভারতের লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সদগুরুর চরণাশ্রয়ে সংশিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সংশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ যদি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান্ হইয়েন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী করিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রসার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ করিয়া প্রার্থনা, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ-কর্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থির-চিন্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চালচলন অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

দৃশ্য দৃষ্টে দ্রষ্টা ভগবান্ অনুমেয়

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির পরিণাম হইতে চিজ্জগৎ, তটস্থা-
শক্তির পরিণাম হইতে জৈব জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম হইতে মায়িক জগৎ
প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মের বাহিরে কোন বস্তুর
স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জুনকে
বলিয়াছেন,—“হে ভারত! এই চরাচর বিশ্বে আমি ব্যতীত কোন বস্তু নাই জানিবে।”
বিষ্ণুপুরাণে সনম্বাদিও বলিয়াছেন,—“হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, আর
কিছুই পরমার্থ নহে।” অথর্বশিখাতেও পাওয়া যায়,—“অহমেকং প্রথমমাসং বর্তামি
চ ভবিষ্যামি” অর্থাৎ “একমাত্র আমিই প্রথমে ছিলাম, এখন আছি ও পরে থাকিব।”
“আত্মৈবেদমগ্র”-শ্লোকে (বৃঃ আঃ ১৪।১) ইহার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ঐতরেয়
উপনিষদে (১।১) উল্লেখ রহিয়াছে,—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্মান্যৎ কিঞ্চন
মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্মু সৃজা।” অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক ভগবান্ই ছিলেন,
স্বতন্ত্র থাকার কেহ ছিল না।” চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ‘অহমেবাসম্’ (ভাঃ
২।৯।৩২) ও উপরোক্ত শ্রুতিমন্ত্রসমূহের পূর্ণ সমর্থক। ‘অহমেবাসম্’ শ্লোকের টীকায়
স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—“আমি বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ছিলাম। আমি ব্যতীত সৎ অর্থাৎ
স্থূল বা কার্য্য, অসৎ অর্থাৎ সুক্ষ্ম বা কারণ এবং পর অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মের কারণ
প্রধান—এরূপ অন্য কিছু ছিল না। অন্তর্মুখতাবশতঃ ঐ সমস্তই আমাতে লীন ছিল
বলিয়া আমি তখন অন্তরঙ্গ লীলায় ছিলাম, বহিরঙ্গা ব্যাপারাদি কিছু করি নাই,
বিশ্বসৃষ্টির পরেও আমি আছি। এই যে বিশ্ব, ইহাও আমিই—আমা হইতে ইহা
পৃথক্ সম্ভাযুক্ত নহে। প্রলয়ে যিনি শেষরূপে বর্তমান, তিনিও আমিই, অন্য কেহ
নহেন। এতদ্বারা আমি যে অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিপূর্ণ, তাহা কথিত
হইল।” মহাবিশ্বের অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচেতন্যমহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—

তোমাতে যে চারিবেদে বুলে অষেষিয়া।

তুমি এথা আসি’ রহিয়াছ লুকাইয়া॥

লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।

‘ভক্তজনে তোমা ধরি’ করয়ে বাহির ॥

সঙ্কীর্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৬।১২৪-১২৬)

ভগবান্ই একমাত্র সত্য অর্থাৎ সর্বকাল দেশবর্তী ও পর বা শ্রেষ্ঠ। আধি-
কারিক দেবতার ন্যায় তিনি অনিত্য বা অনুৎকৃষ্ট নহেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবচ্চরণ ব্যতীত

অন্য কোন প্রকার সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। অপর কাল্পনিক সত্য-সমূহ কুহকাবৃত। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে দেবগণ ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যেনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

(ভঃ ১০।২।২৬)

“হে ভগবন্! আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করেন বলিয়া আপনি সত্যব্রত। সত্য ব্যতীত আপনাকে পাইবার অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমানভাবে বর্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য। আপনি ভূতগণের অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি সুসত্যবচন ও সমদর্শন—এই উভয়ের প্রবর্তক, অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।” এই প্রসঙ্গে মহাভারতের উদ্যমপর্বেরও বলা হইয়াছে,—

“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিসত্য অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান, বল, ক্রিয়া—এই ত্রিবিধ শক্তি সত্য। তাহার অংশসমূহও সত্য। মৎস্য, কুর্মাাদি অবতারসমূহের তিনি যোনি অর্থাৎ অবতারা। তাহার ধামও সত্য বা নিত্য। তিনি নিত্য মথুরা-বৈকুণ্ঠাদিলোকে স্থিত। তিনি সত্যের সত্য, সারের সার অর্থাৎ সমস্ত চিৎস্বর সার।” শ্রুতিতেও (কেনো-পনিষৎ ১১।২) বলিয়াছেন,—“ভগবান্ চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ। তিনি নিত্য সত্যস্বরূপ, তাঁহার নেত্র সত্য অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের উপলক্ষক নয়নেন্দ্রিয়। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিত্য সত্য।”

ভগবান্‌ই জগদুপত্তির মূল কারণ, পুরাণ পুরুষ, সনাতন, পূর্ণ নিত্যানন্দময়, অমৃতস্বরূপ, উপাধিমুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক-গুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয়। কার্য্য ও কারণ উভয় অবস্থাতেই তিনি সাক্ষিরূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্বদা সব কিছুই নিরীক্ষণ করিতেছেন। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সন্নিধিগ্রহ ভগবান্‌ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণ-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরুষ, পরমেশ্বর ইত্যাদি বহুবিধ নামে কথিত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ অসম্যক্ প্রতীতিসূত্রে জ্ঞানযোগদ্বারা ব্রহ্মরূপ, আংশিক প্রতীতিমূলে অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরমাত্মারূপ, সম্যক্ প্রতীতিমূলে শুদ্ধভক্তিদ্বারা স্বয়ং ভগবদ্রূপ পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

বাস্তবিকপক্ষে জীবমাৎস্রেই ভগবৎস্বরূপকেই দর্শন করিয়া থাকেন। তবে কৃষ্ণ-ভক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের ভগবৎস্বরূপ দর্শনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তারতম্য বিদ্যমান। যে-সকল ব্যক্তি জড়ভোগে প্রপীড়িত হন, তাহাদের কখনও ভগবানের

অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ ঘটে না। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ নিগুণ পরব্রহ্ম কৃষ্ণবহিস্মুখ জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রতীত হয়। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি লাভ করিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তুতে ঔদাসীণ্য প্রদর্শন করিলেই জীব দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনের ত্রিবিধ অধিষ্ঠানগত ভোগপর নশ্বর বিচারদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভে বঞ্চিত হয়। অজ্ঞব্যক্তিসকলই ভগবানের প্রাকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়া মোহসংগ্ৰবে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন কখনও সম্ভবপর নহে। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।” বিশ্বের যাবতীয় বস্তু অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য। যাঁহার এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চ দর্শন না হইয়া সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারে সর্বত্র কৃষ্ণ ও কার্য্য দর্শন হয়, তিনিই যথার্থ অধোক্ষজ দ্রষ্টা। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবোন্মুখ, তিনি অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত। তাঁহার ভোগপর অক্ষজ দর্শন বা দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভ্রান্তি নাই। প্রাকৃত দর্শনরহিত হইয়া যিনি ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি অনায়াসেই মৃত্যুকে জয় করিতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে,—“যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাঁহাকে আর মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয় না। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি আর কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন না, তিনি সেই ব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আর শোক বা মোহ কোথায়?” অতএব দ্রষ্টা সৌভাগ্যবান জীব হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা দৃশ্য ভগবানের বাস্তব দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

যোগমায়া ও মহামায়া

নমি আমি যোগমায়া তব পদাম্বুজে,
 বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী তুমি! বিদ্যাশক্তি
 রূপে তুমি বিরাজিতা ভকত-নয়নে ;
 চিত্তামের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
 তুমি না করিলে কৃপা, কে পারে জানিতে
 মহিমা অপার তব? এ ভবমণ্ডলে
 ‘গউড়-মণ্ডল-ভূমি চিন্তামণি বলি’
 যে জানে, তাহার হয় ব্রজপুরে বাস’—
 শ্রীমুখের বাক্য এই শ্রীল ঠাকুরের,
 উপলব্ধি হয় মাত্র প্রসাদে তোমারি ;

কৃপাপাত্র তব শুদ্ধভক্ত বিনা কেহ,
 অপ্রাকৃত বাক্য সেই সিদ্ধান্ত পরম
 না পারে বুঝিতে কভু, না পায় সন্ধান।
 অকৃপা তোমারি মোহ-তিমির-যামিনী।
 অভীষ্ট-দায়িনী নিত্য কাত্যায়নী তুমি
 বৃন্দাবনে ; ব্রজ-বনে দয়া মূর্তিমতী ;
 পূজিয়া তোমারে তথা গোপাঙ্গনাগণ,
 তোমারি কৃপায় আহা, পাইল সকলে
 বাঞ্ছিত পরমলোকে—কৃষ্ণপতি-বর।
 জ্ঞান-যোগ-কর্ম আদি অশেষ বন্ধনে
 বদ্ধজীব অসহায় সহে কি সংসারে
 শোক-তাপ! সাধু-সঙ্গে তব কৃপা লভি
 কর্মভোগ সেই তার শেষ হয় ভবে ;
 কর গো ছেদন তবে তুমি সে বন্ধন
 চিরতরে। তমোঘোরে দিব্যজ্ঞানালোক
 করিয়া প্রকাশ নাশ কর বিঘ্ন শত
 শ্রেয়ঃপথে অনুত্তম। মুক্ত কর তার
 বৈকুণ্ঠের মহাদ্বার ; ভক্তিপথে সার
 জিনিয়া মন্দার-দল কোমল নির্মল
 পায় সে কমল পদ কালীয়-লাঞ্ছন
 কালভয় হর সদা। চিন্ময়ী-স্বরূপা
 চৈতন্যরূপিণী ভক্ত-সেবাবিকাশিনী
 নিত্যানন্দ-বিধায়িনী তুমি গো ত্রিলোকে ;
 অনন্ত মহিমা তব বেদে অগোচর ;
 হ্লাদিনীস্বরূপা তুমি চিদানন্দময়ী।
 একান্ত দুঃখের শেষে, আনন্দ অশেষ
 অপাঙ্গ-ঈক্ষণে তব অনায়াসে পায়
 অপায়-আকুল জীব। নাহি জ্বলে আর
 ত্রিতাপ কটাহে কভু, পাইয়া বারেক
 তোমার করুণা কণা। জন্ম-মৃত্যু ঘুচি'
 টুটি' মহামায়াপাশ পায় সে প্রবেশ
 উর্দ্ধদেশে—অমৃতের দেশে নিত্যধামে
 বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ-লীলা-পরিকর-সনে

ইন্দ্রিয়-তোষণে তাঁরি করে নিত্যলীলা
 নিত্যানন্দময়ী। ওগো তুমিই সে দেশে
 নিত্যানন্দ-বিধায়িনী সচ্চিদ্রূপিণী
 পরানন্দ-প্রদায়িনী। নবদ্বীপধামে
 অধিষ্ঠাত্রী তুমিই সে 'প্রৌঢ়ামায়া'রূপে ;
 'পোড়া মা' প্রাকৃত লোকে বলে তোমারেই,
 না জানে স্বরূপতত্ত্ব মোহ-মত্ত জন।
 কর কৃপাদৃষ্টি দেবি, বন্দি শ্রীচরণ। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

সাত্ত্বত-সম্প্রদায়

“সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্ৰাস্তে বিফলা মতাঃ।
 অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
 শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
 চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হুৎকলে পুরুষোত্তমাং॥
 রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখং।
 শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥”

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—সৎ-সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্ৰসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম-বর্ষ-পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় কলিকালে চারিটি সম্প্রদায়-প্রবর্তক মূল আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। ‘কলি’-শব্দের অর্থ—‘বিবাদ’ বা ‘তর্ক’। কলিকালে তর্ক-পন্থারই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রীতপন্থার নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-বাদ, প্রকৃতি-লয়বাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-লয়বাদরূপ মায়াবাদ অবৈধ-রূপে ‘শ্রীতপন্থা’ বলিয়া দাবী করিলেও উহা সূক্ষ্মবিচারে ‘তর্কপন্থা’ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তর্ক-পন্থার কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রীতপন্থায় প্রবর্তিত করিবার জন্য শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন—এই চারিটি সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন সাত্ত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উদ্ভূত হইবেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যে পরিচিত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সেবা-প্রণালী অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধভজন-প্রণালীই তাঁহার আশ্রিতজনে পুরুষোত্তমে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্ৰসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনির্দিষ্ট অভিমানে জীব

সর্বদাই চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতি ব্যক্তি একা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিবার পরিবর্তে বহু শাখাবলম্বী অব্যবসায়ী। এইরূপ ব্যক্তি অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্মোৎখ মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া চিহ্নভেদসমন্বয়বাদী ও কার্যতঃ মনঃকল্লিত সন্ধীর্ণ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। নির্বিশেষবাদিগণের মধ্যে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্রদায়িকতার হেয়াংশের পরিচয় মাত্র। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটীমত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন ; ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। গম্ভীরভাবে বিচার করিলে উদারতার নামে অসাম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ যথেষ্টাচারিতা বা আনুগত্য-রাহিত্যের পক্ষপাতি-ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। সংসম্প্রদায়-স্বীকার জীবের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। যাঁহারা সংসম্প্রদায় স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজদিগকে ‘পরম মুক্ত’, নয় ‘পরম বদ্ধ’ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পরমমুক্তগণও লোকশিক্ষা-কল্পে আপনাদিগকে সংসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উদারতার নামে সংসম্প্রদায় স্বীকারে বীতস্পৃহতার আদর্শ বালকের গুরু-মহাশয়ের শাসন বাপিতা-মাতার প্রদর্শিত পস্থা আপাততঃ দুঃখদায়ক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপাতসুখদায়িনী, পরিণামে অমঙ্গল-প্রসূতি স্বতন্ত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বরণ। সরল, বুদ্ধিমান, আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ সংসম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্বক তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন ; আর অসরল, অদূরদর্শী, বিতর্কপ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সাহিত্য-সিদ্ধান্ত-বিরোধী একটী সন্ধীর্ণ সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্বারা তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করেন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে কখনই সংসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত আশ্রয়পূর্বক কেহ আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে অবধি ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই সময় হইতে কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী যখন শ্রীতপস্থার আনুগত্য-ত্যাগরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার—যাহা স্বরূপ-বিশ্রান্ত জীবের স্বভাব বলিয়া আপাতপ্রীতিকর—সেইরূপ কোন বৃত্তিকেই ‘উদারতা’ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন সেই বিচারটী বহিস্মুখ-জীবকোটর অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণপূর্বক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মনোধর্ম সমর্থনের একটী বেশ উপায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচার নির্বিশেষবাদিগণ—যাঁহারা জীব, জগৎ, ভগবান, পরিকর, ধাম প্রভৃতির পারমার্থিক সত্য স্বীকার করেন না অর্থাৎ চরমে সকলেরই নির্বিশেষ-পরিণাম বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইলেও যাঁহারা জীব, জগৎ, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সত্য স্বীকার করেন, তাঁহারা

কখনই গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা বেদান্তসূত্রকার ও তদকৃত্রিম ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন।

আদি-গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র, চতুঃসন—এই চারিজন্যের অবলম্বনেই কলিকালে সং-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে। কলিকালে শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম-প্রবর্তক মূল আচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্তকের সাত্ত্ব মত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয়ের চরম মীমাংসা শ্রীগৌর-সুন্দরের আশ্রিতজনই জগতে প্রচার করিয়াছেন। পুরীধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠসমূহ শত বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈভব জনসমাজে বিস্তার ও জীবসমূহকে বিষ্ণু-সেবারূপ নিত্য-ধর্মে নিযুক্ত করিলেও শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সারসিদ্ধান্ত আশ্রিত জনগণে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বার্কস্বামীকে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজ-স্বামীকে এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে কলিকালে স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণের অভ্যুদয়ের কালবিচারে সর্বপ্রথম নিত্যবিষ্ণু-সঙ্গিনী লক্ষ্মী, তৎপরে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা, দ্বিতীয় মহাবিষ্ণু হইতে রুদ্র ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসনের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইলেও মূল আচার্য্য-গণের কালবিচারে সর্বপ্রথমে বিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমাধ্বের আবির্ভাব-কাল পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে খুব কম লোকেই খবর রাখেন, এমনকি, যাহারা বর্তমানে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও গবেষণানিপুণ বলিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, তাঁহারা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মতের বিচার দূরে থাকুক, কোন্ আচার্য্য কোন্ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার নামটী মাত্র বলিতে গিয়া যে-সকল ভ্রম করেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গদেশের গবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণের গবেষণায় শৈথিল্য-দর্শনে হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়।

ব্রহ্মার সাতটি বিভিন্ন জন্মে সাত্ত্বত ধর্ম পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্ক-পন্থার আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনारायण হইতে ফেনপগণ সাত্ত্বত-ধর্মের কথা অবগত হন। ফেনপগণ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণবধর্মের সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুঃজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালখিল্যগণ সনাতন বৈষ্ণবধর্মের সত্য শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাটিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকরমন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘণাসি-

সম্প্রদায় এবং বিঘাশাসিগণ হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজ-জন্মে আরণ্যক-সহ বেদশাস্ত্রে সাত্ত্বতধর্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাভ সাত্ত্বতধর্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চান্দ্রজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রবণজ-জন্ম—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐকান্তিক ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সেইসময় ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজজন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্ত্বতধর্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্বপ্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পান্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবত-ধর্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘাশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চান্দ্রজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অধঃস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্মা ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চমজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রৈতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম লাভ করেন।

গোপাল-তাপনী

কোনসময়ে মুনিগণ ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! সর্বদেবতা-শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতা? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হন? কাহার তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিলে সব কিছু জ্ঞান হয় এবং কাহার প্রেরণায় এই বিশ্ব গতাগতি-চক্রে ভ্রমণ করে? ব্রহ্মা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। গোবিন্দকে মৃত্যু ভয় করে। গোপীজনবল্লভের তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিলে সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। ‘স্বাহা’ এই মায়াশক্তি প্রেরিত হইয়া বিশ্ব যাতায়াত-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

মুনিগণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কে? গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ এবং স্বাহা কে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন,—পাপ-অপকর্ষণকারী (অপহরণকারী) শ্রীকৃষ্ণ। গো, ভূমি এবং বেদবাণীর জ্ঞাতা গোবিন্দ। গোপীজন জীবগণের অবিদ্যাকলা-নিবারক অথবা যাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরূপা ব্রজসুন্দরীগণ গোপীজন, যিনি চৌষট্টি কলা বিদ্যাদ্বারা তাঁহাদিগকে সুনিপুণা করিয়াছেন, তাঁহাদের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণই গোপীজনবল্লভ। স্বাহা তাঁহারই মায়াশক্তি। এসকলই পরব্রহ্ম-

স্বরূপ। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা, জপাদিদ্বারা, তাঁহার নামামৃত আন্বাদনদ্বারা জীব অমৃত-স্বরূপ হইয়া থাকে।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানযোগ রূপ কি-প্রকার? তাঁহার নামামৃত-রস কিরূপে আন্বাদন করা যায় এবং তাঁহার ভজন কিরূপে হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন,—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাস্বরম্।

দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥

গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাস্থিতম্।

দিব্যালঙ্কারণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥

কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।

চিন্তয়ং শ্বেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতঃ॥

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নেত্র বিকসিত কমলের ন্যায় সুন্দর, শ্রীঅঙ্গের কান্তি নব-জলধরের ন্যায়, তাহাতে বিদ্যুৎসদৃশ তেজোময় পীতাস্বর পরিহিত, বাহুদ্বয় জ্ঞান-মুদ্রাঢ্য, কণ্ঠ হইতে শ্রীচরণ পর্য্যন্ত লম্বিত বনমালা বিরাজিত, তিনি ব্রহ্মাদি-দেবতা-গণের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর, গো-গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষের নিম্নে অবস্থিত, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দিব্যভরণে ভূষিত, তিনি রত্নসিংহাসনে রত্নময় কমলের মধ্যভাগে বিরাজমান। কালিন্দী-সলিলোথিত চঞ্চল লহরীস্পর্শী সুশীতল সমীরণসেবিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে মনে মনে চিন্তা করিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কালবাচক ‘ক’-শব্দ, ভূমির বীজ ‘ল’, ই এবং চন্দ্রের সমান আকার ধারণকারী অনুস্বর, এ সকলের সমষ্টি ‘ক্লীং’—ইহাই কামবীজ। ইহা আদিতে রাখিয়া ‘কৃষ্ণায়’-পদের উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা একপদ। ‘গোবিন্দায়’ দ্বিতীয় পদ, ‘গোপীজন’ তৃতীয় পদ, ‘বল্লাভায়’ চতুর্থ পদ এবং ‘স্বাহা’ পঞ্চম পদ। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রকে পঞ্চপদী বলা হয়। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি—এ সকলের প্রকাশ অথবা স্বরূপ হওয়ার কারণ এই চিন্ময় মন্ত্র পঞ্চঅঙ্গে যুক্ত।

“ক্লীং কৃষ্ণায় দিব্যায়নৈ হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় ভূম্যায়নৈ শিরসে স্বাহা। গোপীজন-সূর্য্যায়নৈ শিখায়ৈ বট্। বল্লাভায় চন্দ্রায়নৈ কবচায় হং। স্বাহা অগ্ন্যায়নৈ অস্ত্রায় ফট্”—এই প্রকার পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিয়া পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিলে সাধক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিবে, তাহার শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই তাঁহার ভজন। ইহলোক বা পরলোকের ভোগ-কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মনকে শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই

নৈষ্কর্ম্য (বাস্তব সম্যাস)। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ‘গোবিন্দ’ নামে প্রসিদ্ধ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। ‘গোপীজনবল্লভ’ জীবমাত্রের অকৃত্রিম সুহৃদ গোপসুন্দরীগণের প্রাণাধার এবং সম্পূর্ণ লোকের পালনকর্তা। তিনি ‘স্বাহা’-নাম্নী নিজ মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত বায়ুতত্ত্ব প্রত্যেক শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানরূপে বিরাজিত, এইপ্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চনামে প্রতীত।

মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—সমস্ত জগতের আশ্রয়ভূত গোবিন্দের উপাসনা কি-প্রকার? ব্রহ্মা বলিলেন,—গৃহ গোময় লিপ্ত করিয়া তাহাতে ঘৌত পীঠ (পিঁড়ি) স্থাপনপূর্বক তাহাতে সুবর্ণময় অষ্টদল কমল স্থাপন করিবে অথবা চন্দনে অষ্টদল কমল রচনা করিবে। তাহার মধ্যভাগে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে ; ঐ ষট্‌কোণের মধ্যভাগে কর্ণিকায় কামবীজ লিখিবে। প্রতি কোণে ‘ক্লীং কৃষ্ণয় নমঃ’ এক একটা অক্ষর লিখিবে। তৎপরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও কামগায়ত্রীদ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। অতঃপর চতুর্বাহু, শক্তি, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং বসুদেবাদি, পার্থ আদি, নিধি আদি অষ্ট আবরণবেষ্টিত পীঠের পূজা করিবে। এই পীঠের ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও পূজা করিলে উপাসকের চতুর্বর্গাদি সব কিছু প্রাপ্তি হয়।

পুনরায় ঋষিগণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বলেন,—আমার দ্বিপারদ্ধকাল আয়ুর অধিকাংশ সময় শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে থাকিলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্বক গোপবেশ শ্যামসুন্দররূপে আমার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। আমি ভক্তিপূর্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলে তিনি সৃষ্টি রচনার জন্য আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপদেশ করিয়া অন্তর্দান করেন। তৎপরে আমার হৃদয়ে সৃষ্টিবাসনা জাগিলে ঐ অষ্টাদশ অক্ষরে ভাবীজগতের স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া আমার সম্মুখে প্রকটিত হন। তখন আমি ‘ক’ অক্ষরে জল, ‘ল’ অক্ষরে পৃথিবী, ‘ই’কারে অগ্নি, অনুস্বারে চন্দ্রমা এবং এ সমুদায়ের সমষ্টি ‘ক্লীং’ এ সূর্য্য, ‘কৃষ্ণয়’ শব্দ হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে বায়ু, ‘গোবিন্দায়’ পদ হইতে কামধেনু এবং বেদাদি বিদ্যা প্রকাশ করি। ‘গোপীজনবল্লভায়’-শব্দ হইতে স্ত্রী-পুরুষাদি রচনা এবং ‘স্বাহা’-পদ হইতে জড় চেতনময় চরাচর জগৎ রচনা করিয়াছি।

পুরাকালে ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রকে ওঁকার সম্পূর্ণকৃত করত জপ করিয়া রাজর্ষি চন্দ্রধ্বজ মোহরহিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও অসঙ্গ হইয়াছিলেন।

ঐ মন্ত্র সম্বন্ধে মুনিগণ বলিয়া থাকেন,—প্রথম পদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ হইলে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ পঞ্চ মহাব্যাহতি-স্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করে। পরম বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, লোভাদিশূন্য

সর্বপ্রকার আসক্তি ও বাসনাবর্জিত গোলোকধাম এই পঞ্চ পদের অভিন্ন। বাসুদেব হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষনিম্নে রত্নময় সিংহাসনে সর্বদা বিরাজমান। তাঁহাকে আমি উত্তম স্তুতি-দ্বারা সমুপ্ত করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

“ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?”

চৌষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গমধ্যে পাচটি মুখ্য বিধি লক্ষণ ; যথা,—

“সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।

মথুরা-বাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৪-১২৫)

কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পরবৎসর গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করলে মহাপ্রভু জানানলেন,—গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সঙ্কীর্তন প্রীতিপূর্বক করলে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হবে।

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্তন।

দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)

পাঁচটি মুখ্য বিধি-লক্ষণের মধ্যে প্রথম বিধিই সাধুসঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবাই কর্তব্য বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। তাহাই সংক্ষেপে প্রথমতঃ বৈষ্ণবসেবা ও দ্বিতীয়তঃ নাম-সঙ্কীর্তনকে মুখ্য বিধিরূপে শ্রীমদ্রূপপ্রভু নির্দেশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর একান্ত অনুগত দাস বা সেবকই বৈষ্ণব। সাধারণতঃ কৃষ্ণভক্তকে কার্য্য এবং বিষ্ণু বা নারায়ণ-ভক্তকে বৈষ্ণব বলা হয়। কিন্তু শাস্ত্রে কৃষ্ণকে মূল বিষ্ণু বা মূল নারায়ণ বলে উক্ত হয়েছে। যথা,—(ভাঃ ১০।১৪।১৪) “ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বললেন,—“হে অধীশ! তুমি অখিল লোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল-শব্দে নার, তাহাতে যাঁর অয়ন বা আশ্রয়, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ বা অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাক্ষিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁরা মায়াধীশ, মায়াতীত পরম সত্য।”

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।

সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ॥

অঙ্গ-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।

মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬৯-৭০)

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে পাওয়া যায়,—“রাসক্ৰীড়াপরায়ণ যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণ সেই শ্রীমদনমোহন ‘বিষ্ণু’ উপাসক। ব্রজবধুগণের সহিত সেই বিষ্ণুর রাসক্ৰীড়া যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধাঘ্রিত হয়ে গুরুমুখে শ্রবণ করে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের পরাভক্তি লাভ করে হাদ্রোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করতে সমর্থ হন।”—এই ‘বিষ্ণু’দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

কৃষ্ণভক্ত ‘বৈষ্ণব’ কেন? তদুত্তরে শাস্ত্র আরও জানালেন,—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সৰ্ব্বাশ্রয়।

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সৰ্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

* * * *

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।

কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।

কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।

অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥

কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।

সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারাী॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১০৬, ১১২-১১৫)

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মতে,—“মূল হেতু-রূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণরূপে রয়েছে। বিষ্ণু হতে চারিটি গুণ অধিক-রূপে এবং নারায়ণের ষাটটি গুণ অত্যন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-রূপ মূল-দীপস্বরূপ। তাঁহা হতেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্জলিত হয়েছে।” এমতাবস্থায় ‘কৃষ্ণ-ভক্ত’ ‘বৈষ্ণব’ বলে পরিচিত হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত বাসুদেব দত্তের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন,—

তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬৯)

কৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব। ভক্ত বৈষ্ণব যাঁর মঙ্গল কামনা করেন, তাঁর প্রার্থনা ভগবান্ কৃষ্ণ অবশ্যই পূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় বা সেবনীয়। কারণ তাঁর সহিত জীবের নিত্য-সিদ্ধ প্রীতির সম্বন্ধ রয়েছে। তিনিই সর্ব কারণেরও কারণ অর্থাৎ মূলস্বরূপ। সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত বস্তুই কৃষ্ণ। তিনি ইন্দ্রিয়বান্ ও রূপবান্। রক্তমাংসের দ্বারা তাঁর দেহ গঠিত নয়। জড় সত্ত্বায় আনন্দ নাই, চেতন সত্ত্বাতেই আনন্দ বিদ্যমান।

“তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।” (চৈঃ চঃ)

পূর্ণ আনন্দময় সত্তা শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য সকল সত্তাকে আকর্ষণ করে নিজে আনন্দ লাভ করেন ও অন্যান্য সত্তাকেও আনন্দ প্রদান করেন। তিনি সর্বাকর্ষক ও সর্বানন্দ-দায়ক। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম, তাই সর্বাকর্ষক। তিনিই সকলের আত্মা এবং সেজন্যই তিনি সকলের প্রিয় হয়েছেন। প্রিয়জনের সেবাতেই সুখ বিদ্যমান। কৃষ্ণেতেই ভজনীয় গুণসকল সর্বদাই সংযুক্ত আছে। তাঁর ভজনে বা সেবায় সংসাররূপ অবিদ্যার বন্ধন হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতির অংশ জীব। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড জ্ঞান তত্ত্ব ; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁর মধ্যে সত্ত্বাভাব বোধভাব ও আনন্দভাব তথা ক্রিয়াভাবের বিদ্যমানতা বুঝতে পারেন। জীবের মধ্যেও প্রকৃতিগত সত্ত্বা, বোধ ও আনন্দ বা ক্রিয়াশীলতা অণু পরিমাণে আছে। জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ; কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে তথা কোনও দেবদেবীর সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণের দুই প্রকৃতি, যথা— পরা ও অপরা। জীবের হৃদয়ে কারণরূপে যে চিৎসত্তা আছে, উহা কৃষ্ণেরই পরা প্রকৃতির অংশ ; আর বাহিরের অবয়ব যাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহরূপে কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা কৃষ্ণেরই অপরা প্রকৃতির অংশ। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে সেব্য বস্তু থাকতে পারে?

সেব্যবস্তুর অনুকূল প্রীতিবিধানই সেবা। সেব্য, সেবা ও সেবক নিত্য। সেবা বৃত্তিটা দেহ-মনের ধর্ম নয়—উহা আত্মার বৃত্তি। সেব্যের নিত্যত্বে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে সেবা ও সেবকের নিত্যত্ব থাকে না। জীবাত্মা অবিনশ্বর, নিত্য ও সনাতন। সেব্যের সাথে সেবক সমান পর্যায়ভুক্ত না হলে সেব্যের প্রীতিবিধান বা সেবা সূচুরূপে সম্ভব হয় না। সেব্যের অনুকূল সুখসাধন প্রকৃত অনন্যভক্ত বা সেবকের দ্বারাই যথাযথ হয়ে থাকে। আত্মা নিত্য এবং আত্মবৃত্তি সেবাও সেইহেতু নিত্য। বিসর্জনীয় দেব-দেবীর পূজা বা সেবা যে অনিত্য তাহা কি কেহ অস্বীকার করতে পারে? ঐ সকল দেব-দেবীর পূজা শুধুই দেহ-মনের তৃপ্তিমাত্র, অনিত্য পূজায় অনিত্য ফলই লাভ হয়।

সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণের অধোক্ষজত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সংশয় না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সেবকের অপ্রাকৃতত্ব কিরূপে সম্ভব হতে পারে? জগদগুরু শ্রী

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ‘ভাগবত-ব্যাখ্যা’-প্রসঙ্গে ইহার সদুত্তর বর্ণন করছি—“স্বরূপের অভিব্যক্তি হলে সেবা-কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা করবে না। তবে ভক্তের সেবা করবে কেন? এ প্রশ্ন এলে বলতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেবা পদার্থ। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে পড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না করে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হবে না।”

শুদ্ধবৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান্ সর্বদা অত্যন্ত আসক্ত হয়ে প্রীতির সহিত অবস্থান করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়,—

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥

ভক্তি বা প্রীতি ভগবানের সহিত যোগসূত্র। কৃষ্ণভক্তের শক্তি বা কৃষ্ণের কৃপাশক্তি সদৃশ চরণাশ্রয় ব্যতীত এবং তাঁর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত মায়ার হস্ত হতে উদ্ধার হওয়া যায় না ও ভগবানকে লাভ করে তাঁর সুখবিধান-সেবায় আত্মনিয়োগ করা আদৌ সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব যে কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণদাস হওয়ার যোগ্যতা যে কিরূপ ; তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।

অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥

আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ নাশ।

তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৫-১০৬)

মন্ত্র-সিদ্ধিতে সংসার-মুক্তি হয়, তৎপরে শুদ্ধাভক্তি বা নিষ্ঠাভক্তি বা সাধন-ভক্তি আরম্ভ হয়। মন্ত্রসিদ্ধির পূর্বে সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়া। মন্ত্রসিদ্ধি হলে প্রাকৃত অহঙ্কার থাকে না। তখন নিষ্কাম হয়ে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি-বাঞ্ছা-শূন্য এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ হয়ে শান্ত বা সুখী হয়। ইতর কামনা তথা ভুক্তি-কামী, মুক্তিকামী জ্ঞানী ও অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগী—এইসমস্ত কামনায়ুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ভগবৎসেবাকামী ব্যক্তিই সুখী। মন্ত্রসিদ্ধি হলে ভগবৎসুখার্থ ভগবৎসেবা করার বাঞ্ছা ও সৌভাগ্য হয়। শাস্ত্রে ধ্বনিত হয়,—

“কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার-মোচন।

কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

শাস্ত্র আরও বলেছেন,—‘জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এবং কৃষ্ণই জীবের নিত্য প্রভু। কিন্তু যারা এই শাস্ত্র-বাক্য স্বীকার করে না, তাদের সংসার-দুঃখ অনিবার্য।’

লোকশিক্ষক ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং স্বকীয় ভক্ত বৈষ্ণবের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করে সমগ্র জগৎবাসীকে বৈষ্ণব-সেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন,—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।

বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করয়ে আপনে॥

দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৫৬, ৪১)

আদিপুরাণে ভগবান্ বলেছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্রক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ—“হে অর্জুন! যাঁরা আমার ভক্ত, তাঁরা আমার ভক্ত বলে গণনীয় নন। মদীয় ভক্তগণের ভক্তেরাই মদীয় সর্বোত্তম ভক্ত বলে পরিকীর্তিত।”

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য

(জয়) মহাবিশ্বের অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

গৌরে আনিতে অবনীতে তুমি শ্রেষ্ঠ আর্য্য॥

তুমি সে আনিলে গৌর হুঙ্কার করিয়া।

নেত্র বুজি’ গঙ্গাজল-তুলসী প্রদানিয়া॥

এস হে গৌর একবার করুণা করিয়া।

তুমি না উদ্ধারিলে জীব যাবে যে মরিয়া॥

কলির করাল গ্রাসে সবে যায় যে ধাএগ।

মুই মোর ইত্যাকার (বৃথা) অভিমান লএগ॥

কেবা কার মাতা পিতা কেবা কার পতি।

মিথ্যা অভিমানে তারা রয়েছে যে মাতি’॥

স্বরূপতঃ জীব হয় ‘নিত্য কৃষ্ণদাস’।

ইহা ভুলি’ জীবের যে হয় সর্বনাশ॥

(প্রভু) গৌরে না আনিলে জীবে কেবা উদ্ধারিত?

হরিনাম মহামন্ত্র কেবা প্রদানিত??

তুমি ত' করুণাময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

জীবের মঙ্গল লাগি' তুমি গৌরবার্য্য ॥

লহ হে চরণে তব মম ভক্তি অর্ঘ্য।

জয় জয় প্রভু মোর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ॥

জন্মে জন্মে গৌর-চরণে দেহ' মোরে রতি।

জয়াদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তোমায় রহ মতি ॥

শ্রীঅদ্বৈত-চরণানুচরানুগ কৃপাপ্রার্থী—

—শ্রীভক্তিবৈদান্ত সাধু

পাঠান বৈষ্ণব

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেছেন। দ্বাদশ বন পরিক্রমা করিয়া তিনি অক্লুরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই অক্লুরঘাটে অক্লুর জলমধ্যে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন—এইকথা স্মরণ হইবামাত্র মহাপ্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া গেলেন এবং জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। আর উঠেন না। ইহা দেখিয়া সঙ্গী কৃষ্ণদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই কৃষ্ণদাস রাজপুত্র বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া খুবই আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করেন। কৃষ্ণদাসের চীৎকার শুনিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দৌড়াইয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে জল হইতে উঠাইলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস বিপ্র পরামর্শ করিলেন—প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া যাইতে হইবে। মথুরার নিকটে গঙ্গাতীরে সোরো ক্ষেত্র। প্রথমে সেখানে গিয়া সেখান হইতে মাঘ মাসে প্রয়াগে গিয়া মকরস্নান করাই ভাল। ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট গিয়া কহিলেন,—“প্রভু! এখানে বহু লোকের গুণ্ণগোল। প্রাতঃকালে আপনার নিকট কত লোক আসে। আপনাকে পায় না। তজ্জন্য আমাদের নিকট কত জুলুমবাজী করে। আমরা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি। চলুন, আমরা মাঘ মাসে মকর স্নান করিবার জন্য প্রয়াগ যাই।” যদিও মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে কোথাও যাওয়ার আদৌ ইচ্ছা নাই, তথাপি ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী গৌরহরি ভট্টকে বলিলেন,—“ভট্ট! তোমার ঋণ আমি জীবনে কোনদিন শোধ করিতে পারিব না। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে। তুমি আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইলে। আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি সেখানেই যাইব।”

মহাপ্রভু প্রাতঃকালে স্নান করিলেন। বৃন্দাবন ছাড়িতে হইবে। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান নাই। যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন,—“চলুন, আমরা গোকুল মহাবন যাই।” এই বলিয়া প্রভুকে নৌকায় বসাইয়া পরপারে লইয়া গেলেন। রাজপুত প্রেমী কৃষ্ণদাস ও মাথুর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ—এই দুইজনের গঙ্গাতীরে পথে যাইবার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তজ্জন্য ভট্ট তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ—এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। পথ চলিতে চলিতে তাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা বুঝিয়া মহাপ্রভু পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসিলেন। সেই বৃক্ষের নিকটে অনেকগুলি গাভী চরিতেছে। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ব্রজলীলা-স্মৃতি জাগরিত হইল। আবার সে-সময় এক গোপবালক হঠাৎ বাঁশি বাজাইতে লাগিল। সে বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রভু এমন প্রেমাবিষ্ট হইলেন যে, তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে লাগিল ও তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গেল।

এমন সময় ঘোড়ায় চড়িয়া দশজন ম্লেচ্ছ পাঠান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দলপতি ছিল পাঠান বিজলী খান। বিজলী খান মহাপ্রভুকে প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় মুচ্ছিত দেখিয়া প্রভুর সঙ্গীগণকে প্রভুর হত্যাকারী দস্যু মনে করিল এবং ভাবিল—এই সন্ন্যাসীর নিকট নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান স্বর্ণাদি ছিল। এই চারিজন দস্যু সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছে। সেই পাঠান চারিজনকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং কাটিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে গৌড়ীয়া দুইজন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ ঘাবড়াইলেন না বা ভয় পাইলেন না। সাহস করিয়া নির্ভয়ে পাঠানকে তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ কথাবার্তায় খুব পটু ছিলেন। তিনি পাঠান বিজলী খানকে বলিলেন,—“পাঠান! আমি মাথুর ব্রাহ্মণ। এই সন্ন্যাসী আমার গুরু। বাদশাহের কাছে আমার একশত জন লোক আছে। এই সন্ন্যাসী কখনও কখনও মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। এখনই ইঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমাদের কাছে বাঁধিয়া রাখুন। আমরা কোথাও পলাইব না। ইঁহার জ্ঞান ফিরিলে ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। যদি ইঁনি আমাদের দস্যু বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের মারিয়া ফেলিবেন।” পাঠান খুব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—“তোমাদের কথাবার্তায় তোমরা দুইজন পশ্চিমা মাথুর ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই দুইজন ভয়ে কাঁপিতেছে কেন? ইঁহারা নিশ্চয়ই গৌড়ীয়া ঠকু।”

কৃষ্ণদাস সাহস করিয়া পাঠানকে ভয় দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন,—“দেখ, এই গ্রামেই আমার বাড়ী। আমার দুইশত তুর্কী সৈন্য এবং একশত কামান আছে। আমি তাহাদিগকে ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে মারিয়া ঘোড়া প্রভৃতি সবই লুট করিয়া লইবে। এই দুইজন গৌড়ীয়া বাটপাড় বা দস্যু নহে। ইহারা সাধু। তোমরাই বাটপাড় দস্যু। তোমরা নির্দোষ তীর্থযাত্রীদের সর্বস্ব লুট কর।

এমন সময় মহাপ্রভুর বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি ‘হরি’ ‘হরি’ বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তিনি প্রেমাবেশে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাপী স্লেচ্ছের হরিনাম ভাল লাগিল না। হরিনাম ধ্বনি যেন তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে ভয় পাইয়া প্রভুর সঙ্গী চারিজনকে ছাড়িয়া দিল। মহাপ্রভু আর তাহাদিগকে বন্ধন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন। স্লেচ্ছগণকে সম্মুখে দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন। তাহারা মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন এবং চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—“এই চারিজন ঠক্। ইহারা চারিজনে মিলিয়া তোমাকে ধতুরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়া তোমার সমস্ত ধন লুটিয়া লইয়াছে।” তাহাদের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—“ছিঃ! ছিঃ! ইহারা ঠক্ নহেন, পরম সাধু। ইহারা আমার সঙ্গী। আমি ত’ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার কিছুই ধন নাই। আমার মৃগী রোগ আছে। আমি কখনও কখনও অচেতন হইয়া পড়ি। এই চারি মহাত্মা দয়া করিয়া আমায় পালন করেন।”

পাঠানগণের মধ্যে একজন ‘মৌলানা’ ছিলেন। তাহার পরিধানে কালো রঙের বস্ত্র ছিল। তাহাকে সকলে ‘পীর’ বলেন। প্রভুর দর্শনে সেই পীরের চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং নম্রভাবে প্রভুর নিকট নিজশাস্ত্র কোরাণ হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কারণ ইহাদের মত হইতেছে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম। মুসলমান-শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারাই মহাপ্রভু ‘অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ’ সমূহ খণ্ডন করিলেন। প্রভুর মুখে শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিয়া সেই পীর স্তব্ধীভূত হইয়া গেলেন। তাহার মুখে আর কোন উত্তর আসিল না। মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন,—“মুসলমান-শাস্ত্রে প্রথমে নির্বিশেষত্বের কথা আছে বটে, কিন্তু পরিশেষে সবিশেষ ব্রহ্মেরই স্থাপন দেখা যায়। কোরাণে সর্বশেষে সবিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ঈশ্বর দর্শন বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণ বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে বলিয়াছেন,—একই ঈশ্বর। তিনি সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, সর্বাত্মা ও সর্ববজ্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাহা হইতেই হয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য, সর্বকারণের কারণ। সেই ঈশ্বরের সেবা

না করিলে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না।” আপনাদের শাস্ত্রে ভগবচ্চরণে প্রীতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন। তাহাতে কর্ম, যোগ, জ্ঞানাদি স্থাপনপূর্বক সর্বশেষে উহা খণ্ডন করত ঈশ্বরের সেবারই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। কোরাণে পূর্বের কর্ম, জ্ঞান, যোগ বলিয়া শেষে ভগবদ্ভক্তিকেই স্থাপন করিয়াছেন।” প্রভু বলিলেন,—“আপনারা মুসলমান পণ্ডিতগণ কোরাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। পূর্বের কর্ম ও জ্ঞান বিধি অপেক্ষা পরবর্তী ভক্তি বিধিই বলবান।” মৌলানাকে প্রভু নিজের শাস্ত্র দেখিয়া বিচারপূর্বক উহার যথার্থ্য নির্ণয় করিতে অনুরোধ করিলেন। মৌলানা প্রভুর শ্রীমুখে প্রকৃত তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া প্রভুবাক্যকে সত্যজ্ঞানে অনুমোদন করিলেন এবং প্রভুকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—“প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমি অত্যন্ত অযোগ্য, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। আমাকে আপনি কৃপা করুন। আমি সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই।”

শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে মৌলানার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণনামের স্ফূরণ হইল। তাঁহার জড় অভিমান দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি প্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—“আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কোটা জন্মের পাপ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। আপনার জীবন পরিম পবিত্র হইল।” প্রভু সকলকেই কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে পাঠানগণ সকলেই ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই মৌলানাকে প্রভু নাম দিলেন—‘রামদাস’।

পাঠান দলপতি ছিলেন বিজলী খান। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল। রামদাস প্রভৃতি পাঠানগণ তাঁহার ভৃত্য ছিলেন। রামদাসের প্রতি মহাপ্রভুর এইপ্রকার করুণা দেখিয়া বিজলীখানের হৃদয়ে ভাবের উদয় হইল। তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহার আর্তি দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। ধন্য বিজলীখান, তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া গেল। প্রভুর কৃপায় পাঠানগণ বৈরাগী হইলেন। ‘পাঠান বৈষ্ণব’ বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি হইল। তাঁহারা সর্বত্র মহাপ্রভুর গুণগান কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই পাঠান-দলপতি বিজলীখান পরম বৈষ্ণব মহাভাগবত বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত হইলেন এবং সর্বত্রীর্থে তাঁহার পরম মহত্ব কীর্তিত হইতে লাগিল।

জয় মহাপ্রভুর ভক্ত পাঠান বৈষ্ণব কি জয়।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[স্থান—ধুবুড়ী হরিসভা (আসাম), তাং—৫/৪/১৯৯০]

সর্বপ্রথমে পরমারাধ্যতম জগদগুরু নিতালীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সান্ত্বিঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, মাননীয় প্রধান অতিথিবর্গ, সুধী সজ্জন-মণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলী। আজ আমাদের সনাতন-ধর্ম আলোচনা সভার দ্বিতীয় দিবস বা অন্তিম দিবস। বহু কথাই আমরা শ্রবণ করবার সুযোগ পেলাম বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ থেকে, সাধুসন্ন্যাসিগণের শ্রীমুখ থেকে। তার মধ্যেই কিছু প্রশ্ন হয়েছে। সর্ব-প্রথমে আমার মূল বক্তব্য সনাতন ধর্ম নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, এ আলোচনার মধ্যে দুটা ভাব আছে। একটা অম্বয়মুখী আলোচনা, আর একটা ব্যতিরেকমুখী আলোচনা। দুটোই প্রয়োজন আছে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে, বাস্তবসত্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এ রীতি শাস্ত্রেই প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা সনাতন ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করব। তিনি প্রথমে সূত্রাকারে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেছেন—যার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত, তার শেষের দিকে কিভাবে আমরা তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনা করব, তার একটা নির্দেশনামা রেখেছেন। বলছেন সেখানে,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

অম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥

আলোচনা অম্বয়মুখী ও ব্যতিরেকমুখী দুটোই চাই। যাকে আমরা আজকাল বলি Comparative study। এটা না হলে আলোচনা সর্বাস্তসুন্দর হয় না, তত্ত্ববস্তু প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেজন্য দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা একটা শ্লোক দেখতে পাই এরই অনুকূলে,—

“ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেৎ বুদ্ধিমান্।”

দুঃসঙ্গ ছাড়, সাধুসঙ্গ—সৎসঙ্গ গ্রহণ কর। খারাপটাকে ছাড়তে বলছেন। সে-সম্বন্ধেও আলোচনা। ‘সৎসু সজ্জেৎ বুদ্ধিমান্’—সাধুসঙ্গ কর, এরও ক্ষেত্র রয়েছে Positive side। সুতরাং Positive-negative দুটো দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে শাস্ত্রে। সনাতনধর্ম আলোচনা করতে গেলে আমাদের এ ভাবটা রাখতে হবে।

আমার কাছে কিছু প্রশ্ন এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে—ধর্মসভায় আমরা হিন্দুধর্ম ছাড়াও বর্তমান রাজনীতির যে ভয়াবহতা, এ সম্বন্ধেও কিছু শুনতে চাই। যদি এটা ধর্মানুকূলে হয়, তাহলে আলোচনা করতে দোষ নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায়, আজ যাঁরা বিশ্বে বিদ্বজ্জনবরণ্য আছেন, চিন্তাশীল মনীষী যাঁরা

আছেন, তাঁরা অনেকেই মনে করছেন যে, ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে, ধর্মকথা আলোচনার ক্ষেত্রে বোধ হয় রাজনীতির আলোচনা অপয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু এখানে নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই—সবটা নিয়েই পাশাপাশি আলোচনা করা চলে মূলবস্তুকে স্থাপন করবার জন্য। সনাতনধর্মই যদি আমাদের স্থাপনের বিশেষ প্রচেষ্টা থাকে, উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আশেপাশে সবগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে ক্ষতি হয় না কিছু মূল বস্তুকে প্রতিষ্ঠার জন্য। আর মূল বস্তুকে পরিত্যাগ করে যদি আমরা ডালপালা নিয়ে টানাটানি করি, তাহলে মুশ্কিল হয়ে যাবে। বহু ব্যক্তি বলছেন,—ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। আবার কেউ কেউ বলছেন,—রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত হতে পারেন নাই।

শাস্ত্র আমাদের যে যুক্তি দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে আমরা দেখতে পাই, আলোচনার ক্ষেত্রে সবটাই করা চলে, যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয়। যাঁরা রাজনীতি করছেন, তাঁরা যদি ধর্মনীতির আবরণে রাজনীতি করেন, সেটা নিশ্চয়ই অন্যায়। আবার যাঁরা সত্য সত্যই বাস্তব সনাতনধর্মী, তাঁরা যদি ধর্মীয় অনুশাসনকে নিয়ে চলতে চান, তাহলে সেখানে রাজনীতিটা মিশিয়ে ফেলবেন না। কেন বলছেন এটা? এটা স্বয়ং কৃষ্ণই গীতার মধ্যে বলেছেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমর আরম্ভ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার একমাত্র কারণ হল—নীতি-আদর্শের বিরোধ। একদল তারা নীতি-আদর্শকে মেনে চলছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁরা হলেন পাণ্ডবপক্ষ। আর একদল তারা নীতি-আদর্শ-বিরোধী। যাদের সমান অধিকার আছে রাজ্যে, সম্পত্তিতে, তাদের বঞ্চিত করছেন। সে দলকে বলা হয়েছে কৌরবপক্ষ। ধর্মযুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একটা কথা আছে, এটা থাকবেই। কিন্তু কার জয়, কার পরাজয় কিভাবে হবে, সে-সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছেন,—ঘটনাটা কি হবে? কোন্ পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করবে? উত্তরটা যেন তিনি আগেভাগে পেয়ে বসে আছেন।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণে যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

এত্র শ্রীবিজয়ো ভূতীর্ধ্বা নীতির্মতির্মম॥

‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’—‘যথা ধর্ম তথা জয়’ কথাটা বুঝাতে চাচ্ছেন। যে দলে ভগবান্ আছেন সেই দল জয়লাভ করবে। ভগবদ্বিশ্বাসী, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সনাতনধর্ম-বিশ্বাসী যারা ঠিক নন, তারা কিন্তু অন্যরকম চিন্তা করছেন। যেমন দুর্যোধন অন্যরকম চিন্তা করেছে। ইনি ভগবানের নারায়ণী সেনা চেয়েছেন যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য। অর্জুনও গিয়েছিলেন, তিনি গিয়ে ভগবানের পায়ের কাছে বসেছেন ; আর দুর্যোধন ভগবানের মাতার কাছে গিয়ে যে সিংহাসন সেইখানে

বসেছেন। অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি চাও? তিনি বললেন,—ঠাকুর! আমার প্রতি তোমার স্নেহদৃষ্টি থাকলে হবে। কথা সত্য। ভগবান্ যে জিনিষটাকে—নীতি-আদর্শ বুঝাতে চাচ্ছেন জগৎকে, সেই নীতি-আদর্শের পূর্ণ তত্ত্বদর্শন হলেন ভগবান্। তা তিনি যদিও থাকবেন, সেদিকে ত' জয় হবেই। এটা ত' জানা কথা। তথাপিও কুরুক্ষেত্রে মহাসমর শুরু হয়েছে। শিক্ষা তার ভিতরে আমাদের নিতে হবে। সেই শিক্ষারই বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে গীতার মধ্যে।

প্রথমে অর্জুন বলেছেন,—“সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত॥” ভগবান্ কৃষ্ণ তিনি যুদ্ধ করবেন না—এইরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি অর্জুনের সারথিগিরি করতে বসেছেন। উভয় সৈন্যপক্ষের মাঝখানে রথ দাঁড় করালেন। দেখ তুমি, দেখে নাও সব। যখন তিনি বলছেন,—এদের বধ কর, এরা সব আততায়ী। আততায়ীকে বধ করলে তোমার কোনরূপ পাপ স্পর্শ করবে না, অর্জুন তখন আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন,—এঁরা গুরুবর্গ—“মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥” আমি এঁদের বধ করতে পারব না। মহাপাপে আমি লিপ্ত হতে পারব না। তিনি আবার বলছেন,—আমি ভিক্ষু মেগে খাব, তথাপি এ যুদ্ধ চাই আমি না।

কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ।

যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রাহ্মি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

কার্পণ্য-দোষ। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব যার মধ্যে আছে, তাকে কৃপণ বলা হয়। তার মধ্যে কার্পণ্যভাব আসে। বৈদিক ব্যাখ্যা এটা। উপনিষদের মধ্যেও এ ব্যাখ্যা আছে। আমরা যাকে ‘কৃপণ’ বলি, আর ‘দাতা’ বলি, শাস্ত্রে ঠিক ‘কৃপণ’ আর ‘দাতা’ তাকে বলেন না। কৃপণ কাকে বলছেন? “য এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাং প্রৈতি স এব কৃপণঃ।” হে গার্গি! অক্ষর পরব্রহ্মকে না জেনে যারা এ জগৎ থেকে চলে যাচ্ছেন, তাঁরাই হলেন কৃপণ। আত্মকল্যাণ চিন্তা তারা করলেন না। আবার বললেন, দাতা। কে দাতা? তার নাম বলছেন ব্রাহ্মণ। “য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাং প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ।” অক্ষর পরব্রহ্মকে জেনে যারা এ জগৎ থেকে চলে যেতে পারছেন, তাঁরাই হলেন তত্ত্বদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী। সুতরাং শাস্ত্রীয় যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেটা একটা অদ্ভুত রকমের। আমাদের যে শব্দের পরিচিতি, আমাদের যে শব্দসামান্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এটা দোষ-ত্রুটীযুক্ত। শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যাবে, যে শব্দের যে অর্থ আমরা জেনে রেখেছি, বুঝে রেখেছি, শাস্ত্রীয় অর্থ—বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-গীতা-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতের যে অর্থ, সে অর্থ থেকে সম্পূর্ণ উল্টো। সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে অভিধাবৃত্তিতে, লক্ষণাবৃত্তিতে। লক্ষণাবৃত্তি একটা Negative side, অভিধাবৃত্তি positive side। আমাদের অভিধাবৃত্তিতেই সব জিনিষটা জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে। কৃষ্ণ বললেন,—

“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।”

হে অর্জুন! দেখ, আমার সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার। আমি সকলের কাছে সমান, আমার কেউ দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। সাধারণ কথা এটা, একটা আইনের কথা। কিন্তু বিশেষ বিধির কথা কথা তিনি আবার বলছেন,—

“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥”

যিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ-মমতা করেন, ভালবাসেন, যার আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, তিনি আমার বিশেষ প্রিয়। এই বিষয়টা কৃষ্ণ যেমন বুঝাতে চেয়েছেন, ঠিক ঐ জিনিষটা আজ দুনিয়ায় সংসারেও আছে, আমরা দেখতে পাই। মা-বাপের যদি পাঁচটা সন্তান, তার ভিতরে কোন একটা বিশেষ সন্তানের প্রতি হয়ত’ পিতা-মাতার, অভিভাবকের স্নেহ-মমতা অধিক আছে। এটাকে একটোখো বিচার বা Partiality, ঠিক তেমন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। যে সন্তান—পুত্র-কন্যা তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বিশেষভাবে অর্পণ করে, নির্ভর করে, তাদের প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা থাকা স্বাভাবিক। কৃষ্ণ সেইটাই বুঝিয়েছেন—“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥” আমার যে ভক্তের আমার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, তার প্রতিও আমার বেশী টান একটা আছে। এটা কোন দোষের কথা নয়। ঠিক এই বিচারটা দেখিয়েছেন।

জাগতিক যে-সকল বিধি-ব্যবস্থাগুলো আমরা নিয়েছি, সে-সব বিধি-ব্যবস্থার ভিতরে দোষ-ত্রুটি আছে, গলদ আছে। আইনকানুন যত এখানে আছে, অধিকাংশ আইনকানুনগুলো—Indian Penal Code-এর আইনগুলো ঋষিনীতি থেকেই নেওয়া হয়েছে, ঋষিশাস্ত্র থেকেই নেওয়া হয়েছে। ঋষিগণ সমাজ-ব্যবস্থা দিয়েছেন। সমাজ কি করে চলবে, আমরা কি করে পরস্পর মিলেমিশে চলব, সে-সব ব্যবস্থা-গুলো ত’ ঋষিগণ রেখেছেন স্মৃতিশাস্ত্রে। মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিতা, দক্ষ, গৌতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ যে সমাজ-ব্যবস্থা রেখেছেন, সেগুলো নিয়েই ত’ বহু আইন প্রণীত হয়েছে। শুধু আমাদের ভারতবর্ষে নয়, পাশ্চাত্যদেশে, বৃটিশ পার্লামেন্টে ও অন্যান্য পার্লামেন্টেও দেখতে পাওয়া যায় সেই আইনগুলো। প্রত্যেকটা দেশেরই সংবিধান—Constitution আছে, কিন্তু সেই Constitution পরিবর্ত্তনযোগ্য, পরিবর্ত্তনযোগ্য। যখনই কিছু আমরা অসুবিধা মনে করছি, তখনই সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্র যাকে বলা হচ্ছে, এর অপর নাম Spiritual constitution, এর কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন নাই। এর কোন Addition, alteration নাই। এটা Everlasting, unchanging, unchallenging। এটা সর্বকালিক সত্য, এর কোন পরিবর্ত্তন, পরি-

বর্জন হয় না। এটা Axiomatic Truth, Universal Truth—বাস্তবসত্য, চিরসত্য। সুতরাং ভগবান্ প্রত্যেকটি বিষয়ে—গীতার ভিতরে যা বলতে চেয়েছেন, এর একটা Grade আছে, তর-তম রয়েছে, স্তরভেদ রয়েছে। সেই কথাটা বুঝাতে চেয়েছেন কৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে গীতায়।

প্রথমে তিনি প্রাকৃত নীতির কথা বুঝাতে চেয়েছেন অর্জুনকে দিয়ে। কিন্তু সেই প্রাকৃত নীতি যেন অর্জুন ঠিকমত পালন করতে পারছেন না। পূর্বেই বলে নেওয়া ভাল যে, অর্জুন আমাদের মত বোকা-হতভাগা ছিলেন না, অত্যধিক ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি পরম তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি। যিনি ভগবানের সঙ্গে সখ্যভাব স্থাপন করতে পেরেছেন, সে ব্যক্তি ত' কমা নন। তথাপি ভগবান্ তাঁকে দিয়েই জগৎকে তত্ত্বদর্শন শিখাতে চাচ্ছেন, জানাতে চাচ্ছেন, বুঝাতে চাচ্ছেন। সেইক্ষেত্রে দেখা যায়, গীতার একাদশ অধ্যায়ের 'বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ' আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বরূপ দর্শন জিনিষটা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একরকমের উন্নত ধারণা, আর শাস্ত্রীয় বিচার অনুসারে দেখা যায়, ওটা খুব একটা উন্নত চিন্তা নয়, ওটা প্রাকৃত। সেইজন্য যত টীকাকার, ভাষ্যকারগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা এই কথাই বলেছেন। বিশ্বরূপোপাসনা—এটা প্রাকৃত, জড়। কিছু Sugar coating বলে মনে হয়, খুব একটা উন্নত ধরণের ব্যাপার নয়। আমরা বহু জায়গায় যখন প্রচারে যাই, তখন অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেন, স্বামীজি! একটু গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে চাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়ের ষটপঞ্চাশৎ-বর্ষ

বিগত পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষকাল শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের সেবা করিয়া শ্রীপত্রিকা অদ্য নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্মের শিক্ষামৃত যাঁহাদের বিশেষ রুচিকর, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই আমরা সর্বদা ব্যগ্র। দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক গৌড়ীয় গুরুবর্গ ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত-পথে শ্রীপত্রিকা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের সূচী সেবাবিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রতিকূল বর্জন না হইলে, আনুকূল্য গ্রহণ কখনই সম্ভব নহে। তজ্জন্য বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুগণ ভজন-প্রতিকূল অন্যাভিলাষাদি পরিত্যাগপূর্বক হরিভজনানুকূল পরিবেশে অবস্থানকেই বাস্তব কল্যাণ বা আত্যন্তিক মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং অম্বয়-ব্যতিরেকভাবে তুলনামূলক আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকিলে যথার্থ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আমরা সর্ববিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত শ্রীশ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী ও শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইতেছি। সাধন-ভজনক্ষেত্রে তাঁহাদের শুভেচ্ছা শুভাশীর্বাদই আমাদের একমাত্র পাথের ও সম্বল।

বর্তমানে একশ্রেণীর লোক বলেন,—ধর্মই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম জাতিকে দাস-মনোভাবাপন্ন করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণায় যে ‘ধর্ম’, তাহা বাস্তবিক অধঃপতনের কারণ, উহা অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের নামে বর্তমানে সমাজে কতই না দুর্নীতি চলিতেছে। এখন বুজরুকীকেই মানুষ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছে। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া কোন কোন ব্যক্তির ধর্মের প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া পড়িতেছেন। ধর্মের নামে যখন লোকে ভণ্ডামি করে, তখন ধর্মমাত্রই খারাপ—এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। বালক ও তরুণ সমাজ যাহাতে ধর্মের সংস্পর্শে না আসিতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদিতে ধর্মালোচনা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ আমরা যখন নিত্যধর্মের বিরোধী হই, তখনই জড়ের উন্নতি-অবনতিকেই বহুমানন করিয়া বসি। এরূপ হইলে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। আত্মার অনুশীলন ব্যতীত মানব-সভ্যতার যাবতীয় অধঃপতন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

“নূতন কিছু কর রে ভাই নূতন কিছু কর।” বহুপূর্বে সংস্কৃত ভাষাকে Dead Language করিয়া তাহাকে নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে মাননীয় সরকার বাহাদুর ‘লিপি-সংস্কারের’ নামে প্রচলিত বাংলা ভাষার বহু যুক্তাক্ষর পরিবর্তন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বাংলা ভাষা হইতে সংস্কৃতাত্মকে বাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি হল—“ইহাতে শিশু ও নবসাক্ষরদিগের যুক্তাক্ষর শিখাইতে সুবিধা হইবে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের যে বাংলা ব্যাকরণ পড়তে হয়, তা ভীষণভাবে সংস্কৃতানুসারী। যে-সব সন্ধিবদ্ধ তৎসম শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে, সেগুলির সন্ধির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণে শেখানোর দরকার নেই। ** এটা সংস্কৃত নিয়ম।” তাহা হইলে কি এতদিন বাংলা ভাষা যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কি অক্ষর শিখিতে খুব অসুবিধা হইত? লিঙ্গ-পক্ষপাতিত্বের বিলোপসাধন করিতেই স্কুলপাঠ্য থেকে ‘পুরুষের’ নির্বাসনও অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। জনৈক শিক্ষাবিদ এইরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন,—“সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের মনোনীত সদস্যেরা একতরফাভাবে বানান বা লিপি-সংস্কার নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত কারও উপর চাপিয়ে দিতে পারে না।”

অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। সুতরাং বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতাত্ম থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষা হইতে উক্ত সংস্কৃতাত্মকে বাদ দিয়া ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতাকে

নষ্ট করিবার ইহা এক প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট উক্ত যুক্তাস্করগুলির হয়ত' কোনও মূল্য থাকিবে না এবং তাঁহারা প্রাচীন বাংলা রচনাবলী ও সংস্কৃত গ্রন্থালোচনার অধিকার হইতে চিরবঞ্চিত হইবেন।

যে দেশের রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকাগণ দুর্নৈতিক ও অধার্মিক, সে দেশের কি কখনও মঙ্গল হইতে পারে? যাঁহারা ঘুষখোর, শঠ, প্রতারক ও সমাজের অবাস্তিত ব্যক্তি-গণকে কঠোরহস্তে দমন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধা কিরূপে থাকিতে পারে? দেশবাসীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় বহু উপদশে প্রদান করিলেও তিনি ধর্মীয় অনুশাসনে যুবসমাজ গঠনের জন্য একটীও শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। হয়ত' বা তিনি মেকী সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে তাহা উচ্চারণ করিবার সংসাহস দেখাইতে পারেন নাই। মেরুদণ্ডস্বরূপ ধর্মই মানবজাতির বাস্তব কল্যাণ করিতে সমর্থ। সেই ধর্মালোচনা তথা নীতি-আদর্শকে অবাস্তিতবিধায় পরিত্যাগ করার জন্য আজ মনুষ্যসমাজের তথা দেশের চরম অবক্ষয় পরিলক্ষিত হইতেছে।

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।”—শাস্ত্রীয় এই বাক্য লইয়াও বর্তমানে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। কালের এমনই অসাধারণ প্রভাব! বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ সবই এক। সুতরাং শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করার যে নীতি, তাহা আর চলিবে না। প্রকৃত চোর ‘ঐ চোর’ ‘ঐ চোর’ বলিয়া নিজেকে যেমন সাধু প্রতিপন্ন করিতে চায়, তদ্রূপ অসৎ প্রকৃতির লোকগুলিই সংখ্যাধিক্য হইয়া সাধুগণকেই অসাধু বলিয়া হয়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের যতই প্রভাব বা প্রতাপ বিস্তার লাভ করুক না কেন, তাহা সংখ্যালঘিষ্ঠের গুরুত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের অধীনে আসিতে বাধ্য।

বর্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত “শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থখানি আদি-সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহাতে অনুভাষ্য, অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য এবং অপসিদ্ধান্ত-নিরসনমূলক ‘অমৃতানুকণা-ভাষ্য’ নামে একটী ভাষ্য সন্নিবেশিত হইল। সুধী সজ্জনবৃন্দ উক্ত গ্রন্থ আলোচনা করিলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈদিকী বাণীই আমাদের একমাত্র অনুশীলনীয়, আলোচনীয় ও গ্রহণীয়। ইহা ব্যতীত অন্য সকল পথই কুপথ, বিপথ বলিয়া পরিগণিত।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়সুত্ৰদ্বাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পূমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

FORM-IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central)
Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali
month, i.e. once in a month.
3. Printer's name—Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta
Acharyya Maharaj
Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba,
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's name—Do
Nationality—Do
Address—Do
5. Editor's name—Tridandi Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Narayan Maharaj
Nationality—Indian Goudiya-Vaishnaba,
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W.B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one per cent of the capital,—
Tridandi Swami Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Swami Bhakti Vedanta Acharyya hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ Swami B. V. Acharyya

Dated 29.2.2004

Signature of Publisher

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদে জয়তঃ

卐	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	卐
ধর্মঃ স্তুতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।		নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
卐	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	卐

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
---	---

৫৬শ বর্ষ }	৮ মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ ৩০ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪১০, ইং ১৩/৪/২০০৪	{ ২য় সংখ্যা
------------	--	--------------

সানুবাদঃ

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

[শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অমিত-ভবদবাকৌ দহমানং চিরান্মাং
কথমপি কলয়িত্বা পূর্ণকারুণ্যমূর্তিঃ ।
নিজ-সহজজনান্তে স্বীচকারেশ্বরো য-
ন্তুমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥১॥

যে কারুণ্যঘনমূর্তি পরমেশ্বর চিরকাল অসীম সংসারতাপে দহমান আমাকে কোনওপ্রকারে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় বিশুদ্ধ দাসের শ্রীপাদপদ্মে ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই মহারূপবানু শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥১॥

নিখিল-জন-কুপুং মাং কৃপাপূর্ণচেতা
নিজচরণসরোজ-প্রান্তদেশে প্রণীয় ।

নিজ-ভজনপদ-ব্যাবর্তয়দ্-ভুরিশো য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥২॥

যে দয়াদ্রুচিন্তা নিখিল জনগণের মধ্যে কুৎসিত আমাকে স্বীয় ও স্বীয় ভক্ত-
গণের শ্রীপাদপদ্মের প্রান্তদেশে আনয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজ ভজন-পথে রক্ষা
করিয়াছেন, সেই পরম রূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে নিত্যকাল সেবা করি ॥২॥

অশুচিমরুচিমস্তং সন্ততং ভক্তিয়োগে

বিহিতবিদিতমস্তং জন্তুজাতাধমঞ্চ ।

অকৃপণকরুণাভিঃ পাতি মাং পাতিনং য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৩॥

অপবিত্র, ভক্তিয়োগে সর্বদা অরুচিশীল, শাস্ত্রসদাচারাদি জানিয়াও অন্যথা-
চরণরূপ অপরাধ-পরায়ণ এবং নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে অধম ও পাতকী আমাকে
যে করুণাসাগর স্বীয় মহতী করুণাধারা সর্বদা রক্ষা করেন, সেই মহারূপবান্
ক্ৰীড়াবিনোদী শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্যকাল ভজনা করি ॥৩॥

অতিমুনিমতি-বৃন্দাং বৃন্দকা-কাননীয়ং

নিজচরিত-সুধালীং বন্ধুহৃৎসিন্ধুপালীম্ ।

বিধুরিব বিধুরং মাং তাঞ্চ সম্ব্যঞ্জয়দ্ য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৪॥

চন্দ্র যেরূপ সুধারশিকে প্রকাশ করে, সিঙ্ধুকে পালন অর্থাৎ সিঙ্ধুর আনন্দ-
বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ যিনি আমার ন্যায় বিকল জীবকে মুনিগণেরও বুদ্ধির অগম্য,
অথচ শ্রীব্রজবাসী বন্ধুগণের হৃদয়রূপ সিঙ্ধুর আনন্দবৃদ্ধিকর শ্রীবৃন্দাবনীয় নিজ-
চরিত সুধারশি সম্যগ্রূপে প্রকট করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি
নিত্য সেবা করি ॥৪॥

স্বপদ-নখরমিন্দুং তাপদন্ধায় দন্তে

মুকুরমজিত-ভক্ত্যা স্বং পরিস্কুর্ষতে চ ।

অপি কিমপি কমিত্রে যস্ত চিত্তামগিৎ মে

তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৫॥

যিনি তাপত্রয়দন্ধ আমার হৃদয়ে স্বীয় শ্রীচরণ-নখর-চন্দ্রমা বিতরণ করিয়াছেন,
যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিদানে আমার চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত করিতেছেন, যিনি কোন
তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করিলেও সাক্ষাৎ চিত্তামগিই দান করেন, সেই মহারূপবান্
শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥৫॥

অকৃত মৃতমিবামুং মাং প্রসাদামৃতাস্তং

তমথ বলিতবাল্যং পাদপদ্মাবলম্বে ।

তদপি কলিত-লৌল্যং স্নেহদৃষ্ট্যাবৃতৌ য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৬॥

যিনি আমার ন্যায় মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদরূপ অমৃত প্রদানে অমৃত করিয়াছেন, যিনি বালক-সুলভ চাঞ্চল্যবিশিষ্ট বা মূর্খ আমাকেও শ্রীপাদপদ্মাবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় মহাচঞ্চল দেখিয়া স্নেহদৃষ্টিদ্বারা আবরণ বা রক্ষা করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥৬॥

অহমতিশয়তপ্তো যঃ কৃপা-পূরিত-হ্রৌ-

রহমতিমতিশীতঃ পাপানাং পাবকো যঃ ।

অহমসমতমস্থান্ বেদধামা স্বয়ং য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৭॥

আমি অত্যন্ত তপ্ত, কিন্তু যিনি কৃপাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ; আমি অতিশয় শীতল বা অলস, আর যিনি পাপসমূহের বা আলস্য-রাশির পক্ষে অগ্নিতুল্য অর্থাৎ জাড্যাপহারক ; আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ আর নাই, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ বেদ—সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করি ॥৭॥

নিজগুণগণদান্না বিপ্রমুক্তান্নিরুদ্ধে

প্রণয়বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈঃ সমস্তাং ।

অথ চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্বিধং য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৮॥

যিনি স্বীয় গুণগণরূপ রজ্জুদ্বারা মুক্তজীবকুলকে নিরোধ করেন এবং তাঁহাদের প্রণয়গর্ভ বিনয়-জালে নিরোধ করেন অথচ যিনি বিপথে বিচরণশীল আমার ন্যায় জীবকেও উদ্ধার করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥৮॥

উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা

নিধিবদপি যদীয় পাদপদ্মং নিষেব্যম্ ।

অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্বদা য-

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥৯॥

যিনি আমার ইহ-পরকালের নিত্য মঙ্গল সর্বদা বিধান করিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রত্নের ন্যায় আমার পরম সেব্য, যিনি উদার কৃপাদ্বারা সর্বদা নিজ প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য

সর্ববেদ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও বিচার করত ব্রহ্মা শত-শত কল্পেও যে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সমস্ত যোগ ও বৈরাগ্যমার্গের একেশ্বর হইয়াও দেবাদিদেব মহাদেব যাহা সর্বদা অন্বেষণ করেন এবং মুক্ত জীবসকল যে ব্রহ্মকে স্ব-মহিমা বলিয়া নিত্য আদর করেন, সেই অখিল সাধন-তত্ত্বের একমাত্র সাধ্যবস্তু এবং সর্বশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ পরম পুরুষার্থ যে প্রেম—তাহাই সম্প্রতি দীনদয়াল মহাপ্রভুর কৃপাকণ অবলম্বনপূর্বক বিচার করিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলিয়া প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন ; যথা,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হএণ করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হএণ ফলে 'প্রেমফল'।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্তনাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুধি' যায় পাতা ॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্ধাম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি'—যত উপশাখাগণ ॥
সেক-জল পাএণ উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হএণ মূল-শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আশ্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥

তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন।

সুখে প্রেমফল-রস করে আশ্বাদন॥

এই ত' পরম ফল—‘পরম-পুরুষার্থ’।

যাঁ'র আগে তৃণতুল্য চারি পরমার্থ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)

মহাপ্রভুর এই রূপককে কবিরাজ গোস্বামী কি অপার পাণ্ডিত্যের সহিত উপরোক্ত পয়ারে বর্ণন করিয়াছেন। জীব যদি এই পয়ারের অর্থ সম্যক বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে ধন্য হয়। জুপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল না মিলে, তাহা এই আটাইশটি পংক্তি ভাল করিয়া বুঝিলে অনায়াসে পাওয়া যায়। কৰ্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবসকল এই ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে। যেইবার ভক্তিবাসনারূপ সুকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইবার ভক্তিতে জীবের শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন। সাধুগুরুর নির্দেশমতে সেই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে চিন্তে ভাল করিয়া রোপণ করেন। জীব তখন মালী হইয়া হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। লতা বাড়িতে বাড়িতে জড়ীয় জগৎকে ভেদপূর্ব্বক চিজ্জগতের সীমারূপ বিরজা পার হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করত চিহ্নিলাসময় পরব্যোমে প্রবেশ করে। ব্রহ্মাণ্ড-ভেদকালে আর একটি প্রকরণ লাভ হয় ; তাহার নাম কৃষ্ণকৃপা। জীব স্বীয় চিৎস্বরূপে ক্ষুদ্র ; তাহার আলোচনা করিতে করিতে জড়-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ-ধৰ্ম্ম নিরন্ত হইয়া জীবের সন্তানশের উদ্যম হইয়া পড়ে। এইসময় কৃষ্ণ-ভক্তের বিশেষ কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা সহায়তা করেন। সে কৃপা এই,—চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীশক্তি অত্যন্ত প্রভাবময়ী। মায়া-নিরসন-সময়ে চিহ্নিশেষ-হানি হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধনভক্তিতে ভাবরূপে উদ্ভিত হন। সেই ভাব-বলে জীব রতিলভ করত ক্রমশঃ উদ্ধগতি লাভ করেন। হ্লাদিনীশক্তির কৃপা-ব্যতীত জীব প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন। পরব্যোমের উপরি-ভাগে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথায় কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে ভক্তিলতা বিস্তৃত হইয়া প্রেমফল প্রদান করেন। মালী এদিকে নিরন্তর হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল লতার মূলে সেচন করিতে থাকেন। যে-সময় লতা অক্ষুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে-সময়ে মালীকে আর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। বৈষ্ণব-অপরাধ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের প্রতি হিংসা-দ্বেষ-নিন্দারূপ অপরাধ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কখন কখন উঠিয়া ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাতে তাহার পত্রাদি

শুদ্ধ হইয়া যায়। কখন বা লতাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। এই সময় মালীকে বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত যেন ঐ প্রকার অপরাধ-হস্তী উঠিতে না পারে। আর এক উপদ্রব এই যে, ভক্তিলতার সঙ্গে সময়ে সময়ে উপশাখা উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্তন-সেকজলে বাড়িয়া বাড়িয়া মূলশাখাকে বাড়িতে দেয় না। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ অকস্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, ক্রুরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্যলাভগ্রহ ইত্যাদি অনেক উপশাখা উৎপন্ন হয়। মালী সতর্ক হইয়া ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতেই ছেদন করিয়া ফেলিবেন। এরূপ করিলে মূলশাখা জড়ীয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃতধাম বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যায়। প্রেমফল পাকিয়া পাকিয়া পড়িতে থাকে এবং মালী পরমানন্দে তাহা সেবন করে। এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ইহার নিকট তুণতুল্য।

এখন প্রেমের স্বরূপ ও প্রকারাদির সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইতেছে। যথা,—

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিন্তামাসৃগ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ৩।১)

তথা (প্রেমভক্তি-লহরীতে ১ম শ্লোক),—

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তে সমত্বাতিশয়াক্তিতঃ।

ভাবঃ স এব সান্দ্ৰাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাবে প্রেম বলা যায়। সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সন্ধিৎ-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়্যা-শক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতায় গাঢ় আর্দ্রভাব চিহ্নভক্তিগত হলাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরম-বৃত্তিরূপ চমৎকার ভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সন্ধিৎ ও হলাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদ্রূপ প্রেমের হেয় ছায়া মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়ীভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। যথা,—

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়।

রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৬-১৭৭)

ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহা উদয় হইলে যে-প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। যথা,—

এই নব প্রীতাকুর যাব চিত্তে হয়।
 প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥
 কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
 ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁ'রে নাহি ভায়॥
 'সর্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে॥
 সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
 নামগানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥
 কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি।
 কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২০-৩১)

যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ রতিভক্তিহরীতে ১১ শ্লোক),—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
 আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
 আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
 ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ সূৰ্জ্জাতভাবাকুরে জনে॥

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলা-সম্বন্ধস্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাকুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

এই রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প অল্প সাদ্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্বয়ং চিন্ত্যাপার অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত এবং সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুইপ্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে সাধনাভিনিবেশজ রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধসাধনজ ভেদে দ্বিবিধ। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—বাহিরের ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যা, ধন বা দরিদ্র দেখিয়া কি ভক্তকে চেনা যায়?

উঃ—কখনই না। ভোগী হ'ল জড়বিলাসী বা বিষয়ী আর ত্যাগী হ'ল বিষয় দুঃখকর জানিয়া বিষয়বিরক্ত। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই সকাম এবং অভক্ত। তাই তাহারা ভক্তের সেবাবিলাস ও সহজ বিরাগের কথা বুঝিতে পারে না। ভক্ত বহির্দর্শনে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য আদি জাগতিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যরহিত যে কোন লীলাই করুন না কেন, তাঁহাকে তদনুপাতে দর্শন করিতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হইবে। যেহেতু—“বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।” কর্ম্মী ও জ্ঞানী—ভোগী ও ত্যাগী তাহাদের স্থূল দর্শনে ভক্তকে যাহাই দর্শন করুক না কেন, তাহা কিছু ভক্তের স্বরূপ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবানের ভক্তগণের কোন ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্যকে ভগবৎ-সেবায় সমর্পণ ব্যতীত ভোগী বা ত্যাগীর ন্যায় প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের কোন ঐশ্বর্য্য দর্শনে বা অদর্শনে তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিতে হইবে না। জগতের সমুদয় বিষয়ের—সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের সদ্যবহার একমাত্র তিনিই জানেন।

ভক্ত ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন ; তিনি তদুভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল-মাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী। ভক্তকৃপাক্রমেই তাদৃশ বিচার বা বুদ্ধি লাভ হয় সুতরাং অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্বদা হরিকীর্তন ও হরিসেবা করিবার বিচারবিশিষ্ট হইলেই মাপিয়া লইবার বিচার বা ইতর পিপাসা থামিয়া যাইবে—নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

প্রঃ—সদগুরুচরণাশ্রয়ে কি সবই লাভ হয়?

উঃ—শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়ে কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণমন্ত্র প্রভৃতি সবই লাভ হয়। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার বিচার না আসিলে এই সব অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। বিশ্রুতভাবে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুকে আশ্রয় না করিলে, গুরুর নির্দেশমত ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে না পারিলে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয় না। কারণ আধ্যাত্মিকগণ তর্কপন্থী। তর্কপন্থায় শ্রৌতপথ বা ভক্তিপথের কথা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভক্ত-গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তদনুগতো ভক্তিপথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ন্ত স্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষণম্।

বিশ্রভ্বেণ গুরোঃ সেবা সাধু-বর্তানুবর্তনম্॥

প্রঃ—নিষ্কিঞ্চন কে?

উঃ—যিনি ইহ-জগতের কোন বস্তুই চান না, তিনিই নিষ্কিঞ্চন। তিনি বিচার করেন—আমাকে চিরকাল সুখ দিতে পারে এমন কোন বস্তু এ-জগতে নাই। এই পৃথিবীতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার, আমরা কৃষ্ণবহিস্মুখ হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি, এইজন্যই এত কষ্ট পাইতেছি।

প্রহ্লাদ মহারাজ ভারতসম্রাট হইয়াও নিষ্কিঞ্চন ভক্ত। আবার সুদামা বিপ্র অতি গরীব হইয়াও নিষ্কিঞ্চন। কারণ ইহারা উভয়েই নিষ্কাম ভক্ত।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ জানেন যে—এই জগৎটা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার উপ-করণ। এইজন্য তাঁহারা জগতের কোন বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি করেন না এবং তাহা ত্যাগও করেন না, উপরন্তু সকল দ্রব্যকে ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত করেন। হরি-ভজন না করিলে জগতে একটা তৃণও গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই, ইহা তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

ভক্তগণ জানেন—কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করলে সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণজ্ঞামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে। সাধুগুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে তাহা কীর্তন করিতে হইবে, তাহা হইলেই কৃষ্ণানুশীলন হইবে। কৃষ্ণের অনুশীলন না হইলে কৃষ্ণের বস্তুর অনুশীলন হইয়া যাইবে।

প্রঃ—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন জিনিষটা কি?

উঃ—আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। কৃষ্ণানুকূলা হ'লেন শ্রীবার্হভানবী দেবী। শ্রীবার্হভানবীরই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীরাধার প্রিয়জনগণ সকলেই গুরু-পাদপদ্ম। গৌড়ীয়গণ অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীবার্হভানবীরই পক্ষপাতী বেশী। অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইয়া থাকে। অনুশীলন-কার্য্যটা কৃষ্ণের সম্বন্ধে হইলেই সব সুবিধা হইবে। কিন্তু হায়! আমরা কৃষ্ণকে গৃহপতি না করিয়া নিজে গৃহকর্ত্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িতেছি।

প্রঃ—আমরা কি নিখুঁত সত্য কথা বলিব?

উঃ—নিশ্চয়ই। আমরা কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া সকলের নিকট নির্ভীক-ভাবে সত্যকথা বলিব। জীবের প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে হয়, সেইরূপ সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে, ইহাতে ভূতোদ্বৈগ হয় না। বাস্তব সত্যেরই অনুসন্ধান করা

দরকার। পৃথিবীর সকল লোকের মঙ্গল কিরূপে হইবে, সেই চিন্তা করা প্রয়োজন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজের ও অপরের মঙ্গল করিতে হইবে। কেবল বর্তমান যুগের মনুষ্যের জন্য নয়—সকল যুগের সকল মানুষের অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে স্থান হইতে আর কোন দিন ফিরিয়া আসিতে হইবে না, সেই সুখময় বৈকুণ্ঠরাজ্যের কথাই সকলকে বলিতে হইবে। সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা অপরকে জানাইতে হইলে আমাদের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা সব সময়েই সেই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদদ্বাকে *Serve* করিব। যদি আমরা গৃহে থাকি, তাহা হইলেও বাড়ীর সকল লোক মিলিয়া তাঁহার সেবা করিব। আমরা ভাল ভাল ঘরবাড়ীতে ভগবানকে ও ভক্তগণকে রাখিব—নিজেরা কুটীরে থাকিব। আমরা যদি না খাইয়া ভগবানকে খাওয়াই, তবে তাঁহার করুণা পাইব।

প্রত্যেক জিনিষটা ভগবানের—এই বিচারটি আমাদের সব সময় থাকিবে। জগতের সকল জিনিষ ভগবানের সেবায় লাগাইতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে। এসব কথা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিতে না পারিলে শ্রীগুরুগৌরানন্দ প্রসন্ন হইবেন না। যাঁহার ভক্তিশক্তি ও দৃঢ়তা যত বেশী, তিনি তত নির্ভীক প্রচারক।

লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়, এই ভয়ে যদি সত্যকথা না বলি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি নাস্তিক ও বঞ্চক হইলাম।

প্রঃ—গৃহব্রত কে?

উঃ—তিনিই গৃহব্রত—যিনি পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান করেন। গৃহব্রতগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই গৃহব্রত।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহের কর্তা হইয়া যথোচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিব, ইহাই আমাদের ব্রত বা লক্ষ্য।

আমরা দেহাত্মবাদী বা গৃহব্রত হইয়া প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগ-নেত্রে দর্শন করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িতেছি। সমগ্র জগৎ ভগবৎ-সেবার বস্তু—এই সুবুদ্ধি না আসা পর্যন্ত আমাদের গৃহব্রতবুদ্ধি কাটিবে না, আমরা মঙ্গলের সন্ধান পাইব না। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ কর্ণ বিচার করে, তাহাদের সর্বনাশই হয়। তাহারা কোনদিন ভগবানকে জানিতে পারে না।

অনিত্য জগতের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ ও মৃত্যুই লাভ হইবে। কৃষ্ণ-

বহির্মুখ সংসার করার ফলই প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপে জ্বলন।

সংসারের চিন্তা-ভাবনা সমস্তই মরণের জন্য। তাহা যে আমাদের দিন দিন নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে, উত্তরোত্তর দুঃখে নিষ্ক্ষেপ করিতেছে ও করিবে, এ চিন্তা গৃহব্রতের নাই।

প্রঃ—কাহার নিকট ভাগবত শুনিব?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেব ও গুরুনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তের নিকট শুনিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজে ভাগবত নয়, তাহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শুনিলে মঙ্গল হইবে না।

যাহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা-যাহার প্রবল, যাহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যিক, সে কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পারে না, তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীৰ্ত্তিত হন না। সে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের ছলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে।

যিনি সর্বক্ষণ হরিভজন করেন এরূপ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে অথবা তাঁহার নির্দেশে অন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে হইবে। তাহা হইলেই মঙ্গল ও ভক্তি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদের জীবন ও সেব্য, তাঁহারা ই সত্য সত্য ভাগবত পাঠ করেন, ঠাকুর-সেবা করেন, হরিনাম করেন, তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে। কারণ তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না অথবা ঠাকুর-সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না, কিংবা ভগবৎ-সেবোপ-করণকে প্রাপঞ্চিকবোধে ত্যাগ করিয়া ফল-বৈরাগীর ন্যায় জড় প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করেন না।

আমি যাঁহার সঙ্গ করিব বা যাঁহার কথা শুনিব, তিনি শ্রীতপস্বী হইবেন। সাধু-গুরু কখনও প্রেয়ঃপথ স্বীকার করেন না। তাঁহারা শ্রেয়ঃপস্বী বা শ্রীতপস্বী। শ্রীতপস্বী সাধুগণ নিজ গুরুর নিকট হইতে সত্যপথে বা ভক্তিপথে চলিবার যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অপরকে বলেন। তাঁহারা নিজের মনঃকল্লিত কোন কথা কাহাকেও বলেন না।

আমরা অনেকসময় গুরু করি বা সাধুসঙ্গ করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য—নিজ অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য। আজকাল গুরু করা কার্যটি একশ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা; আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধু-সঙ্গ বা পাঠশুনা ব্যাপারটাও সেইরূপ ধরণের একটা কার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং আমাদের মঙ্গল আর কি করিয়া হইবে? উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কথা না শুনিলে কি কাহারও সুবিধা হয়? এইজন্য যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা সঙ্গ-বিষয়ে সাবধান হইবেন, সাধুনাথধারী লোকের নিকট হরিকথা শুনিতে গিয়া বিপন্ন হইবেন না।

ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় যদি কেহ প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সত্যের সন্ধান পাইবামাত্র তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের যাহার যতটুকু সময় আছে, তাহার একমুহূর্তও বিষয়-কার্য্য বা অন্যকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা আবশ্যিক—সৎসঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য কর্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য সদগুরুচরণাশ্রয়ে বা সৎসঙ্গে কৃষ্ণভজন মনুষ্যজন্ম ছাড়া অন্য জন্মে সম্ভব হইবে না। (ক্রমশঃ)

গোপাল-তাপনী

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৬ পৃষ্ঠার পর]

একসময় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রিয় গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে শ্যামসুন্দর! আমাদের মনোভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্তব্য? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—মহর্ষি দুর্বাসাকে ভোজন করান উচিত। তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—দুর্বাসা যমুনার অপরপারে অবস্থিত। অগাধ যমুনা কিরূপে অতিক্রম করিয়া তাঁহার আশ্রমে যাইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ শ্যামসুন্দর পূর্ণ ব্রহ্মচারী, এই কথা কহিতে থাকিলে যমুনা তোমাদিগকে পরপারের মার্গ প্রদান করিবে। আমার স্মরণে অগাধ বারি অগভীর হয়, অপবিত্র বস্তু পবিত্র হয়, ব্রতহীন ব্যক্তি ব্রতধারী হয়, সকাম ব্যক্তি নিক্রাম আত্মারাম হয় এবং বেদজ্ঞানরহিত ব্যক্তি বেদজ্ঞ হয়।

শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মহাদেবের অংশভূত দুর্বাসার স্মরণ ও ভগবৎ-কথিত নাম-কীর্তন করিতে করিতে যমুনার পরপারে দুর্বাসার আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা দুর্বাসাকে বিচিত্র সামগ্রী ভোজন করাইয়া সমুপস্থিত করিলে দুর্বাসা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা সূর্য্যকন্যা যমুনা কিরূপে পার হইব? দুর্বাসা বলিলেন,—দুর্বাসা দুর্বাভোজী—এই কথা স্মরণ করিয়া অনায়াসে যমুনা পার হইবে। তখন গোপীগণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্বাসাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদের সহিত নিত্যবিহারশীল কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন? আর বিচিত্র দ্রব্য ভোজন করিয়া দুর্ব্বাসা কি-প্রকারে দুর্ব্বাভোজী হইলেন? দুর্ব্বাসা বলিলেন,—আকাশ শব্দগুণযুক্ত, কিন্তু পরমাত্মা শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন হইয়াও ঐ শব্দগুণযুক্ত আকাশে বিরাজিত। ঐ শব্দবান্ আকাশ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মাই আমি। অতএব আমি ভোক্তা কি-প্রকারে হই? বায়ু স্পর্শগুণযুক্ত। পরমাত্মা বায়ু ও স্পর্শগুণ হইতে ভিন্ন হইয়াও বায়ুতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। আমি সেই পরমাত্মা ভিন্ন আত্মা ভোক্তা কিরূপে হইব? তেজ রূপ-গুণে যুক্ত। পরমাত্মা ঐ তেজ ও রূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও অন্তর্যামিরূপে তেজে অবস্থিত। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মা ভোক্তা কি-প্রকারে হইতে পারি? এইপ্রকার জল রসগুণযুক্ত এবং পৃথিবী গন্ধগুণযুক্ত। ঐ উভয় হইতে ভিন্ন অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা ঐ বস্তুতে অবস্থিত হইলেও উহারা পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মা কি-প্রকারে ভোক্তা হইতে পারি? মনই আকাশাদি-বিষয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প করে, মনই বিষয় গ্রহণ করে। যখন আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, তখন বিশুদ্ধ আত্মা ভোক্তা হইতে পারে না।

তোমাদের প্রিয়তম শ্যামসুন্দর ব্যক্তি-সমষ্টি স্থূল-সূক্ষ্ম সকলের কারণ। সর্ব্বদা একত্র অবস্থানকারী দুই পক্ষীর মত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্তমান। তন্মধ্যে পরমাত্মার অংশভূত আত্মা ভোক্তা এবং তাহা হইতে ভিন্ন অভোক্তা পরমাত্মা কেবল সাক্ষী। ঐ অভোক্তা পরমাত্মাই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরমেশ্বর। যিনি বিদ্যা-অবিদ্যা উভয় হইতেই বিলক্ষণ, পরন্তু যিনি বিদ্যাময়, তিনি কিরূপে বিষয়ী হইতে পারেন?

যে ব্যক্তি কামনা-পরবশ হইয়া ভোগের অভিলাষ করে সে কামী। কিন্তু যাঁহার ভোগ অভিলাষ নাই, পরন্তু প্রেমবশ্য হইয়া প্রেমিক ভক্তের প্রদত্ত বিষয় ভোগ করেন, তিনি অকামী; কামনা ও আসক্তি তাঁহাতে নাই। তিনি জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদি শারীরধর্ম্ম-রহিত। যিনি সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজমান, যিনি গো-সকলে বিরাজিত, যিনি গোপগণের মধ্যে অবস্থিত, যিনি সমস্ত দেবগণ-মধ্যে অন্তর্যামিস্বরূপে বর্তমান, সমস্ত বেদ যাঁহার মহিমা গান করেন এবং চরাচর ভূতে পরমাত্মরূপে যিনি স্থিত, তিনিই তোমাদের স্বামী পরমেশ্বর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তখন গোপীপ্রধানা গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করেন,—এই অদ্ভুত অচিন্ত্য মহিমাশালী শ্রীকৃষ্ণ কি-প্রকারে আমাদের নিকট প্রকট হইলেন? আপনিই বা তাঁহার তত্ত্ব কিরূপে জানিলেন? তাঁহারা প্রাপ্তিস্বরূপ সাধন কি? তাঁহার নিবাস-স্থান কোথায়?

তিনি কিরূপে দেবকী-গর্ভে প্রকটিত হন? তাঁহারা অগ্রজ বলরামই বা কে? তাঁহার পূজা কি-প্রকার? প্রকৃতির অতীত বস্তু তিনি কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন?

দুর্বাসা উত্তর করিলেন—এ কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, তাঁহাতে সমস্ত লোক ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত ছিল। তাঁহার মানসিক সঙ্কল্পক্রমে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা ভগবানের আদেশে তপস্যা করিয়া ভগবানের তত্ত্ব অবগত হন। ব্রহ্মা ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন—হে ভগবন্! সমস্ত অবতারের মধ্যে কোন্ অবতার শ্রেষ্ঠ? যাঁহার প্রতি সমস্ত লোক ও সমস্ত দেবতা প্রীতি করেন এবং যাঁহার স্মরণপ্রভাবে মনুষ্যগণ সংসার হইতে মুক্ত হয়? আর এই অবতার-শ্রেষ্ঠের পরব্রহ্মতা কিরূপ সিদ্ধ?

ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলেন,—যে-প্রকার মেরু শিখরের উপর বিখ্যাত সপ্তলোকপালের সপ্তপুরী আছে। সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যপ্রভাবে যে-সকল পুরীতে গমন করিতে পারে, সেই প্রকার ভূগোলচক্রে সপ্তপুরী বিরাজিত। তাহা সকাম-নিষ্কাম সকলেরই সেবনযোগ্য। সে-সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপী গোপালপুরী মথুরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ভূতলোপরি এই পুরী অবস্থিত। তাহার কর্ণিকার স্থানে এই মথুরাপুরী এবং অন্যান্য দলে মধুবনাদি বন অবস্থিত। এই মথুরাপুরী শ্রীভগবানের চক্রদ্বারা সুরক্ষিত। মধুবন, বহলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, তালবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন, লৌহবন, কাম্যবন ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশবন মথুরাপুরীর চতুর্দিকে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থানে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নরাদি সকলে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। এই দ্বাদশবনে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, সপ্তঋষি, ব্রহ্মা, নারদ, পঞ্চগণেশ, অশ্বিকেশ্বর, বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বিশ্বেশ্বর, গোপালেশ্বর, ভদ্রেশ্বর আদি চতুর্বিংশতি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। এখানে সিদ্ধগণ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে শ্রীবলদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় মূর্তি বিরাজিত। দ্বাদশবনে শ্রীভগবানের দ্বাদশ অর্চ্যমূর্তি আছেন। যাঁহারা অর্চ্যমূর্তির সেবা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন—গর্ভবাস, জন্ম, জরাদি তাপ হইতে অতিক্রান্ত হন।

এ বিষয়ে উক্তি আছে—এই ধাম ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক সর্বদা সেবিত। ভগবানের শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-ধনু নিরন্তর ইহার রক্ষা করে। শ্রীবলভদ্রের মুখলাদিও ইহার রক্ষা করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধসহ এবং নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিসহ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ। তবে প্রণবের মাত্র (অ, উ, ম ও অর্দ্ধমাত্র) ভেদে চারিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অকারাত্মক

বিশ্বরূপ বলরাম, উকারাত্মক তেজরূপ প্রদ্যুম্ন, মকারাত্মক প্রাজ্ঞরূপ অনিরুদ্ধ এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক তুরীয় রূপ ভগবান্ বাসুদেব।

অতএব ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্ম গোপালের ধ্যান করিবে। ওঁ তৎসৎ পরব্রহ্ম গোপাল আমার আত্মা, তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনি ত্রিকালসত্য।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মথুরাপুরীতে আমার সর্বদা নিবাস। আমার স্বরূপ সর্বদা চিন্ময়। ইহাতে প্রাকৃত রূপের গন্ধ নাই, কিন্তু স্বপ্রকাশ বস্তু। যে আমার এই রূপের চিন্তন করে, সে নিশ্চয়ই আমার পরম ধামে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জম্বুদ্বীপের যে কোন প্রদেশে অবস্থান করিয়া পূজ্য সামগ্রীদ্বারা আমার বিগ্রহের পূজা করে এবং আমার ধ্যান করে, সে এই ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয়। আমি মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণরূপেই সর্বদা বিরাজ করি। অধিকারভেদে বিভিন্ন যুগে উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমার এই চারিরূপেরই উপাসনা করে। যে ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে না, যাহারা কলির কবলে গ্রস্ত, তাহারাও মথুরাতে অবস্থান করিয়া আমায় ভজন করিলে নিশ্চয়ই উত্তম গতি লাভ করিবে।

সম্পূর্ণ বিশ্বের আধারভূত ভগবান্ গোপাল ‘ওঁ’-রূপে অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণবীজ ‘ক্লীং’ ও ‘ওঁ’-কারে কোন ভেদ নাই। মথুরাপুরীতে যাহারা আমার চতুর্ভূজ-রূপের ধ্যান করে, তাহারা মোক্ষ-সুখ প্রাপ্ত হয়।

ধ্যানের বিধি—ভক্তের বিকশিত অষ্টদল হৃদয়-কমলে শ্রীভগবান্ বিরাজিত। তাঁহার শ্রীচরণদ্বয় শঙ্খ, ধ্বজা, ছত্রাদি চিহ্নে সুশোভিত। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তভমণি অদ্ভুত প্রভায় প্রকাশিত। তাঁহার চারিহস্ত শঙ্খ, চক্র, শার্ঙ্গ-ধনু, পদ্ম এবং গদাতে সুশোভিত। কণ্ঠে ধৃত বনমালা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক শোভাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। মস্তকে কিরীট এবং কর্ণে কুণ্ডল বলমল করিতেছে। হস্তে কঙ্কণ, স্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র পরিহিত। নিজ ভক্তজনকে অভয়প্রদানে উন্মুখ মুদ্রায় অবস্থিত। এই রূপ অথবা দ্বিভূজ মুরলীধর রূপের চিন্তা করিবে।

সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা মন্থন করিয়া তাহার সারস্বরূপ মথুরা বলা হয়। এই অষ্টদিক্‌পালরূপী অষ্টকমলদল বিভূতি, এই ভূমি জগতের রূপে প্রকাশিত। এই কমল সংসার-সমুদ্রেই প্রকটিত। যাহাদের অন্তঃকরণ রাগ-দ্বेषাদিশূন্য—সর্বতোভাবে সম, তাহারাই এই কমলের সেবা করেন। চন্দ্র-সূর্য্যের দিব্য-কিরণ ইহার পতাকাস্বরূপ এবং সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বত ইহার ধ্বজা। ব্রহ্মলোক ছত্র, সপ্ত পাতাল আমার চরণস্বরূপ। লক্ষ্মীর নিবাসভূত যে শ্রীবৎস, তাহা আমারই স্বরূপ। ঐ শ্রীবৎস (চন্দ্রাকৃতি দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী) আমার বক্ষে চিহ্নিত। এজন্য ইহার নাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন। ভগবৎ-স্বরূপভূত যে তেজে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি আদি তেজঃ-পদার্থ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীভগবানের কৌস্তভ-মণির আলোক। সত্ত্ব, রজ, তম

ও অহঙ্কার—এই চারিটি আমার চারি ভুজ। আমার হাতে পঞ্চভূতাত্মক পাঞ্চজন্য শঙ্খ অবস্থিত। অত্যন্ত চঞ্চল সমষ্টি মন আমার হাতের চক্র। আদি মায়া শার্ঙ্গধনু, আর সমস্ত বিশ্বই কমলরূপে আমার হাতে অবস্থিত। সর্বদা অপ্রতিহত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চারিটি দিব্য কেয়ুর (ভুজবন্ধ) আমার চার বাহুতে বিরাজমান। আমার কণ্ঠ নিগুণ, অজন্মা মায়াদ্বারা তাহা আবৃত। এ জন্য তোমার মানসপুত্র সনকাদি মুনিগণ অবিদ্যাকে আমার কণ্ঠমালা বলিয়া থাকে। কূটস্থ সংস্করণই আমার কিরীট। ক্ষর এবং উত্তম জীব আমার কাণের কুণ্ডলস্বরূপ। এই প্রকার আমার ধ্যান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! আমার সগুণ, নিগুণ উভয় রূপেরই বর্ণন করিলাম।

দুর্বাসা শ্রীমতী রাধিকাকে বলিলেন,—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এইরূপ উপাসনার কথা উপদেশ করিয়া দৃষ্টি-সামর্থ্য দিয়া অন্তর্দান করিলেন। আমি ব্রহ্মার নিকট এবং তাঁহার মানসপুত্রগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাই যথাযথ বর্ণন করিলাম। অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীহরিনাম—পরম সাধন ও পরম সাধ্য

শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য। সাধন ও সিদ্ধি—উভয়কালেই নামগ্রহণের সার্থকতা। শ্রীহরিনাম নিত্য বলিয়া তাহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করাই সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই উৎকৃষ্ট সাধন—ইহা বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন। সাধকগণের ও সিদ্ধগণের শ্রীহরির নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ অন্য কিছুই নাই, ইহা উল্লেখ করিতে গিয়া গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত (২।১।১১) বলিয়াছেন,—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্নামানুকীর্তনম্॥

“যাঁহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণকর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।”

শ্রীনামের দ্বারাই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের ক্ষয় হয় বলিয়া শ্রীনামই সাধন। আবার শ্রীনামের দ্বারা গুণসম্বন্ধ দূর হইলে শ্রীনামই কর—এই বাক্যদ্বারা শ্রীনামেরই

সাধ্যত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনাম ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তির অন্য কোন পথই নাই। জ্ঞান ও বৈরাগ্য পৃথক্ সাধনের দ্বারা লাভ করিতে হয় না, উহা শ্রীনামের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হয়। নিত্য ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে কৰ্ম্মের অনিশ্চয়তা, তাই তাহার অনাবশ্যকতা ও দুঃখরূপত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর শাস্ত্র শ্রীনামেরই ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে আবশ্যকতা ও সুখরূপত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। বিঘ্নবাহূল্য-নিবন্ধন কৃষিকার্য্যে যেমন ফলপ্রাপ্তির (শস্যলাভের) নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ কৰ্ম্মের ফলপ্রাপ্তি বিষয়েও সংশয় বর্তমান বলিয়া উহা নির্ভরতার অযোগ্য—এতদ্বারা শ্রীনামের সাধন ও ফল, উভয়েরই নিশ্চয়তা হেতু শ্রীনামের উপর নির্ভর করিতে পারা যায়।

অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন সর্বশক্তিমান্ চিদ্বিলাস ভগবান্ শ্রীহরি ও তাঁহার নামের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, সেই নাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ চেতন ও সর্বশক্তিমান্। অনন্ত, অপ্রাকৃত নিত্য-নামযুক্ত অধোক্ষজ-ভগবান্ তাঁহার নিত্য ধামে নিত্য নামী-রূপে বিরাজিত। নির্বিশেষবাদিগণ ভগবানের চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য্যের কথা কোনকালে শ্রবণ করেন নাই, তাই তাহারা শ্রীহরিনামকে জড় দেহবিশিষ্ট জীবের বা জড়ীয় বস্তুর নামের ন্যায় অনিত্য মনে করেন। শ্রীহরির নাম কিরূপে সাধ্য হয় তাহা তাহাদের জড়বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারেন না। তাহারা মনে করেন, “নাম-কীর্ত্তনাদি কেবল নির্বিশেষভাব প্রাপ্তির একটি উপায় মাত্র। নির্বিশেষভাব প্রাপ্ত হইলে নামগ্রহণের কোন আবশ্যকতা থাকে না।” নির্বিশেষবাদিগণের যুক্তি অপরাধময়ী, যেহেতু জীবের প্রাপ্য বস্তু নির্বিশেষমাত্র নহেন, তাহা পূর্ণচিদ্বিলাসময়। যেমন, কোন বালক যদি কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাহার পিতাকে হারাইয়া ফেলে, তখন বালক তাহার পিতাকে পাইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যাকুলভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। পিতা বালকের ব্যাকুল-স্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন প্রদান করেন এবং স্বগৃহে লইয়া যান। বালক স্বগৃহে গমন করিয়া পিতাকে আর পিতা বলিয়া ডাকিবে না, চিরকালের জন্য পিতার নাম করা ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে, বরং পিতাকে গৃহমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আরও অধিকতর উল্লাসভরে পিতাকে আহ্বান ও পিতার নানাবিধ পরিচর্য্যাই করিবে। কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীব মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে পড়িয়া সাধুগণের উপদেশ কৃষ্ণনামের দ্বারা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান যখন নিষ্কপট ও ব্যাকুলতাময় হয়, তখনই তাহা কৃষ্ণের কর্ণে পৌঁছাইয়া থাকে। কৃষ্ণ তখন সাধক জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্থায়ী স্বরূপ দর্শন করান ; জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন, কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেন—কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন।

নামগ্রহণকারী দ্বিবিধ অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ—ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে। সাধক আবার দুইপ্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। প্রাথমিক সাধকগণের অবিদ্যা-পিত্তোপ-তপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। প্রাথমিক সাধকগণ নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামকীর্তনের নৈরন্তর্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। মুক্তজীব উচ্চ করিয়া নামকীর্তন করিয়া থাকেন, আর বদ্ধজীব তাহার অনুগমনে তাহা প্রথমে শ্রবণ ও পরে অনর্থমুক্তিতে সাধ্য-বিচারে কীর্তন করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবের সাধন প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় তাহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বাসনা থাকায় তিনি ভীতিযুক্ত। মুক্তজীবের সাধন কামনাবর্জিত এবং নিত্য ভগবৎকামেরই পরিপূরক, কামনার অভাবে তাহার অনর্থের কোন অবকাশ নাই। সিদ্ধগণ জাতরতি হইয়া নামকীর্তন করিতে করিতে ভগবানের চিন্ময় রূপ, চিন্ময় গুণ ও চিন্ময় লীলায় প্রবিষ্ট হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় জীব ভগবানের নামসেবাকালে দশপ্রকার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জীব মুক্ত হইলে তবেই অপ্রতিহতভাবে অনুক্ষণ ভগবানের শুদ্ধনাম কীর্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্বে যে নামগ্রহণের অভিনয়, তাহা অনেক সময়ই দেহ-দ্রবিশ-লোভ-পাশওতাদি প্রতিবন্ধকযুক্ত নামাপরাধের মধ্যে গণ্য। কখনও কখনও বহু ভাগ্যফলে ‘নামাভাস’ মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত হইবার পরেই মুক্তকুলের সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শুদ্ধ চিৎস্বরূপ শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিরন্তর কীর্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন। এই জন্যই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীনামকে ‘শ্রুতির সার ও মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।

অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

(শ্রীনামাষ্টক ১ম শ্লোক)

“হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-রূপ রত্নমালায় প্রভা-নিকরদ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।”

শ্রীনাম—সাধ্য শিরোমণি, যাহারা নামাপরাধী অর্থাৎ যাহারা শ্রীনামকে ধর্ম, ব্রত, যজ্ঞ, ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্মের সমান মনে করেন, তাহারাই শ্রীনামকে কেবলমাত্র ‘সাধন’ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাদের বিচারে চিত্তশুদ্ধিরূপ সাধ্যলাভের নিমিত্ত যেরূপ ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদির প্রয়োজন হয়, চিত্তশুদ্ধির পর তাহাদের কোন আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ নামকীর্তনরূপ সাধনের দ্বারা ভগবদর্শন হইলে

নামকীর্তনের আর আবশ্যিকতা নাই। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিও পরম প্রয়োজন নহে, উহাও একটী সাধনবিশেষ, উহা অন্য প্রাপ্যবস্তুকে অপেক্ষা করে। কিন্তু নামকীর্তন অন্য বস্তুকে কোনকালে অপেক্ষা করে না। উহা স্বয়ংই উপেয় বা সাধ্য। নামসাধন ব্যতীত অন্যান্য জাগতিক ভজনপ্রণালীতে উপায় ও উপেয় বিচারে নিত্যতা স্বীকৃত হয় না। যাহারা শ্রীহরিনামকে ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদির সমজাতীয় মনে করেন, তাহারা নারকী ও হরিবিদ্বেষী। সিদ্ধগণের মুক্তোচিত সাধনে শ্রীহরিনাম কীর্তন ব্যতীত অন্য কিছুই নাই।

শ্রীনাম যখন বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে ‘সাধন’ বলে। ‘সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি’—শাস্ত্রের এই বাক্যানুযায়ী সিদ্ধের যাহা কার্য্য, তাহাই সাধকাবস্থায় মহড়া দেওয়া হয় মাত্র। যিনি শত শত পূর্বজন্ম সম্যগ্ৰূপে বাসুদেবের অর্চন শ্রীনামকীর্তন-সহযোগে করিয়াছেন, তাহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকে, তাহা “যেন জন্ম-শতৈঃ পূর্বং বাসুদেব সমর্চিতঃ” শ্লোক হইতে জানা যায়। ভগবানের শ্রীনামকীর্তন করা চেতন জীবাশ্রয় নিত্য বৃত্তি। মুক্ত হইয়া সিদ্ধ অবস্থায় যে শ্রীহরির নাম-কীর্তন, তাহা অপ্রতিহতা ও সম্পূর্ণ। সাধনাবস্থায় যতটুকু সেবোন্মুখতা থাকে, সাধন ততটুকুই নির্দোষ হয়। সেবোন্মুখতার একান্ত অভাব থাকিলে, তাহা ‘নামাপরাধ’ ; সেবোন্মুখতা ঈষৎ বিকশিত হইলে, তাহা ‘নামাভাস’ ; আর সেবোন্মুখতা পূর্ণ বিকশিত হইয়া যখন চিদ্রিয়দ্বারা নাম কীর্তিত হইতে থাকেন, তখনই তাহাকে শুদ্ধনাম বলা হয়, তাহাই সাধ্যস্বরূপ। সাধ্যস্বরূপ শ্রীনাম সিদ্ধজীবের হৃদয়ে কিরূপ স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত হন, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫) শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। “তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ। ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ” অর্থাৎ “ভক্তিরসিকগণ নামসঙ্কীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া থাকেন। যেহেতু নাম-সঙ্কীর্তনই অব্যর্থ-প্রেমা-সম্পত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাহারা নাম-সঙ্কীর্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।”

আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যাভিনিবেশ স্বয়ং দূরীভূত হয়। মুক্ত হইলে জীব নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই কৃষ্ণপ্রেমলাভের কার্য্য ও কারণ উভয়ই। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতককুলের আর্দ্রনাদের ন্যায় ও রজনীকালে পতি-বিরহিনী চন্দ্রবাকী ও কুররীসকলের ন্যায়, ভক্তগণ বিরহবিধুর হইয়া বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নামসঙ্কীর্তন করিয়া থাকেন।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

“ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?”

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ-সেবা করে অনেকে বিফল-মনোরথ হয়েছেন ; কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবা করলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য।—

এতেক বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।

ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৮৭)

আবার শাস্ত্র-মতে নামাভাস-মাত্রে মুক্তি হয়।—

হরিদাস কহেন,—কেনে করহ সংশয়?

শাস্ত্রে কহে,—নামাভাস-মাত্রে মুক্তি হয়॥

ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।

অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৯৩-১৯৪)

ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মাপেক্ষা ভক্তি অতিরিক্ত গুণবিশিষ্ট। ভক্তি স্বভাবতঃ সুখরূপা হওয়ায় তাহা অহৈতুকী—ভক্তিতে অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই। আবার ভক্তি-সুখের উদ্বোধে জগতের বা কোথাকারও কোন সুখই বিরাজিত নাই—তজ্জন্য ভক্তি অপ্রতিহতা। ঐমত রুচিলক্ষণা ভক্তিজাত হলে তদ্বারা শ্রবণাদিরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ প্রবর্তিত হয়। সাক্ষাৎ ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন,—“কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণ কীর্তনাদি লক্ষণেইব ভজেত ইত্যুক্তম্”—সাক্ষাদ্ভক্তির লক্ষণ—শ্রীহরির রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি। এতৎপ্রসঙ্গে ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্’-গ্রন্থের ১০৭ শ্লোকে কথিত হয়েছে,—“হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহলে তোমার কিশোরমূর্তি স্বভাবতঃ এসে উদিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেননা ভক্তি থাকলে মুকুলিতাঞ্জলি হয়ে মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আমাদের কাছে অবাস্তুর ফল যে অবিদ্যা-মোচন, তদ্রূপে সেবা করতে থাকে। ধর্ম্মার্থ-কামসকল যেমন যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময়-প্রতীক্ষা করতে থাকে। তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। এস্থলে মাধুর্যময়ী জ্ঞান-কর্ম্মশূন্যা শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ্য।”

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ সাধন সম্বন্ধে শাস্ত্র উল্লেখ করলেও ঐ সকল সাধন ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কার্য্যকর হয় না ; তাই শাস্ত্রের উপদেশ—“ভক্তিদ্বারাই ভজন বা সেবা করবে।” ভক্তির গুণ—অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা,—ইহা অন্য কোন সাধনে নাই। “যয়াত্মা সুপ্রসীদতি”—ইহাতেই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়। ভক্তি কোথায় থাকে? ভক্তি থাকে অনন্য ভক্তের কাছে। তাই মহাজন-গীতিতে পাই,—

“বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন,
আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।”

শুকদেব গোস্বামী বলেছেন,—

ন তথা হৃদবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ।

যথা কৃষ্ণপতি প্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥

“হে মহারাজ! পাপী ব্যক্তি ভক্তগণের সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি মন সমর্পণ করলে তাহাতে যেমন পবিত্রতা লাভ করে, তপস্যাতির দ্বারা সেরূপ হয়ই না।” জ্ঞান বা যোগপথে অনর্থ বা বিষয়বাসনা সম্পূর্ণ দূরীভূত হওয়ার পর উপাসনার আরম্ভ হয় ; কিন্তু ভক্তিয়োগে বলা হয়েছে,—বাসনা থাকুক, সেই অবস্থাতেই ভক্তি কর। যথা—“ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ় নিশ্চয়ঃ” (ভঃ ১১।২০।২৮)।

কাম লাগি’ কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।

কাম ছাড়ি’ দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪১)

এস্থলে বলা হয়েছে,—অঙ্গ সরল ব্যক্তি (কুটিল ও কপট ব্যক্তি নহে) কামনা নিয়ে সাধুসঙ্গে সাধুর সেবায় মগ্ন থেকে কৃষ্ণভজন করলে সাধুবৈষ্ণবসঙ্গ ও ভজনপ্রভাবে তিনিও নিষ্কাম হয়ে দাসাভিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভগবান্কেও প্রাপ্ত হন। নিত্য ভক্তগণের সেবা ও ভাগবত শাস্ত্রের সেবার দ্বারা অশুভ সকল বিনষ্টপ্রায় হল উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। যথা—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।

ভগবন্তুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ (ভাঃ ১।২।১৮)

অতএব ভক্ত ভাগবতকে সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মনোসংযোগ করত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথ পরিত্যাগ করে তাঁর শ্রীমুখে ভাগবত-কথা তথা হরিকথা শ্রবণ করলে কেবল ভক্তির আভাসেই সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়, সংসার-ভীতি দূরীভূত হয় ও ক্রমশঃ ভগবৎসামুখ্য ও ভগবদনুভূতি লাভ হয়। তবে অবশ্যই স্বীকার্য্য এই যে,—

আশ্রয় লইয়া ভজে,

তারে কৃষ্ণ নাহি তাজে,

আর সব মরে অকারণ ॥

সদগুরু চরণাশ্রয় অবশ্যই সর্বপ্রাণে প্রয়োজন ; গুরুর প্রসাদেই জীব ভক্তিলতার বীজ পায়। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করলে যেমন জীবন পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা না করলে ও নিন্দা করলে জন্ম জন্ম নরক-দুঃখ

ভোগ করতে হয়। এতদপ্রসঙ্গে প্রথমতঃ বৈষ্ণব-মহিমা ও দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চির দুঃখ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যভাগবত হতে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করছি।—

অসমোদ্ধ বৈষ্ণব-মহিমা—

যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।

ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র॥

যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।

সে বৈষ্ণব পূজা হৈতে বড় আর নাই॥

শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।

বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৫৬-৩৫৮)

বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চিরদুঃখ,—

হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যেই জন।

সেই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ॥

বিদ্যাকুল তপ সব বিফল তাহার।

বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার॥

পূজাও তাহারে কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপীষ্ঠ জন॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৬০-৩৬২)

ভক্ত-ভূমিকায় আস্তে হলে ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্ত-সেবা অবশ্যই করতে হবে। শুদ্ধভক্তগণ যেভাবে কায়মনোবাক্যে ভক্তিসাধন করছেন, সেইভাবে স্থিত হয়ে সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে দাস-অভিমান নিয়ে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সেবোন্মুখ হয়ে ভগবানের সুখ-চেষ্টা থাকলে ও ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনাদি জীবনের একমাত্র ব্রত করলে শুদ্ধভক্তি হবে এবং ভগবান্ কৃপা করে তখন ধরা দিবেন। কিন্তু অবৈষ্ণবকে সাধু-বৈষ্ণব মনে করে তাদের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করলে তাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তি হানি হয়। দেওয়া ও নেওয়া, গুপ্তকথা বলা ও জিজ্ঞাসা করা, অবৈষ্ণবের প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা ও প্রীতিপূর্বক ভোজন করান—এই ছয় প্রকার কার্য আসক্তি ও প্রীতিসহকারে করলে মঙ্গল ত' হয়ই না, বরং নরকগতি হয়। ঐ ছয় প্রকার ক্রিয়া সাধুবৈষ্ণবের প্রতি হলে অবশ্যই মঙ্গল হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিতে জানা যায়,—

তত্ত্ব না বুঝিয়ে,

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,

অসতে এ-সব করি'।

ভক্তি হারাইনু,

সংসারী হইনু,

সুদূরে রহিলে হরি॥

*

*

*

*

তব ভক্তজন-

সঙ্গ অনুক্ষণ,

কবে বা হইবে হরি॥

যিনি বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্বক দানাদি না করে তৎপরিবর্তে দেশের অন্যান্য বহু ব্যক্তির সেবা ও দানাদি ধর্ম যাজন করেন, তাঁর সেই কর্মফলে অধোগতি হয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ বৈষ্ণব-সেবা না করার পরিণাম কয়েকটা শাস্ত্রীয় উপাখ্যানের মাধ্যমে বর্ণনা করতে প্রয়াসী হচ্ছি।—

(১)

সৎপাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা না করে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবকে ধনাদি দান না করে কেবলমাত্র অবৈষ্ণব, অভক্ত, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে ভোজন ও দান দিলে কোনরূপ মঙ্গল হয় না ও মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। পুরাকালে ইক্ষ্বাকু বংশে ‘হেমঙ্গ’-নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দেখলেন—ভক্তিমার্গের লোকগুলো কি বোকা! কেবল বৈষ্ণবদেরই সেবা করে, অন্য কত দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছে, তাদের ত’ সেবা করে না। কেন? তাদের সেবা ত’ সর্বাপ্রাে একান্ত আবশ্যক! রাজা ভাবলেন,—আমি ঐ সকল বৈষ্ণবদের সেবা না করে দীন, কানা, খোঁড়া, অন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিদেরই মাত্র সেবা করব। রাজা একটুও চিন্তা করলেন না যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ তথা ইন্দ্রদ্যুম্ন, অম্বরীষ, রুদ্ৰাঙ্গদ, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব প্রভৃতি রাজাগণ বৈষ্ণবসেবা ও তৎসহ দেশ ও দশের কল্যাণার্থ দানাদি করেছিলেন; তাই তাঁরা শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করে সেবা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজার যাহা চিন্তা—তাহাই তিনি করলেন। তিনি বৈষ্ণবসেবা আদৌ করলেন না, পরন্তু বৈষ্ণবসেবা ব্যতিরেকে অন্যান্য ধর্মাদি পালন করলেন। কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তিন জন্ম চাতক, এক জন্ম শকুনি, সাত জন্ম কুকুর ও সাতাশ জন্ম গিরিগিটি হয়ে মিথিলায় ‘শ্রুতকীর্তি’ রাজার গৃহে অবস্থান করেন।

একদা বৈশাখ মাসে হঠাৎ মুনি ‘শ্রুতদেব’ মিথিলায় ‘শ্রুতকীর্তি’ রাজার গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। তখন রাজা মুনির যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ ও সম্মান করত স্বয়ং জল নিয়ে মুনির চরণদ্বয় ধৌত করে দিলেন এবং সেই পবিত্র পদধৌত-জল এক পাত্র-মধ্যে ধারণ করে গৃহের সর্বস্থানে ছড়াতে থাকেন। সহসা সেই ‘হেমঙ্গ’ রাজা—যিনি সেই সময়ে গিরিগিটির দেহ ধারণ করে তথায় অবস্থান করছিলেন, তাঁর গয়ে সেই জল পতিত হল। তখন সেই গিরিগিটি ছটফট করতে

করতে মানুষের মত কণ্ঠস্বরে বলল,—“আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।” মুনি ঋতদেব ইহা দেখে হতচকিত ও বিস্মিত হয়ে সেই গিরগিটিকে হাতে তুলে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,—“আপনি কে, তাহা বলুন এবং আমি আপনার কি করতে পারি, তাহাও আমাকে আজ্ঞা করুন।” গিরগিটি তখন মুনিকে বলল,—“হে মুনে! আপনার চরণ-দ্বীত জলস্পর্শে আমার পূর্বের সমস্ত জন্মের কথা মনে পড়ছে। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে হেমাঙ্গ-নামে রাজা ছিলাম। আমি বৈষ্ণবগণকে দানাদি না করে অবৈষ্ণব অভক্তদের বহু দানাদি করেছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে বৈষ্ণব-নিন্দা ও বৈষ্ণব-হিংসাজনিত অজ্ঞাত অপরাধের জন্য আমি তিন জন্ম চাতক, এক জন্ম শকুনি, সাত জন্ম কুকুর এবং সাতাশ জন্ম গিরগিটি হয়ে এই গৃহে অবস্থান করছিলাম। এক্ষণে আপনার পদদ্বীত জলস্পর্শে আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত জ্ঞান হল। অতএব কৃপার সাগর আপনি এইবার আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন। তখন ‘ঋতদেব’ মুনি তাঁহার বৈশাখোক্ত ধর্মযাজনের একদিনের ফল সেই গিরগিটিকে প্রদান করলে সেই গিরগিটি তৎক্ষণাৎ গিরগিটি-দেহ পরিত্যাগ করে হেমাঙ্গ-রাজার দেহ ধারণ করে পুরবাসী সকলের সমক্ষে স্বর্গীয় ভূষণ ও মাণ্যে বিভূষিত হয়ে মুনি ঋতদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে মুনিবরের আজ্ঞানুসারে দিব্যবিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করলেন। রাজা ঋতকীর্ত্তি ইহা অবলোকন করে বিস্ময়াব্বিত হলেন। বৈষ্ণবসেবা না করার জন্য হেমাঙ্গ রাজাকে এবম্প্রকার দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল।

(২)

পাষণ্ডীর সহিত প্রীতি-সম্ভাষণজনিত সংলাপে বৈষ্ণবকেও মহাপাপগ্রস্থ হয়ে বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত মহারাজ শতধনুর জীবনীই তার প্রমাণ। পুরাকালে শতধনু-নামে এক ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁর ভার্য্যা মহারাজী শৈব্যা পাতিব্রত, সত্য, শৌচ, কৃপালু প্রভৃতি বহু গুণে বিভূষিতা ছিলেন। মহারাজ শতধনু ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণীসহ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীহরির সেবা-পূজা করতেন।

একদা কার্ত্তিক-পূর্ণিমাতে উভয়ে গঙ্গাস্নানে গমন করেন এবং স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন করবার পথে রাজার ধনুর্বেদাচার্য্যের মিত্র এক পাষণ্ডী ব্রাহ্মণের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হয়। এক্ষণে পাষণ্ডী কাহারো? শাস্ত্র বলেন,—“যাহারা বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র মানে না, ভগবান্, ভক্ত, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও মহাপ্রসাদে সমাদর করে না, যাহারা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ শ্রীহরির সহিত সমান মনে করে অর্থাৎ কালীও যা, কৃষ্ণও তাই ; শিব যা, বিষ্ণুও তাই ; দুর্গা যা, হরিও তাই;

মনসাও যা, ভগবানও তাই—এইরূপ কথা বলে, তাহারা সকলেই পাষণ্ডী।” মহাভারতে অরণ্যযাত্রা পর্ব ১ম অধ্যায়—“অসং ব্যক্তিগণের দর্শন, তাদের সঙ্গে আলাপ, একসঙ্গে উপবেশন করলে ধর্ম্মাচার একেবারে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ঘোর তমোগুণে অভিভূত হয়ে পড়ে।”

রাজা ধনুর্বেদাচার্য্যের গৌরব-রক্ষার নিমিত্ত সেই পাষণ্ডীর সহিত বন্ধুবৎ আলাপ করেন। কিন্তু মহারানী সেই পাষণ্ডীকে আদৌ আদর-যত্ন করেন নাই, বরং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তার দর্শনজন্য অনুশোচনা করত তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ জ্ঞানসূর্য্য স্মরণ ও হৃদয়ে অনুভব করে পবিত্র হয়েছিলেন। অতঃপর রাজা ও রানী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক যথাবিধি শ্রীহরির সেবাপূজায় মগ্ন হন।

কিছুকাল পরে রাজা শতধনু পরলোক গমন করলে রানী শৈব্যাও রাজার চিতাঘ্নিতে প্রবেশ করে সহমৃত্যু বরণ করেন। পাষণ্ডীর সহিত রাজার সেদিনে প্রীতি-সম্ভাষণজনিত মহাপাপ হয় ও সেই মহাপাপের ফলে রাজা দেহান্তে বিদিশা নগরে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে মহারানী শৈব্যা কিন্তু কাশীরাজার কন্যারূপে সর্ব্বগুণসম্পন্না ও জাতিস্মর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে কাশীরাজ-কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হলে রাজা কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাজকন্যা তাহাতে অসম্মতি জানান। জাতিস্মরা রাজকন্যা জানতে পারেন যে, তাঁর পূর্ব্বস্বামী শতধনু বিদিশা-নামক নগরে কুকুর-দেহ ধারণ করে আছেন। অনন্তর রাজকন্যা তথায় গমন করত কুকুর-দেহধারী রাজাকে সম্বন্ধে আহ্বাদি দিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলেন,—“মহারাজ! আমি আপনার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী শৈব্যা এবং আপনি শতধনু রাজা। আপনার দুর্ভাগ্য-বশতঃ একদিন এক পাষণ্ডীর সহিত আলাপ হওয়ায় সেই পাপের ফলে আপনি কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।” রাজা ইহা শ্রবণ করত অনুতপ্ত হৃদয়ে গ্রামের বাহিরে গিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক কোলাহল-পর্ব্বতে শৃগাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজকন্যা পুনরায় তাহা জানতে পেরে সেই পর্ব্বতে গিয়া শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করায় রাজা উপবাসদ্বারা দেহত্যাগ করে পুনরায় বৃক- (নেকড়ে বাঘ) হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বৃক-দেহধারী সেই রাজা অতঃপর রাজ-কন্যার নিকট পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনে তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় অনুশোচনা করতে করতে বৃক-দেহ পরিত্যাগ করলেন ও পুনরায় ভাগ্য-দোষে শকুন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

কাশীরাজ-কন্যা তাহা অবগত হয়ে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই শকুন-রূপী রাজাকে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে রাজা অনুতাপনলে দক্ষ হয়ে শকুন-দেহ পরিত্যাগ করত আবার কাক-যোনি প্রাপ্ত হলেন।

মহাশূণ্যবতী রাজকন্যা জাতিস্মরতা-প্রভাবে তাহা জানতে পেরে কাক-রূপী পূর্বপতির নিকট গিয়া তাঁকে সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত বললেন। তখন রাজা তাঁর নিজ সর্বনাশের কথা মনে ভাবতে ভাবতে কাক-দেহ পরিত্যাগ করে পুনরায় ময়ূর জন্ম প্রাপ্ত হলেন।

রাজকন্যা পুনরায় তথায় গমন করত ময়ূরকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিয়ে পূর্ববৃত্তান্তসকল জানালেন। সেই সময় জনকরাজ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করেন ও যজ্ঞস্থলে 'অবভৃত' স্নানকালে সেই ময়ূরটিকে স্নান করান হয়। কাশীরাজ-কন্যাও স্নান করে ময়ূররূপী নিজ পূর্ব-পতি শতধনু রাজাকে পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলে রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ময়ূরদেহ ত্যাগপূর্বক সেই জনকরাজারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কিছুদিন পর রাজকন্যা বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে কাশীরাজ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন ও রাজকন্যার অনুরোধে দেশের অন্যান্য নৃপতিগণ ও তৎসহ জনকরাজ-পুত্রকে ও নিমন্ত্রণ করেন। রাজকন্যা তাঁর পিতা কাশীরাজকে তাঁর ও তাঁর পতির পূর্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন ও স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে নিজ পূর্বজন্মের পতি সেই জনকরাজ-পুত্রের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করেন। জনকরাজা পরলোক গমন করলে সেই রাজকুমার (শতধনু) মিথিলার রাজা হয়ে সত্ৰীক নানা উপচারে প্রত্যহ শ্রীহরির উপাসনা করত বহু বৎসর রাজত্ব করে অবশেষে দেহান্তে উভয়েই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন।

ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।৫১ সংখ্যাধৃত 'কাত্যায়ন-সংহিতা-বচন' ও 'বিষ্ণুসংহিতা-বাক্য' উদ্ধার করে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ কৃষ্ণবিমুখ-সঙ্গত্যাগ প্রসঙ্গে শুদ্ধগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করছি,—

“প্রদীপ্ত অগ্নির শিখা-পঞ্জরে অবস্থান করতে হয়, সেও বরং ভাল ; তথাপি যেন কৃষ্ণ-চিন্তাবিমুখ-জনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করতে না হয়।”

“যদি সর্প, ব্যাঘ্র ও কুস্তীরের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি যেন বাসনারূপ শল্যবিদ্ধ নানা-দেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে।”

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ



বেদ-স্তুতি

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকালে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মবস্তু অনির্দেশ্য ও গুণাতীত। বেদ গুণময়। সুতরাং বেদ কি-প্রকারে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ? পরীক্ষিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া শুকদেব গোস্বামী বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীহরি জীবের ভোগ-মোক্ষসাধনের জন্য রূপ-রসাদি গ্রহণের উপযোগী মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্-জ্ঞান সনক-নারদাদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক এই সকল তত্ত্ব শ্রবণ-কীর্তন করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই নিত্য, সনাতন ভগবানের পরম পদ লাভ করিবেন। এই বিষয়ে আমি নারদ ও নারায়ণ-সংবাদ আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।—

একদা নারদঋষি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্রীনারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তিনি নারায়ণ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নারায়ণ ঋষি সমগ্র মানবকুলের মঙ্গল বিধানের জন্য কল্পকাল পর্য্যন্ত আশ্রমে মহাতপস্যায় মগ্ন ছিলেন। নারদ সেখানে গিয়া দেখিলেন—কলাপ-গ্রামবাসী বহু ঋষিকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নারায়ণ ঋষি বসিয়া আছেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারায়ণ ঋষি তদুত্তরে বলিলেন,—শ্রুতিগণ প্রলয়কালে শ্বেতদ্বীপে অবস্থান করেন। তথায় আমার অনিরুদ্ধমূর্তি রহিয়াছেন। তুমিও সেখানে তাঁহার দর্শনের জন্য গিয়াছিলে। সেখানে ব্রহ্মবাদ লইয়া জনলোকে যাহা সকলের আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থাৎ সকলে যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি তুমি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছ। সেখানে মুনিগণ সকলেই সমভাববিশিষ্ট। তাঁহাদের তপস্যা, বল, তত্ত্বজ্ঞান সবই সমতুল্য। তাঁহাদের কোন শত্রু-মিত্র ভাব ছিল না। তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। সকল মুনিগণ একত্রিত হইয়া সনন্দনকে তত্ত্বকথা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সনন্দন হস্তচিহ্নে সম্মতি প্রদানপূর্বক বলিলেন,—হে মুনিগণ! এই বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা মহাপ্রলয়ে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করেন। প্রলয়ের অবসানকালে শ্রুতিগণ তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। শ্রুতিগণ কহিতে লাগিলেন,—“হে প্রভু! তুমি অজিত, মায়াধীশ, ষড়ৈশ্বর্যশালী। জগতের সর্ব-শক্তির আধারস্বরূপ। তুমি আত্মশক্তির দ্বারা চিল্লীলায় মগ্ন থাক। বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই তোমার প্রকাশ। যোগী ও জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম বলিয়া তোমার গুণগানে সর্বদাই মত্ত থাকেন। ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়। যদিও ব্রহ্ম নিগুণ, বিকাররহিত, তথাপি সেই ব্রহ্ম অধিষ্ঠানেই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া থাকে।

যেমন মাটি হইতে কতপ্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং সেই সকল বস্তু ভাঙ্গিয়া গেলে মাটি মাত্রই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই সর্বলোক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ঋতিগণ চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতাকে নানা মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু হে হরি! তুমি সকলের সর্বময় কর্তা—ইহা বিশেষভাবে অবগত হইয়া তোমারই গুণগান কীর্তনে সদা মত্ত রহিয়াছেন। তুমি সর্বরূপে বিরাজমান আছ। তুমি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত বস্তু। বিবেকিগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার গুণগান কীর্তন করিয়া থাকেন। সেই কীর্তনপ্রভাবে তাঁহারা সমূহ পাপ ও সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। হে হরি! জীব স্বরূপতঃ তোমারই নিত্যদাস। জীবের যখন এই স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন তাহাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ত্রিতাপ সমূলে বিনাশ হইয়া যায় এবং অখণ্ড আনন্দস্বরূপ তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। এই সেবার দ্বারাই তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। তোমার অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে জীবের যদি ভক্তির উদয় হয়, তবেই তাহাদের জীবন সার্থক হয় ; অন্যথায় তাহাদের জীবন বিফলে পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

তুমি মহত্ত্ব, সমষ্টি, ব্যষ্টি সৃষ্টি করিয়া পঞ্চকোষে অনুপ্রবিষ্ট। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম সমূহ পদার্থের অতীত, সত্য, ব্রহ্মবস্তু। ঋষিগণ স্থূলদৃষ্টিদ্বারা নাভিচক্রে ব্রহ্মচিন্তা করেন। যোগিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মধ্যান করিয়া নাড়ীভেদপূর্ব্বক শিরোপরি সহস্রকমলে নির্মল জ্যোতি অবলোকন করিয়া ভবসাগর পারাবারে সমর্থ হন। জীব নিজ কর্ম্মফলে দেহ লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞজন তাঁহাদের সমূহ কর্ম্মফল তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। সাধুগণ জগতে প্রকটিত হইয়া জীবগণকে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন এবং তাহাদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। সেই সাধুগণের সঙ্গলাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারা কোনদিন মুক্তি প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের স্বভাব অতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এই মনুষ্যদেহ কেবলমাত্র তোমার সেবার জন্যই লাভ হইয়াছে। তোমার সেবাসুখ লাভ হইলে ভবব্যাধি অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যায়। যাহারা তুমিই জীবের আত্মা, সুহৃদ, সখা না জানিয়া এই নম্বর দেহকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করে এবং অসৎ উপাসনায় ব্যস্ত হয়, তাহারা এই ভয়সঙ্কুল সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুনিগণ মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া তোমার তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করেন। ব্রজগোপীগণ তোমার স্পর্শলাভের জন্য সততই লালায়িতা হইয়া ভোজনে-শয়নে-জাগরণে তোমারই চিন্তাতেই নিমগ্ন। আমরাও তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন

সতত সুখসাগরে নিমজ্জিত হই, হে প্রভু! ইহাই তোমার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমা হইতেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। তুমি যোগনিদ্রা অবলম্বনে শয়ন করিয়া আছ। বিনাশশীল ব্যক্তি কি করিয়া তোমাকে জানিতে পারিবে? তুমি ত্রিগুণাতীত। অজ্ঞগণ তোমাকে গুণময় মনে করিয়া কেবলমাত্র দুঃখই পাইয়া থাকে। তুমি জ্ঞানঘনানন্দ, চিদঘনানন্দ, সচ্চিদানন্দ। এই গুণময় প্রপঞ্চ অনিত্য। যাঁহারা তোমাকে নিখিল জীবের অধিষ্ঠাতা-জ্ঞানে তোমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া অনায়াসে ভবসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। তথাকথিত পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ কৰ্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া যদি ভক্তিশূন্য অবস্থায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পশুর ন্যায় বৃথাই কালান্তিপাত করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার প্রতি প্রেমভাবসম্পন্ন হন, তাঁহারা নিজেরাই ত' অবশ্যই পরম পবিত্র হইয়া থাকেন, এমনকি জগতের সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

তুমি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে বিরাজমান রহিয়াছ। অজ-ভব-মায়াদি সকলেই বিশ্বকর্তা তোমার পাদপদ্মের পূজা করিতেছেন এবং তোমার ভজনে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। তোমা হইতে ভীত হইয়া সকলেই যথাসময়ে নিজ নিজ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তুমি যখন ঈক্ষণদ্বারা আভাসেও মিলিত হও, তখন এই চরাচর সমস্ত জগৎ তোমা হইতেই আবির্ভূত হয়। তুমি পরম করুণাময়, অন্তর্যামী। তোমার আপন-পর কেহই নাই। তুমি আকাশতুল্য সমভাবসম্পন্ন। তুমি সর্ব্বজীবের একমাত্র গতি। এই অনন্ত জীবসমূহ তোমা হইতেই প্রকাশিত, শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ তোমা হইতেই সমস্ত জীব প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য হে প্রভু! তুমিই সকলের কারণ। যাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ, অজ্ঞানী, বিচারহীন, তাঁহারা তোমার ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহারা বুঝে না যে তোমার ঈক্ষণ আভাসে প্রকৃতি হইতে জীবের জন্ম হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে জীবগণ লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। তোমার মায়ার প্রভাবে সমস্ত জীবকুল ভ্রমযুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপে দক্ষীভূত হইতেছে। তাঁহারা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন বিপত্তির দ্বারা আকুল হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখের সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র বিবেকিগণ এই সংসার-দুঃখ নাশ করিবার জন্য তোমার অশোক-অভয়-অমৃত-আধারস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হে প্রভু! তুমি একমাত্র সকলের শরণ্য, নিয়ন্তা ও বিধাতা। তুমি পরমানন্দময়, সর্ব্বরসময় ও সর্ব্বসুখদাতা। পরমার্থে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুখের আশায় সদা দুঃখ-

প্রদ এই সংসারে স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, বিষয়বৈভবে আসক্তচিত্ত হইয়া নিরন্তর হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যাঁহারা সর্বদা তোমার গুণগান কীর্তনে মগ্ন থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সুখরাশির সীমা নাই। তাঁহারা পরমানন্দে তোমার ভজনে মগ্ন থাকিয়া রসসাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছেন।”

নারায়ণের উপদিষ্ট এইসকল তত্ত্ব শ্রীনারদমুনি গ্রহণ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন। তিনি শ্রীনারায়ণকে এবং তাঁহার উদারস্বভাব সমস্ত শিষ্যগণকে প্রণাম করত ব্যাসাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের নিকট গমন করিলেন এবং ব্যাসের সভায় নারায়ণ-মুখশ্রুত তত্ত্বসমূহ যথাযথভাবে বর্ণন করিলেন।

এই শ্রীনারদ-নারায়ণ-সংবাদে বেদস্তুতি শ্রবণ বা কীর্তন করিলে অবশ্যই ত্রিতাপজ্বালা-যন্ত্রণা, শোক, মোহ, ভয় ও অবিদ্যারূপ অন্ধকারসমূহ সমূলে বিধ্বংস হইয়া যাইবে এবং শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয়ে সেবাসুখ লাভ করিয়া পরমার্থধনে ধনী হইয়া প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ হইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

যোগমায়া ও মহামায়া

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০ পৃষ্ঠার পর]

অন্যদিকে, কে তুমি গো অবিদ্যাজননী,

জড়ানন্দ-প্রদায়িনী বিমুখ-মোহিনী?

মহামায়া নাম তব বিদিত জগতে।

কৃষ্ণসেবা ভুলি' জীব অনাদি-বিমুখ

নিত্যবদ্ধ ; মোহবশে বসে তারা সবে

তব অধিকারে। জড় অধিষ্ঠাত্রী তুমি।

ভ্রান্ত মৃগযুথ যথা তৃষ্ণাতুর হায়,

উদ্ধর্মুখে বারি আশে ধায় মরুভূমে

মরীচিকা পানে, শেষে হতাশ-জীবনে

হইতে নিধন সেই নীরস প্রান্তরে

অগ্নিময়। মুগ্ধ তথা, তব মায়া হেরি,

না পারি বুঝিতে ঘোর ইন্দ্রজাল তব,
 (ছলনা-রূপিণী তুমি মহা-মায়াবিনী)
 বহিস্মুখ জীবগণ, শান্তি-অন্বেষণে
 না ল'য়ে শরণ সেই সদা শান্তিদাম
 পাদপদ্মে গোবিন্দের, মোহান্ধ-হৃদয়ে
 মিথ্যা-প্রলোভনময় মন্দিরে তোমার
 অশান্তির পারাবার পশে গো সত্বরে
 বেগভরে। শুষ্কধরে সতৃষ্ণ সবার
 কি মধু-মদির-ধার ঢাল তুমি তবে ;
 আপাতঃ মধুর তাহা গরল বিষম
 বিভ্রম-জনক, তারা জানিতে না পারে ;
 করিতে করিতে পান মত্ত হ'য়ে যায়
 মোহিনী মায়ায় তব, চায় বারবার ;
 সর্বনাশ আপনার করে সাধ করি !
 পঞ্চরসে ভরি ভোগডালা সাজাইয়ে
 ধর তুমি নানারূপে সম্মুখে তাদের
 সময় বুঝিয়া ; মজে মূঢ়মতি সবে।
 মহার্ণবে তরী যথা কাণ্ডারী-বিহীন,
 ঘুরে ভবে অনুদিন, উঠে পড়ে বেগে
 তরঙ্গে তরঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর অশেষ !
 না পারে বুঝিতে তব বঞ্চনার লেশ।
 কৃষ্ণ ভুলি' ইষ্ট বলি বরিয়া বিষয়ে
 বদ্ধ মোহপাশে তব এই জীব হায়,
 দেহধর্ম-মনোধর্ম সাধিছে কেবল
 কবলে তোমার। কাল পরিণাম তাঁর
 ভাবে না গো একবার, ভাবিতে না পারে
 জড়মতি মদিরায়। পূজিয়া তোমায়
 'সুখদা' 'মোক্ষদা' বলি বিভ্রমে বিপুল,
 দিয়া বলি ফল ফুল, বণিক্ ব্যাপারে,
 বিনিময়ে তারস্বরে চাহে শতমুখে
 ভোগের ইন্ধন-রাজি ; রসনা ভরিয়া

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া তুলে 'দেহি' 'দেহি' রব
 তস্ত্রে মস্ত্রে অভিনব। তুমিই সে জীব
 তুলিয়া ত্রিদিবে কভু, ডুবায়ে নরকে,
 পলকে পলকে কোটি কুহক-লীলায়
 নাচাও নিয়ত রঙ্গে। তরঙ্গে কালের
 কোথাও কভু সে স্থির থাকিতে না পারে,
 উঠিলেও বহু উর্দ্ধে পড়ে পুনর্ব্বার
 পুণ্যক্ষয়ে। নিদারুণ কস্মের বন্ধন
 না ঘুচে কখন ; তাপ না হয় নির্ব্বাণ।
 কলির সহায় তুমি, কালের কামিনী।
 কালচক্রে অনিবার এই জীবগণে
 শিশ্নোদর-পরায়ণ, দেহারাম সদা,
 কর আবর্ত্তিত বেগে। মোহমস্ত্রে তব
 অসুখ অনিত্য—কালবিপ্লুত সম্পদে
 বিমুগ্ধ তাহারা শুধু ; নিত্য সত্য-ধন
 চিরপূর্ণ পূর্ণতম, অনুত্তম যাহা,
 না পায় সন্ধান তার। রুদ্ধ পথ সেই
 প্রভাবে তোমার। 'আবরিকা' শক্তি বলে
 আবরি তাদের তুমি স্বরূপ নিশ্চল,
 মিথ্যা অহঙ্কারে কত অভিমান আনি
 রাখ ভুলাইয়া। শত ঐশ্বর্য্যে দুর্লভ,
 উচ্চ পদ, উচ্চ মান, উচ্চ নাম দিয়া
 করিয়া বিভোর, কর লক্ষ্যহারা মূলে।
 মুগ্ধ তাহে অন্ধ-নেত্র না দেখে কেহই—
 যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়,
 সংক্ষয় সকলি হয় কালের নিশ্বাসে!
 অয়ি কুহকিনী মায়া,—মোহজাল তব
 কে পারে কাটিতে লোকে? মাত্র সেই জন,
 একান্ত শরণ রাধাকান্তের চরণে
 কায়মনে যে জনার, পারে অনায়াসে,
 দৃঢ় মোহপাশে তব শতধা কাটিয়া,

তাজিয়া বিদূরে ছল-ভাব-ভক্তি-আদি
 আত্মেন্দ্রিয়-সুখচেষ্টা কাপট্য ধর্মের,
 লভিতে সে অকৈতব ধর্মে সনাতন
 অনুপম, শুদ্ধভক্তিপথ অনাবিল ;
 অখিল প্রভাব তব ব্যর্থ যেই স্থলে।
 হরি ব'লে সেই স্থলে আনন্দে পরম,
 যোগমায়া-সুরক্ষিত শুদ্ধ ভক্তগণ,
 দুর্ভেদ্য সে আবরণ ভেদিয়া তোমার
 হয় দ্রুত অগ্রসর ; সবার উত্তর
 সদানন্দময় সেই ভবনে অভয়
 পায় দাস্য-যোগ নিত্য গোবিন্দ-চরণে !
 ধন্য শক্তি তব দেবি, ভক্তিহীন জনে !

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃষ্ঠার পর]

একটু ভাগবতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে চাই। তখন তাদের উত্তরে বলা হয়, আপনারা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে চাচ্ছেন কেন? অধ্যাত্মবাদ কথাটা এসেছে মনকে কেন্দ্র করে। “মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।” মন হল বন্ধনের কারণ, মুক্তির কারণ। কিন্তু সেই যে মানসিক বিচারসম্পন্ন যারা, তাদের সেই জিনিষটা শুনতে ভাল লাগছে কেন?

অধ্যাত্মবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাকৃত, জড়। সুতরাং বিশ্বরূপোপাসনা একটা জড়ীয় ব্যাপার। বহু ব্যক্তির ধারণা যে, গীতার যে-সমস্ত বর্ণনা, ওটা ঠিক নয়, ওটা কাল্পনিক। এবং এর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, অর্জুন প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি, এঁরা সব কাল্পনিক ব্যক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধেও ঐ রকম অনেকে কথা তুলছেন। কিন্তু জিনিষটা কি? প্রধান অতিথি মাননীয় S.D.C. মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছি যে, গীতার ব্যাপারটা বাস্তব সত্য ঘটনা এবং যুদ্ধ বাস্তবেই ঘটেছিল। এ কথা অবিশ্বাস করবার ত' কোন কারণ নাই। বর্তমানে এখন দূরদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তখনও দূরদর্শন ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ত' হাজির ছিলেন না সঞ্জয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা

করেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা। তিনি ত' সকল ঘটনা বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক তাঁর দূরদর্শিতা, ভবিষ্যদর্শিতা, আবার সাক্ষাৎভাবে সেই জিনিষটা তিনি দেখছেন সম্মুখে। সেটা দেখে তিনি বর্ণনা করে যাচ্ছেন। সুতরাং দূরদর্শন তখনও ছিল, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ঋষিগণের যে ক্ষমতা, অধিকার, সেটা একটা পৃথক্ জিনিষ। এটা সাধনায় উপলব্ধ সত্য জিনিষ। তাতে বাহাদুরি আছে কিছু। যে বাহাদুরি আমরা অর্জন করতে পারি না, সে বাহাদুরি কেউ কেউ অর্জন করেছেন, করতে পারেন। যেহেতু আমি পারি না, সুতরাং এটা মিথ্যা—এ কথা বলা ভুল। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত—এসব কথাগুলো শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। আমি প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকের যদি শিষ্য হই, তাহলে আমি চোখে যা দেখব, তা বিশ্বাস করব, মানব। বাকীটা মানতে পারি না। কিন্তু তা ত' সবক্ষেত্রে হচ্ছে না। প্রত্যক্ষ ছাড়াও পরোক্ষকেও আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে। অস্বীকার করবার উপায় নাই। সব জিনিষটা নিয়েই ত' শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন আলোচনার ক্ষেত্র হচ্ছে এই যে, কিভাবে আমরা জিনিষটাকে বুঝব? শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা সব জিনিষটাকে বুঝবার চেষ্টা করব এবং আমাদের পূর্ব পূর্ব মুনি-ঋষিগণ যেভাবে সাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন সেই পরমসত্য, বাস্তবসত্যকে, আমরা তাঁদেরই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তাঁদেরই বিচার নিয়ে সব জিনিষটাকে বুঝবার চেষ্টা করব। ক্ষেত্র হল এই।

গীতার শেষের দিকে “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” শ্লোকের আগে যে, গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম বাক্য আমি তোমায় বললাম, এটা তুমি চিন্তা কর, বিবেচনা কর। এই কথাটা কিন্তু প্রথম থেকেই বুঝিয়ে আসছিলেন কৃষ্ণ অর্জুনকে। প্রাকৃত নীতি, তারপরে তিনি বিশেষ নীতির কথা বলেছেন। রাজনীতির কথা ত' তিনি সেখানে তুলেছেন। এদের বধ কর, তোমার পাপ হবে না, অন্যায় হবে না—এটা রাজনীতিরই কথা। সেইজন্যই সেখানে কথাটা এসেছে—“অর্থ-শাস্ত্রাত্ত্ব বলবদ্ধশাস্ত্রম্।” অর্থশাস্ত্র মানে কৌটিল্য চাণক্যের অর্থনীতি। রাজনীতির কথা। রাজনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ তখন বলছেন ধর্মনীতির কথা। দেখ, আমি তোমাকে খানিকক্ষণ আগে বলেছি—এদের বধ কর, কিন্তু তুমি ব্যবস্থা নিতে পারছ না। এখন আমি বলছি—“মা হিংসাং সর্বানি ভূতানি।” ধর্মনীতিতে এটা বলছে, তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। এ জাতীয় কথা অন্য জায়গায়ও আছে। যখন অশ্বখামা পাণ্ডবগণের সেই সন্তানগুলোকে বধ করেছিল, তাদের শিরচ্ছেদ করেছিল, সেইসময় কথাটা এসেছিল। বলেছিলেন কৃষ্ণ—একে বধ কর। কিন্তু

সেখানে কৃষ্ণ পারেন নাই, যখনই তাঁকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল, কৃষ্ণ—দৌপদী তখন বললেন,—ছেড়ে দাও ওঁকে। কেন?—গুরুপুত্র, ব্রাহ্মণ উনি। ব্রাহ্মণের শারীরিক যে বধ, সেটা ঐরকম নয়। শাস্ত্রে বিধান আছে কি?—এর মণিটা কেটে নাও। এর অবমাননা, এটাই এর মৃত্যু। সুতরাং একই আইনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটা আইন প্রথমে তোলা হয়েছে, তারপরে Section, sub-section করে তার বহুরকম ধরণের ব্যাখ্যা চলেছে। এমন এক সময় দেখা গেছে যে, মূল আইনই সরে গেছে ব্যাখ্যায়। এ সমস্ত কথাগুলো ত' সব রয়েছে। সবটা সামঞ্জস্য করে বুঝতে হবে আমাদের। কৃষ্ণ পর পর তত্ত্ব-দর্শনটা বুঝাতে চেয়েছেন গীতার মধ্যে। কিন্তু অর্জুন এমনই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমি যদি বলে ফেলি হ্যাঁ বুঝে গেছি, তাহলে তত্ত্বদর্শন বন্ধ হয়ে যাবে, ভগবান্ আর উপদেশ করবেন না। সেজন্য যাতে ওটা চলতে থাকে, সেইজন্য তিনি বলে যাচ্ছেন—না আমি এটা বুঝতে পারলাম না, এটা বুঝতে পারছি না। এই বুঝতে পারছেন না বলেই আরও অগ্রসর হতে হচ্ছে কৃষ্ণকে পর পর।

সমস্ত অধিকারের কথা বলে ফেললেন, তাতেও যেন অর্জুন বুঝতে পারছেন না। তখন তাঁকে চরম বাক্য প্রয়োগ করতে হয়েছে—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” সর্বধর্ম্ম মানে লোকধর্ম্ম, ব্যবহারিক ধর্ম্ম, পারমার্থিক ধর্ম্মের উন্নত, উন্নততর, উন্নততম কথাগুলো সেখানে এনে ফেলেছেন। কিন্তু বলছেন, ওগুলো ছাড়, তোমার মাথায় ঢোকেনি, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার শেষ কথা শোন। এই যে শেষ কথা—Last wishes এর কি মূল্য, তা আইনজ্ঞগণ জানেন। অভিভাবক তিনি শেষ কথাটা বলে যাচ্ছেন, আর সেই কথাটা যদি তাঁর সন্তানরা পালন করে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সম্পত্তির অধিকার-অধিকারিণী, ভক্তির অধিকারী-অধিকারিণী হয়। এখানে ঠিক ভগবানের শেষ কথা, আমার চরম বাক্য—এতক্ষণ যা বলেছি ছেড়ে দাও ওগুলো। আইনেতেও এটা বলা আছে। “পূর্ব পরয়োঃ পর-বিধি বলবান্।” আগে বহুকথা বলা হল, কিন্তু এটা আমার চরম কথা, শেষ কথা, ছাড় ওগুলো। ঠিক সেইরকম ধরণের কথা ওখানে এসেছে। Final decision এবং এই অনুসারেই আমাদের প্রাপ্তি। এখানে কিসের প্রাপ্তি অর্জুনের?—ভগবানের আজ্ঞা পালন করা রূপ প্রাপ্তি। তাতে কি লাভ হয়? আর ভগবানের আজ্ঞা পালন না করলে বা কি দোষ-ত্রুটি হয়, সেটাও ত' শাস্ত্রে বহু জায়গায় দেখান হয়েছে। মহাভারতের মধ্যেও রয়েছে। ভগবানের আজ্ঞা পালন করে অর্জুন ভক্তিমান্, তাঁর সখ্যভাব বজায় থাকল। যদিও যুক্তির ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে সখ্যভাব ছাড়তে হয়েছিল। সেটাও রয়েছে এর মধ্যে।

কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুচ্যেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাম্নিচ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

আমি ধর্মের ভাল-মন্দটা বুঝে উঠতে পারছি না। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। আমার পক্ষে যেটা শ্রেয়ঃজনক, আত্মকল্যাণজনক, সেটা তুমি বল। বলছেন না কৃষ্ণ। তখন আসছে “শিষ্যস্তেহং”। কেন বলছেন না? তাহলে বোধ হয় আমি যোগ্য নই, অধিকারী নই। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বলছেন,—“শাধি মাম্”—আমাকে শাসন কর। শাসন কর কে বলবেন?—শিষ্য বলবেন, ছাত্র বলবেন, অন্তোবাসী বলবেন, শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী বলবেন। এ কথাটা উপদেশকের নয়। আমি শিষ্যত্ব স্বীকার করলাম। শিষ্যত্ব স্বীকার মুখে করলেই হবে? আবার বলছেন,—“শাধি মাম্”—আমাকে শাসন করুন, আমি শাসন গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। তাতেও হচ্ছে না, তাতেও যেন ঠিক বিচারটা পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও গীতার মধ্যে একথাগুলো বলা আছে আগে।—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

তিনটে অধিকার রয়েছে শিক্ষার্থীর, বিদ্যার্থীর—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি। Humble obeisances রয়েছে, honest enquiry of a Truth—বাস্তবসত্য জানবার জন্য প্রশ্ন, আর serving temperament—এ তিনটে অবশ্য গুণ থাকা চাই শিক্ষার্থীর, বিদ্যার্থীর। ঠিক সেই কথাই গীতার মধ্যে এসেছে। তখন কিছু উপদেশ আসতে পারে আমার জন্য, এর পূর্বে আমি কিছু উপদেশ পাওয়ার যোগ্য নই, অধিকারী নই—সেইকথা বুঝাচ্ছেন এখানে। “শাধি মাম্”—সেখানেও যেন সব সদগুণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। “ত্বাং প্রপন্নম্”—যখন বলেছেন আমি তোমাতে প্রপত্তি স্বীকার করছি, আমি তোমার শরণাগত হলাম, আমার যা কিছু বাহাদুরি আমি সব ছাড়লাম, তখন থেকে উপদেশটা ঠিক ঠিক ভাবে আরম্ভ হয়েছে। তার আগে উপদেশ আরম্ভই হয় নাই এবং সেইখানে পর পর উপদেশ-গুলো দিয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন তুমি অহঙ্কারী হয়ো না, তুমি বাহাদুর নয়, সবটার মালিকানা আমার রয়েছে। আমি সব ভাল-মন্দটা বুঝি।

“ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্ ॥”—বলা হয়েছে। এখানে ‘ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব’—ভগবান্ যদি এই কৌরবদের মেরে রাখেন, তাহলে ভগবানের পরে দোষারোপ হয়। ভগবান্ তাহলে Neutral—নিরপেক্ষ নন।

সেইজন্য তাঁকে বলতে হয়েছে—“ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব” অর্থাৎ এরা এদের কর্মফলে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হবে, তা আগেভাগে দেখে রাখ। তুমি নিমিত্তমাত্র হও, বাহাদুরি করো না। যা হবার তা ত’ হয়েছে। এটা দেখাবার জন্য তাঁকে বিষ্ণুরূপ দেখাতে হয়েছে, তা না হলে ওটার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভক্তের যে ভাব—পূর্ণ শরণাগতি, পূর্ণ আত্মসমর্পণ, সেটা শেষের দিকে গিয়ে অর্জুন দেখাচ্ছেন এবং ভগবান্ সেইটাই চেয়েছেন। তাই তাঁর শেষ বাক্য বলছেন—“মামেকং শরণং ব্রজ।” এতকথা তোমায় বললাম, তুমি কিছু বুঝলে না। আমার শেষ কথাটা শোন। এই কথাটা মানলে পরে তোমার সবটাই মানা হবে। “মামেকং শরণং ব্রজ”—একমাত্র আমারই শরণ লও। এই কথার ভিতরে ভগবানের—কৃষ্ণের কোন দাস্তিকতা নাই, অহঙ্কার নাই। তিনি যে তত্ত্ববস্ত্ত, সেই তত্ত্ববস্ত্ত অনুসারে এই কথাটা বলবার হক্কার, বলতে তিনি সমর্থ, সর্বসমর্থ। “কর্তৃমকর্তৃমন্যথা কৰ্ত্তুম্ ইতি ঈশ্বরঃ।” সেই ভগবান্ তিনি এটা বলতে সমর্থ, তাই তিনি একথা বলেছেন এবং তত্ত্বদর্শনটাও তাই। একেশ্বরবাদের কথা এর ভিতরে রয়েছে, অনুসূত আছে। এই কথারই প্রতিধ্বনি গীতার অন্যান্য শ্লোকেও রয়েছে।

“ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।”

আমি ব্যবসা করতে বসেছি, লাভ করাটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তার মধ্যে বিচার, নিরীক্ষা করতে হবে। লাভ চাই। যারা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই লাভ করবেন। এখানে লাভ কি? সেই লাভের কথা বলছেন—যারা সত্যই ধার্মিক হতে চান, ধর্ম অনুশীলন করতে চান, বাস্তবসত্য তাদের জানতে হবে। ভাল কোনটা, খারাপ কোনটা—এ দুটোই তাদের জেনে নিতে হবে। জেনে না নিলে আমি খারাপটাকে ছাড়তে পারি না, আর ভালটাকে গ্রহণও করতে পারি না। সেইজন্য যুক্তির ক্ষেত্রে দুটোই আমাকে জানতে হচ্ছে, শিখতে হচ্ছে, বুঝে নিতে হচ্ছে। ভগবান্ শুধু ভালরই মালিক, খারাপটা তাঁর থেকে আসে নাই—একথা বলা চলবে না। কেন? “সদসদ্যোনি জন্মষু” বলা হয়েছে শাস্ত্রে। সুতরাং ভাল-মন্দ যা কিছু সবই সেই ভগবান্ থেকে এসেছে।

আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় তিনি বলেছেন,—“নাসতো বিদ্যতে ভাবো।” কথাটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেন? পাশ্চাত্য নাস্তিক্য দর্শন শিখাচ্ছে কি আমাদের?—“Out of nothing everything has been created.” শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলছেন তাঁরা। কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে এটা মেনে নেওয়া যায় না। সেই দেশেরই আবার অন্য দার্শনিক যাঁরা, তাঁরাই আবার বলছেন,—“Out of something something has been created.”—একথা

সত্য। “Out of nothing everything has been created” এটা বাজে কথা, মিথ্যা কথা, অযৌক্তিক কথা, অতাত্ত্বিক কথা। তাঁরাই প্রতিবাদ করেছেন এবং তার Reference দিয়েছেন এই শ্লোক,—

“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।”

শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। যিনি স্রষ্টা তিনি নিরাকার নন, তিনি নিগুণ নন, তিনি নিঃশক্তিক নন, তিনি সবকিছু অপ্রাকৃত অবস্থাবিশিষ্ট। তাঁর সব ক্ষমতা আছে—সৃজনী শক্তি তাঁর আছে, তাই তাঁর থেকে অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

নিরীশ্বর সাংখ্যকার যে কপিল, তাঁর যে কথাটা—পুরুষ হচ্ছেন নিষ্ক্রিয়, একথাটাও যেমন, আর আচার্য্য শঙ্করপাদের নির্বিশেষ মতবাদের মধ্যে যে কথাটা আছে—“ক্লীব ব্রহ্ম”, তাঁর কোন ক্ষমতা নাই, কোন কিছু যোগ্যতা নাই—একথাটাও একই। যদি প্রশ্ন করেন আপনারা কেন শঙ্করাচার্য্য এই কথাটা বললেন? বলার কি প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, কারণ নিশ্চয়ই ছিল। তিনি এমনি এমনি বলতে যান নাই। বলার প্রয়োজন ছিল বলে তিনি বলেছেন। ভগবান্ আদেশ করেছেন বলে তাঁকে বলতে হয়েছে। কেন ভগবান্ আদেশ করলেন? তিনি কি অবিচারক? না। তাঁর ভক্তের পথ রোধ করছিল অসুরগণ, নাস্তিকগণ। সেইজন্য ভগবান্ শিবঠাকুরকে ডেকে বললেন,—এই অসাধ্যসাধন তোমায় করতে হবে। কিন্তু শিবঠাকুর ত’ প্রথমে রাজী হন নাই ঐ ব্যাপারে। তিনি অনেক কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু ভগবান্ ত’ শুনছেন না। এটা তোমাকে দিয়েই আমাকে করাতে হবে এবং তুমিই এই জিনিষটা বলবার অধিকারী বিশেষ। যে কথা বর্ণিত হয়েছে শাস্ত্রে,—

“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা।।”

মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র আমি প্রচার করব—শিবঠাকুর বলছেন শিবানীকে। সেটা কি? “প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে”—সেটা হল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। বুদ্ধের কি বাদ? শূন্যবাদ—Nihilism। “ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা”—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণের গৃহে এসে জন্মগ্রহণ করব এবং এই মায়াবাদ, নির্বিশেষবাদ প্রচার করব।

“স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্তৃষ্ণ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।”

আবার ভগবান্ বলছেন,—আগমের, বেদের সব কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাও তুমি। জনগণকে বিমুখ কর। কোন্ জনগণকে?—যারা আমার ভক্তের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে, আমার প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে, তাদিগকে তুমি Divert কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদেৱ জয়তঃ

নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

প্রধান কার্যালয় :—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপ (নদীয়া)

০৩৫৩-২৪৬৮৫৯৬

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ

মিলনপল্লী, পোঃ—শিলিগুড়ি

জেলা—দার্জিলিং, পিন—৭৩৪৪০৫

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখা-মঠ শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে নবনির্মিত সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শুভবিজয়-অনুষ্ঠান সমিতির বর্তমান অধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্ধিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সমিতির সাধারণ-সম্পাদক পরম পূজনীয় ত্রিদিগ্ধিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজের পরিচালনায় উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে ৯ই বৈশাখ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং২২/৪/২০০৪) বৃহস্পতিবার দিবসে সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষ্যে নগর-সঙ্কীৰ্তন, ধৰ্ম্মসভা, বৈষ্ণবহোম, মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইবে।

ধৰ্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যানুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে। ইতি—২২ ফাল্গুন, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদিগ্ধিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

□ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ চৈত্র, ১৪১০; ১৩ এপ্রিল, ২০০৪

অনুষ্ঠান-সূচী

৮ই বৈশাখ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ২১।৪।২০০৪), বুধবার—

মঙ্গলারতি—ব্রাহ্মমুহূর্তে

মহাজন-পদাবলী-কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—প্রাতঃ ৬টা—৮টা

মধ্যাহ্ন-ভোগারতি—দুপুর ১২টা

নগর-সঙ্কীৰ্তন—বৈকাল ৩টা—৬টা

সন্ধ্যারতি—সন্ধ্যা ৬টা—৭টা

ধর্মসভা—রাত্রি ৭টা—৯টা

৯ই বৈশাখ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ২২।৪।২০০৪), বৃহস্পতিবার—

মঙ্গলারতি—ব্রাহ্মমুহূর্তে

মহাজন-পদাবলী-কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—প্রাতঃ ৬টা—৮টা

বৈষ্ণবহোম-যজ্ঞ—প্রাতঃ ৮টা—১০টা

মধ্যাহ্ন-ভোগারতি—দুপুর ১২টা

মহাপ্রসাদ-বিতরণ—মধ্যাহ্ন ১টা—৩টা

মহাজন-পদাবলী-কীর্তন—বৈকাল ৪টা—৫টা

ধর্মসভা—বৈকাল ৫টা—৭টা

সন্ধ্যারতি—সন্ধ্যা ৭টা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[অনুভাষ্য, অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অমৃতানুকণা-ভাষ্য-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

<p>শ্রী</p> <p>ধর্মঃ বনুভিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।</p> <p>শ্রী</p>	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p> <div data-bbox="145 182 787 600"> </div> <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্মা সুপ্রসীদতি ॥</p>	<p>শ্রী</p> <p>নোংগদ্যেদ্যদি রতিং শ্রম এব ই কেবলম্ ॥</p> <p>শ্রী</p>
---	---	--

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিয়শূন্য ॥	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
---	--

৫৬শ বর্ষ }	১০ ত্রিবিক্রম, গর্ভোদশায়ী, ৫১৮ শ্রীগৌরাঙ্গ ৩১ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪১১, ইং ১৪/৫/২০০৪	{ ৩য় সংখ্যা
------------	---	--------------

সানুবাদঃ

শ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্

(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্)

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষি-বক্তৃ-, চন্দ্রপ্রভা-স্বস্ত-তমোভরায় ।

গৌরাঙ্গ-দেবানুচরায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামামৃত-বর্ষণশীল যে-মুখচন্দ্রের প্রভায় সকল অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয়,
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীমন্ নরোত্তমঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সঙ্কীর্ণনানন্দজ-মন্দহাস্য, দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিগ্‌মুখায় ।

স্বৈদাশ্রধারা-স্নপিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীহরিসঙ্কীর্ণনের আনন্দে মন্দ মন্দ হাস্য করিলে সেই দন্তকিরণে দিগ্‌গণের
মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া থাকে এবং সেইকালে ঘর্ম ও অশ্রুধারায় যিনি স্নান
করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২ ॥

বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নয়, বিধি-প্রসক্ত-নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।

রত্নির চেষ্টারূপ অঙ্গ—অনুভাব ও সঞ্চরি-সামগ্রীবিশেষ। তন্মিলনে গাঢ় রত্নিরূপ প্রেম, রস হইয়া পড়ে। রসবিষয়ে কৃষ্ণের রসামৃতসমুদ্র-বিচার-প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমরস-বিষয়ে, এস্থলে পুনরায় বলা হইল না, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞান (ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান) যুক্ত প্রেম। রাগানুগ ভুক্তসাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধিমাগীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সান্ত্বাদি অবস্থা (সান্ত্বি প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি) প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-সর্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোথ ('ভাব' হইতে জাত) ও প্রসাদোথ (কৃপা হইতে জাত) ভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোথ আবার বৈধ-ভাবোথ ও রাগানুগীয় ভাবোথ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোথ প্রেম বিরল। ভাবোথ প্রেমই সাধারণ। ভাবোথ প্রেমের উদয়ক্রম শ্রীচৈতন্যচরিতামতে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রব' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ'-কীর্তন'।
সাধনভক্তে হয় সর্কানর্থ-নিবর্তন।।
অনর্থনিবৃতি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্কানন্দ-ধাম।।
যাঁর চিন্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩, ১৫)

এ বিষয়ে কারিকা,—

আকর্ষ সন্নিবোধী লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোন্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিরেব সা।।
প্রতিফলন-ধর্ম্মত্বাৎ বদ্ধজীবে নিসর্গতঃ।
ইতরেষু চ সর্কেষু রাগোক্তি বিষয়াদিষু।।
নিদ্রভদ্রোত্তরা ভক্তিঃ শুদ্ধপ্রীতিরনুত্তমা।
তৎপূর্কমাত্মনিক্ষেপাৎ ভক্তিঃ প্রীতিময়ী সতী।।
কৃষ্ণবহিস্মুখে সা চ বিষয়প্রীতিরেব হি।

সা চৈব কৃষ্ণসাম্মুখ্যাং কৃষ্ণপ্ৰীতিঃ সুনিৰ্মলা ॥
 রত্যাদি-ভাবপর্য্যন্তং স্বরূপলক্ষণং স্মৃতম্ ।
 দাস্যসখ্যাদি-সম্বন্ধাৎ স চৈব রসতাং ব্রজেৎ ॥
 তরঙ্গরঙ্গিণী প্ৰীতিশিখিলাস-স্বরূপিণী ।
 বিষয়ে সচ্চিদানন্দে রসবিস্তারিণী মতা ।
 প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রসঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ ॥
 কৃষ্ণেতি নামধেয়ন্তু জনাকর্ষ-বিশেষতঃ ।
 চিদম্বনানন্দ-সর্কস্বং রূপং চামৃতং প্রিয়ম্ ॥
 অনন্তগুণ-সম্পূর্ণো লীলাঢ্যঃ গোপীবল্লভঃ ।
 অভিলিঙ্গৈহরিঃ সাক্ষাদৃশ্যতে প্রেষ্ঠমাশ্রয়ঃ ॥
 তেন বৃন্দাবনে রম্যে তদ্বনে রমতে তু যঃ ।
 স ধন্য শুদ্ধবুদ্ধে হি কেনোপনিষদাং মতে ॥

আকর্ষ (চুম্বক) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমন তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীব সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্ৰীতির স্বরূপলক্ষণ। এই রাগধর্ম চিৎজগতে স্বভাবসিদ্ধ। জড়জগৎ সেই চিৎজগতের প্রতিফলন। জীব তাহাতে বৈধর্ম (বিরুদ্ধ ধর্ম) অঙ্গীকার করায় চিৎপ্রতিফলিত জড়ধর্মে তাঁহার ইতরবিষয়াদিতে নিসর্গজাত একপ্রকার রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। বদ্ধজীবের 'লিঙ্গদেহ' ভঙ্গ না হইলে আর বস্তৃসিদ্ধ শুদ্ধভাব উদিত হয় না। সেই 'লিঙ্গভঙ্গের' পরে যে ভক্তি লক্ষিতা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধপ্ৰীতি। তৎপূর্বে জড়ীয়স্বরূপ-তিরস্কার ও চিৎ-স্বরূপ-পুরস্কার (স্বীকার-) রূপ আত্মনিষ্ক্ষেপ (আত্মনিবেদন)-প্রক্রিয়ার দ্বারা যে ভক্তি হয় তাহা প্ৰীতি ময়ী হইতে পারে, প্ৰীত্যাগ্নিকা হইতে পারে না। তাহার লক্ষণ শ্রীচরিতামৃতে,—

রাগাগ্নিকা-ভক্তি—‘মুখ্যা’ ব্রজবাসী-জনে।

তার অনুগত ভক্তির ‘রাগানুগা’-নামে ॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত সাধন।

‘বাহ্যে’ সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥

‘মনে’ নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

নিজাভিষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত’ লাগিয়া।

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হএগা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৪)

বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণেন্দুমুখী হয়, তখনই তাহা কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণবহিস্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধের উদয়ে সামগ্রী-সাহচর্য্যে রসতা-লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। শ্রীজীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভ-অনুসারে শিক্ষাষ্টক-ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে (সম্মোদনভাষ্য ৭ম শ্লোক),—

উল্লাস-মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্ত-রসেহনুমীয়তে। যস্যং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমুদ্র প্রীতিঃ প্রেমা দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি-ভঙ্গহেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রজাত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সথ্যে প্রতীয়তে। যস্মিন্ জাতে সত্ত্বমাদি-যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভাসপূর্ব্বক-ভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ যস্মিন্ জাতে মহাবাস্পাদিবিংকারঃ। দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম-সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিন্দিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে। স্নেহ এবাভিলাষাত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগপরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোহনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং নবনবীভাবন্নুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পর-ভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা। বিপ্রলম্বে বিস্মৃর্ত্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোদর্জ্জ-চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা-কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদীপ্ত্যশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়তে ইতি।

অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম—‘প্রেম’। তাহা দাস্যরসে অনুভূত হয়। যাহা উৎপন্ন হইলে আর প্রীতিভঙ্গের হেতুসকল বলবান হইতে পারে না। সেই প্রেম বিশ্বাসময় হইলে ‘প্রণয়’ হয়, তাহা সখ্যরসে লক্ষিত। প্রণয় জন্মিলে সত্ত্বমযোগ্যতাস্থলেও সত্ত্বম থাকে না। প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমানে কৌটিল্যের একটু আভাস যুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্র্যরূপ প্রণয় ‘মান’ হইয়া পড়ে। মান হইলে শ্রীভগবানও (সেই প্রণয়কোপ-হেতু) প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিন্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই ‘স্নেহ’। স্নেহ জন্মিলে মহাবাস্পাদি-বিকার, দর্শনে অতৃপ্তি, তদ্বিষয়ের মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। স্নেহ অভিলাষাত্মক হইলে ‘রাগ’ হয়। রাগ জন্মিলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। সংযোগ-বিষয়ে দুঃখও সুখ। বিয়োগ-বিষয়ে সুখও দুঃখ। সেই রাগ যখন নিজ বিষয়কে নব-নব-ভাবে সর্ব্বদা অনুভব করে

ও নিজে নব-নব-ভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম—‘অনুরাগ’। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশভাবরূপ প্রেমবৈচিত্র্যক্রমে তাহার বিষয়-সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্মলাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলভে বিস্মৃতি (বিশেষ স্মৃতি) হয়। অনুরাগ অসমোদ্ধ-চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন অবস্থা পাইলে তাকে ‘মহাভাব’ বলে। মহাভাব জন্মিলে যোগসময়ে নিমেষ সহ্য হয় না ও কল্প ও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময়ে ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগে ও মহাভাবে মহাদীপ্তির সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।

প্রীতি অশেষ-তরঙ্গ-রঙ্গে চিদিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণে সর্বদা রসবিস্তার করে। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণতত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতেই কৃষ্ণনাম। শ্যামরূপ চিৎসনানন্দ-সর্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণ-গুণদ্বারা সম্পূর্ণ ও নিত্যলীলা-রসাত্মক। এই নাম-রূপ-গুণ ও লীলাপরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য। সেই কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনরূপ ‘তদ্বনে’ যিনি রমণ করেন, তিনি কেনোপনিষৎ-মতে ধন্য ও শুদ্ধবুদ্ধি।

পঞ্চঙ্গে সদ্ধিয়ামম্বয়সুকৃতিমতাং সৎকৃপৈকপ্রভাবাৎ

রাগপ্রাপ্তেপ্তদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্বা।

বেদাতীতা হি ভক্তির্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা

ক্ষিপ্ৰং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌরশিক্ষেব গূঢ়া।।

শ্রীমূর্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য আস্থাদান, নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ণন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চঙ্গ-সাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপাপ্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণ-সেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা নামে সাধনভক্তি উদ্ভিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধ অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদ্ভিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাপর্ণমস্ত্র।

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভাগবতধর্ম-শিক্ষার্থীগণের কর্তব্য

ভাগবতধর্ম-শিক্ষার্থী সর্বতোভাবে মনোবেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার

উপদেশ করিলেই মন নিগৃহীত হইবে। কায়মনোবাক্যের দণ্ডগ্রহণ ফলে শম-দমাদিভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। দম-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ; শম-শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি। ত্রিদিগুগণের এই সব গুণ ফলরূপে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবত-বিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ (উদাসীন) হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা, তাঁহাদের দণ্ডগ্রহণাধিকার অবশ্যসম্ভাবী। বহির্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগী বস্তু হইতে পৃথক্ বুদ্ধিও সেবাবিমুখ মানসভাবসমূহের অনাদর—এই উভয়প্রকার গুচিই শ্রীভাগবতশ্রিত জনগণের অবশ্যসম্ভাবী। বহির্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বিমুখ জীবের ভোগ্য—এই বিচার পরিহার করাই বাহ্য গুচি। ভগবদ্বিমুখ স্মার্তগণের মৃৎজলাদিগুচি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্যভাবে ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত বস্তুই অশুচির আকর। অহঙ্কার-অবলম্বনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধভাব পোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধ।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ॥

অদন্তপোষণই ভাগবত-জীবনের নিরহঙ্কারত্বের প্রতীতি। ভগবদন্তু স্বধর্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও সেবাবিমুখ-পদার্থের সহিত সঙ্গত্যাগকেই ‘তপস্যা’ বলিয়া জানেন। নতুবা সেবা-বিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

অন্তবহিযদি হরিস্তপসা ততঃ কিং

নান্তবহিযদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

---এই বিচার আলোচ্য।

আগমাপায়ী অনিত্যবস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা ভাগবত-জীবনের অন্তরায়। প্রাকৃত ক্ষেত্রের কারণ হইলেও দুরূহ না হওয়াই ‘তিতিক্ষা’র লক্ষণ। মায়াবাদাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক-ইন্দ্রিয় পরিচালনমুখে বহির্জগতের বস্তু-সমূহের ভোগ-প্রয়াস-কল্পে কর্মকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যথেষ্টা-চারিতার উপযোগী ব্যাকবিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবত-জীবনের মৌনের লক্ষণ। স্বরূপবোধের অভাবে প্রাকৃত দুঃখে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশের জন্য হরিবৈমুখ্য সাধন প্রভৃতি মুনি-বৃত্তির ব্যাঘাতকরক। শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুতি বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনই—মৌনধর্মের প্রশস্তি-কারক। কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্তি হওয়া বা প্রজন্মাদি ব্যাপারে উদাসীন্যই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানাত্মক বেদশাস্ত্র-অনুশীলনই—‘স্বাধ্যায়’ শব্দবাচ্য। শ্রীত-পথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদানুগ শাস্ত্র অধ্যয়নই সর্বদা বিহিত। শ্রীত-গৃহ্যাদি সূত্রবিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্মকাণ্ডের যে আবাহন, তাহা স্বাধ্যায়নিরত জনগণকে একায়ন পদ্ধতি হইতে বিপথ-গামী করে। ঐকান্তিক সেবা-প্রবৃত্তি লাভের জন্য শব্দের বিদ্বদ্ভটিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগম-নিগমাদির মন্ত্রোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে-শ্রবণ ও গ্রহণ করাই স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্ভিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবানিরত জনগণই সর্বর্বতোভাবে সহজ পথের পথিক। প্রাকৃত-সাহজিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহজিকগণের ত্রুরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবাবিমুখতা আর্জব (সরলতা) হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সর্বাশ্রনাশ্রিতপদো যদি নির্ঝালীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে ॥

ঔপাধিক অহংমমভাব-বিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই অসরলতা। আত্মধর্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিত। ব্রহ্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত জনগণ দ্বীয় ঋজুবৃত্তির (সরলবৃত্তির) লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূল-বিচারে ব্রহ্মাণ্যধর্মে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ত্রুরতাবশে অধমবৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজন-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচার-বর্ণনে যোষিৎসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্ভিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতি-প্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্যরহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়মনোবাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ প্রাপঞ্চিক ভোগ্য বস্তুসমূহে ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত, রাজস, তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে, সেই সময় পরিচ্ছিন্ন, সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সেবানুকূলে অখিল-ইন্দ্রিয়-নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের তটস্থ-লক্ষণ এবং কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পশুশালায় জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে অব্রহ্মে বিচরণ বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রীতপন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহস্থাস্রমী বৈষ্ণবগণ নৈশচর্য্যায় মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষুভক্তি-নিরত জনগণই নির্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈন-নীতি যদিও অহিংসাদি-বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। তাঁহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিচারবশে জড়জগতের ভোগত্যাগে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদের আত্মতাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমৎকার ॥

—এই কথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যা নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা তাৎপর্য্যকেই ‘অহিংসা’ বলিয়া জানিতে পারেন না। বর্ষর-গণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসা-প্রবৃত্তিকে বহমান করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্রোহী করাইয়া হিংসারাজ্যে চতুবর্গের অভিলাষী করিয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনতত্ত্ব, ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসরস্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রপঞ্চ বিপরীত ধর্ম বিপরীত-রুচি-বিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে (বন্ধনের খুঁটিতে) আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপারবিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে ‘দুনৈতিক’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ নিজ অপস্বার্থ-পোষণের উদ্দেশে ত্রিবিধ অহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্ভিমুখজনগণ নিজ নিজ কৃতকার্য্যকেই নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না, তিনিই ‘সমতা’ লাভ করেন।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুত্তিং লভতে পরাম্ ॥

নির্বিশেষবাদিগণ গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ; কেন না, তাঁহাদের ভক্তিবিমুখতা ত্রিবিধ অহঙ্কার-রজ্জু-দ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণই ‘সমদর্শী’ বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাচ-ভাবসমূহের সহিত, বাস্তবসত্য, যিনি প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্বেই এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাঁহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত গুণজাত জগতের ভাব-সমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচাররূপ সমত্বাভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণরত আধ্যাত্মিক অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়। দৃশ্য জগৎকে ভগবদ্ভিমুখ জনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকল বস্তুই ভগবৎসেবোপকরণ যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্মমিসূত্রে ভগবদ্বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তত্ত্ব আংশিক সেবা গ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজ ভোগের অরোপ না করিয়া ভাগবতজীবন

লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্বিরোধি-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বিষয়ত্যাগী মায়াবাদী বিবর্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধদ্বৈত-বিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধদ্বৈত-বিচার-পরায়ণ শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদ দৃশ্য-বস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবৎআনন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত জীবব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিৎস্বর্গবিশিষ্ট জীব অচিন্ত্যে প্রতীক্ষিত নহেন, অথবা নিজেস্বরূপে বিমূঢ় নহেন। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্তমান। উহাকেই দৃশ্যজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব ‘জগন্মিত্যাত্মবাদ’ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যে কালে তিনি ভগবৎঅবতারের প্রাপঞ্চিক-অধিষ্ঠান-উপলক্ষিপূর্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দের অভাব থাকে না; অথবা জগতের প্রতি ভোগ্য-বিচার প্রবল হয় না। দৃশ্য জগৎ ও মিশ্রভাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবা উপকরণবিচারে অন্তর্য়ামিত্বসূত্রে আশ্রয় জাতীয়,—এই প্রকার বৈষম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার সর্বত্রই নিজপ্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-বশ্বে কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসন্দিগ্ধ-উপলক্ষি ঘটে।

মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর যে তাহার নিত্য আবাসস্থলী নহে, এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্ম-ধূলিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস, ও তামস দ্যুতকীড়াসদনরূপ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত তত্ত্বাংশীর অংশবিশেষরূপ স্বরূপে উপলক্ষিতে যে ভেদজ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য-অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িকভেদবিচারে অচিন্ত্যত্বের ব্যাঘাত করে; তাদৃশ উপলক্ষি-ভাবরাহিত্যই অনিকেতত্ব। প্রপঞ্চে অবস্থানকালে সকল বস্তুই যে ভগবৎসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট,—এই বিচার প্রবল হইলেই জীবের অসন্তোষের কারণ থাকে না। তিনি তখন সুষ্ঠুভাবে লজ্জাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোকদৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বন্ধলাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্য-সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কস্মী ও যথেষ্টাচারীর সঙ্গ বর্জন করেন।

দুঃসন্দলাভ-কামনায় অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রবৃত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাত্ত্বতশাস্ত্র গর্হণ করেন, তাদৃশী প্রশংসা ও নিন্দা শুদ্ধভক্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

—শ্রীল ভক্তিসিন্ধু ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

(গৌড়ীয় ১৯শ খণ্ড, ২৬শ সংখ্যা)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া

জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—রামকৃষ্ণ হল, পুরী

তারিখ—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, আমার পূর্ববর্তী বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের শ্রীমুখ হতে ‘শ্রীচৈতন্যের দয়া’ সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনারা শ্রবণ করেছেন। বর্তমানে রাত্রি অধিক হওয়ায় আপনাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এই Fag-end of the meeting-এ আমি আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ করব না ; কারণ আমাদের বক্তব্য-বিষয় গুরুতর হলেও এবং আপনাদের তা শ্রবণের ইচ্ছা থাকলেও চঞ্চলচিত্তে গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ হবে না। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃ-মহোদয় আমার দার্শনিকতা-সম্বন্ধে যে-পরিচয় দিয়েছেন, আমি সে-পরিচয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ; এমনকি, আমি কোন দর্শন-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করি নাই। তবে তাঁর কাছে এখানে ও মঠে যে-সমস্ত কথা শ্রবণ করেছি, তার মধ্য হতে দু-একটি কথার outline আপনাদের কাছে আধঘণ্টার মধ্যে নিবেদন করে নিরস্ত হব।

আজ আমাদের বক্তব্য বিষয়—“শ্রীচৈতন্যের দয়া”। আপনারা তা আমার পূর্ববর্তী বক্তৃ-মহোদয়ের কাছে জেনেছেন। ‘দয়া’-শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচার করলে আমরা লক্ষ্য করি—এতে পরদুঃখ-মোচনোচ্ছা নিহিত আছে। ‘দয়া’-শব্দ দয় ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বললে আমরা এটাই বুঝব যে, চৈতন্যদেবের দয়াতে পরদুঃখ-মোচনরূপ একটা ক্রিয়া তাঁর লীলাতে বর্তমান আছে। ‘দয়া’-শব্দের ভিতরে আমরা আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করি যে, তাতে প্রিয়তা, কমণীয়তা আছে। ‘দয়’ ধাতুর অর্থই কমণীয়তা, প্রিয়তা ; আমরা যা হতে ‘দয়িত’-শব্দ শ্রবণ করেছি। সুতরাং চৈতন্যদেবের দয়া বললে তাঁর এই দয়ার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে কমণীয়তা ও প্রিয়তা আছে বুঝায়। তাঁর দয়া সাধারণ দয়া অপেক্ষা এই অংশে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এইজন্যই আমার পূর্ববর্তী বক্তৃ-মহোদয় চৈতন্যদেবের পরিচয়-মুখে এবং মঙ্গলাচরণে “নমো মহাবদান্যায়” ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মহাবদান্য ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিচয় আপনাদের অবদিত নাই। কারণ তিনি সন্ন্যাসলীলার পর দীর্ঘ অষ্টাদশ-বৎসর এই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করে তাঁর মহাবদান্য-লীলার পূর্ণ প্রকাশ করেছিলেন।

দয়া একটা গুণ-পদার্থ। গুণ-পদার্থের গৃথক্ভাবে অবিষ্ঠান আমরা কখনও চিন্তা করতে পারি না। গুণ কিছুকে আশ্রয় করে থাকে। সুতরাং দয়ারূপ গুণ-পদার্থকে কারও

আশ্রয়ে থাকতে হবে। পাশ্চত-ভাষায় বললে তা আপনাদের আরও সহজবোধ্য হবে। গুণ-পদার্থ অর্থাৎ Attribute ; সুতরাং Attribute এর Exclusively separate existance আমরা কখনই চিন্তা করতে পারি না। উহা substance- এর সহিত ওতঃপ্রোতভাবে স্বতঃ-বিদ্যমান। সুতরাং Attribute এর বিষয় আলোচনা করলে substance চৈতন্যদেব হতে তা পৃথগ্ভাবে অবস্থান করতে পারে না। অতএব চৈতন্যদেব বললে দয়া তাঁর সঙ্গের সাথী বুঝতে হবে। চৈতন্যদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা “অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ” ইত্যাদি একটা শ্লোক দেখতে পাই। এই শ্লোকটির ভিতরে ‘করুণয়া অবতীর্ণ’ এই কথাটি দেখতে পাচ্ছি। ‘করুণয়া’ এই তৃতীয় পদে আমরা দুইটা জিনিষ লক্ষ্য করছি। প্রথমতঃ করণকারকে অর্থাৎ দয়াপরবশ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ সাহচর্য্য-অর্থে করুণার সহিত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এইরূপ বুঝাচ্ছে।

চৈতন্যদেব দয়া করে এখানে আমাদের দুঃখ মোচনের জন্য এসেছিলেন—এই অর্থ অপেক্ষা তিনি করুণা অর্থাৎ দয়া-গুণপদার্থটিকে সঙ্গ করি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই অর্থই আমি গ্রহণ করছি। ‘করুণা’—এই গুণপদার্থ শ্রীচৈতন্যে অবস্থিত আছে। সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত গুণাবলীর আবির্ভাব হয়েছিল। তন্মধ্যে দয়া-গুণই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমি পূর্বেই বলেছি—‘দয়া’ বলতে কমণীয়তা, প্রিয়তা লক্ষ্য করে। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃ-মহোদয় আপনাদের কাছে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের যে কথা বলেছেন অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ”—সেটাই দয়া। ‘প্রেম’-শব্দ ‘প্ৰী’-ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। দয়ার ভিতরে যে প্রিয়তা লক্ষ্য করি, সেটাই প্রেম। সুতরাং ‘দয়া’ বলতে প্রিয়তা অর্থাৎ প্রেম বুঝবে। চৈতন্যদেবের দয়া চৈতন্যদেবের প্রেমকে লক্ষ্য করে।

পূর্বে যে আমি প্রিয়তা ও কমণীয়তার কথা বলেছি, তার উদ্দেশ্য—তাঁর দয়ার ভিতরে কোনপ্রকার কাঠিন্য, উগ্রতা, কৃচ্ছতা বা অনুপাদেয়তা ব’লে কোন পদার্থই আমরা লক্ষ্য করি না। এইজন্যই চৈতন্যদেব মহাবদান্য। তিনি যে বস্তু দয়া করে আমাদের দান করেছেন, তা আমাদের মত কলিহত জীবের পক্ষে অতি সহজ, সরল, স্নিগ্ধ, প্রিয় ও কমণীয়। তিনি যে বস্তু দয়া করে দান করেছেন, তা তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই আমাদের প্রিয় মঙ্গলের জন্য দান করেন নি। আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্ব, আচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্য এবং শ্রীপাদ শঙ্কর প্রভৃতি কেহই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের জন্য যে প্রকার করেছেন, সে-প্রকার করেন নি। চৈতন্যদেব যেভাবে জীবের কৃষ্ণদাসত্ব জানিয়ে দিয়েছেন, অন্যান্য আচার্য্যগণ সেভাবে জানান নি। আচার্য্য শঙ্কর দাসত্বের অঙ্গীকার

আদৌ করেন নি। চৈতন্যদেব দ্বাদশ প্রকার দাসত্বের মধ্যে পাঁচ প্রকার দাসত্ব জীবের স্বরূপে প্রধানতঃ অবস্থান করছে, জানিয়েছেন। চৈতন্যদেবের এই দাসত্ব-পঞ্চক বা রস-পঞ্চকের বিষয় আপনাদের কাছে বলবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। যা হোক অন্য সময়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকল। চৈতন্যদেবের দয়ার এটী একদেশ-বৈশিষ্ট্য। তিনি ঐ পাঁচ প্রকার সেবা লাভ করবার উপায়স্বরূপে শ্রীনামগ্রহণের কথা আমাদের জানিয়েছেন।

আমরা কলিকালের জীব। আমাদের কোনপ্রকারের যোগ্যতা নাই। আমরা দুর্বল, চিত্তশক্তিবিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যায়, তার উপর সাংসারিক মায়ামোহে সর্বপ্রকারে আকৃষ্ট। এমতাবস্থায় আমাদের অন্যান্য যুগের ভজনপদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলে সর্বতোভাবে অকৃতকার্য হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হতে হবে। তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

“কৃতে যদ্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতয়া যজতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বরিকীর্ণনাৎ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচনে আমরা জানতে পারি যে, অন্যান্য যুগে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যার দ্বারা যে বস্তু জীব লাভ করতেন, কলিকালে হরিনাম-গ্রহণের দ্বারাই আমরা তা লাভ করতে পারব। চৈতন্যদেব দয়া করে আমাদেরকে তাঁর গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ নিজ নাম দান করেছেন। তাঁর দয়ার ভিতরে আমি আজ এই দুইটা বিষয়ের আলোচনা করবার ইচ্ছা করেছিলাম—শ্রীনামতত্ত্ব ও দাসত্বপঞ্চক। আমার বলবার সময় অতি সংক্ষেপ, সতরাং সময়ান্তরে শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। বর্তমানে ঐ বিষয় দুইটির যৎসামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র করে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে প্রয়াস পাই।

জাগতিক শব্দগুলি শব্দী হতে পৃথক্ হয়ে থাকে। আমরা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেই দেখতে পাই—নামবাচক যত শব্দ আছে, তা শব্দী হতে সমস্তপ্রকারে পৃথক্। একটা উদাহরণের দ্বারা আপনাদেরকে এই বিষয় বলছি। ‘অশ্ব’ একটা শব্দ। এই শব্দের যে অর্থ অর্থাৎ শব্দী যে চতুষ্পদ জন্তু, তার নাম ও রূপ ঐ ‘অশ্ব’-শব্দ হতে ভিন্ন। কারণ, আমরা এই ‘অশ্ব’-শব্দের পিঠে বসে অন্য কোথাও যেতে পারিনা। কিন্তু ‘অশ্ব’-বস্তুটার পিঠে বসে যাতায়াত করতে পারি।

‘শ্রীকৃষ্ণঃ’—এই শব্দটাকে কিন্তু ঐপ্রকার মনে করতে হবে না। এই নামরূপ শব্দ অন্যান্য বাচকের মত মনে হলেও তা বাচ্য হতে সমস্তপ্রকারে অভিন্ন। বাচ্য এবং বাচকের লক্ষণে আমরা সর্বদা যে ভেদ লক্ষ্য করে থাকি, তা শ্রীনাম-ক্ষেত্রে কখনই প্রযুক্ত নয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রসঙ্গে শব্দ দুইপ্রকার বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ বাচক-শব্দ ও বাচ্য-শব্দ। বাচক-শব্দ যা লক্ষ্য করে, বাচ্য-শব্দ তা লক্ষ্য করে না। বাচক-শব্দ প্রাকৃত, বাচ্য-শব্দ অপ্রাকৃত। সুতরাং বাচ্য-শব্দকে ‘গৌণ’ অর্থাৎ গুণের

অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। বাচ্য-শব্দের অন্য নাম ‘আত্মশব্দ’। কোন কোন দার্শনিক মনে করতে পারেন, ‘বাচ্য-শব্দ’ বলে কিছু নাই—তা ‘সোনার পাথরবাটির’ মতই অলীক মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা নয়। বিগুহক বৈদান্তিকগণ এই বাচ্য-শব্দের যথার্থতা উপলব্ধি করেছেন এবং তা’কে ‘আত্মশব্দ’ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকেই শ্রীনামতত্ত্ব বলেছেন। তা কখনই প্রাকৃত বা গৌণ নয়। বেদান্তের প্রথম পাদের প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ সূত্রে আমরা তা জানতে পারি। সূত্রকার ব্যাসদেব বলেছেন—
“গৌণশ্চৈতন্যশব্দম্” অর্থাৎ গৌণঃ চেৎ ন আত্মশব্দম্—যদি গৌণ অর্থাৎ গুণের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত হয়, তবে তা আত্মশব্দ নয়। সুতরাং আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, আত্মশব্দ অর্থাৎ বাচ্য-শব্দ অথবা শ্রীনাম কখনও গৌণ নন।

যারা অবৈদান্তিক অথবা বেদান্তের স্বকপোল-কল্পিত অর্থবাদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই কেবলমাত্র চৈতন্যদেবের এই শ্রীনামদান-রূপ মহতী দয়ার উপলব্ধি করতে পারেন না। যাঁরা বাস্তবিক নিজেদের আত্মস্তিক মঙ্গল কামনা করেন, তাঁরা কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার ভিখারী না হয়ে থাকতে পারেন না। যাঁরা মুক্ত-অবস্থাতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট বাচ্য-শব্দরূপ শ্রীনাম গ্রহণ করতে কখনও পশ্চৎপদ হবেন না। যাঁরা প্রকৃত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন, কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই আত্মশব্দের তথা শ্রীনামের উপদেশ। যাঁদের সেই নামে নিষ্ঠা নাই, তাঁদের জন্য মোক্ষ উপদিষ্ট হয়নি, অর্থাৎ কলিকালে আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নামগ্রহণ ছাড়া মোক্ষলাভের আর কোন উপায় নাই। এটাই চৈতন্যদেব দয়া করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা শ্রীনামগ্রহণ হতে পশ্চৎপদ হয়েছেন, আমি, তাঁদেরকে মুক্তকণ্ঠে অতিস্পর্ধর সাথে বলছি যে, তাঁরা কখনই অবিমিশ্র নিত্য মোক্ষলাভ করতে পারবেন না। আমার এই কথা আপনাদের কাছে Revolting বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের পরমদয়ার কথা বলতে গিয়ে যদি এই কথাটা আপনাদের কাছে গোপন করি, তা হলে ‘Suppression of fact’ এই অপরাধে অভিযুক্ত হব। বেদান্তের যে সূত্র পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, তা’র পরসূত্রেই ব্যাসদেব বলেছেন—
“তন্নিস্তস্য মোক্ষোপদেশাৎ”। শ্রীনামেই অর্থাৎ আত্মশব্দে যাঁদের নিষ্ঠা আছে অর্থাৎ যাঁরা একান্তভাবে শ্রীচৈতন্য-চরণ আশ্রয় করে তাঁ’র অনর্পিতচর শ্রীনামগ্রহণে নিষ্ঠাবান হয়েছেন। কেবল তাঁদের জন্যই পরম-মোক্ষের উপদেশ। সুতরাং আমি জোর করে আপনাদের পুনরায় বলছি—আত্মশব্দে নিষ্ঠা ছাড়া মোক্ষলাভের কোনই উপায় নাই। শ্রীনাম-সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের দয়ার মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎমাত্র আপনাদের সামনে জ্ঞাপন করলাম। আপনারা অনুগ্রহ করে অধিকার দিলে সময়ান্তরে এর বিস্তারিত আলোচনা হতে পারবে।

দ্বিতীয় বিষয়—চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট দাসত্ব-পঞ্চকর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দুই একটা

কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই রস-পঞ্চকের অপর নাম দাসত্ব-পঞ্চক। আমি পূর্বে যে আচার্য্য-পঞ্চকের নাম উল্লেখ করেছি, তাঁদের মধ্যে কেহই চৈতন্যদেবের উপদ্রষ্ট দাসত্ব-পঞ্চকের বিষয় অবগত ছিলেন না। এইজন্যই চৈতন্যদেবের স্তবে—“অনর্পিত-চরীং চিরাং” কথাটা আমরা দেখতে পাই। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর দাসত্ব-বিচারে কুণ্ঠিত ছিলেন। অন্যান্য আচার্য্য-চতুষ্টয় যে সেবারসের আলোচনা করেছেন, তা চৈতন্যদেবের সেবারস হতে যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক্। তাঁরা উন্নত-অঙ্গের দ্বারা ভগবানের যে সেবার বিধান করেছেন, তাতে গৌরবের ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেব সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ই সর্ব্বতোভাবে ভগবানের যে সেবার কথা দয়া করে জানিয়েছেন তাতে গৌরবভাবের কোন গন্ধ নাই, তা কেবল মাধুর্য্যময়। চৈতন্যদেবের দয়ায় যে কমনীয়তা বা প্রিয়তার কথা পূর্বে আপনাদের জানিয়েছি, তা বর্ত্তমানে আপনারা কিছু পরিমাণে অনুধাবন করেছেন, আশা করি।

আমরা জন্মগত বা সমাজগত বা শিক্ষাগত যে প্রবৃত্তি লাভ করেছি, সেই সমস্ত প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কোনপ্রকার অনুষ্ঠানের বা কোনপ্রকার যুক্তির কথা শ্রবণ করলে আমাদের চিত্তে তা Revolting বলে মনে হয়। আমরা এখানে দেওয়াল দেখছি, চেয়ার দেখছি—‘এটা দেওয়াল নয় বা চেয়ার নয়’; এখানে আমি ও আপনি আছি—‘আমরা কখনও দুই নই’ ইত্যাদি নানাপ্রকার মিথ্যাকথা দ্বারা আমাদেরকে যদি কেহ মিথ্যা-পথে চালাবার চেষ্টা করেন, তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের সে-প্রকার কোন idea প্রদান করেন নি। এ সম্পর্কে আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর ছাড়া সকলেই একমত। আমরা আজকাল voting-system-এ মত গ্রহণ করার ইচ্ছা করি। আপনারা যদি আচার্য্যগণের ভোট সংগ্রহ করেন, তা হলে দেখবেন একমাত্র শঙ্কর ছাড়া সকল আচার্য্যই চৈতন্যদেবের মতের পোষকতা করেছেন। এ সম্পর্কে অন্যসময়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। বর্ত্তমানে আমার সময় অতিক্রম হয়েছে। আমি আজকের মত আপনাদের কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করলাম।

(দৈনিক নদায়া প্রকাশ ৮ম বর্ষ—২৬৩ সংখ্যা)

উপনিষদ্-বাণী

প্রশ্ন (১)

শান্তি পাঠ—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তৃষ্ণু বাৎসন্তনুভিঃ ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ।

গুরুগৃহে অধ্যয়নকারী শিষ্য সহপাঠীগণ-সহ নিজ ও মানবমানবের কল্যাণ কামনা

করিয়া দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছে,—হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণজনক বাক্য শুনি। কাহারও নিন্দাবাদ বা পাপ-কথা যেন কর্ণে প্রবেশ না করে। আমাদের জীবন যেন যজন-পরায়ণ হয়—যেন সর্বদা ভগবৎআরাধনা-তৎপর থাকে। নেত্রদ্বারা যেন কল্যাণজনক দর্শন হয়, কোন অমঙ্গলজনক বস্তুর দৃশ্য যেন দৃষ্টিপথে না আসে। আমাদের শরীর ও প্রত্যেক অবয়ব যেন সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট থাকে। আমাদের আয়ু যেন ভোগবিলাসে গত না হয়—যেন আয়ু দ্বারা ভগবৎ-স্তুতি ও ভগবৎ-সেবা করিতে পারি।

প্রশ্নোপনিষৎ—অথর্ববেদের পিপ্পলাদ-শাখীয় ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত। ইহাতে পিপ্পলাদ-ঋষি সুকেশা প্রভৃতি ছয় জন ঋষির প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ; এজন্য ইহার নাম প্রশ্নোপনিষদ।

ভরদ্বাজের পুত্র ‘সুকেশা’, শিবি-তনয় ‘সত্যকাম’, গর্গ-গোত্রীয় ‘শৌর্য্যায়ণী’ কোশল-নিবাসী ‘আশ্বালায়ন’, বিদর্ভ-দেশীয় ‘ভার্গব’ এবং কতোর প্রপৌত্র ‘কবন্ধী’—এই ছয় জন ঋষি বেদাভ্যাস-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা একসময়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার নিমিত্ত পিপ্পলাদ ঋষির নিকট সমিৎ হস্তে গমনপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিতে উদ্যত হন। পিপ্পলাদ সেই ঋষিগণকে বলিলেন—তোমরা তপস্বী এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সাস্ত্রবেদ অধ্যয়ন করিয়াছ। তথাপি আমার আশ্রমে থাকিয়া একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক তপস্যা কর। তৎপরে তোমরা যাহা প্রশ্ন করিবে, সে বিষয়ে যদি আমার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তোমাদিককে যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিব।

ঋষির বাক্যানুসারে বর্ষাবধি তপঃ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর ‘কবন্ধী’ সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা-সহকারে বিনীতভাবে প্রথম প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্! যাঁহা হইতে এই চরাচর জীব নানাপ্রকারে উৎপন্ন হয়, সেই পরম কারণ কে?

পিপ্পলাদ বলিলেন—বেদে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, সমস্ত জগতের স্বামী পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যান্তে সর্ব্বাগ্রে ‘রয়ি’ ও ‘প্রাণ’-নামক এক মিথুন (জোড়া) উৎপন্ন করেন। এবং ইহারা উভয়ে মিলিয়া মিথুন ধর্ম্মের দ্বারা নানাপ্রকার প্রজাসৃষ্টি করিবে। সমস্ত প্রাণীর জীবনী-শক্তির নাম ‘প্রাণ’। আর স্থূল ভূত-সমুদয়ের নাম ‘রয়ি’। ইহাদের অপর নাম ‘পুরুষ’ ও ‘প্রকৃতি’। দৃশ্য জগৎ সমস্তই রয়ি ও প্রাণের সংযোগে উৎপন্ন। যে-সূর্য্যদেব আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তিনিই প্রাণ। কারণ ইহাঁতে আমাদের চেতন-শক্তির প্রাধান্য ও আধিক্য বর্ত্তমান। আর চন্দ্রই রয়ি। কারণ স্থূল-তত্ত্বকে পুষ্ট করা চন্দ্রেরই কার্য্য। আমাদের শরীরে এই দুই শক্তি প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বর্ত্তমান। সূর্য্যের সহিত জীবনী-শক্তির এবং চন্দ্রের সহিত মাংস-মেদাদি স্থূলতত্ত্বের সম্বন্ধ। রাত্রি অস্তে সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে আলোক বিস্তার করেন, তখন সমস্ত প্রাণীর প্রাণকে নিজ কিরণের দ্বারা ধারণ করেন। সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণীর শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি জাগরিত হয়। এজন্য সূর্য্যই

সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণিগণের শরীরে যে ‘বৈশ্বানর’-নামক জঠরাগ্নি আছে, তাহা সূর্য্যেরই অংশ। আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত প্রাণও সূর্য্যেরই অংশ। এজন্য সূর্য্যই প্রাণ-স্বরূপ। কিরণজাল-মণ্ডিত প্রাকালময় সূর্য্য সমস্ত রূপের কেন্দ্র। সমস্ত রং সূর্য্য হইতে প্রকাশিত। সূর্য্যই সকলের উৎপত্তিস্থল এবং জীবন-জ্যোতির মূলাধার। এই সূর্য্য আমাদের শত-শত প্রকার কার্য্য সিদ্ধ করেন। জগতে উষ্ণতা প্রদান ও প্রকাশ কার্য্য, সকলের জীবনদান কার্য্য, ঋতু-সকলের পরিবর্তন ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় কার্য্য পূরণ করায় সূর্য্যকে জীবন-দাতা, প্রাণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

বার মাসের সমষ্টি সংবৎসরকে কাল-স্বরূপ বিচার করিয়া উহাকে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বা প্রজাপতি বলা হয়। ইহার দুইটি অয়ন—উত্তর ও দক্ষিণ। দক্ষিণায়ণের ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ঘুরিতে থাকেন। ইহাকে দক্ষিণাঙ্গ বলে। আর ছয় মাস উত্তরাভিমুখে ভ্রমণকারী সূর্য্যের উত্তরায়ণকে উত্তরাঙ্গ বলে। তন্মধ্যে উত্তরাঙ্গ—‘প্রাণ’, আর দক্ষিণাঙ্গ—‘রয়ি’। এই সংসারে ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণের যজ্ঞ, ধনাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সংস্কার, দুঃখী প্রাণীর উপকার এবং কুপ খনন, পুষ্করিণী-খনন, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয়, ঔষধালয়াদি স্থাপন-কার্য্যকে উৎকৃষ্ট কর্তব্য মনে করিয়া পরলোকে ভোগ-প্রাপ্তির আশায় দক্ষিণ-অঙ্গের উপাসনা করে। ঈশাবাস্য উপনিষদে ইহার নাম ‘অসম্ভূতির উপাসনা’ বলা হইয়াছে। এই কর্ম্মের ফলে তাহারা চন্দ্র-লোকে গমন করে এবং তথায় কিছুকাল ভোগের পর পুনর্জন্ম-লাভ করে; ইহার নাম ‘পিতৃ-যান’ বা ‘ধূম্র-যান’।

পূর্কোক্ত সকাম উপাসক ব্যতীত যাঁহারা বাস্তবিক কল্যাণকামী, তাঁহারা সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা ও পরিণাম দুঃখ-স্বরূপ বুঝিয়া ভোগে বিরক্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় অনুকূল সাধনের দ্বারা নিষ্কাম উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা সংবৎসরের উত্তর অঙ্গ-স্বরূপ। ইহাই ঈশাবাস্য-উপনিষদে কথিত ‘সম্ভূতির উপাসনা’ (অর্থাৎ অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনা)। এই নিষ্কাম উপাসকগণ উত্তরায়ণ মার্গে সূর্য্যালোকে গমন করিয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। ইহারই নাম ‘দেবযান’। ইহাই পরমা গতি। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

এই সূর্য্যের বিষয়ে অনেকে বলেন যে, ইহার পঞ্চ চরণ (ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ও শীতকে একত্রে ধরিয়া পঞ্চ সমষ্টি), আর বার মাস ইহার বার আকৃতি। ইহার স্থান স্বর্গলোকের উর্দ্ধে কারণ সূর্য্য স্বর্গলোককেও আলোকিত করেন। যে-বৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা সূর্য্য হইতেই আসিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য সকলের জীবনদাতা বলিয়া সকলের পিতা (জলের অপর নাম জীবন)। জ্ঞানী পুরুষগণের মতে—সাত রংএর কিরণযুক্ত সাত চক্রবিশিষ্ট এবং ছয় ঋতু স্বরূপ ছয় অরযুক্ত রথে সূর্য্যদেব অবস্থিত। এই সূর্য্যের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সূর্য্যের উপাস্যরূপে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন। শ্রীমন্নারায়ণের ধ্যানমন্ত্রেও দেখা যায়—“ধ্যোঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী

নারায়ণঃ” ইত্যাদি। দ্বাদশ মাসকে প্রজাপতি এবং কৃষ্ণপক্ষকে দক্ষিণ অঙ্গ, আর শুক্লপক্ষকে উত্তর অঙ্গ বলা হয়। কৃষ্ণপক্ষ ‘রয়ি’ এবং শুক্লপক্ষ ‘প্রাণ’-স্বরূপ। এজন্য কল্যাণকামী পুরুষ রয়ি-স্থানীয় ভোগ্য পদার্থে বিরক্ত হইয়া প্রাণ-স্বরূপ শুক্লপক্ষে সমস্ত শুভ-কর্ম নিষ্কামভাবে করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভোগকামী ব্যক্তিগণ স্থূল ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণপক্ষে সর্বপ্রকার কর্ম করে। অহোরাত্রকে প্রজাপতি কল্পনা করিয়া দিনকে প্রাণ ও রাত্রিকে ‘রয়ি’ বলা হইয়াছে। যাহারা দিবাভাগে স্ত্রী-সন্তোগে রত হয় তাহাদের অমূল্য জীবন ব্যর্থ হয় ; কিন্তু রাত্রিতে অভিগমনশীল গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী-তুল্য বলা হয়। রাত্রিতে শাস্ত্রানুসারে সন্তান-কামনায় স্ত্রী-সন্তোগের উপদেশ আছে। অন্ন-দ্বারা সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। অন্নের দ্বারা বীৰ্য্য উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয় বলিয়া অন্মকেও প্রজাপতি বলা হয়। যাহারা সন্তানোৎপত্তি-কামনায় প্রজাপতি-ব্রত করে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত স্ত্রী-গমনাদি করে, তাহারা পুত্র-কন্যারূপ মিথুন উৎপাদন করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করে। যাহারা ইহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যে সুনিষ্ঠিত, তাহারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। যাহাদের মধ্যে কুটিলতার লেশ মাত্র নাই—যাহারা স্বপ্নেও মিথ্যা কথা বলেন না—অসত্য আচরণ হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করেন এবং রাগদ্বेषাদি রহিত, তাহারাই বিকার-রহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোকের অধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ শ্লোক দেখা যায়—

যেযাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্বাভ্যুনাশিতপদো যদি নির্বালীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈবাং মমাহমিতিধীঃ স্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে ॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

অর্থাৎ সেই অনন্ত ভগবান্ (অন্য দেবতা নহে) যাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছা রহিত হইয়া) ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহারা সেই দুস্তরা দৈবী মায়ায় পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ায় বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে ‘আমি ও আমার’ বুদ্ধি নাই।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর-সঙ্গ— উভয়ই অনিষ্টকারক ও পরিত্যজ্য

সনজ্‌ ধাতু হইতে ‘সঙ্গ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হওয়ায় ‘সঙ্গ’ শব্দে কোন বিষয়ে আসক্তি

বুঝায়। শ্রীমদ্ভাবতের ৩।৩১।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদও ‘সঙ্গ-মাসক্তিং’ অর্থ লিখিয়াছেন। সঙ্গ আছে যাহার তিনিই সঙ্গী, তাহা হইলে সঙ্গী শব্দের অর্থ হইল— আসক্তিস্থিত ব্যক্তি ; আর স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ—স্ত্রীলোকে আসক্তিস্থিত ব্যক্তি অর্থাৎ কামুক। নিজের স্ত্রীতেই হউক, কি পরের স্ত্রীতে হউক, স্ত্রীলোকে যাহার আসক্তি আছে, তাহাকেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা হয়। ভাঃ ৯।১১।১৭ শ্লোকানুসারে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর প্রসঙ্গ বা আসক্তি সর্বত্রই ভয় আবাহন করে। যোষিৎ প্রভৃতি বিষয়ে ভোগবুদ্ধিরশতঃই তাহাতে ভোগ্য পুরুষাভিমাত্রী আসক্তি। কামুক ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে কৃপণ বা দীন। ভাগবতে ১১।১৪।১০ শ্লোকে কথিত কামমার্গ অবশ্য ত্যজ্য। বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কামুকের সঙ্গ চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ। স্ত্রীসঙ্গী মাত্রেই অসাধু, যেহেতু তাহারা সর্বদাই শিশ্নোদর-তর্পণরত। স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ লালসাকেই ‘উপস্থবেগ’ বলে। এই বেগের বশবর্তী হইলে মানুষ অবৈধভাবে স্ত্রী-সংসর্গ দ্বারা জড়েন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া মহাপাপে আসক্ত হইয়া পড়ে। শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিগণের একজনের সঙ্গেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, বহুর সঙ্গফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অন্ধের অনুবর্তী অন্ধ যেমন কূপাদিতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ অসতের অনুগামী ব্যক্তি অসৎই হইয়া অন্ধতামিশ্রে পতিত হয়—ইহা ভাঃ ১১।২৬।৩ শ্লোক হইতে জানা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের বিবৃতিতে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিন্ধু সনাতনী লিখিয়াছেন,—“প্রপঞ্চো নিত্য-বশ্যতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে ‘পুরুষ’ বা ভোগ্যভিমাণে যে স্ত্রীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দুষণীয়।” স্ত্রীসঙ্গী মাত্রেই অসৎ, অতএব তাঁহাদের সঙ্গত্যাগ বৈষ্ণব-আচারের মধ্যে পরিগণিত, ইহা শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু আমাদের বিশেষভাবে জানাইয়াছেন,—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।

স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর।। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০)

যোষিৎ-সঙ্গে মানুষের সমস্ত সদ্গুণসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে ভগবদ্ব্যবতার কপিল মাতা দেবহৃতিকে উপদেশ করিয়াছেন (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪),

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হীঃ শ্রীর্ষাঃ ক্ষমা।

শমো দমো ভগশ্চৈতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্।।

তেষাংশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাশ্বসাধুযু।

সঙ্গং ন কুর্য্যাস্থ্যেচ্যেযু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ।।

—“সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় সেই শোচ্য ও আত্মবিনাশের কারণ। অশান্ত, মূঢ়, যোষিৎক্রীড়ামৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনও করিবে না।” শ্রীভাগবতে ১১স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ের ৪র্থ—২৪শ শ্লোকে ইলা-তনয় পুরুষবার স্ত্রী-সঙ্গের পরিণামসূচক আখ্যান

বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত ৯ম স্কন্দের ৮৩ অধ্যায়ে রাজা যযাতি দেবযানীর নিকট স্ত্রীসঙ্গের ভয়াবহ পরিণামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ এমন কি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও অতীব অনিষ্টকারক বলিয়া উহা সৰ্বদা পরিবর্জনীয়। স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে সম্বন্ধ যত বেশী থাকিবে, ততই ভজন হইতে দূরে পড়িতে হইবে। যাহারা স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গও যখন অনিষ্টকর, তখন সাক্ষাৎ স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে কত অধিক অনিষ্টকর, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইলে, পরস্ত্রীর সম্পর্ক ত' দূরের কথা— তাহা স্বপ্নেরও অতীত, পরন্তু নিজস্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়েও যে অতি সাবধান হইতে শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্ত্রীসঙ্গ হইতে বন্ধন ও মোহ উৎপন্ন হয়, সুতরাং কৃষ্ণভজন-বিষয়ে উহা বিশেষ অন্তরায় বলিয়া সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চন্যপ্রসঙ্গতঃ।

যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসন্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩০)

—“স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন লাভ হয়, অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।” ভাঃ ৩।৩১।৩২-৪২ শ্লোকসমূহে কপিলদেব মাতা দেবহৃতিকে বলিয়াছেন,—“স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ সৰ্ব্বনাশ হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও নিজ দুহিতাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় মৃগ-রূপ ধরিয়া সেই কন্যার পশ্চদ্বনন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী বীরগণ পর্যন্তও স্ত্রীলোকের দ্রুতসীমাত্রে তাহার পদানত হইয়া পড়ে। যিনি সাধনভক্তিব্যোগের পরপার লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। তত্ত্ববিদগণ যোষিৎকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। স্ত্রীরূপী দৈবীমায়া শুশ্রূষাদি-ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় অবলোকন করিবেন।”

ভাঃ ৩।৩১।৩৫ শ্লোকের ‘সঙ্গ’ শব্দের অর্থে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন,—“সঙ্গোহত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্তাময়ঃ” অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ক কথাবার্তাময় যে সঙ্গ তাহা।” যাহারা গৃহী, তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংস্রব ত্যাগ সম্ভবপর নহে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গের কামনা পোষণ করিয়া স্ত্রীলোকের সংস্রবে যাওয়া এবং সংস্রবে যাইয়াও যাহাতে সঙ্গমের বাসনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্রূপ আলাপ-আলোচনা দূষণীয়। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিলেও তদ্রূপ কথাবার্তা হইবার সম্ভাবনা, তহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা বিশেষরূপে উদ্দীপিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও দূষণীয়। যোষিতের সঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ অত্যন্ত ভয়াবহ কেননা

প্রথমে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতেই যোষিতের অনুসন্ধানাদি ক্রেশ হয়, পরে যোষিৎসঙ্গ হইতে বন্ধন হয়, অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ প্রথমেই ত্যাগ করা কর্তব্য। শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধের ১০ম পরিচ্ছেদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন,— “ভক্ত দেহ, গেহ ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন। ভক্তিবিশিষ্ট পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যপ্রভাবে দেবকীডাঙ্গুলে নন্দনকাননাদিতে স্ত্রীগণের সহিত বিহার করিতে থাকিলেও স্ত্রীয় অধঃপতন জানিতে পারে না।

যদি বা অসতের সঙ্গবশতঃ কেহ অধর্ম্মরত, অজিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা ও স্ত্রীলম্পট হইয়া প্রাণিগণের হিংসা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অন্তিমকালে ভীষণ তমোগতি লাভ করে”। স্ত্রৈণ বা স্ত্রীলম্পট পুরুষমাগ্রেই জীবহিংসক। ভাঃ ৭।১৫।১৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,— “স্ত্রী-বাধ্য ব্যক্তি নিজেকে ভোগ্য্য স্ত্রীর ভোক্তা অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই ঔপস্থ্যসুখপ্রার্থী স্ত্রীভৃত্য এবং কুকুরতুল্য আচরণশীল। সে সর্ব্বদাই স্ত্রীর ইন্দ্রিয়তোষণে রত, সুতরাং স্ত্রী-দেহ সংপোষণে সে প্রাণিহিংসক হইয়া পড়ে।”

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গ-লালসা প্রশংসার যোগ্য নহে

কেহ কেহ বলেন, “শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রী-সঙ্গী বলিতে পরস্ত্রী-সঙ্গীকেই নির্দেশ করিয়াছেন, নিজ-স্ত্রীতে আসক্তি-যুক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করেন নাই”। স্ত্রী-সঙ্গী বলিতে কেবলমাত্র পরস্ত্রী-সঙ্গী—এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের বিশেষ আচারের কথা বলিতে গিয়া ‘স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু’ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন, অপরে কেহ ত্যাগ করিতে না পারিলেও বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা অবশ্যই ত্যজ্য। পরদার-গমন মনুষ্যমাগ্রেই পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহা সকলের পক্ষে সাধারণ নিষেধ। নিজ-স্ত্রীতে আসক্তি ত্যাগ ইহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ নিষেধ। শাস্ত্র হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ বলিতে পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ ত বটেই, নিজ-স্ত্রীতেও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। স্ত্রী-শব্দে সাধারণতঃ পরস্ত্রী বুঝায় না, বরং বিবাহিত পত্নীকেই বুঝায়। আবার, যেক্ষেত্রে স্ত্রী-শব্দে স্ত্রী-জাতিকে বুঝায়, সেইক্ষেত্রে স্ত্রী-শব্দে স্ত্রীলোক মাত্রকেই বুঝায়। সুতরাং স্ত্রী-সঙ্গ অর্থ স্ত্রীলোক মাত্রেরই সঙ্গ—তা নিজের স্ত্রীই হউক বা অপর কোন স্ত্রীলোকই হউক, যেকোন স্ত্রীলোকে আসক্তিই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ হরিকথায় বলিয়াছেন,— “স্ত্রী-সম্বন্ধী পাপ আচরণ করিতে নাই। “গৃহস্থস্যাপ্তৌগন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্”। গৃহস্থ বলে অত্যন্ত কাম-প্রবৃত্তি চালনা করিতে হবে না। যে কৃষ্ণকে ভুলে সংসার করবে ও ছাগধর্ম্ম গ্রহণ করবে, সে গৃহব্রত। গৃহস্থ অভিমান করে অন্য বিচার এলে অধর্ম্ম হবে। ” ভাঃ ৩।৩১।৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে,— “যে ব্যক্তি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, তাহার প্রমদার সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য নহে। ” “সঙ্গ ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু”। শ্রীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ভগবান্ ঋষভদেব আত্মজগণের

নিকট “শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া” জানাইয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কয়েকটি শ্লোক রহিয়াছে, তাহাদের কোনটাতেই বা কোনটার টীকাতেই ‘স্ত্রী’ অর্থে কেবলমাত্র যে পরস্ত্রী বুঝায়, তাহার উল্লেখ নাই। “সঙ্গ ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু” শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন,—“প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্যাৎ।” নিজের বিবাহিত স্ত্রীতেও আসক্তিযুক্ত হইবে না। টীকায় ‘স্বীয়াসু অপি’ অংশের ‘অপি’ শব্দের তাৎপর্য এই যে, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত’ দূরের কথা, স্বকীয়া স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। “যোপযাতি শনৈর্ময়া যোষিদেববিনির্মিতা। তামীক্ষেতান্মমৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্” ॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ লিখিয়াছেন,—“স্ত্রীলোক দেব-নির্মিত মায়াবিশেষ, এই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। পুরুষকে বিরক্ত নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপনপূর্বক কেবল সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোন স্ত্রী কোন পুরুষের নিকটবর্তিনী হয়, তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় স্ত্রীবেশ-ধারী নিজমৃত্যু বলিয়া জ্ঞাপন করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, জ্ঞানমতী ও বৈরাগ্যমতীও হয় অথবা উন্মাদ-রোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমনকি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্তী হইবে না—সর্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিবে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

মাত্রা স্বপ্না দুহিতা বা নাবিবিভ্রাসনো ভবেৎ।

বলবানিन्द्रিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৭)

—“মাতা, ভগ্নী, অথবা দুহিতার সহিতও সঙ্গীর্ণ আসনে অর্থাৎ নির্জনে একাসনে উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান ইन्द्रিয়সমূহ বদ্ধমোক্ষবিদ্ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।”

দুর্বার ইन्द्रিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দারু-প্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৮)

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, “স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু” বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল পরস্ত্রীকেই লক্ষ্য করেন নাই, স্বকীয়া স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন।

আবার বিচার্যের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০ পয়ায়ে যে কেবলমাত্র পুরুষ বৈষ্ণবের আচারের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে, স্ত্রী-বৈষ্ণবের আচারও উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভক্তিমার্গে সমান অধিকার। পুরুষের পক্ষে যেরূপ স্ত্রী-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষসঙ্গ তদ্রূপ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। ভাঃ ৩।৩১।৪১-৪২ শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গবশতঃ

অন্ত্যকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীস্থ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সেও পুরুষের আচরণকারিণী ভগবন্মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই ভগবন্মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রুতিমধুর হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যু-স্বরূপ, তেমনি পতি, পুত্রাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সৰ্ব্বতোভাবে বজ্জনীয়।

স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহরতগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। স্ত্রী-সঙ্গী মৃত ব্যক্তি অনিত্য পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই ‘পরমার্থ’ বুদ্ধিকরিয়া ভ্রান্তি নিজ ইন্দ্রিয়সুখসাধক গৃহ ও কাম্যকৰ্ম্মাদিতে আবদ্ধ থাকা জন্মমরণময় সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, বিষুণ্ডের পরমপদ কখনও লাভ করিতে পারে না। নিত্য দুঃখপ্রদ, মৃত্যুকারণ অতিকষ্টলভ্য বিত্তদ্বারা লব্ধ অনিত্য গৃহ ও যোষিৎ প্রভৃতির সঙ্গের দ্বারা কতটুকুই বা প্রতীলাভ হইতে পারে? “যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং” ভাঃ ৭।৯।৪৫ শ্লোকে গৃহমেধিগণের স্ত্রী-সঙ্গ জনিত সুখকে অতীব তুচ্ছ বলিয়াছেন এবং উহাতে করদ্বয় কণ্ডুয়নের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই লাভ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াও জীব যখন ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা বা ভোগময়ী প্রবৃত্তিকে ‘অনর্থ’ বলিয়া দর্শন না করে, তখন সে স্বরূপবিস্মৃত, প্রমত্ত ও মৃত হইয়া মৈথুনসুখ-প্রধান গৃহ লাভ করিয়া তাপত্রয় ভোগ করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তদ্রূপ বিষুণ্ডমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্তির দর্শনে তদীয় হাবে-ভাবে প্রলোভিত হইয়া অন্ধতামিশ্রে পতিত হয়। ভাঃ ৬।৩।২৮ শ্লোকে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছেন,—“যে সকল অসাধু গৃহমেধী নরকের দ্বারস্বরূপ স্ত্রী-সঙ্গের জন্য একান্ত লালায়িত, হে দূতগণ তোমরা তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন করিও।” যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোক্তৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনিই নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅজিতকে জয় করেন। অন্তিমে কুমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্য্যবসান যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, আর এই দেহের সুখের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, সেই স্ত্রীই বা কোথায় রহিবে? শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধে অবধূত ব্রাহ্মণ রাজর্ষি যদুর মাধ্যমে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ স্ত্রীতে আসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, আসক্ত হইলে গজের দশার ন্যায় নিধনপ্রাপ্ত অবশ্যস্তম্ভী।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীবাসুদেব ঘোষের গৌর-দর্শন

শ্রীবাসুদেব ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। তিনি যে দৃষ্টিতে গৌরদর্শন করেছিলেন

তাঁহার লিখিত পদাবলী হইতেই কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি।

তাঁহারা তিনভাই ছিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব। বাসুদেব ঘোষের শ্রীপাঠ—
—তমলুকে, মাধব ঘোষের শ্রীপাট—দাঁইহাটে এবং গোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট—
অগ্রদ্বীপে। তাঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা তিন ভাইই
সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত প্রিয় পার্শ্বদ ছিলেন। বাসুদেবের
কীর্তনে শ্রীল গৌরহরি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তিনি নিজে পদ রচনা করিয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্তদর্পণে যে গৌররূপ দর্শন
করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস, পাইতেছি মাত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবত
ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় তাঁহার পরিচয় এইরূপ—

“মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন—ভাই।

গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।।”

“গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিনভাই।

যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।।”

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও তাঁহার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়
শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র নীলাচলে যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ
তিন ভাইই বাহির হইয়া পড়িলেন। বিশেষ আকাঙ্ক্ষা গৌর দর্শন। নীলাচলে উপস্থিত
হইয়া গৌরদর্শনে এমনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন যে, বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত
হইয়া গেল। বাসুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র বুঝিলেন—ইনি ত সেই ব্রজের
কানাই। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি শুধু গায়ক ছিলেন না, প্রসিদ্ধ পদকর্তাও বটে। সঙ্গে
সঙ্গে গাহিয়া উঠিলেন—

“নীলাচলে শঙ্ক, চক্র, গদা, পদ্ম ধর।

নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু ধর।।

শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।

হরে-কৃষ্ণ নাম গৌর করিল প্রচার।।

বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।

যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।”

বাসুদেব গৌরের লীলাসঙ্গী ছিলেন। গৌরদর্শনে তাঁহার যে অনুভূতি তাহা স্পষ্টতঃই
উপরোক্ত পদে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি গৌরদর্শন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—
—যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং নীলাচলে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই জগন্নাথ—
—রূপে বিরাজিত। তিনি দেখিতে পাইলেন—

“কস্তুরী তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌন্তভং

নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং বেণুঃ করে কঙ্কনম্।

সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী

গোপস্ট্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ।।”

তিনি দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে শ্রীগোপাল চূড়ামণি, ললাটে কস্তুরী তিলক, বক্ষঃস্থলে কৌমুদ-মণি, নাসিকার অগ্রভাগে সুন্দর মতির লোলক, করতলে বংশী, শ্রীহস্তে কঙ্কন, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন, কণ্ঠে স্বচ্ছ মতির মালা ধারণপূর্ব্বক গোপস্ট্রীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বোৎকর্ষ রূপে বিরাজমান।

পরক্ষণেই তাঁহার গৌরের বাল্যলীলা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। তিনি মানস চক্ষে দেখিতে পাইলেন—সেই গোপাল শচীমাতার ক্রোড় আলো করিয়া বসিয়া আছে। গৌরকে পাইয়া জগৎ আনন্দময়। গোরাচাঁদের উদয়ে জগৎ আলোকিত। আকাশের চাঁদ মলিন হইয়া গিয়াছে। কারণ, এই চাঁদে ত কলঙ্ক রহিয়াছে। কিন্তু গোরাচাঁদ যে অকলঙ্ক।

“অকলঙ্ক গৌরহরি দিলা দরশন।

সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন।।”

তিনি যেন দেখিতেছেন—শচীমাতা গৌরকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। আকন্দ্রশে পূর্ণিমার চাঁদ। গোরাচাঁদ সেই চাঁদ দেখিয়া ‘কাছে আয়, কাছে আয়’ বলিয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছেন। ছেলে কাঁদিয়া অস্থির—চাঁদ চাই। মা কেমন করিয়া পুত্ররত্নকে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিবেন ভাবিয়া অস্থির। হঠাৎ তাঁহার এক বুদ্ধি আসিল। তিনি বাড়ীর ভিতরে গিয়া একটা রাধা-কৃষ্ণের চিত্র আনিয়া নিমাইর হাতে দিতেই নিমাই চিত্রটির দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া রহিল। আর কাঁদিলেন না। চুপ করিয়া গেল। সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া বাসুদেব ঘোষ লিখিয়াছেন—

“চিত্র পাইয়া গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।

বাসু কহে পটে পছ হের নিজ মুখ।।”

যেন তিনি মনে মনে বলিলেন—“গোরাচাঁদ! তুমি ত সেই, নিজের চেহারা দেখিয়া খুবই খুশী হইয়াছ দেখিতেছি। গৌররূপ-দর্শনে ব্রজলীলার স্মৃতিচারণ করিতে করিতে বলিতেছেন—“বাঃ বেশ ত’ তুমি রাজার ছেলে ছিলে, কত সুখে, যত্নে পালিত হইয়াছ। এখন কোথায় তোমার সেই বেশ—পীত ধড়া, মোহন চূড়া, মোহন মুরলী।” বাল্যলীলা স্মৃতিচারণের পর গৌরদর্শনে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা তাঁহার মনে জাগিল। নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পাগলিনী প্রায় বিষুপ্ৰিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—

“শয়ন মন্দিরে ছিলে

নিশাভালে কোথা গেলে

মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।।”

সেই আত্মস্বর শুনিয়া শচীমাতা বাতি জ্বালাইয়া আলুথালু বেশে আকুলি বিকুলি হইয়া নিমাইকে খুঁজিতেছেন—যাহা বাসু ঘোষের ভাষায়—

“শীঘ্র করি জ্বালি বাতি

খুঁজিলেন ইতি উতি

গৌরান্দের উদ্দেশ না পাইয়া।”

শচীমাতা যতই নিমাই নিমাই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ততই প্রতিধ্বনি কহিতে লাগিল, নাই, নাই, নাই। মা নিমাইকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাঁদিয়া আকুল। এক পথিক মাকে বলিল—“মাগো! আমি ত নিমাইকে কাটোয়ার পথে যাইতে দেখিলাম। দেখিলাম—নিমাইর নয়নে অশ্রুধারা এবং বদনে হরিনাম। বাসুদেব অন্তরে সেই গৌররূপ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া কহিলেন—

“সন্ন্যাসীর করে ধরি তোমার নিমাই বলে হরি হরি
দ্বিতীয় বসন নাহি গায়।

বাসু কহে তাহা মরি তোমার গৌরান্দ্র হরি
পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায়।।”

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায়। তিনি বলিতেছেন—“আমি এখন কিবা করি, কোথায় বা যাই কারে হেরে প্রাণ জুড়াই।” এই কথা স্মরণ হইতেই বাসুদেব গাহিলেন—

“এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।

বাসুদেব ঘোষ কহে মোর সমান পাষণ নহে
তবু হিয়া বিদারিয়া যায়।।”

শচীমাতা পাগলিনী প্রায়। বাসুর মনে জাগিয়া উঠিল, শচীমাতা বলিতেছেন—

“যে মোরে মিলিয়া দেয় মূল্য দিয়া কিনা লয়
হইতাম দাসের সে দাসী।

বাসুদেব ঘোষ মনে শচী কাঁদে অকারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী।।”

নিমাই কাটোয়ায় গিয়া শ্রীকেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন—এবং করজোড়ে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। নিমাই সন্দর্শনে কেশব ভারতীর ভাব উথলিয়া উঠিল। কোন ক্রমে সেই অপ্রাকৃত ভাব সম্বরণ করিয়া অন্তরে প্রভুকে প্রণাম জানাইয়া তাঁহার আবেদন-ক্রমে সন্ন্যাস দানে সম্মত হইলে পর নিমাই মস্তক-মুণ্ডনে যাইবার কালে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার সেই ভুবন-মোহন অপরূপ রূপে জগৎ আলোময় হইয়া উঠিল।

কাটোয়ার লোক সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—কে এমন ভাগ্যবতী এহন পুত্ররত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে। কে এমন ভাগ্যশীলা যে এমন পতিকে বরণ করিয়াছে।

প্রভু যখন মস্তক-মুণ্ডনের জন্য মধুশীলের নিকট উপবিষ্ট হইলেন—তখন সকলেই

হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং প্রভুকে কাতর অনুনয়ে কহিতে লাগিলেন—“না না ! তোমার এমন চাঁচর চিকুর কেশ মুগুন করিও না ।” প্রভু তাঁহদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন—

“প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাতা পিতা ।

সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচি নিজ মাথা ।।”

প্রভু মধুশীলকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিলেন—“ভাই ! কেশব ভারতীর নিকট আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব । তুমি আমার মস্তকটী মুগুন করিয়া দাও ”।

“প্রভু বলে—আমি যে ছাড়িব এই ধর্ম্ম ।

সন্ন্যাস করিব আমি কেশে নাহি কন্ম ।।

কেশে-বেশে ধন-জনে কৃষ্ণ নাহি পাই ।

সকল তেজিব আমি গুন এবে নাই ।।”

মধুশীল প্রভুর শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িল । সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—“না না আমি এই কাজ করিতে পারিব না । তোমার মাথায় হাত দিয়া আমি মুগুন করিব—আবার সেই হাত কেমন করিয়া অন্যের পায়ে ছোঁয়াইব ? আমাকে সেই অপরাধে অনন্তকাল পাপ পঙ্কিলে ডুবিয়া মরিতে হইবে ।”

গৌরাঙ্গসুন্দর তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতেছেন—“মধু ! তুমি আমার মস্তকটী মুগুন করিয়া দাও, আমি বলিতেছি তোমার কোন পাপই হইবে না, আর তোমাকে এই কাজ করিতেই হইবে না । তোমার সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে । তুমি দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে । মধুশীল প্রভুকে ঠিকই চিনিয়া ফেলিল । সে বলিল—“তুমি কে হে, আমাকে আর ভুলাইতে পারিবে না । ওঃ তুমি ত’ সেই কৃষ্ণ । বর্ণচোরা শ্যাম নদীয়ায় গৌররূপে আসিয়াছ ।” বাসুদেব ঘোষের গৌরদর্শন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি লিখিলেন—

“মধুশীল বলে—গোঁসাই, না ভাঁড়াও মোরে ।

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু জানি অনুরে ।।

যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে, সেই কৃষ্ণ তুমি ।

তব পদ বিষ্ণুলোক কিবা জানি আমি ।।

মুড়াবে চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে ।

কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে ।।

মধুর বচনে প্রভু দিল শিরে পদ ।

বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ ।।

এইভাবে গৌরসুন্দর মস্তক মুগুন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট আসিলেন । ভারতী গোঁসাই তাঁহাকে ডোর কৌপীন প্রদানপূর্বক সন্ন্যাস দিলেন । বাসুদেব গাহিলেন—

“গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কান্দিল ।

কেমনে ধরিনু দে'।

বাসুর হিয়া,

পাষণ দিয়া,

কেমনে গড়িয়াছে।।

বাসুদেব গৌররূপ-দর্শনে পাগল পারা।

“গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে

গঙ্গা পুলিনে রঙ্গে।

হরি হরি বলে নিজ বৃন্দে।।

কাঁচা কাঞ্চন মণি

গোরা রূপ তাহা জিনি

ডগমগি প্রেমতরঙ্গে।

ও নব কুসুম-দাম

গলে দোলে অনুপম

হেলন নরহরি-অঙ্গে।।

প্রিয়তম গদাধর

ধরিয়া সে বামকর

নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে।

ভাবে ভরল তনু

পুলক কদম্ব জনু

গরজন যৈছন সিংহে।।

ঈষৎ হাসিয়া ক্ষণে

অরুণ নয়ন-কোণে

রোওত কিবা অভিলাষে।

সঙরি সে-সব খেলা

বৃন্দাবন-রসলীলা

কি বলিব বাসুদেব শোষে।।”

গৌরহরির অরুণ বর্ণ বসন। মনোহর চারু গণ্ডস্থল, চন্দ্র-বিনিদিত নখজ্যোতি, অশ্রুপূর্ণ নয়নকমল, নবরস ভাববিকার, অতি মধুর গতি, চন্দ্র বিনিদিত শীতল বদন, মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলক, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, এইপ্রকার কিশোর কলেবর দর্শন করিয়া শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—

“গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িও।

আপন করিয়া রাঙ্গা-চরণে রাখিও।।

তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।

শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইনু।।

এ কূলে ও, কূলে মুঞি দিনু জলাঞ্জলি।

রাখিও চরণে মোরে আপনার বলি।।

বাসুদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া।

কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া।।”

তাঁহার এই প্রার্থনাটি বড়ই মন্মস্পর্শী। আমরা যদি শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে শ্রীগৌররূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে অবশ্যই ঘটিবে।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রহ্লাদেশ শ্রীনৃসিংহদেব

ছিল সত্যযুগে প্রহ্লাদ নামেতে
 হরিভক্ত এক ছেলে।
 দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর
 মুখে শুধু হরি বলে।।
 পিতা ছিল তাঁর হিরণ্যকশিপু
 হরির বিরোধী যিনি।
 বাহুর বলেতে তিনটি ভুবন
 জিনিয়াছিলেন তিনি।।
 করিলেন তিনি অনেক তপস্যা
 পাইলেন এক বর—
 দেবাসুরে তাঁরে না বধিতে পারে
 না কোন কিম্বদন্তি নর।।
 জলে স্থলে তিনি নাহি মরিবেন
 না কোন অস্ত্রাঘাতে।
 রজনী দিবসে না যাবে জীবন
 না কোন প্রাণীর হাতে।।
 এই সব বরে হ'য়ে বলীয়ান্
 ধরাকে দেখেন সরা।

সূচনায় তিনি হরির ভকতে
 বিদ্রোহ করেন ত্বরী ।।
 বাধা দেন তিনি তাঁহার ছেলে
 হরিনাম গুণগানে ।
 কান নাহি দেন প্রহ্লাদ তাহাতে
 ডাকেন হরিকে প্রাণে ।।
 এতে দৈত্যরাজ সক্রোধে জ্বলিয়া
 দেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড ।
 কিবা আশ্চর্য্য ঘাতক-খড়গ
 হইল তা' খণ্ড খণ্ড ।।
 বহুবিধ চেষ্টা করিল যে রাজা
 প্রহ্লাদে মারিবারে ।
 শ্রীহরি যাঁহারে রক্ষা করিবেন
 কে তাঁরে মারিতে পারে ?
 প্রহ্লাদে মারিতে বিফল হইয়া
 শেষে রাজা তাঁরে বলে ।
 কোথায় তোমার শ্রীহরি ঠাকুর
 দরশাও এইকালে ।।
 এতেক শুনিয়া ভকত প্রহ্লাদ
 বলেন নম্রস্বরে—
 শ্রীহরি আমার সর্বত্র আছেন,
 দেখেন সদাই মোরে ।।
 দৈত্যরাজ বলে, তবে বেটা ওরে
 ঐ থামে কি হরি আছে ?
 নিশ্চয় নিশ্চয়, প্রহ্লাদ কয়,
 প্রভু আছে থাম মাঝে ।।
 ইহাতে নৃপতি বিষম রাগিয়া

গদাঘাত করে থামে।

থাম ভাঙ্গি' ক্রোধে প্রকটে নুহরি

সবে কাঁপে ধরাধামে।।

গোধূলি লগনে বীর-রসে ক্ষণে

ধরেন দৈত্যরাজে।

উরুপরি রাখি' বধিলেন হরি

নখ দিয়া বক্ষ মাঝে।।

ভকত প্রহ্লাদে . সব রিপু হ'তে

এরূপে রাখেন হরি।

দয়াল ঠাকুর শ্রীনৃসিংহে আজ

এখানে প্রণাম করি।।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবশর্মা

শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৮৪ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময়, ভগবান্ নিখিল বিশ্বের শাসক। আবার শাসক বললে কি বুঝতে হবে—তঁার কোন হৃদয় নাই, তিনি অন্তঃকরণ হীন? না, তা নয়—তঁার স্নেহ মমতাও আছে, সেটাও পাশাপাশি রাখা আছে। ভগবানের আছে, ভক্তের মধ্যে কি তা' নেই? ভক্তের মধ্যেও তা আছে—সেটাও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। “বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।।” ভগবানের মধ্যে দুটো ভাবই যুগপৎ আছে—বজ্র অপেক্ষাও কঠোরতা এবং পুষ্প অপেক্ষাও কোমলতা। যারা শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশ মানে না, ভক্তগণকে পীড়ন করে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি বজ্র অপেক্ষাও কঠোর। আর ‘মৃদুনি কুসুমাদপি’ কোথায়? যাঁরা তার আইন, সংবিধান, নির্দেশ পালন করে ঠিক ঠিক জীবন-পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের প্রতি তিনি পুষ্প অপেক্ষাও কোমল। তাঁরা কে? তাঁরা ভক্ত, একান্ত অনুগত। দুটো section ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একথা শাস্ত্রে সব জায়গায় বুঝানো আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে ‘দেবাসুর-সম্পদ বিভাগ’ যোগে ভগবান্ স্বয়ং তা বলে বুঝাচ্ছেন—

“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥”

হে পার্থ, আমি পূর্বে তোমাকে দৈব ভাবের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছি। এখন আসুর প্রকৃতির কথা বর্ণনা করছি। আমি বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-নিয়ন্তা, অনন্ত বিশ্বের মালিক, আমার ছাড়া কারও কোন পরিচয় নাই,—সেই বস্তু আমি। অথচ এরা আমাকে অস্বীকার করেই চলতে চাইছে, নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চাইছে এ দুনিয়ায়। এরা কি রকম? সেইটাই তো তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

“অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥”

(শ্লোকের) প্রথম দিকে বলেছেন—‘অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে’। সেটা কি জিনিষ? ‘ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা’—এই বিচারটা আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে জগতে প্রচার করেছেন। প্রয়োজন হয়েছিল, সেইজন্যই তিনি সেটা করেছেন। কিন্তু তিনি যে-মতবাদ প্রচার করেছিলেন, তা আমাদের গ্রহণ করা ঠিক হয় না। বুঝে রাখতে হবে যে, এটা আসলে ভগবৎবিরোধী ভাব। যারা নিচ্ছেন, তারা নাস্তিক্য পর্যায়ে গণিত হয়ে পড়ছেন। বিচারটা আমাদের positive side- এ নিতে হবে। ভগবানে ভক্তি করতে হবে—শ্রদ্ধা করতে হবে। ‘শ্রদ্ধা’ শব্দে শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যা রয়েছে—তা অনেক বড় কথা।

“কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কৰ্ম কৃত হয়”—একেই বলে শ্রদ্ধা। বলুন তো, এ শ্রদ্ধা ক’জনের কাছে? আমরা ত’ নানা দেবদেবী পূজা করি; ‘ধন দাও, অর্থ দাও, জন দাও’, এরকম আরও কত কিছু চাইছি আমরা। সেখানে আমাদের যে-প্রকার চাহিদা, প্রাপ্তিটাও ঐ ধরণের। কামনা-বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে আমরা সেই সেই আধিকারিক দেব-দেবীর উপাসনা করতে অগ্রসর হচ্ছি। কৃষ্ণ তো এইটাও খণ্ডন করেছেন গীতার মধ্যে। “কামৈস্তেস্তৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।” অন্যদেবতার শরণাপন্ন হচ্ছি কেন আমরা? কামনা-বাসনার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তি-প্রার্থনা—“হে ভগবান্, আমি যেন তোমার প্রতি ভক্তিবিধান করিতে পারি, আমি যেন তোমার ভক্তকে ভালবাসতে পারি, আমি যেন সাধুসঙ্গ, বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ করতে পারি; তোমার চরণে যেন আমার রতি মতি থাকে”—এটাকেই বলা হয়েছে শ্রদ্ধা—এটা ভক্তির অন্তর্গত।

কিন্তু আমরা তো জগতে কেবল ‘দাও দাও’ করে আসছি—অথচ এই চাওয়ার কোন শেষ নাই। The more you give, the more he wants---এই ত’ দুনিয়ার স্বভাব। আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষের যা আছে সংসারে, এর তো নিবৃত্তি নাই! শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, একটা লোককেও এই পৃথিবীতে সন্তুষ্ট করা যায় না। আমরা যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ, প্রায় সাড়ে চারশ’ কোটি মানুষ, একত্রে যদি চেষ্টা করি, যাতে একটা মানুষ অন্ততঃ সন্তুষ্ট হয়—তা’ও অসম্ভব। সেটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন,-

“যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

একস্যাপি ন পর্যাপ্তং কামহতস্য পুংস তে ॥

সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য, সোনা, পশু, স্ত্রী যদি একজনকে দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়—তাও তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। সে আরও চাইছে, আরও চাইবে। তাকে রাজ্য দেন, সে সমস্ত পৃথিবী চাইবে। পৃথিবী দেন, তখন বলবে—আমার সব চাই। সমস্ত রসাতল সব চাই। সুতরাং শাস্ত্র আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন—“ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্”—ভোগে শাস্তি নাই, ত্যাগেই শাস্তি আছে। এখন ‘ভোগ’ আর ‘ত্যাগ’—এই দুটো জিনিষ নিয়েও শাস্ত্রে সুন্দর আলোচনা আছে। আমরা ভোগ-ত্যাগীও নই, আবার ত্যাগ-ত্যাগীও নই—এই কথাটাও আবার শাস্ত্রে বুঝান আছে। ‘ত্যাগ-ত্যাগী’—সেটা আবার কিরকম? ত্যাগকে ত্যাগ করতে বলছেন—সেটা কি আবার খারাপ নাকি? হ্যাঁ, ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটা যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত না হয়, তাহলে সবটাই বিফল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগেই আমরা শুনলাম,—

“নেহ যৎকৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।

ন তীৰ্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃত হি সঃ ॥”

যে কৰ্ম্ম আমাদের ধৰ্ম্মের জন্য উদ্দিষ্ট হয়নি—সেই কৰ্ম্ম বৃথা। “নৈক্কৰ্ম্ম্যমপি অচ্যুতভাব-বর্ণিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ॥” এইভাবে শাস্ত্রে সব কথাগুলি বুঝান আছে। সেই কৰ্ম্ম বৃথা, সেই জ্ঞান বৃথা, সেই যোগ বৃথা, সেই তপস্যা বৃথা—যদি তারা সব ভক্তিশূন্য হয়। কিন্তু ভক্তিকে নিয়ে যখন আমরা চলতে পারি, তখন সবগুলিই সার্থক বলে পরিগণিত হয়। ভগবান্ স্বয়ং তা আমাদের বুঝিয়েছেন,—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধর।

ন সাধ্যায়স্তপ-ত্যাগো যথা ভক্তি মমোজ্জিতা ॥”

সখা উদ্ধরকে কৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন,—দেখ উদ্ধর, সাংখ্যজ্ঞান বা অন্য কিছুই আমাকে বশীভূত করতে পারে না। আমার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিই, ঐকান্তিক ভক্তিই আমাকে বশীভূত করে। আমার পূৰ্ব্ব বক্তৃমহোদয় বলেছেন,—“ভক্তি রৈবৈনং নয়তি, ভক্তিরৈবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।” এখানে ভক্তিরই মহিমা বলা হয়েছে। গীতার মধ্যেও আমরা পাচ্ছি—

“ভক্ত্যা মাং অভিজানাতি যাবান্ যশ্চমি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্ ॥”

এই ‘বিশতে’ শব্দটা এসেছে। এখানে ‘বিশতে’ শব্দের অর্থ—সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে একটা স্থানে দেখবেন,—অঘাসুর যখন বধ হল, তখন অঘাসুর থেকে একটা তেজ নির্গত হয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হল। ভগবানের সাথে জীবাত্মার যে মিলন, সেইটাই শাস্ত্রে বুঝানো হয়েছে। এবং সেইটা ভগবানের প্রতি সেবা-সম্বন্ধেই—

—এর বাইরে কিছু নয়। পাঁচপ্রকার মুক্তির কথা শাস্ত্রে আছে,—

সালোক্য-সান্ধি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার ভক্তগণকে চতুর্বিধ মুক্তিও যদি আমি দেই, তথাপি তারা সেটা গ্রহণ করে না। কেন গ্রহণ করেন না? কারণ ঐ মুক্তি চাইতে গেলে, যদি ভগবান্ তোমাকে আমরা হারিয়ে ফেলি—এই ভয়। তুমি যদি থাক, তবে সব কিছুই আমার পূর্ণভাবে আছে—এইটাই ভক্তের বিচার। আর minus God যদি হয়, তাহলে সবই cypher (অর্থাৎ শূন্য)। যে উদাহরণ দিয়ে আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারি,—১, এর পরে ‘০’ বসলে হয় ১০, তারপরে ‘০’ বসলে হয় ১০০, তারপরে ‘০’ দিলে হয় ১০০০। তাহলে ‘১’কে বামে রেখে যতগুলো ‘০’ বসিয়ে যাচ্ছি, সব দশগুণ করে ফল বেড়ে যাচ্ছে। এখন বামদিকের যে ‘১’ আছে, সেটা যদি মুছে ফেলা যায়, তবে দশটা শূন্যের আর কোন মূল্য থাকল না। একেই cypher বলা হচ্ছে। তেমনই ভগবান্ হচ্ছেন মূল নীতি, মূল আদর্শ—তাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই, ছেড়ে দিই, তবে আমাদের কোন মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। God-centred সংসারের আমাদের প্রয়োজন আছে—এইটা শাস্ত্রের বিশেষ উপদেশ। ভগবান্ আমাদের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে থাকবেন—তাকে কেন্দ্র করে আমরা যে-কোন radius এর যত circle অংকন করি না কেন; তার সুন্দর সামঞ্জস্য আছে—মূল্যায়ণ আছে। আর মূল কেন্দ্রবিন্দু যদি হারিয়ে ফেলি, তবে নিশ্চয়ই বৃত্ত অঙ্কিত হবে না। সুতরাং ভগবান্কে আমরা কোন ভাবেই বাদ দিতে পারছি না।

সেই ভগবান্ অত্যন্ত প্রেমময়। আমার পূর্ব বক্তৃৎমহোদয় বলেছেন, তিনি হলেন অখিল রসামৃতমূর্তি। উপনিষদ বলেছেন, তিনি “রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাযং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কো হ্যোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দো না স্যাৎ।” সেই প্রেমময় ভগবান্—তঁার উপাসনা করলে আমরা আনন্দ লাভ করি। আমরা তো সবাই আনন্দ লাভের আশায় বসে আছি। আত্মা তো কখনই নিরানন্দ চায় না—সে তো সবসময় আনন্দ চায়, শান্তি চায়। সেই যে রসময় বস্তু, প্রেমময় বস্তু, তঁার মধ্যে সবটাই আছে। তিনি পূর্ণ পঞ্চরসের অধিদেবতা। পূর্ণ পঞ্চরস মানে? তঁার মধ্যে সপ্ত গৌণরসও আছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। এই সমস্ত রসগুলি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণমাত্রায় আছে। এখন যে ভক্তের যতটুকু অধিকার, সে-অধিকার নিয়ে তিনি সাধন-ভজন পথে অগ্রসর হবেন। কেহ শান্তরসের সেবক-সেবিকা, কেহ দাস্যরসের, কেহ বাৎসল্যরসের, কেহ সখ্যরসের, কেহ বা মধুররতির। কিন্তু তারতম্য বিচারে কোনটা শ্রেষ্ঠ, তা শাস্ত্রে বুঝানো আছে। মহাপ্রভুর সাথে রঘুপতি উপাধ্যায়ের

আলোচনায় তা বলা আছে বা রামানন্দ সংবাদেও সেই বিচারটা দেখা যায়। সেখানে বলা আছে,—

“শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এর পরো রসঃ।।”

এখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব কোন বিচার বলা নেই। যিনি বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণতম তত্ত্ববস্তু, তাঁকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে। গতকাল আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছিল, পঞ্চশটি universal good qualities যাঁদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু মাত্রায় আছে, তাকে বলে জীব বা জীবাত্মা। পঞ্চশটি গুণ অধিক মাত্রায় যাঁদের মধ্যে আছে, তাঁরা হচ্ছেন শিব, ব্রহ্মাদি দেবতা। ষাটটি গুণ যাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে, তাঁকে বলা হয় বিষ্ণু বা নারায়ণ তত্ত্ব। তারপর আরও ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাক্। ভগবানের বিবিধ অবতার আছেন—তাঁদের বিভিন্ন রসে প্রকাশ রয়েছে। এর মধ্যে যেমন এসে গেলেন—মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। তিনি ধনুর্দ্ধারী। একজন আছেন বংশীধারী এবং অপরজন আছেন ধনুর্দ্ধারী। যিনি ধনুর্দ্ধারী, তাঁর মধ্যে শান্ত, দাস্য এবং স্বর্ষের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে—পূর্ণরস নয়। কিন্তু কৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণরস রয়েছে। এখন তত্ত্বদর্শন আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে—সাধারণ জগতে যে কম বেশী বিচার করি আমরা—পার্থক্য যাকে বলে, বা মতভেদ যাকে বলে, এখানে সে জিনিষটা নাই। এখানে ‘মতবৈশিষ্ট্য’ কথাটি বলা হয়েছে—পার্থক্য বললে ভুল বলা হবে। তত্ত্বদর্শনের বিচারে পূর্ণত্বের বিচার এসেছে নারায়ণ-বিষ্ণুর স্বরূপ থেকে। ধরুন এটা হচ্ছে positive side। comparative degree ধরতে পারেন শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে। অন্য আর এক বিচারে পরমাত্মাকে comparative degree বলা হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনের মধ্যে পরমাত্মা হলেন comparative degree এবং superlative degree হলেন—শ্রীভগবান্। এখানেও ঐপ্রকার একটা বিচার আছে। কি আছে? শ্রীরামচন্দ্রের পরে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” বলে যে কথাটি বিচারের মধ্যে এল, সেটা superlative degree এর কথা। সব কিছু—All inclusive One—সেই শ্রীকৃষ্ণ। কোন কিছু বাদ দিয়ে নয়—সব কিছু নিয়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

যেমন রাজা আসছেন বললে—রাজা একাকী আসছেন, সেই অর্থ বুঝতে হবে না। তাঁর মন্ত্রী, পারিষদ, হাতী, ঘোড়া, দোলা—সব আসছেন। এখানে যে one-ness এর কথা, সেই ‘one’টাও সেই রকম। তিনি সর্বশক্তি সমন্বিত, সর্ববৃত্ত্ব-সমন্বিত। সুতরাং তিনি যে ‘এক’, সেটা কেবল ‘এক’ নয়—সেই ‘এক’-এর মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ সব আছে। দর্শনশাস্ত্রে এইপ্রকার ব্যাখ্যাই দেওয়া আছে। পূর্ণদর্শনের বিচার যেখানে করা হয়েছে—সেখানে অংকটা আবার

একটু অন্যপ্রকার, সাধারণ অংকের মত নয়। কিরকম? দশ থেকে দশ বিয়োগ করলে শূন্য হয়। কিন্তু পূর্ণদর্শনের বিচারে তা হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে শেষে পূর্ণই অবশেষ থাকে---এই অংক কষেছেন---এটা Higher Mathematics। আবার আমরা জানি---Two parallel straight lines can never meet. এটা আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু বিশেষ বিধি-ব্যবস্থায় দেখা যায়---They can meet in the eternity. সুতরাং পূর্ণদর্শনের যে বিচার, তাতে সাধারণ অংকের হিসাব মিলবে না। সাধারণ অংকে ১০ থেকে ১০ বিয়োগ করলে শূন্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু পূর্ণদর্শনে ১০ থেকে ১০ বিয়োগ করলে সেই ১০ই থাকে। এটা খুব সূক্ষ্ম বিচার---মহাভারতের মধ্যে তা অংক কষে বুঝানো হয়েছে। সেই জিনিষটা আচার্য্য শঙ্করপাদ নিয়েছেন, তার উপর টীকা-ভাষ্য করেছেন। গ্রন্থটার নাম হয়েছে---‘সনৎসুজাতীয়ম্ অধ্যাত্ম্য-শাস্ত্রম্’। বাজারে সেটা পাওয়া যায়---আপনারা তা দেখে নিতে পারেন। একটা chapter-এর ব্যাখ্যা দুটো বড় বড় volumes। সেখানে ঐ পূর্ণদর্শনের বিচারটা দেখানো হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

কাল---কলি, অর্থাৎ কলহময় এই যুগ। সর্বদোষের আকর এই যুগ। এই যুগে মূল অপেক্ষা শাখার আদর বেশী---ভগবান্ অপেক্ষাও দেবতাগণের মূল্য বেশী---দেবতা অপেক্ষা ‘অবতার-সাজা’ ভগুদের পূজা বেশী---আসল অপেক্ষা নকলের ব্যবহার বেশী। এই যুগে রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে---ব্রাহ্মণ সাজিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম নাশ করে। এই যুগে ভ্রষ্টগণ ‘ভাগবত’ সাজিয়া নির্মল ভাগবত-ধর্ম কলঙ্কিত করে। এই যুগে শয়তান শাস্ত্রের কথা বলিয়া অজ্ঞ জীবগণকে বিপথে চালিত করে---শুদ্ধধর্মের বিচার আচ্ছাদিত করে।

মূলে শাখা অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ যুগে শাখাই মূলকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। অথও ভারতবর্ষ হইতে ধর্মের নামে পাকিস্তান সৃষ্ট হইয়া মূলকে বিনাশ করিতে মূলের সহিত চিরবৈরীতা সাধনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যে-ভগবানের অংশ জীব, সেই জীব ভগবান্কে কেবল ভুলিয়া থাকে নাই---ভগবানের সহিত

বিরোধিতা করিতে কোমরে গামছা বাধিয়াছে। সাধারণ অর্থনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগতে পরমার্থ-নীতি পর্য্যন্ত যুগপ্রভাবে দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যে-‘ভক্তি’ আশ্রয় বিনা ‘কর্ম’ ‘জ্ঞান’ ‘যোগ’ প্রভৃতি নিষ্ফল---সেই ‘কেবল-ভক্তি’র অনুশীলনেও ‘ভক্ত্যর্থ-অনর্থ’র প্রভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উপশাখা ভক্তির মূলশাখাকে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিতেছে। যে-কৃষ্ণকীর্তন এই দোষাকর কলিযুগে একমাত্র মহান্ গুণ---সেই কীর্তন ‘মানুষ-ভজনে’র মাধ্যম-স্বরূপ হইয়াছে। ভগবৎপার্বদ শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাই এহেন পরিস্থিতিতে আত্যন্তিক-শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবের পরমাশ্রয়-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াই ভিক্ষা করিতেছেন---

“কালঃ কলিকলিন ইন্দ্রিয়বৈরীবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।

হা হা হা যামি বিকলঃ কিমহং করোমি

চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।”

শ্রীচৈতন্যদেবের আত্যন্তিক চরণাশ্রয় বিনা কলির করাল গ্রাস হইতে মুক্তি-লাভ অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় দশম অধস্তনবর আচার্য্যকেশরী জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বাধ্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে তৎপদাক্ষিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিধি সংরক্ষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ ‘এ বৎসর নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা হইবে না’ বলিয়া গুজব ছড়াইলেও তাহাতে সুখী মানবগণ কর্ণপাত করেন নাই। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও বিপুল যাত্রী সমাবেশ হইয়াছিল। এই বৎসর প্রকৃতি দেবী সর্ব্বদা প্রফুল্লভাব ব্যক্ত করায় যাত্রীসাধারণের কোনপ্রকার উদ্বেগ হয় নাই। পরন্তু শ্রীগুরুগৌরঙ্গের অশেষ কৃপায় সমগ্র পরিক্রমা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

গত ১৭ই ফাল্গুন, ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১।৩।২০০৪) সোমবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।২০০৪) রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিবৎসর যে-নিয়মে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়া থাকে---এইবৎসর সেই নিয়মে প্রথম দিবসে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ এবং দ্বিতীয় দিবসে একাদশী তিথিতে শ্রীকোলদ্বীপ-অন্তর্গত সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং শ্রীঋতুদ্বীপ-অন্তর্গত রাতুপুর পরিক্রমা হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে একাদশী-ব্রতোপবাসের পারণের সময়ে কিছু জটিলতা থাকায় পরিক্রমার সূচী পরিবর্তন করিয়া সে-দিবস নবদ্বীপ শহরস্থ পৌঢ়া-মায়াস্থান, বৈষ্ণবসার্কভৌম শ্রীল জগন্নাথ বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনপূর্ব্বক নিদয়া-ঘাটে গমন করিয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন

করা হয়। চতুর্থ দিবসে শ্রীজহ্নুদ্বীপ-অন্তর্গত বিদ্যানগর (শ্রীসার্কভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পাট), জাল্লগর (জহ্নুমুনির স্থান) এবং মোদদ্রুম-দ্বীপ-অন্তর্গত মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা, মাতাপুর পরিক্রমা হয়। পঞ্চম দিবসে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। সে-দিবস শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠস্থ জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীমুরারীগুপ্তের শ্রীপাট, চাঁদকাজীর সমাধি দর্শনপূর্বক শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, এবং যোগপীঠ (শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থলী) পরিক্রমা করা হয়। তৎপশ্চৎ শ্রীচৈতন্যমঠের নিকটস্থ ‘শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয় মঠ’-নামক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সংগৃহীত ভূমিতে সকল যাত্রীগণ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতিস্থানে প্রচুর পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরদিবস ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।২০০৪) শনিবার শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই নিরম্ব উপবাসী থাকিয়া এবং সমগ্রদিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মনোরম শ্রীগৌরলীলা ও গৌরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যায় কীর্তনমুখে মহাপ্রভুর অভিষেক-অনুষ্ঠান দর্শনে কৃতার্থ হন। পরদিন সাধারণ মহোৎসবে অগণিত লোক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রদর্শিত সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শ-অনুসারে শ্রীসমিতির কিছু একনিষ্ঠ সেবকগণ চতুর্থাশ্রমরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদিককে যথাবিধি সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিলে পর সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক পরমপূজনীয় ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ‘সৎক্রিয়াসার’ দীপিকা গ্রন্থানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা চতুর্থাশ্রম-বেষ ও ত্রিদিগ্ধ প্রদান করেন। যে-সকল মঠবাসীগণ চতুর্থাশ্রমী হইয়া যে যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী

শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী

শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীদীনদয়াল দাস বাবাজী

শ্রীরাধারমণ দাস বাবাজী

ত্রিদিগ্ভিন্দু শ্রীভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ

” শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্যাগী

” শ্রীভক্তিবেদান্ত ন্যাসী

” শ্রীভক্তিবেদান্ত নিক্ষিপন

শ্রী	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	শ্রী
ধর্মঃ বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন কথাসু যঃ ।		নোংগাদয়েদ্যদি রতিন্ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
শ্রী	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা সুপ্রসীদতি ॥	শ্রী

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
--	--

৫৬শ বর্ষ }	১২ বামন, প্রদ্যুম্ন, ৫১৮ শ্রীগৌরান্দ	{ ৪র্থ সংখ্যা
	৩২ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪১১, ইং ১৫/৬/২০০৪	

সানুবাদং

শ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্

(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর-বিরচিতম্)

যঃ কৃষ্ণচেতন্য-কৃপৈকবিন্ত-, স্তং প্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিন্তঃ ।

নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচেতন্যের কৃপা যাঁহার একমাত্র ধন, গৌরপ্রেমরূপ স্বর্ণালঙ্কারে যাঁহার চিত্ত
অলঙ্কৃত, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি ভূমিতে পতিত হইয়া আশ্রয়
করিতেছি ॥ ১ ॥

যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ, পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ ।

স্বাচারচর্য্যা-সততাবিরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন, যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও
রাস স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন, যিনি সর্বদাই নিজ স্বরূপোচিত আচার-অনুষ্ঠানেই মগ্ন,
সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ২ ॥

সদোল্লসদ্-ভাগবতানুরক্ত্যা, যঃ কৃষ্ণরোধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা।

অযাতযামীকৃতঃ সর্বযাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বদা উজ্জ্বল-অনুরাগের প্রভাবে আসক্তি প্রকাশে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি শ্রবণাদি ভক্তি-প্রভাবে যাঁহার সকল প্রহর অ-যাতযাম অর্থাৎ বর্তমান থাকে, অতীত হয় না, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৩॥

বৃন্দাবনাধীশ-পাদাজ-সেবা-, স্বাদেহনুমজ্জতি ন হন্ত! কে বা।

যস্তেষ্মপি শ্লাঘ্যতমোহভিরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৪॥

বৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবারস-আস্বাদে কে নানিমগ্ন হন; কিন্তু যিনি সেইসকল মহানুভবগণের মধ্যেও শ্লাঘ্যতম ও চিত্তাকর্ষক, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৪॥

যঃ কৃষ্ণলীলা-রস এব লোকান্, অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্তি শোকান্।

স্বয়ং তদাস্বাদনমাত্র কাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৫॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্বাদে বহির্মুখ লোকসকলকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসস্বাদেই অভিলাষ প্রকাশ করেন, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৫॥

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ, নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশিৎ।

যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৬॥

মহান্ পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম যাঁহার কৃপাবল অবগত ছিলেন, যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য সর্বত্র খ্যাত, সেই লোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৬॥

রাগানুগা-বত্বনি যৎপ্রসাদাদ্-, বিশস্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্ঝিষাদাঃ।

জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৭॥

যাঁহার অনুগ্রহে অবিজ্ঞগণও রাগানুগ-ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া শোক-রহিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি অপরাধীর প্রতিও অনুকূল-ভাবাপন্ন, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৭॥

যদাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ, বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।

যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৮॥

যাঁহার দাসের দাসানুগদাস তদাস্যলাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, এবং অচিরেই যাঁহার ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশ করিব, সেই শ্রীলোকনাথ নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি॥ ৮॥

শ্রীলোকনাথাস্তকমতু্যদারং, ভক্ত্যা পঠেৎ যঃ পুরুষার্থ-সারম্।

স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য, শ্রীরাধিকাং সেবত এব সদ্যঃ॥ ৯॥

যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সারভূত এই অতিমনোজ্ঞ শ্রীলোকনাথাস্তক পাঠ করেন, তিনি শ্রীমঞ্জুলালী-নাম্নী মঞ্জুরীর আশ্রয়ে সদ্য শ্রীমতী রাধিকার সেবা লাভ করিবেন।। ৯।।

সোহয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্মরতু পুরু-কৃপা-রশ্মিভিঃ স্নৈঃ সমুদ্য-

নুদ্ব্যত্যাঙ্ক্য যো নঃ প্রচুরতম-তমঃ-কূপতো দীপিতাভিঃ।

দৃগ্ভিঃ স্বপ্রেম-বীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-

রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল-গোবর্দ্ধনং স্মঃ।। ১০।।

যিনি আপন প্রদীপ্ত নয়নদ্বারা গাঢ়তম অন্ধকারকূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রেমমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, আহা! যাঁহার কৃপাবলেই আমরা অপ্রাকৃত লীলাভাণ্ডার অতি নির্জ্ঞান শ্রীগোবর্দ্ধন লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীল লোকনাথ প্রভু স্বকীয় কৃপা-রশ্মিসহ স্মৃতিপ্রাপ্ত হউন।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

প্রথম অধ্যায়

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ? উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমঙ্গাচার্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত যে নয়টি তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব।

প্রশ্ন। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে?

উত্তর। গুরুদিগের আদিগুরু--ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমঙ্গাচার্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম--গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্রশ্ন। শ্রীমঙ্গাচার্য যে নয়টি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি?

উত্তর। তাহাদের নাম, যথা--(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি অখিল বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব--সত্য, (৪) ভেদ--সত্য, (৫) জীব--শ্রীহরিদাস, (৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য, (৭) ভগবৎচরণ-প্রাপ্তির নাম মোক্ষ, (৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু, (৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', ও 'শব্দ'--এই তিনটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া দৈশ্বর-স্বরূপে (পরমাত্মা-স্বরূপে) তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে (জীব ও জড়কে) অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের চিন্তিবৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম---ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরা শক্তি বলা যায়। বাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উ। ভগবান্ একটি বস্তু এবং শক্তি (অপর) একটি বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য---এই ছয়টি ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্য-প্রধান প্রকাশ (যে প্রকাশে ঐশ্বর্য্যই প্রধান), সেখানে পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার?

উ। স্বরূপ---একই একর চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্বা কার্য্যক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দ-স্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি?

উ। চিৎজগতের মধ্যে পরম-রমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন ; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দ-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে (দাসী-ভাবে) নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটি—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্বিশেষ বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কৰ্ম্ম যে বুদ্ধিকে সন্ধীর্ণ করিয়া রাখে, তাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে (চিন্ময়) বৃন্দাবন-ধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে ; (নিত্য) কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে ; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে ; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে ; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না ; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কৰ্ম্মকেই ‘কর্তব্য’ মনে করে।

প্র। নির্বিশেষ-বুদ্ধি কি?

উ। যে ধৰ্ম্মদ্বারা জড়-জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাকে ‘বিশেষ’ বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্বিশেষ হইয়া পড়ে ; তিনি আর বস্তুভেদ (বস্তুসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ তথা ‘বিশেষ’) দেখিতে পান না ; অগত্যা আপনাকে নির্ঝাণ বা ব্রহ্মালয়-অবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না ; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্য-প্রদেশে (ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে) কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়ধৰ্ম্মের অধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত ও শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীব-হৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া

তাঁহাতে জড়যুক্তি দ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রস লাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বেরই উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম-সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্য-বুद्धিই (শ্রেষ্ঠতম-জ্ঞানই) জীবের চরম জ্ঞান। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ঐকান্তিক হরিভজন

বাগদগুরূপ মৌন, দেহদগুরূপ চেষ্টা-রাহিত্য ও কৃষ্ণ-সেবা-চিন্তনের দ্বারা চিন্তাস্থৈর্য্য না করিলে ‘গোস্বামী’ হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংসগীতায় এবং শ্রীল রূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ড-বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণ-ভজনানুকূল জীবন-যাপনেই ত্রিদণ্ড-গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দণ্ডের জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় জীবের হরি-ভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।

ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ---মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্-প্রণীত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে ‘মাধুকর-ভৈক্ষ্য’ বলে। উহাই ভিক্ষুজীবনের সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি, না দিবেন---না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে ‘অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য’ বলে। পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে ‘প্রাক্-প্রণীত ভৈক্ষ্য’ বলে। অনির্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্র-গৃহে সম্পন্ন করিয়া সেই লব্ধ ভিক্ষার দ্বারাই নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্তব্য। শুক্ল বিত্ত-সংগ্রহকারী, অমেধ্য-গ্রহণে বিরত ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়। যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদ্ভজনে বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা যাক্সা করিবেন না কেননা তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী যথেষ্টাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া Vagrancy Actএর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত একল হইয়া একায়ন-পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে

উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়-গ্রহণ করাই কর্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথা-কীর্তন-রত, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জন-সঙ্গ আদৃত হয় না—উহা আপনা হইতে রহিত হইবে। সংসঙ্গই অসংসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-সঙ্গই ইতর-সঙ্গ-রহিত জানিবে। যেখানে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনার উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দুঃসঙ্গ-বর্জন সর্বতোভাবে বিধেয়।

“দদাতি প্রতিগৃহ্মাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুক্তো ভোজয়তে চেব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম॥”

—ইহাই সঙ্গ-বিচারে বিচার্য। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একল হইয়া জীবদশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন জড়ভোগ-বৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎ-সেবানিরত—এরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্ ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত-ব্যক্তির নামই আত্মজীড়। ভগবান্ ও ভক্তে সর্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবা-বিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণক-সেবাতৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মজীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের ও তত্তত্ত্বজনের প্রতি বিদ্রোহ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে সঙ্গ-দোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে। তখন তাহার সংযত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যক্রমেই বহু-শাখিগণের একায়ণ-স্বল্প-পরিত্যাগের বাসনা হয়। সেখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি নাই। ব্যভিচারক্রমে বহু দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত, তাহার কৃষ্ণের বস্তুকে দেবাস্তুর জ্ঞান হয়। উহা ভোগেরই প্রকারভেদ। কামদেব কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য—এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থপর ভোগরূপ বহু দেব-ভজন-স্পৃহা নিরস্ত হয়।

যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচ প্রকার সেবন-ভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নিঃসঙ্গ ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গলরূপ ভগবান্ বা ভক্তসেবায়ই তৎপর হইবেন। আপনাকে ভগবৎসেবা-বিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্মদেহ ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদবাদ উপস্থিত হয়। হৃষীকেশের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদ-বাদই অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়-চেষ্টাগুলিকে ঞ্জংস করিয়া অভেদ-চিন্তায় যে জড় আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্তৈর্য্য সম্ভব হয় না। সর্বক্ষণ অভেদচিন্তার মধ্যে জড়ভোগীর ন্যায় ভেদ-চিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়-সকল অধোক্ষজ ভগবৎসেবায়

নিযুক্ত না হইলে আধ্যাত্মিকগণের পরামর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নিষ্ঠুর চিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ায় সগুণ বিচার প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর বিবেক কখনও নির্জ্ঞানতা আনয়ন করিবে না। বহির্জগতের ভোগ-চিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।

জাগতিক বস্তুতে বিলাস-রহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্য-বস্তুর অপেক্ষা-রহিত ভগবৎ-প্রীতিকামী ভগবৎ-সেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা-হেতু জড়-ভোগ্যাপেক্ষা-প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকারে বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্য-ধর্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত কথিত—

“এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।

অকিঞ্চন হএগ লয় কৃষ্ণৈক-শরণ।।”—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সূচী বিচার।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধি-পালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য বহির্জগতে পালিত ন হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্ত্বদ্বিষয়ে পারঙ্গতি লাভই পারমহংস্য বিচার। আপাত-দর্শনে খর্বদৃষ্টি-ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্ম-কলঙ্ক বিধান করেন।

“দৃষ্টোঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ”—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অদৈব বর্ণাশ্রমমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

—জগদগুরু ও বিষুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

বেদান্তে শব্দবাদ

জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

তারিখ—অক্টোবর ১৯৩৩, স্থান—কটক রেভেন্স কলেজ

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্জনা-শলাকয়া।

চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি, প্রাণপ্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা লক্ষ্য করেছেন—বস্তু মাত্রেরই ধর্ম আছে। আমরা জন্ম-হতে মৃত্যু পর্যন্ত যতপ্রকার বস্তুরই ধারণা করি না কেন, সমস্ত বস্তুরই ধর্ম আছে। এবং আপনারা কলেজের পাঠ্য-পুস্তকেও Substance-Attribute-এর কথা পড়েছেন। আমাদের পাঠ্যের মধ্যে

আমরা যে Attribute-এর কথা সর্বদা আলোচনা করে থাকি, তার অপর নাম ‘ধর্ম’। যত দৃশ্যবস্তু আছে, তাদের Attribute বা ধর্মের কথা আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করি ; তথাপি এ-ছাড়াও স্বতন্ত্র ও অন্যপ্রকারে ধর্মসম্বন্ধে জানবার আমাদের একটা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি দেখা যায়। সেই ধর্ম-সম্বন্ধেই আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরীমহারাজ আপনাদের কাছে আলোচনা করেছেন। আমি তার অনুকূলেই ঐ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করব।

শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আপনারা আমার “পুনরাবৃত্তি-দোষ” গ্রহণ করবেন না। কারণ, পাণিনি প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তাগণ বলেন—“আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাগাং বোধাদপি গরীয়সী”। এই মতের আদর সর্বত্র না থাকলেও এই ক্ষেত্রে আমাকে তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। কারণ বক্তব্য বিষয়—এক বই দুই নয়।

আমি আজকের বক্তব্য বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা আখ্যায়িকা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের সংবাদ শুনে থাকবেন। ‘হিরণ্য’ মানে কনক অর্থাৎ টাকা-কড়ি, ধনরত্ন ইত্যাদি বুঝায়; আর ‘কশিপু’-শব্দে বিছানা বা উত্তম শয্যা। উত্তম শয্যা বলতে কামিনীকে লক্ষ্য করে। সুতরাং হিরণ্যকশিপু-অর্থে কনক-কামিনী বুঝায়। আর সত্য সত্যই তিনি Embodiment of কনক-কামিনী (কনক-কামিনী-বিগ্রহ) ছিলেন। আমরা এখানে বহু পিতা এবং বহু পুত্র উপস্থিত আছি। আমরা একটু ধীরচিন্তে চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারব যে, আমরাও কিন্তু অনেকেই সেই কনক-কামিনী-লুব্ধ হিরণ্যকশিপু। আমরা জন্ম থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছি বা করছি, তার মূলে কনক-কামিনী সংগ্রহ-ছাড়া আর অন্য কোন চেষ্টা লক্ষ্য করি না। আমাদের পিতামাতা বাল্য-কাল হতেই আমাদের বলেন—“তোমরা ভাল করে লেখাপড়া শিখ, নতুবা তোমাদের ভালঘরে বিবাহ হবে না। আর যদি অর্থ-উপার্জন করতে না পার, তবে নিজের বা বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণ কিভাবে করবে?” আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান্ এবং উচ্চশিক্ষিত; এখন একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন—এই সমস্ত শিক্ষাতে শুধু কনক-কামিনীরই লক্ষ্য আছে কি না এবং পিতামাতার সেইসব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কনক-কামিনী সংগ্রহ করে সুখে জীবনযাপন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয়েছে কি না। অবশ্য যাদের পিতামাতা পুত্রদের এইপ্রকার শিক্ষা দেন, আমি মাত্র তাঁদেরকেই লক্ষ্য করে এই কথা বলছি। আমি আপনাদের আরও ধীরভাবে এই বিচারটা চিন্তা করতে অনুরোধ করছি ; আপনারা এখানে (এই কলেজে) যে Attribute-এর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকেন, তার মূলেও ঐ কনক-সংগ্রহ আর বিবাহাদি-দ্বারা সংসার-সৃষ্টি নির্বাহ করা।

আমাদের দেশে যে-স্মৃতি প্রচলিত আছে, তা হতে আমরা জানতে পারি—“আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ”; তাহলে হিরণ্যকশিপুর মত পিতার ঔরসে প্রহ্লাদ মহারাজের আবির্ভাব কিরূপে হ'ল? প্রহ্লাদ-শব্দে প্রকৃষ্ট হ্লাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আনন্দ

বুঝায়। প্রকৃষ্ট আনন্দ বললে ‘প্র’-উপসর্গেতে নিত্য, অপরিবর্তনশীল ও জড়াতীত চিন্ময়-সত্তাবিশিষ্ট বুঝা যায়। আমরা এ-জগতে যে আনন্দের সত্তা উপলব্ধি করি, তা’তে এবং তা’র ফলে ও মূলে নিরানন্দই বর্তমান। এই প্রাকৃত জগতে আনন্দের যে-প্রতিমাই দেখা যাক না কেন, তা আসলে নিরানন্দেরই প্রতিকৃতি। এ-ক্ষেত্রে দার্শনিকভাবে বিষয়টা আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে নিত্যসত্তা-বিশিষ্ট চিন্ময় বস্তুর আনন্দের অভাব কোথাও নাই এবং সম্ভবপর নয়। চিদানন্দের অধিষ্ঠান আছে ব’লেই অন্যপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হয়। বিষুৎ সমস্তজগতে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান বলেই জগতের অস্তিত্ব অনুভব হচ্ছে। ‘কনক-কামিনী’-রূপ হিরণ্যকশিপু হতে যে-আনন্দ উদ্ভূত হয়, তা অনিত্য ও অনুপাদেয়ই হওয়া সম্ভব ; তা আমরা সেই স্মৃতি-বচনের দ্বারাই জানতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রহ্লাদ মহারাজের অর্থাৎ নিত্যানন্দের আবির্ভাব হওয়ায় আমরা এই শিক্ষা পাই যে, নিত্যানন্দের আত্যন্তিক অভাব কোথাও নাই এবং হতে পারে না—কারণ তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্য সদ্ধর্ম-বিশিষ্ট।

আমরা সূতিকাগৃহের ইতিহাস আলোচনা করলে জানতে পারি যে, সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় না। সর্বপ্রথম কর্ণ-ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়ে থাকে। এইজন্য আমাদের শ্রবণই প্রথম উপাদান। কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা শ্রবণের সাহায্যই প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করছি। অনেকে শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না—তাঁরা নিজেরাই অনেক বিষয়ে আলোচনা করে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে-প্রকার চেষ্টা বা যত্নকে কখনই প্রশংসা করা যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করা যায় না। শ্রবণের আবশ্যিকতা মেনে নেওয়ার নামই গুরুকরণের বিচার স্বীকার করে নেওয়া। আধুনিক গতানুগতিক ধারায় এই গুরুকরণের আবশ্যিকতা দেখা যায় না। অধিক কি, কনক-কামিনী বিগ্রহ হিরণ্যকশিপু পর্য্যন্ত এই গুরুকরণকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তিনি তাঁর অতি আদরের পুত্রকে-জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজগুরু গুণ্ডাচার্যের কাছে শ্রবণ করতে পাঠিয়েছিলেন। গুণ্ডাচার্য-শব্দে আমরা বুঝতে পারি—যিনি গুরু অর্থাৎ জননের আচার্য্য। হিরণ্যকশিপুর ম’ত ব্যক্তির গুরুদেব গুণ্ডাচার্য্য ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারেন? ‘কনক-কামিনীর’ গুরু জননাচার্য্য (শ্রোতৃমণ্ডলীর অট্টহাস্য)। সুতরাং হিরণ্যকশিপু তার পুত্রের জন্য জননাচার্য্যকেই নিযুক্ত করলেন।

পিতা যে প্রকৃতির হন, নিজ পুত্রকে সেই প্রকৃতির শিক্ষা দেওয়াই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। আমাদের এই শিক্ষা-মন্দিরে যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা আমাদের পিতা-মাতার চিন্তবৃত্তির অনুকূল। আমরা তাঁদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হব—এই আশা করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আর আমরাও এখানে যে শিক্ষা লাভ করি, তাতে কনক-কামিনী সংগ্রহ ছাড়া আর অন্য কিছু সংগ্রহের শিক্ষা থাকে না।

প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতিও হিরণ্যকশিপু ঐপ্রকার আশা করে শুক্রাচার্য্যের কাছে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। আমাদের নিজ নিজ পিতৃবর্গ আমাদের ঐ শিক্ষা ছাড়া আর অন্য কোন শিক্ষার জন্য যত্নবান হতে দেখলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এমন কি, যে-শিক্ষাতে কনক-কামিনী-সংগ্রহের ব্যবস্থা নাই, এমন কোন শিক্ষামন্দিরে যদি পুত্রকে যাতায়াত করতে দেখেন, তবে পিতার হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তখন পুত্রকে সেই পথ হতে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকেন—হাত-পা কাপড়-চোপড় ধরে টানতে থাকেন। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হাস্য)

যা হোক, প্রহ্লাদ মহারাজ পিতার আদেশে শুক্রাচার্য্যের কাছে অধ্যয়নের জন্য গমন করলেন। কিন্তু অসুরকূল-গুরু শুক্রাচার্য্য তখন দেবগণের এবং দৈব-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ভীষণ চিন্তিত এবং মহাব্যস্ত। তিনি অসুররাজের আদরের পুত্রের শিক্ষার ভার নিজের দুই পুত্র যণ্ডা আর অমর্কের উপর ন্যস্ত করলেন। যেমন শুক্রাচার্য্য জননাচার্য্য, তেমনি তাঁর দুইপুত্র যণ্ডামর্ক। যণ্ডামর্ক বেশ যত্নসহকারে রাজপুত্রের শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করলেন। শিক্ষামন্দিরে কিছুকাল অতিবাহিত হলে পর হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র কিপ্রকার শিক্ষা অর্জন করেছে, তা জানতে চেয়ে প্রহ্লাদকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন—“বৎস, প্রহ্লাদ, তুমি তোমার গুরুর কাছে যা শিক্ষা করেছ, তার মধ্যে যেটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা আমার কাছে কীর্তন কর।” প্রহ্লাদ তার উত্তরে—“শ্রবণং কীর্তনং বিষেগঃ স্মরণং পাদসেবনম্” শ্লোকটি কীর্তন করলেন। যারা কনক-কামিনীতে প্রলুব্ধ, তাদের কাছে বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্তনের কথা অত্যন্ত বিষবৎ বলে মনে হয়ে থাকে। তাই হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং যণ্ডামর্কের কাছে পুত্রের ঐপ্রকার প্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যণ্ডামর্ক তাঁদের নিজ শিক্ষার পরিচয় দিয়ে বললেন,—“আমরা ঐপ্রকার শিক্ষা কোনদিনই লাভ করিনি, যে অপরকে দিতে পারব। আর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও এরূপ নয় যে, কেহ বিষ্ণু-পরায়ণ হয়ে আমাদের আসুরিক-প্রবৃত্তির বিরোধী হয়।” হিরণ্যকশিপু আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, তথাপি প্রহ্লাদকে পুত্রস্নেহে ক্ষমা করলেন।

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আপনাদের এই শিক্ষা-প্রচার-গৃহে প্রার্থন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের কাছে তাই আমার প্রার্থনা—আপনারা এই প্রার্থনা-মন্দিরে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা-বিষয়টি বিশেষরূপে আলোচনার ব্যবস্থা রাখবেন। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বপ্রথমেই বিষ্ণুর শ্রবণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তার কারণ—আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমেই শ্রবণ অধিকার লাভ করেছি। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মালোচনা করতে গেলে শ্রবণেরই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। প্রহ্লাদ মহারাজ যে-প্রকার যণ্ডামর্কের কাছে তাঁর পিতার অভীজিত শিক্ষালাভের মধ্যেও বিষ্ণু-তত্ত্বের শ্রবণ-কীর্তনই শিক্ষা করেছিলেন, সেইপ্রকার আমার প্রার্থনা—আপনারা যে-শিক্ষার আলোচনা করছেন, তার মধ্যেও বিষ্ণু-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ-কীর্তন করুন। সেই বিষয়ে

যে আপনাদের কিছু চেষ্টা আছে, সেটাও আমরা লক্ষ্য করছি। আপনারা সব প্রাকৃত-বস্তুর ধর্মের আলোচনা করতে থাকলেও অন্য আর এক স্বতন্ত্র ধর্মের আলোচনা করার প্রবৃত্তি ত' আপনাদের মনে উকিঝুকি দেয়—হৃদয়দ্বারে knock করে। তাই বলছি আপনাদের হৃদয়েতে ঐ ভাবটার অনুশীলনের জন্য শ্রবণ-পথের অঙ্গীকার করুন। যে কোন বস্তুর জ্ঞান অর্জন করতে হলে শ্রবণেরই বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু 'শব্দ'কেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ব'লে স্বীকার করা হয়েছে।

'সম্প্রদায়'—বললে আমাদের মধ্যে একপ্রকার সঙ্কোচনের ভাব জেগে উঠে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম-সম্বন্ধে বলেননি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, সম্প্রদায় স্বীকার না করে পারা যায় না। আমি হয়ত অন্ধকারের Advocate, আর আপনি হয় ত' আলোর Advocate. কিন্তু অন্ধকার ও আলো—বিরুদ্ধজাতীয় বস্তু—সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপক। আমরা একই সময় 'এটা টেবিল' ও 'এটা টেবিল নয়' একথা বলতে পারি না। কারণ আপনারা জানেন—দুটো contradictory terms এক সঙ্গে মিলিত হয় না। সার্বজনীনতার অভিনয় করে আমি বললাম—'সব মতই ভাল' ; কিন্তু আপনি বললেন—'সব মত ভাল নয়, আমার মতটা ভাল'। আপনার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হল, তখন 'সব মত ভাল'—বাদী আমি আপনার কেবল ঐ 'নিজ মত ভাল'—বাদ স্বীকার করতে পারলাম না। অতএব আপনার ঐ মতে আমার মতের পার্থক্য থাকায় 'সব মতই ভাল'—এই প্রকার যুক্তি কি ক'রে টিকল? (শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হাততালি)। সুতরাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আপনি একপ্রকার সম্প্রদায়-ভুক্ত আর আমি অন্য প্রকার সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়ে পড়লাম। সুতরাং আমাদের সম্প্রদায় স্বীকার না করার যুক্তি কোথায়? শাস্ত্রগণ বলেন—“সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।” অতএব বক্তব্য এই যে, আমাদের সম্প্রদায় স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সম্প্রদায় দুই প্রকার—সৎ ও অসৎ। আমাদের অসৎ সম্প্রদায় ত্যাগ করে সৎ-সম্প্রদায় গ্রহণ করতে হবে। 'সৎ'-শব্দে নিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বুঝায়। এই সৎসম্প্রদায়ই—বৈষ্ণবগণ। বৈষ্ণবগণ বলেছেন যে, 'শব্দ'ই একমাত্র মূল প্রমাণ।

আমরা প্রায়ই শুনে পাই—অতীন্দ্রিয় বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ যে আত্মবস্তুকে শ্রবণ করার কথা প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করেছেন, সেই আত্মবস্তু প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। অথচ তিনি আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর শ্রবণ-কীর্তন করতে বলেছেন। উপনিষদ্ বলেন—“আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ দ্রষ্টব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”। সর্বপ্রাণে আত্মার শ্রবণ করতে হবে। প্রাকৃত জগতের একটা উদাহরণ দিয়ে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা-সম্বন্ধে আপনাদের কাছে বিষয়টা সরলভাবে বুঝাবার চেষ্টা করব। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে 'কাণ' যে বিষয়টা গ্রহণ করে, অন্য চারটা ইন্দ্রিয় সেই বিষয় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

গ্রহণ করে না। আবার অন্য চারটা ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণ করে, কাণ তা গ্রহণ করতে পারে না। যেমন ‘আম’ একটা বস্তু। চোখের দ্বারা আমের রূপ দর্শন করতে পারি—নাসিকা-দ্বারা আমের ঘ্রাণ নিতে পারি—জিহ্বা-দ্বারা তার আশ্বাদন করতে পারি—ত্বকের দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে পারি। এইপ্রকার, জগতের যাবতীয় বস্তুই এই চারটা ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা তাদের মধ্যে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু ‘কাণ’ যে-শব্দ গ্রহণ করে, তা আর কা’রও দ্বারা গ্রহণীয় নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কর্ণের একটা স্বাধীনতা আছে—তার অধিকারে সে অন্য কিছুকে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না। কর্ণের দ্বারা গৃহীত শব্দ আর অন্য চারটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মলিনতা লাভ করে না। সুতরাং আমাদের বিষ্ণুর বা আত্মার শ্রবণ করতে হলে অন্য চারটা ইন্দ্রিয়ের অধিকার হতে নিষ্কৃতি পেতে হবে। এইজন্য শব্দবাদী সংসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ একমাত্র শব্দকেই আশ্রয় করে কীর্তনোখ্যা ভক্তিরই প্রচার করেন। বিষ্ণুতত্ত্ব কখনই ইন্দ্রিয়ের (কর্ণ ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের) আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত হন না। আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বের আলোচনা করতে যাই, তাতে বিষ্ণুর প্রাকৃতত্বই দর্শন করব। “প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর”—প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ তখন বিষ্ণুতত্ত্বে অযথা আরোপিত হবে। এইজন্য বলছি আমরা বিষ্ণুতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে যতদূর তফাৎ করে রাখতে পারি, ততদূরই মঙ্গল। শাস্ত্রকারগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য এইসমস্ত বিচার করে একমাত্র শ্রবণ-গ্রাহ্য শব্দকেই মূলপ্রমাণ বলে উপদেশ করেছেন। কারণ এতে ঈ ভাগ ইন্দ্রিয়সংস্পর্শ নাই। একমাত্র কর্ণের যা যোগ্যতা, সে-সম্বন্ধে আরও ক্রমশঃ আলোচনা করছি। (ক্রমশঃ)



উপনিষদ্-বাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

২য় প্রশ্ন—ভাগবৎ-ঋষি পিপ্পলাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রাণিগণের শরীর ধারণকারী দেবতা কতজন? তাঁহাদের মধ্যে কে কে ইহাকে প্রকাশ করে এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

পিপ্পলাদ কহিতেছেন—সকলের আধার স্বরূপ আকাশ, তাহা হইতে উৎপন্ন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ; এই পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর উৎপন্ন। সুতরাং ইহারাই শরীরের ধারণকারী দেবতা। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্তা—এই চারি অন্তঃকরণ,—সর্বমোট চতুর্দশ দেবতা শরীরের প্রকাশক। ইহারা শরীরকে ধারণ ও প্রকাশ করে। ইহারা এক সময় পরস্পর ঝগড়া করিতেছিল। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

সকলেই বলিতেছিল—আমি এই শরীরকে আশ্রয় দানপূর্বক ধারণ করিয়া থাকি। তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ সকলকে বলিয়াছিল—তোমরা অজ্ঞান-বশে বিবাদ করিতেছ কেন? তোমাদের মধ্যে কাহারও শক্তি নাই যে, এই শরীরকে ধারণ অথবা রক্ষণ করিতে পারে। আমিই নিজেকে পঞ্চভাগে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) বিভক্ত করিয়া শরীরকে আশ্রয় প্রদান ও ধারণ করি। প্রাণের কথা শুনিয়াও তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তখন প্রাণ নিজ-প্রভাব প্রদর্শনের জন্য শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিবশ হইয়া বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। তখন প্রাণ নিজ যথাস্থানে গিয়া বসিতে অন্য ইন্দ্রিয়সকলও স্থির হইল। মধুমক্ষিকাগণের রাজা যখন নিজস্থান হইতে উড়িয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সকল মধুমক্ষিকাই উড়িয়া যায় এবং রাজা যেস্থানে বসে, তাহারও সেইখানে বসিয়া পড়ে। এই বাকাদি ইন্দ্রিয়গণের ও সেই দশা হইল। অতঃপর অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের ইহা বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রাণই সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এজন্য সকলে প্রসন্ন হইয়া সেই প্রাণের এইরূপে স্তুতি করিতে লাগিল—এই প্রাণই অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া দাহন ও সূর্য্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন। ইনিই মেঘ, ইন্দ্র, ও বায়ু। ইনিই পৃথ্বী ও রয়ি, সৎ ও অসৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা পরমেশ্বর। যেরূপ অরাসকল রথের নাভির আশ্রয়ে থাকে, তদ্রূপ ঋক্, যজুঃ, সামাদি সমস্ত বেদ, তদ্বাদ্য সিদ্ধ যজ্ঞাদি শুভকর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত প্রাণী প্রাণেরই আশ্রয়ে অবস্থিত। অতএব প্রাণই সকলের আশ্রয়। হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভে বিচরণকারী সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ কর। সমস্ত প্রাণী তোমাকেই উপচার দিয়া পূজা করে। তুমি অপানাদির সহিত শরীরে অবস্থিত। তুমি দেবগণের মধ্যে হবি-বহনকারী অগ্নিদেব, পিতৃগণের তুমি স্বধা। তুমি অথর্ব্ব-অঙ্গিরসাদি ঋষিগণের আচরণীয় সত্য। তুমি সর্বপ্রকার তেজঃসম্পন্ন ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র, তুমি সর্বসংহারক রুদ্র, আবার তুমি সকলের রক্ষক। তুমিই অন্তরীক্ষে বিচরণকারী মরুৎ, তুমিই অগ্নি, চন্দ্র, তারা ও সমস্ত জ্যোতিষ্পতি সূর্য্য। তুমি মেঘরূপে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিলে আমাদের জীবন-নির্ব্বাহযোগ্য অন্ন উৎপন্ন হয়—এই আশায় আমরা আনন্দে মগ্ন থাকি। তুমি সংস্কাররহিত হইয়াও সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। কারণ তুমি স্বভাবতঃ শুদ্ধ। তুমি সকলকে পবিত্র করিয়া থাক। আমরা তোমাকে নানাপ্রকার ভোজন-সামগ্রী অর্পণ করিলে তুমি তাহা ভোজন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বের স্বামী ও পিতা। তোমা হইতেই আমাদের জন্ম। হে প্রাণ! তোমার যে স্বরূপ বাকাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত ও ব্যাপ্ত আছে, তাহাকে কল্যাণজনক করিয়া লও অর্থাৎ আমাদের সতর্ক করার জন্য যে শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহাকে শাস্ত কর—শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইও না—এই আমাদের প্রার্থনা। দৃশ্যমান পদার্থ ইহলোকে ও স্বর্গে যাহা কিছু অবস্থিত, সবই প্রাণের অধীন। ইহা বুঝিয়া দেবগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে প্রাণ! যে-প্রকার মাতা পুত্রকে রক্ষা

করে, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর—আমাদিগকে কার্য্য করিবার শক্তি ও জ্ঞান প্রদান কর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত জগতের ধারণ ও পোষণ কর্ত্তা প্রাণরূপী পরমেশ্বর। তাঁহার অভাবে শরীর কার্য্যক্ষম হয় না বা বাঁচিতেও পারে না।

তৃতীয় প্রশ্ন—অতঃপর ‘আশ্বলায়ন মুনি’ জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি যে প্রাণের বর্ণন করিলেন, (১) তাহা কাঁহা হইতে উৎপন্ন? (২) কি প্রকারে তাহা মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করে? (৩) নিজকে বিভক্ত করিয়া তাহা কিরূপে শরীরে অবস্থান করে? (৪) এই বাহ্য জগৎকে তাহা কিরূপে ধারণ করে? (৫) মন, ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক জগৎকে তাহা কিরূপে ধারণ করে? এবং (৬) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যাইবার সময় তাহা কিরূপে পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করে?”

—এই একটি প্রশ্নের মধ্যে ছয়টি প্রশ্ন আছে। এতদ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, একজনের প্রশ্নকালে অন্যান্য সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষি পিপ্লবাদ আশ্বলায়নের বুদ্ধিমত্তা ও তর্কশীলতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তুমি যে ভাবে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাতে বুঝা যায় যে, তুমি শ্রদ্ধালু এবং বেদ-নিষগত। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে,—

—(১) সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। পরমেশ্বরই ইহার উপাদান-কারণ এবং তিনিই ইহার রচয়িতা। অতএব ইহার স্থিতি ও আশ্রয়ও পরমাত্মা। যেরূপ কোন মনুষ্যের ছায়া তাহার অধীন থাকে, প্রাণের অবস্থাও তদ্রূপ।

—(২) মনদ্বারা কৃত-সঙ্কল্প অনুসারে প্রাণ শরীরে প্রবেশ করে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে যেরূপ সঙ্কল্প হয়, তদ্রূপ শরীর-প্রাপ্তি ঘটে, প্রাণও তৎসঙ্গে সেই শরীরে প্রবেশ করে।

—(৩) যে-প্রকার ভূমণ্ডল-চক্রবর্ত্তী সশ্রাট্ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, জনপদাদি অর্পণ করেন এবং তাহাদের কার্য্যও নির্দেশ করিয়া দেন, তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ‘প্রাণ’ও নিজ অঙ্গ-স্বরূপ ‘অপান’ ‘উদান’, ‘ব্যান’ ও ‘সমান’ এই চারি বায়ুকে শরীরের পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করে। ‘প্রাণ’ স্বয়ং মুখ ও নাসিকা-পথে, চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করে। গুহ্য ও উপস্থে ‘অপান’কে স্থাপন করে। তাহার কার্য্য—মলমূত্রকে শরীর হইতে বাহির করা এবং রজঃ, বীর্য্য ও গর্ভকে বহির্গত করাও তাহারই কাজ। শরীরের মধ্যভাগ নাভিতে ‘সমান’কে নিযুক্ত করে। তাহার কার্য্য—প্রাণরূপ অগ্নিতে হৃত অর্থাৎ ভক্ষিত অন্নাদিকে সমস্ত শরীরে যথাযোগ্য পৌছাইয়া দেওয়া। অঙ্গের সারভূত রসদ্বারা সপ্ত অর্কিঃ (দুই নেত্র, দুই কান, দুই নাসিকা এবং মুখ) সমস্ত বিষয়কে প্রকাশ করে। সেই রসে পুষ্ট হইয়া ইহারা আপন আপন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

শরীরের হৃদয়-প্রদেশে জীবাত্তার নিবাস-স্থল। তথায় একশত মূল নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীসকলের প্রত্যেকের এক শত করিয়া শাখা নাড়ী এবং প্রত্যেক শাখা-নাড়ীর

বাহ্যন্তর হাজার (৭২০০) উপশাখা নাড়ী আছে। সর্বমোট সারাশরীরে ৭২ কোটি নাড়ীর অবস্থান। ‘ব্যান’ বায়ু ঐসকলের মধ্যে বিচরণ করে।

ঐ ৭২ কোটি নাড়ী হইতে ভিন্ন একটি নাড়ী আছে, তাহার নাম ‘সুষুন্না’। সে হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া মস্তকে গিয়াছে। তদ্বারা ‘উদান’ বায়ু শরীরের উপরদিকে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, যাহার শুভকর্মের ভোগকাল উদিত হয়, উদান বায়ু তাহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সহ বর্তমান শরীর হইতে বাহির হইয়া পুণ্যলোক স্বর্গাদিতে লইয়া যায় এবং পাপকর্মের মনুষ্যকে শূকর-কুকুরাদি নিকৃষ্ট যোনি এবং রৌরবাদি নরকে লইয়া যায়। আর পাপ-পুণ্যের মিশ্রিত-ফল ভোগের জন্য মনুষ্য শরীরে লইয়া যায়।

—(৪-৫) সূর্য্যই সকলের বাহ্য প্রাণ। এই মুখ্য প্রাণ সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে পুষ্ট করে এবং নেত্র-ইন্দ্রিয়কে দেখিবার শক্তি প্রদান করে। পৃথিবীতে যে-দেবতা ‘অপান’-বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ, তিনি মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ‘অপান’-বায়ুর আশ্রয়দাতা। অপান-বায়ুর কার্য্য গুহ্য ও উপস্থকে সহায়তা করা এবং ইহার বাহ্য স্থূল আকারকে ধারণ করা। পৃথিবী ও স্বর্গলোকের মধ্যস্থানে ‘সমান’ বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ আছে। সে এই শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবকাশ (বিরাম) প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করে এবং শরীরের ভিতরে অবস্থিত সমান-বায়ুকে বিচরণ করিবার জন্য শরীর অভ্যন্তরে অবকাশ দেয়। ইহারই সাহায্যে কণেন্দ্রিয় শব্দ শুনিতে পায়। আকাশে বিচরণকারী প্রত্যক্ষ বায়ুই ‘ব্যান’ বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ। ইহা শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চেষ্টাশীল রাখে ও শান্তি প্রদান করে। আর অভ্যন্তরে ব্যান-বায়ুকে সঞ্চারিত করিতে এবং ত্বক্-ইন্দ্রিয়কে স্পর্শজ্ঞানের সহায়তা করে।

সূর্য্য এবং অগ্নির বাহ্য তেজ অর্থাৎ উষ্ণত্ব—‘উদান’ বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ। ইহা শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঠাণ্ডা হইতে দেয় না এবং ভিতরেও উষ্ণত্ব বজায় রাখে। যাহার শরীর হইতে উদান বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহার শরীর গরম থাকে না এবং শরীরে অবস্থিত জীবাণু মনে বিলীন ইন্দ্রিয়গণ-সহ অন্য শরীরে গমন করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়।

—(৬) মৃত্যুসময়ে জীবাণুর যেরূপ সঙ্কল্প হয়, মন অস্তিম-সময়ে যে-প্রকার ভাবনা করে, সেই সঙ্কল্প-অনুসারে মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মুখ্য-প্রাণে স্থিত হয়। মুখ্যপ্রাণ উদান-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়সহ জীবাণুকে তাহার অস্তিম সংকল্প অনুসারে যথাযোগ্য ভিন্ন লোকে বা যোনিতে লইয়া যায়। গীতার অষ্টম অধ্যায়েও এইপ্রকার কথিত হইয়াছে—

“যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।” (গীঃ ৮।৬)

অতএব মনুষ্যগণের কর্তব্য,—মনকে নিরন্তর ভগবৎচিন্তায় নিযুক্ত রাখা, যাহাতে অন্য সংকল্প না আসিতে পারে। জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। ইহা শরীরের অন্তকাল

উপস্থিত হইতে পারে। যদি সে-সময়ে ভগবৎচিন্তা না করে, তবে অসৎ সঙ্কল্প অনুসারে অসৎগতি প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা। যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রহস্য বুঝিতে পারিয়া প্রাণকে সুরক্ষিত রাখিতে পারেন ও অসৎ যোনিতে গমনের সঙ্কল্প না থাকে, তবে তাহার সন্তান-পরম্পরাও নষ্ট হয় না এবং তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রীতী মহারাজ

দ্বীসঙ্গ ও দ্বীসঙ্গীর সঙ্গ—উভয়ই অনিষ্টকারক ও পরিত্যজ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শিবানন্দ সেন শ্রীবাসাদি

প্রমুখ গৃহী হইলেও দ্বীসঙ্গী বা অসাধু নহেন

কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন,—“শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রীবাস, শিবানন্দ সেনাদি অনেকেই গৃহী ছিলেন, সুতরাং দ্বীলোকের সংশ্রবে তাহাবাও ছিলেন। তবে কি তাহাদের দ্বী-সঙ্গী তথা অসাধু বলিতে হইবে এবং তাহাদের আচরণ কি অনুসরণের যোগ্য নহে?” তাহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমতঃ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ গৃহী হইলেও দ্বীলোকে আসক্ত ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে কিছুতেই দ্বী-সঙ্গী বলা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ভগবৎপরিকর, তাঁহাদের সহধর্মিণী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ভগবৎপরিকর। পরিকরগণের মধ্যে কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ কেহ বা সাধন-সিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে প্রাকৃত জগতের কোন ব্যাপারই নাই। বৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃপাদি গোস্বামিগণও ভগবৎপরিকর, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের দ্বারা সাধক ভক্তের আচরণ জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রমণীসংস্রবে থাকিয়া গোস্বামিপাদগণের কেহই ভজনের আদর্শ দেখাইয়া যান নাই। তৃতীয়তঃ সেন শিবানন্দাদি গৌর-পরিকরগণের মধ্যে যাঁহারা গৃহী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রম মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নরলীলার সহায়তা করিবার জন্য। অনাসক্তভাবে সংসারে দ্বী-পুত্রাদির সঙ্গে থাকিয়াও কিরূপে ভগবদ্ভজন করা যায়, তাহারা তাহার আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা গৃহী সাধকভক্তগণের আদর্শ-স্থানীয়।

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—“শ্রীবাসাদি ভক্তগণ না হয় ভগবৎপরিকর, কিন্তু সাধক ভক্তদের মধ্যে যাহারা গৃহী, দ্বীলোকের সংসর্গে আছেন, তাহারা কি অসাধু বা দ্বী-সঙ্গী?” ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, অনেক সাধক ভক্ত আছেন, যাহারা দ্বীলোকের সংস্রবে থাকিলেও দ্বীলোকে আসক্ত নহেন, পাকাল মাছের ন্যায় তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

অনাসক্তভাবে বিষয়ের মধ্যে আছেন, তাহারা অসাধু বা স্ত্রী-সঙ্গী নহেন। অনাসক্ত-ভাবে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগ করায় ভক্তি অঙ্গের বিঘ্ন হয় না। আবার যাহারা এখনও বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারে নাই, অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ভজানন্দ-সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাহারাও অসাধু নহেন, কারণ তাহাদের ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের কথাই উপলক্ষিত হইতেছে।

অগৃহস্থ মাত্রেই স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ‘প্রেমবিবর্ত’ গ্রন্থে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, “স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সন্তাষণ।” বৈরাগ্যের বেশধারণ করিয়া যোষিৎ বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্যগ্রূপে ভাষণ বা আলাপ-আলোচনা বা মেলামেশার ফলে যে ভীষণ সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাস দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। এইজন্য সাধকের বিশেষ সতর্কতার সহিত স্ত্রীসঙ্গ পিপাসাকে বা উপস্থবেগের প্রকোপকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

“স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ-সংলাপক্ষেলনাদিকম্।

প্রাণিনো মিথুনীভূতান গৃহস্থোহগ্রতস্ত্যজেৎ।।” (ভাঃ ১১।১৭।৩৩)

—“অগৃহস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সর্বপ্রাণে স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, সন্তাষণ ও পরিহাস ত্যাগ করিবেন এমনকি মৈথুনরত প্রাণিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।” ভাঃ ৯।৬।৫১ শ্লোকে সৌভরি ঋষির উক্তি,—“মুমুকু অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-লাভেচ্ছু সাধক মৈথুনধর্মী জীবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।” শ্রীভাগবতে অবধূত-ব্রাহ্মণ রাজর্ষি যদুকে বলিয়াছেন, “অগৃহস্থ কাষ্ঠনির্মিত যুবতী মূর্ত্তিকে পদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। স্পর্শ করিলে হস্তীীর অঙ্গসঙ্গফলে হস্তীর ন্যায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন।”

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী লীলায় প্রাকৃত স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন প্রসঙ্গই কোনপ্রকারে আলোচনা করিতেন না। যেখানে জীবের ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি যোষিদ্ভোগে নিযুক্ত, সেইস্থলে সর্বযোষিৎপতি কৃষ্ণে নিত্য-নির্ব্যলিক সেবাবুদ্ধির অভাব আছে জানিতে হইবে। কেহ যদি গৌরসুন্দরের নিকট স্ত্রী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা করিতে আসিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা নিষেধ করিয়া দিতেন। যাহারা গৌরসুন্দরের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যোষিৎসংক্রান্ত কোন গ্রাম্যকথারই প্রশংসা দেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবন্তু জনোন্মুখস্য

পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরস্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ

হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

—“হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাহাদের ইচ্ছা, এইরূপ ভগবৎ-ভজনোন্মুখ নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু”।

কোন কোন সাধক একদিকে ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতে থাকেন, অপরদিকে ভক্তি-প্রতিকূল ‘অবৈধ যোষিৎসঙ্গ’ অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গাদি অসৎসঙ্গ চালাইতে থাকে এবং মোহবশতঃ নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারে না। আউল বাউল প্রভৃতি অবৈষম্য মাতাজী লইয়া কপট ভেকধারীর বেঘে ঘুরিয়া বেড়ায়। আখড়াধারী বাবাজীগণ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্ত দুইই। সুতরাং তাহাদের দুঃসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যজ্য, নতুবা হরিভজন অসম্ভব।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি—সকলের পক্ষেই

স্ত্রীলোকে ভোগ্যবুদ্ধি দূর করা কর্তব্য

স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গি-ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই ব্যবহার কর্তব্য। সকলেরই গ্রাম্যকথা (কামিনী-গাথা) বর্জ্য কর্তব্য, কেননা, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে। নারী—সাক্ষাৎ অগ্নি এবং পুরুষ-ঘৃতকুণ্ড তুল্য, অতএব নির্জনে স্থায় ঔরসজাত কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান চেষ্টা পরিত্যাগ কর্তব্য—ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জন-তোষণী ১০ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমেই সাধু চরিত হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিন্তামের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।” অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূর্বক সৎসঙ্গে নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করিবেন। যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ যেরূপ অতিনিন্দনীয় কথিত হইয়াছে, তদ্রূপই ভগবৎসঙ্গ হইতেও ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ অতিবন্দনীয়, অতিপ্রশংসনীয় ও অতিপ্রার্থনীয় বৃষ্টিতে হইবে।

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

“উত্তম-শ্রেয়ো জিঞ্জাসু না হইলে ভগবদ্ভেদাশ্রিত ভেদগুরুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-দর্শনের ‘কৃতিরত্ন’ত্ব লাভ হয় না।”—শ্রীল প্রভুপাদ

‘ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?’

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭২ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

‘ভজ’ ধাতু হ’তে ‘ভক্তি’ শব্দ সাধিত হয়। ‘গরুড় পুরাণে’ লিখিত “ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়ং পরিকীৰ্তিত.....ভক্তি-সাধনে ভূয়সী”—শ্লোকানুসারে কৃষ্ণ-সেবাকেই ‘ভক্তি’ বলা হয়েছে। অনুকূল ভাবে সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেব্য-সেবক ভাবই নিত্য। ‘কেবল ভক্তি’ শব্দের একমাত্র ভগবান্ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই চরম বিশ্রাম। শুদ্ধবৈষ্ণবের দর্শন, তাঁর সহিত ভগবৎসম্বন্ধীয় কথার আলোচনা ও তাঁর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ—ইত্যাদি ভক্তি বা সেবার অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। সেবার অঙ্গ বা উপায় অবলম্বনে জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। শরীর, মন, বাক্য, ধন, প্রাণ, বিবিধ দ্রব্যাদি দিয়া ও হৃদয় দিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা সাদরে ও সানন্দে করতে হয়। যিনি যত সেবা করেন, সেব্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবও তাঁকে তত ভালবাসেন, কৃপা করেন ও সুখী করেন। পরম বিষ্ণুভক্ত পৃথু মহারাজের দর্শনে, তাঁর সহিত বাক্যলাপে ও তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে পঁচটা প্রেতের প্রেতত্ব হতে উদ্ধার প্রাপ্তি হয়। একদা পৃথু মহারাজ তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে একাকী জনবসতি-শূন্য বালুকাময় স্থান ও কাঁটা গাছের ঝোপ-ঝাড় মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ দেখলেন সেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কারা যেন নড়া-চড়া করছে ও ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। পৃথু মহারাজ তাদের সন্নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—“তোমরা কে? এই গভীর জঙ্গলে তোমরা কি করছ?” প্রেতগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে বলল—“আমরা পাঁচজনই প্রেত জন্ম পেয়েছি।” প্রথম জন বলল,—“আমার নাম ‘পর্য্যুসিত প্রেত’। আমি যখন মানুষ ছিলাম, তখন আমার গৃহে সাধু-বৈষ্ণবগণ এলে ভাল ভাল খাদ্য তাদের না দিয়ে বাসি-পচা অপবিত্র খাবার দিয়ে তাদের বিদায় দিতাম। ইহাতে সেব্য বৈষ্ণবের সুখবিধানের পরিবর্তে অন্যায় আচরণ ও অবমাননা হওয়ায় সেই পাপে আমি ‘পর্য্যুসিত’ নামে প্রেত হয়েছি।”

দ্বিতীয় জন বলল,—“আমার নাম ‘সূচীমুখ’। আমি মানুষ থাকা-কালে আমার গৃহে সাধু-বৈষ্ণব এলে আমি খুব রেগে গিয়ে, মুখ বিকৃত করে বৈষ্ণবের সমাদর না করে তিরস্কার করতাম। সেই পাপে আমি ‘সূচীমুখ’ নামে প্রেত জন্ম পেয়েছি।” তৃতীয় জন বলল,—“আমার নাম ‘শীঘ্রক’। আমার মানুষ-জন্মে আমার গৃহে বৈষ্ণবগণ এলে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হৃদয়ে ছুটে গিয়ে গৃহের দরজা বন্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দিতাম। সেই পাপের ফলে আমি ‘শীঘ্রক’ নামে প্রেত হয়েছি।”

চতুর্থ জন বলল,—“আমি শুদ্ধ বৈষ্ণব ও সদ্রাস্রাঙ্গের চলাফেরা, সদৃগ্ণাবলী দেখে তা’ সহ্য করতে না পেরে খুব হিংসা করতাম। আমার মনুষ্য-জন্মের সেই পাপে আমি ‘রোধক’ নামে প্রেত হয়েছি।” পঞ্চম প্রেত বলল,—“আমার নাম ‘লেখক’

প্রেত। আমি গৃহের মধ্যে লেখাপড়া ও নানা কার্যের হিসাব-নিকাশ নিয়ে সর্বদা এত ব্যস্ত থাকতাম যে, কোন বৈষ্ণব এলে তাঁকে সমাদর ও সম্মান না করে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলতাম,—‘কে তুমি? এখন অন্যত্র যাও।’—এইরূপ বলে অবজ্ঞা করে সেই বৈষ্ণবকে গৃহ হ'তে দূর করে দিয়ে পুনরায় নিজ কার্যে মনঃনিবেশ করতাম। সেই বৈষ্ণব, অপমানিত হয়ে দুঃখের সহিত চলে যেত। মনুষ্য-জন্মে আমার এবস্থিধ দুর্ব্যবহার নিমিত্ত আমাকে মনুষ্য জন্ম হারিয়ে ‘লেখক’ নামে প্রেত হ'তে হয়েছে।”

পৃথু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন,—“তোমাদের কোথায় গমনাগমন হয় ও তোমরা প্রেত-জন্মে কি খাও?” তাদের মধ্যে একজন বলল,—যে গৃহে অনাচার ও অপবিত্রতা বিদ্যমান এবং যেখানে সাধু-বৈষ্ণব-সেবা, একাদশী ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সকল গৃহেই আমরা প্রেতগণ যাই ও থাকি। আর আমাদের খাদ্য—মল-মূত্র, নর্দমার দুর্গন্ধময় পদার্থ ইত্যাদি। বিষু ও বিষুভক্তের দ্রব্য হরণকারীর ও প্রেত-যোনি হয়। অনন্তর প্রেতগণ পৃথু মহারাজের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি ও সুখী হ'ল। প্রেতগণ পৃথু মহারাজের নিকট হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার মহাত্ম্য শ্রবণ করে এবং তাহাতে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার জন্য প্রেত-যোনি প্রাপ্তির কারণ অবগত হয়ে তাদের প্রেত-যোনি প্রাপ্তির কারণ অবগত হয়ে তাদের কৃতকার্যের জন্য অনুতাপ করতে লাগল। রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাদের প্রেত-যোনি হ'তে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাল। ভক্তরাজ পৃথু তাদের অনুশোচনা দেখে প্রীত হ'য়ে তাদের উদ্ধারার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন। সহসা দেববাণী শোনা গেল,—‘পরম বিষুভক্তের দর্শন, প্রণাম, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁর কথা শ্রবণ, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর প্রেমের উত্তর দান—প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ পালনে প্রেতগণের বৈষ্ণব-সেবন-প্রবৃত্তির উদয় হওয়ার তারা সকলেই দিব্যালোক প্রাপ্ত হবে।’ প্রেতগণের তাহাই হ'ল।

(৪)

এক পৌরাণিক আখ্যান এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করছি। কোন এক বেদবিদ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রেতলোকের উদ্দেশ্যে তৈরী অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য নিজে ও অনেক ব্রাহ্মণকে ভোজন করান। কিছুকাল পরে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁর সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ পরলোক গমন করলেন। তখন ধর্মরাজের বিচারে তাদের সকলের প্রেত-জন্ম পেতে হ'ল। ইহাতে বেদবিদ ব্রাহ্মণটি ধর্মরাজকে ইহার কারণ কি ও প্রেত-জন্ম হ'তে কিভাবে উদ্ধার হ'বে—তাঁহা জিজ্ঞাসা করল। ধর্মরাজ বললেন,—“তোমরা মেরুপ্রদেশে বাস করবে। কোন সময় পরম বৈষ্ণব একজন ঐ মেরুপ্রদেশে গমন করিলে ও তিনি তৃষ্ণার্ঘ ও ক্ষুধার্ঘ হ'য়ে তোমাদের নিকটে গেলে তোমরা যদি তার সেবা-শুশ্রূষা কর, তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রেত-যোনি হ'তে মুক্তির জন্য আশীর্বাদ করলে তোমরা প্রেত হ'তে মুক্তি পাবে।” অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তৎ-সঙ্গীগণ কয়েকবৎসর প্রেত হ'য়ে মেরু অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে একদিন অকস্মাৎ জনৈক

পরম বৈষ্ণব তাদের সমীপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হ'য়ে উপস্থিত হ'ল। তখন সেই ব্রাহ্মণ তা দেখে তাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষরূপ ধরল, আবার কেহ বা নরবেশ ধারণ করল। সেই বেদবিদ ব্রাহ্মণটি একজন ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেই বৈষ্ণবের জন্য ঠাণ্ডা পানীয় জল ও কিছু ফল-মূলাদি সংগ্রহ করে বৈষ্ণবকে তাহা আহার করার জন্য অনুরোধ করে অর্পণ করল। বৈষ্ণব তাতে তুষ্ট হ'য়ে সেই ফল-মূল শ্রীভগবানের ভোগের জন্য তৈরী করে ভগবানকে স্মরণপূর্বক পূজা করতঃ শ্রীহরির ভোগের পর সেই প্রসাদ নিজে গ্রহণ করলেন ও অবশেষ প্রসাদ প্রেতগণকে গ্রহণার্থ বললেন। ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গীগণের সহিত অতি যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে সেই অবশেষ প্রসাদের ঘ্রাণমাত্র গ্রহণেই দিব্য দেবতনু লাভ করলেন ও সকলেই তখন বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাদের পূর্ব বৃত্তান্ত জানালেন ও বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা স্মরণ করে নিজেদের ধন্য মনে করলেন। জীবের দেহে আত্ম-বুদ্ধি হ'তেই বিষয়-বাসনার উদয় হয়। বিষয় বাসনা হতে শুভাশুভ কর্ম করে ; তা'হতে পুণ্য ও পাপ হয়। পুণ্যের ফলে স্বর্গভোগ ও পাপের ফলে নরকভোগ হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায় কামাদি দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্বক শুদ্ধভক্তি লাভ হয়,—যেমন ধ্রুবাদি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কৃষ্ণ-কৃপা বৈষ্ণব-কৃপানুগামীনী। অতএব, বৈষ্ণবের কৃপাতেই নিষ্কাম হ'য়ে ভগবানের সেবা লাভ হয়। এই আখ্যান হ'তে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ একবার মাত্র সেবন বা ঘ্রাণ মাত্র গ্রহণের ফলেই সমস্ত পাপ দূরীভূত ও চিত্ত মার্জিত হয়ে হৃদয়ে ভক্তি প্রকাশিত হয়। মহাপাতকীও বৈষ্ণবের চরণোদক পান ও উচ্ছিষ্ট আহার করলে বৈষ্ণব-কৃপাতেই অবশ্যই যমদূতগণের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ পায়। প্রসঙ্গতঃ শ্রীনারদমুনির পূর্ব জন্মের দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায়, তিনি জনৈক দাসী পুত্র হ'য়েও বৈষ্ণব-সঙ্গ-প্রভাবে, বৈষ্ণব-সেবা ফলে ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন-ফলে পরবর্তী জীবনে ভগবৎ পার্শ্ব হয়েছিলেন।—

“ভক্তপদ ধূলি আর ভক্ত-পদ জল।

ভক্ত-ভুক্ত শেষ—এই তিন সাধনের বল।।—(চৈঃ চঃ)

(৫)

বেনাপোলের দেশাধ্যক্ষ তথা জমিদার রামচন্দ্রখাঁন বৈষ্ণবাপরাধের ফলে বৈষ্ণবদেবী পাষণ্ডি-প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম-প্রচারার্থ ও পাষণ্ডদের দলনের জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করতে করতে অবধূত-বেশে রামচন্দ্র খাঁনের দুর্গামণ্ডপে প্রবেশ করতঃ একদা তথায় উবেশন করে সমবেত সকলের সমক্ষে হরি-কথা বলতে আরম্ভ করলেন। রামচন্দ্র খাঁন তাহা অবগত হয়ে স্বয়ং নিত্যানন্দ-চরণ-তলে উপনীত না হ'য়ে তার সেবক-দ্বারা প্রভু নিত্যানন্দকে জানা'ল—“এই দুর্গামণ্ডপ আপনার থাকার যোগ্য নয়। আপনাকে গৃহস্থের গৃহে বাসস্থান দিবার জন্য খাঁনের নির্দেশ। গোয়ালারা গোশালা অত্যন্ত বিবৃত্ত পরিসর, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

সেখানে আপনার নিজের ও আপনার সঙ্গীগণের ও বহু আগত লোকের স্থান, সঙ্কুলান হবে। সুতরাং আপনাকে সেই গোশালার মধ্যে বাসা-স্থান দেওয়াই সমীচীন।” এই কথা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত ক্রোধে সেই দুর্গামণ্ডপ হ’তে বাহির হ’য়ে অটু অটু হাস্য করে বল্লেন—

“সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।

শ্লেচ্ছ গো বধ করে, তার যোগ্য হয়।।

এত কহি, ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।

তারে দণ্ডদিতে সে-গ্রামে না রহিলা।।”

(চৈঃ চঃ অন্ত ৩।১৫৪-১৫৫)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বেচ্ছায় খাঁনের গৃহে তথা দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হ’লেও খাঁন ব্রহ্ম-শিবাদির আরাধ্য সেই নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা-যত্ন করতে উদ্যোগী না হ’য়ে বরং তাঁকে গৃহ হ’তে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে গোশালায় অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। কেবল তাই নয়, নিত্যানন্দপ্রভু দুর্গা-মন্দিরে যেখানে বসেছিলেন, সেই স্থান গো-ময় জলে খাঁন লেপন করল। ইহাতে রামচন্দ্র খাঁন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে অসুরে পরিণত হ’ল। রাজাকে কর বা খাজনা না দিয়ে দস্যু-বৃত্তি করতে লাগল। শ্লেচ্ছ উজির রামচন্দ্রের গৃহে এসে দুর্গা-মন্দিরে গো-বধ করে মাংস রান্না করে ভোজন করল ও তিন দিন সেখানে অবস্থান করে খাঁনের স্ত্রী-পুত্র সহ খাঁনকে বেঁধে রাজ-দরবারে নিয়ে গেল ও ধন-সম্পত্তি লুট করল। এমন কি খাঁনের পাপের ফলে উজির সেই গ্রামবাসীদেরও গৃহের ধনাদি লুট করে নিয়ে গেল।

“জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল।

বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল।।

মহাস্তরের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।

এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়।।”

(চৈঃ চঃ অন্ত ৩।১৬২-১৬৩)

অদোষদর্শী পরম করুণাময় বৈষ্ণবগণ আমাদের গৃহে উপস্থিত হ’লেও আমরা তাঁদের যথোচিত সম্মান ও সমাদর না করায় আমরা মহাপাতকগ্রস্থ হ’য়ে বহু দুর্গতি ভোগ করতে বাধ্য হই। অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত থাকলেও প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে তাহা বিবৃত করা সম্ভব হ’ল না।

বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা-দ্বারা এবং মনোভীষ্ট পূরণ দ্বারা সেবা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই না অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব চোখের সম্মুখে নাই— তবুও প্রসঙ্গ নিয়ে সানন্দে কাল অতিবাহিত করতে পারি। ভগবান্ বলেছেন—“সভা জয়তে মম পৌরুষম্”— যে সভায় আমার পৌরুষের কথা বা আমার যশের কথা আলোচিত হয়, সেই সভাই জয়যুক্ত হয়। বৈষ্ণবের গুণগান করলেও প্রসঙ্গ হয়; “বৈষ্ণবের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ”—ইহা মহাজন-বাণী। প্রিয়ত্ব ধর্মের চর্চা করা হয় হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা-দ্বারা। বৈষ্ণবের সেবা অর্থে আমাদের সকলকে হয় প্রসঙ্গ, না হয় পরিচর্যারূপা সেবা অথবা মনোভীষ্ট পূরণে তৎপরতা। “প্রিয়স্য সেবা সুখরূপৈব”—প্রিয়ের সেবা সুখরূপ। হরি-গুরু-বৈষ্ণবই আমাদের একমাত্র পরম প্রিয়; তাঁদের সেবাদ্বারা প্রীত করতে পারলে পরাশান্তি বা নিত্যশান্তি ও নিত্যানন্দ লাভ হয়। শুদ্ধবৈষ্ণব তথা মহাভাগবতের সঙ্গ কি করে হবে? আমাদের চিত্তবৃত্তি শুদ্ধবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সহিত একই পর্যায়ভুক্ত হ’লে আমরা তার পদানুগ হ’য়ে তাঁর পথে চলতে শিখব ও তখনই তাঁর সঙ্গ হবে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসঙ্গরূপা বাণীর দ্বারাও তাঁর সঙ্গ হয়। “শ্রুতক্ষিত পথো”—প্রথমতঃ সদ্গুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা কর্ণদ্বারা শ্রবণ এবং দ্বিতীয়তঃ তৎপরে হৃদয়-কমলে শ্রীহরি সাক্ষাৎ নিত্য স্ব-স্বরূপে অনুগ্রহ করার জন্য প্রকটিত হন। ভগবান্ শব্দ-মূর্তির দ্বারা প্রকাশিত হন,—ইহাই শ্রীত-পস্থা। “ভক্তিয়োগ পরিভাবিত”—ভক্তিয়োগের দ্বারাই তিনি সর্বতোভাবে ভাবিত অর্থাৎ প্রকটীকৃত হ’য়ে থাকেন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা তাঁর পূর্ণতম স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। যেখানে ইষ্টের সুখচিন্তা নাই, শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ-সুখ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রার্থনা, সেখানে ভক্তি হয় না—তাহা ক্রিয়া মাত্র। ভগবানকেও চাই, আবার নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও চাই—ইহা শুদ্ধভক্তি মার্গ নয়। ভক্তি-সাধকের বিচার—‘তিনিই আমার একমাত্র রক্ষক ও পালক ; সর্বদা তাঁর স্মৃতি ও তাঁর সেবা থেকে যেন বঞ্চিত না হই। ভক্তি ‘উর্জ্জ্বিতা’ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধা বা কেবলা না হ’লে ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। আবার মহাভাগবতের কৃপা ব্যতীত সেই ভক্তিও লাভ হয় না।

এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এক বানী এস্থলে উল্লেখ করছি ;—“পাপিষ্ঠ লোক কৃষ্ণপূজা করে না ; স্বল্প বিচারপর লোক কৃষ্ণপূজা করে থাকেন, আর বুদ্ধিমান লোক কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করে সত্যি সত্যি কৃষ্ণপূজা করেন। কৃষ্ণপূজা করে ‘কনিষ্ঠাধিকারী’, কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করেন—‘মধ্যম অধিকারী’ ও ‘উত্তম ভাগবত’। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এটা বুঝতে পারে না, তারা মনে করে, যে কৃষ্ণের পূজা করে, সেই বুঝি খুব বড় ; এই মনে করে তারা নিজেকে ‘বৈষ্ণব অভিমান করে অপরের পূজা নেয়, নিজে বৈষ্ণবের পূজা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীগোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যারা, তারা জানেন,—কৃষ্ণের ভক্তের পূজাই, প্রকৃত ‘কৃষ্ণ-পূজা’। কৃষ্ণ-ভক্তের পূজা ছেড়ে কৃষ্ণ-পূজার ছলনার কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণপূজাকারী বা নাম ভজনকারীর প্রতি পদে পদে অপরাধ সম্ভব। নামভজনকারীর ‘সাধুনিন্দা’ অপরাধ হ’তে পারে, অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের সেবা হ’ল না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীরই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা ও ‘নাম’ হয়। ঠাকুর মহাশয় কত ভাবে এসব কথা বলেছেন—গোস্বামিগণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

কতভাবে এসব কথা জানিয়েছেন—‘ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা’।
 *** কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে ব্রজবাস প্রভৃতির ছলনা— দেহটা নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকে
 ভোগ করবার চেষ্টা। * * তারা ইন্দ্রিয়তর্পণের খাতিরে গুরুবৈষ্ণবের কোন কথা
 বুঝতে না পেরে কেবল তাঁদের চরণে অপরাধই করছে। কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীর
 প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামীগণের কৃপা হয়।”

বৈষ্ণব চেনা খুবই দুরূহ ও সাধারণের চিন্তাতীত। যে ‘বৈষ্ণব চিনিতে নারে
 দেবের শক্তি’—সেই বৈষ্ণবকে চিনে তাঁর সঙ্গ ও সেবা করা এবং তাঁর শ্রীমুখে
 ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ করা কি সম্ভব? তথাপি আমাদের সাধু-সঙ্গ, সাধু-সেবা ও সাধুর
 নিকট ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ একান্ত প্রয়োজন বিধায় মোটামুটিভাবে কিরূপ সাধু-বৈষ্ণবকে
 সমাদর, প্রণাম, পরিপ্রণ ও সেবা করব, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি—

(১) সাধুবৈষ্ণব তিনিই—যিনি অনন্যাশ্রয় কৃষ্ণভজনকারী। (২) অনন্যসঙ্গ
 বৈষ্ণব অর্থাৎ যিনি একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত অন্যের আশ্রয় করেন না। (৩) যিনি
 কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কথা চর্চা করেন না ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিপুণ। (৪) যিনি অন্য
 সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল শ্রীহরি-ভক্তের সঙ্গ করেন। (৫) যিনি মহাজনের সেবায়
 নিরত থাকেন ও মহাজনের অনুগত হয়ে চলে। (৬) একমাত্র হরিনামেই সর্বসিদ্ধি—
 এই কথায় যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। (৭) যাঁর প্রাকৃত অভিমান ও প্রাকৃত সম্মান
 নাই। (৮) যিনি সর্বদা ‘সুনীচ’ হয়ে গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কখনও দম্ভপ্রকাশ করেন
 না। (৯) যিনি ‘সহিষ্ণু’ হয়েও গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার দেখে অসহিষ্ণু হ’ন।
 (১০) যিনি ‘অমানী’ হ’য়ে নিজেকে সর্বদা মনে প্রাণে গুরু-বৈষ্ণবের কিস্কর জ্ঞান
 করেন। (১১) যিনি ‘মানদ’ হয়ে নিজের যাবতীয় যোগ্যতার কৃতিত্ব গুরু-বৈষ্ণবে
 আরোপ করেন। (১২) যাঁর কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুতে আদর ও দৈন্যভাবে গুরু-বৈষ্ণব
 সেবায় অতৃপ্তভাব বিদ্যমান। (১৩) যিনি গুরু-বৈষ্ণব সেবায় ‘উপায়-বুদ্ধি’ ত্যাগ
 করে ‘উপেয় বুদ্ধি’ করেন।

—ঃঃঃ—

তুলসীদাসের বৈরাগ্য

তুলসীদাস ছিল তরুণ যখন, তরুণী পত্নী তার,
 মুহূর্ত তুলসী সহিতে নারিত, পত্নী বিরহ ভার।
 তুলসীর নারী চলে শিবিকায়, যাইবে পিতার ঘর,
 নারী পানে চাহি’ ছুটিয়া চলিলা, তুলসী-নারীর বর।
 ‘ছি ছি কি লজ্জা!’ কহিলা সুন্দরী—‘চলে যাও ঘরে ফিরে,
 অথবা মোরে আদেশ করহ আমি ফিরে যাই ঘরে।’
 কহিলা তুলসী—‘তোমার বিরহ সহিতে নারি যে আমি,’
 ‘কি লাভ হইবে’ কহিলা সুন্দরী—‘নারীতে হইলে কামী।’

শ্রীরামে অর্পণ কর যদি রতি মোর প্রতি রতি যত,
 জীবন মরণের দুঃখ-কলুষ চিরতরে হবে হত।’
 পত্নীর কথায় তুলসী দাসের চমক জাগিল চিতে,
 বিরাগী হইয়া ছুটিল রামের চরণে শরণ নিতে।
 সম্যাসী বেশে ভ্রমি’ তীর্থ বহু ফিরিল আপন দেশে,
 পত্নীর পাশে প্রকট হইল জটার জটিল কেশে।
 কোন এক বাড়ীতে রসুই করিতে মসলা যোগায় নারী,
 ‘কি-বা লাগে তব’ কহে নারী—‘এনে দেই তাড়াতাড়ি।’
 হলুদ, লঙ্কা, আদা, মরিচাদি যাহা আনি দিতে চায়,
 সম্যাসী বলে—‘হইবে না দিতে, আছে মো’র থলিয়ায়।’
 ‘এত অনুরক্তি মসলায় যদি, আমারে ত্যজিলা কেনে,
 গৃহেতে রহিয়া সেবা লও মোর, কি কাজ যাইয়া বনে।’
 চিনিলা তুলসী পত্নীরে তার, অন্তরে পাইল লাজ,
 পত্নী-উপদেশ শুনিয়া বুঝিলা, বোলায় নাহিক কাজ।
 সকল ত্যজিয়া তুলসী দাসজী, ছুটিলা অযোধ্যা পানে।
 সফল হইল জীবন তাঁহার শ্রীরামের দরশনে।

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, কবিত্বষণ

হারাধন কবে হারা ধন পাবে

“আমার হরিভজন হল না। জীবন আমার সতিই বৃথাই চলে গেল। কত কিছু করলাম, কই অনর্থ ত’ গেল না। আসলে আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবগণের কোন কৃপাই নাই”—হারাধন-বাবুর আক্ষেপের আর শেষ নাই। যতদূর জানি, তিনি বিষয়কার্য্যে বিশেষ পটু। তাঁকে এইরকম বহু দুঃখ প্রকাশ করতে অনেকেই দেখেন। অবশ্য প্রথমবারের অভিজ্ঞতায় তাঁর এই আক্ষেপ দেখে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য বলেই মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। হরিভজনের আগ্রহ তাঁর নেই বললেই চলে। অথচ মুখে এইপ্রকার দৈন্যপ্রকাশে তাঁর একটুও কার্পণ্য নাই।

“হারাধন বাবু, আপনি খুব করে হরিনাম করুন। শ্রীনামের কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়। আর প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণবগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করতে থাকুন। তাহলেই দেখবেন, হরিভজনের প্রতি বিরাগভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে।” হারাধন বাবু দমে যাবার পাত্র নন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “কি বলেন, নাম ত’ সবসময় করছি, কিন্তু হচ্ছে কই?” উত্তর তাঁর মুখে প্রস্তুত হয়ে আছে—ভেবে চিন্তে এইসব উত্তর দেন বলে মনে হয় না। শেষে “আমার দ্বারা মনে হয় হরিভজন হবে না”—এক বুক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন তিনি বাঁচলেন।

বৈষম্যবোধিত দৈন্য আর হারাধন বাবুর আক্ষেপ বাহ্যে অনেক সময় একইপ্রকার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উভয়ের আন্তরিক নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শুদ্ধবৈষম্যবোধিত দৈন্যে যে আর্তি ও অনুশোচনা, সেখানে “কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার”, “কবে হবে বল সেইদিন আমার”—এইপ্রকার উৎকণ্ঠায় সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যই তখন অন্ধের যষ্টির মত একমাত্র অবলম্বন হয়। সেই দৈন্যেও হতাশার উদয় হয়—কিন্তু তা কখনই হরিভজনের অন্তরায় হয় না—বরং তাতে ভগবানের প্রতি শরণাগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তনে দেখা যায়।—

“অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার।

হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি, বড় দুঃখে ডাকি বার বার।।”

অতএব হারাধন বাবুর সেইসব আক্ষেপ কিছুমাত্র ‘দৈন্য’ নয়। এইটা আসলে একটা রোগ। কিছু রোগী আছে—যারা সত্যি রোগমুক্ত হতে চান। তাঁদের রোগ-নিরাময়ের বিধি-ব্যবস্থা দিলে, তাঁরা সেটা পালন করেন—ফলে যথাসময়ে তাঁরা নীরোগ হন। আর এক শ্রেণীর রোগী—যাঁদের রোগ-মুক্তির জন্য চেষ্টাই দেখা যায় না। এদের জন্য কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয় না। হারাধন বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগী। আমরা সকলেই তো ভবরোগের রোগী। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর রোগী হলে রোগমুক্ত হবার উপায় থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর হলে—সর্বনাশ। “আমার দ্বারা আর হরিভজন হবে না”—এইসব ভাবনাকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তির সাথেই মাত্র তুলনা করা চলে। আত্মহত্যার কুচিন্তা যাঁর মনে প্রবেশ করে, সেই কুচিন্তাই নাকি শেষে তাকে একপ্রকার বলপূর্ব্বক আত্মহত্যায় বাধ্য করে। ঠিক তেমনি, ঐপ্রকার ভাবনাও জীবকে আত্মহননের পথেই প্ররোচিত করে। ভগবানের প্রতি বিমুখ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যা।

হরিভজনের প্রতি আলস্য ভবরোগীর একটা বিশেষ লক্ষণ। আর অলসতা হেন সম্পদ থাকতে জগতে নাকি অসুবিধার কোনদিন অভাবই হয় না। হারাধন-বাবু সেই অসুবিধার মধ্যেই সবসময় হাবুডুবু খাচ্ছেন—কিন্তু তাঁর এই অলসতার মূল ব্যারামটাকে তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার মহিমা তিনি এমনভাবে বুঝেছেন যে, নিজের থেকে আর কোন চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাই মনে করতে চান না। তিনি ভাবেন, “হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হলেই হরিভজন হবে। তাঁদের কৃপা না হলে আর কি হরিভজন সম্ভব? হরিভজন কি চাট্টিখানি কথা? আমার যখন হরিভজন হচ্ছে না, তখন আমার উপর নিশ্চয়ই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা নাই। যখন কৃপা হবে, তখন নিজের থেকেই হরিভজন হবে।” এই শ্রেণীর লোক হামেশা গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার উপর যে নির্ভরতা দেখান, সেটা কেবল মুখে—কিছুমাত্র আন্তরিক নয়। অন্যান্য সমস্ত বিষয়কার্যে তাঁদের ইচ্ছার অভাব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

নাই—কেবল হরিভজনের উপদেশ করলেই “ঠাকুর যখন করান, তখনই করব—এইসব কি আর নিজের ইচ্ছায় হয়?”

গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় নির্ভরতা না থাকলে হরিভজন হবেই না। কিন্তু সেই নির্ভরতা আন্তরিক হওয়া চাই। সেই আন্তরিকতা থাকলে গুরুবৈষ্ণবগণের প্রত্যেকটি উপদেশকেই সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপা বলে অনুভব হয়। তখন সেই উপদেশই হয়ে উঠে তাঁর একমাত্র অবলম্বন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যাপারটাই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—যেমন কোন এক ব্যক্তির গরুর দুধের প্রতিভীষণ লোভ। তিনি সেইজন্য তাঁর একজন প্রকৃত বন্ধুর কাছে শরণাপন্ন হলেন। বন্ধু তাঁকে গরু কিনবার পরামর্শ দিলেন এবং কিভাবে তা পালন করতে হয় ইত্যাদিও সব বুঝিয়ে দিলেন। সেই উপদেশ-অনুসারে ঐব্যক্তি গো-পালন করতে লাগলেন—তাতে তা’র অভীষ্টসিদ্ধি হতে লাগল। ঠিক তেমনি, গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-অবলম্বনেই ‘পরমার্থ’ অর্থাৎ ‘পরম-প্রয়োজন’ সিদ্ধ হয়—এছাড়া আর কোন উপায়ই নেই।

কিন্তু হারাধনবাবু গুরুবৈষ্ণবগণের সেইসব উপদেশ শুনে অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বলেন,—“আমরা কি আর তা এত করতে পারি? আমরা সংসারী জীব।” “কেন, তুমি পারবে না?”—বলে গুরুবৈষ্ণবগণ যখন তাঁর সামনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁর মধ্যে হরিভজনের উৎসাহ জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন, তখন,—“কি যে বলেন, তাঁদের সাথে কি আর আমাদের তুলনা—কোথায় তাঁরা, আর কোথায় আমরা এই ক্ষুদ্র কীট”—ইত্যাদি কত দৈন্যের ফুলঝুরি! শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত দৈন্যে ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হয়—কিন্তু হারাধন বাবুর এইপ্রকার সৰুপট দৈন্যে ভগবানও তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। সেস্থলে আর ভগবৎকৃপা-লাভের সম্ভাবনা!

যিনি সত্যিই নিদ্রিত থাকেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করা অসম্ভব কিছু নয়। নিদ্রা যদি সুগভীর হয়, তবে সেই নিদ্রাভঙ্গ করতে অধিক সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হলেও অসাধ্য নয়। কুন্তকর্ণের নিদ্রা অকালে ভঙ্গ করতে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল—তথাপি অসম্ভব হয়নি। কিন্তু যিনি ‘আমি নিদ্রিতই থাকব, কিছুতেই উঠব না’—এইরকম দৃঢ় সংকল্প করে রেখেছেন, তার নিদ্রাভঙ্গ কার্যতঃই অসম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে প্রহারই তাঁর জন্য একমাত্র ঔষধ-রূপে নিদ্রারূপে হয়। ঠিক তেমনি, দৈন্যের আড়ালে যারা প্রচুর কপটতাকেই মাত্র আশ্রয় করে হরিভজনের প্রতি আলস্যকেই প্রশ্রয় দেন, তাদের জন্য মায়াদেবীর প্রচুর লাঠৌষধেরই ব্যবস্থা-প্রদান ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে?

জীব—অচেতন জড়পদার্থ কিছু নয়। তা’র চেতনতায় স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম অবশ্যই বর্তমান। সেই ধর্মবশে সে কিছু করবার বা কিছু না করবার সিদ্ধান্ত করে থাকে। সুতরাং হরিভজন-বিষয়ে সঠিক উদ্যোগ না গ্রহণ করা—প্রকৃতপক্ষে জীবের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তই বলতে হবে। কারণ, অন্য ক্ষেত্রে ত’ তার কোনপ্রকার যত্নের ত্রুটি দেখা যায় না। যদি

কেহ বলেন, অমুক স্থানে গেলে এখনই লক্ষমুদ্রা পাওয়া যাবে এবং সুনিশ্চিতভাবে তা পাওয়া যাবে, তখন ‘আমার দ্বারা তা হবে না’—এইরকম অলসতার প্রশ্ন না দিয়ে বরং সেই প্রয়োজন-লাভের জন্য কিপ্রকার তৎপরতাই না দেখা যায়! হরি-ভজনের ক্ষেত্রে তাইহলে অপারগতা কেন?

ভগবান্ জীবকে যে-স্বতন্ত্রতা দান করেছেন, সেটা আসলে মহারত্ন-স্বরূপ। সেই মহারত্নের সদব্যবহার না করে জীব নিজেই অশেষ দুঃখের আবাহন করে থাকে—এতে ভগবানের কোন দায়বদ্ধতা নেই। যেমন, পিতার কাছ থেকে সন্তান উত্তরাধিকার-সূত্রে যে-সম্পত্তি লাভ করেন, তার যদি সঠিক ব্যবহার না হয়—তবে তা’র দায় সেই সন্তানেরই, পিতার নয়। সন্তান যদি বুদ্ধিমান হন, তবে তিনি পিতারই শরণ গ্রহণ করেন—এবং পিতার উপদেশমতই রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই সম্পত্তির বুদ্ধিসাধন করেন। সেইপ্রকার, ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’ আমরা ভগবানের কাছ থেকে যে স্বতন্ত্রতা-রূপ মহাধন পেয়েছি, সেই মহাধন ভগবানের শ্রীচরণেই সমর্পণ করে তাঁর উপদেশকে অবলম্বন করলে তবেই সেই স্বতন্ত্রতার সদব্যবহার হয়। তা না করলে, ভগবানের প্রদত্ত সেই স্বতন্ত্রতায় যে মহারত্ন-রূপ মহাধন নিহিত আছে, তা আমাদের কাছে কখনই প্রকাশিত হয় না—চিরকাল গোপনই থাকে। তখন আমরা সেই ধন হারা হয়ে ‘হারাধন’ হয়ে পড়ি।

এই প্রবন্ধে ‘হারাধন’-নামের কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়নি। হরিভজন-বিমুখ ব্যক্তিমাট্রই হারাধন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ‘সনাতন-শিক্ষা’য় স্বয়ং মহাপ্রভু হারাধনের দুঃখের কথা এবং সেই দুঃখ-অবসানের উপায় এক গল্পাকারে জানিয়েছেন—এক সর্বজ্ঞ এক হারাধনের কাছে এসে বললেন, “আরে হারাধন, তুমি বৃথাই কষ্ট পাচ্ছ, তোমার বাড়ীতেই ত প্রচুর ধন রাখা আছে। ভাবছ, আমি মজা করছি? একদম নয়। তোমার বাড়ীতেই মাটির নীচে সেই ধন পোঁতা আছে। তবে সেই ধন পেতে গেলে একটাই উপায় আছে। অন্য যত উপায় থাকুক না কেন, তাতে কিন্তু সে ধন পাওয়া যাবে না। তোমার বাড়ীর পূর্বদিকে মাটি খুঁদলে তুমি সেই ধন পাবে—নতুবা, অন্য উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে গেলে ধনলাভ তো দূরে থাক, অজগর সাপ, কোথাও ভীমরুল, কোথাও বা যক্ষ তোমার জীবনকেই বিপন্ন করে দিবে।” ছান্দোগ্য-উপনিষদে ঠিক এই উদাহরণই দেওয়া হয়েছে,—“জীব ভূমিতে প্রোথিত ধনের উপর সবসময় বিচরণ করে, তথাপি কিনা সেই ধনের অভাবে প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট হয়!” শাস্ত্রে প্রকৃতপক্ষে এইসব উপমার মাধ্যমেই সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব, প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রভৃতি বুঝান হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় জানিয়েছেন—ভক্তিই জীবের সেই মহাধন-লাভের একমাত্র উপায়। কৰ্মপস্থা, জ্ঞানপস্থা বা যোগপস্থা—এইসব পস্থায় সেই মহাধন-লাভের তো কোন সম্ভাবনাই নাই, বরং তাতে ভবিষ্যতে সে-সম্ভাবনারও

অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়। সেই শুদ্ধভক্তির পন্থায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শরণাগতিই প্রথম পদক্ষেপ। হারাধন-বাবু সেই শরণাগতি-অবলম্বন ছাড়াই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভের বাঞ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের উপদিষ্ট শিক্ষা অবলম্বন না করলে সেই বাঞ্ছা নিষ্পল। নতুবা শাস্ত্রে গুরু-বৈষ্ণবগণ এমনকি স্বয়ং শ্রীহরি জীবের জন্য যে এত শিক্ষা প্রকাশ করেছেন, তা'র প্রয়োজনই হত না—তঁারা কেবল 'কৃপা' করলেই পারতেন।

আসলে হারাধন বাবুর অভিসন্ধিই আলাদা। তিনি বিচার করে দেখেছেন, 'গুরু-বৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তির যে-তত্ত্ব বলেন, তা অনুসরণ করতে গেলে সংসার-সুখের বিচারটাই পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সাথে এমন সংসার-সুখ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। বরং সেই সংসার-সুখ বজায় রেখেই এবং ভক্তিযোগের উপায় অবলম্বনের কোন কষ্ট স্বীকার না করেই গুরু-বৈষ্ণবগণের হাতে-পায়ে ধরে যদি কোনরকম ভাবে কৃপা বাগিয়ে নেওয়া যায়—তাহলেই ব্যাস 'কেল্লা ফতে'। এত পরিশ্রমের কোন প্রয়োজনই নেই—সংসার-সুখ থেকে একবারে কৃষ্ণপ্রেমের সুখসাগরে হাবুডুবু খাব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে-মধ্যেই গুরুবৈষ্ণবগণের কাছে 'আমার দ্বারা আর হরিভজন হবে না'—এমন সব ভয়ংকর কথা বলে তাঁদেরকে ভয় দেখাতে চান, যা'তে শেষে তাঁদের ব্যাগে লুকিয়ে রাখা 'কৃপা' হারাধন বাবুকে দিয়ে দেন।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো তা' নয়। একটা কথাই আছে—“ God helps those, who help themselves ”। হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা কোন ভোগের বস্তু নয় যে, কতকগুলি গোঁফ-খেজুরে লোকের মুখের মধ্যে টপু করে পড়বে। যিনি সত্যিই অন্তরে নিষ্কপটভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁর বাহ্যেও সেই কৃপালাভের আন্তরিক চেষ্টা লক্ষিত হয়। কি সেই আন্তরিক চেষ্টা? ভক্তির প্রতিকূল-বর্জ্জন এবং ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁর সেই আন্তরিকতা অনুভব করে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রচুর বল প্রদান করেন। ভগবান্ স্বয়ংই তা ঘোষণা করে সকলকে জানিয়েছেন,—“ তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ” (গীঃ ১০।১০)

—‘যা’রা আমার প্রতি প্রীতিসহকারে আমাতে যুক্ত হয়ে তথা আমার ভক্তগণের সাথে যুক্ত হয়ে যথাবিধি ভজনা করে, আমি তাদের হৃদয়ে সেই বুদ্ধিযোগ-রূপ কৃপা প্রকাশ করি, যার বলে তা'রা আমার নিকটে অগ্রসর হতে পারে।’ সুতরাং জীবকেই প্রথম ভগবদ্ভজনে উদ্যোগী হতে হবে—সেই উদ্যোগ-অনুসারেই ভগবান্ তা'র ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারণ, ভগবান্ জীবকে কিছু করার বা কিছু না করার স্বতন্ত্রতা যখন প্রদান করেছেন, তখন সেই স্বতন্ত্রতা-বশে হরিভজনে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব জীবেরই—ভগবানের নয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা সূর্য্যের মত—সমস্ত দিকে বিকিরণশীল। কেহ যদি মনে করেন, সূর্য্য কৃপা করে আমার বন্ধঘরের দরজা-জানালা

ভেদ করে ভিতরে আলো পাঠিয়ে দিও, তবে তা বাস্তবে কখনও সম্ভব হয় না। যখন কেহ নিজের স্বতন্ত্রতার সদব্যবহার করে ভগবদ্ভজনের জন্য নিজেই উদ্যোগী হন—এবং হৃদয়ের অর্গল খুলে বন্ধ কপাট উন্মুক্ত করে দিতে পারেন—তা’হলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাসূর্য্যের আলো বাহিরেই অপেক্ষা করে আছে, তা তৎক্ষণাৎ হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দেবে। তখন আর অন্ধকারে হাতড়ানো নয়—হারাধন ধনের সন্ধান পেয়ে যাবেন।

—শ্রীভক্তিবাদান্ত তপস্বী

—ঃঃ—

রামদাস শ্রীগোপান্না

কথায় আছে—“বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়।” ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পর এইপ্রকার সম্বন্ধযুক্ত যে সাধারণ মানুষ তাঁহাদের হার্দিক-ভাবের বিচার কোনরূপেই করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা ভগবান্ ও ভক্তকে জগতের ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের কাঠগোড়ায় তুলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু জগতের ভদ্রাভদ্র বিচার কোনপ্রকারেই ভক্ত ও ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারে না। রামদাস শ্রীগোপান্নার ভগবৎসেবার মহিমা ভগবৎসেবাবিমুখ জীবের কাছে কখনই অনুভব হয় না—বন্ধ্যা নারী যেমন সন্তান-ধারণের অনুভূতি ও তদনুরূপ বাসৎসল্য-ভাব লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ।

ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ‘ভদ্রাচলম্’-নামক এক পর্ব্বতে একটা অতিসুন্দর শ্রীরামমন্দির অবস্থিত আছে। সেই মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীসীতাদেবী এবং শ্রীলক্ষ্মণ—এই তিন বিগ্রহ বিরাজমান্। পূর্ব্বে এই বিগ্রহগণ একসময় কোন এক জঙ্গলে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিলেন। তাঁহারা একসময় একজন রামভক্ত মহিলাকে স্বপ্নে আদেশ করেন, “দামাঙ্কা, আমরা তিনজন অমুক বনের মধ্যে মৃত্তিকার নীচে অবস্থিত আছি। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব আমাদেরকে সে-স্থান হইতে উত্তোলন করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা কর। যতদিন পর্য্যন্ত অপর কোন রামভক্ত আসিয়া সেবার দায়িত্ব না গ্রহণ করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমাদের সেবা করিতে থাকিবে।”

দামাঙ্কা সেই স্বপ্নাদেশ পাইয়া তাঁহার গ্রামবাসীদের জানাইলেন। তাহাতে সকলে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া স্বপ্ননির্দিষ্ট স্থানে গেলেন। সত্য-সত্যই মৃত্তিকা হইতে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব তিনটি মূর্ত্তি উত্তোলিত হইল। দামাঙ্কা নির্দেশমত তাঁহাদের স্থাপন করিয়া যথাযথভাবে অত্যন্ত প্রীতির সহিত সেবাপূজার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

খৃঃ ১৭০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল-সম্রাটগণের অধীনে যে গোলকোন্দা-নবাবগণ ছিলেন, তাঁহাদেরই ‘জাইগীর’ ছিল এই ‘ভদ্রাচলম্’-পর্ব্বত। গোলকোন্দা-শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

নবাবগণের মধ্যে একজন বিশেষ উপযুক্ত নবাব ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল—আবদুল্লা। তাঁহার দুই জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদেরই একজনের ভগ্নী-পুত্রের নাম ‘শ্রীগোপাল্লা’। বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। সেই বাল্যকালেই শ্রীরামের নাম-গুণ-গান কীর্তনে তিনি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইয়া বিভোর হইয়া যাইতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন তাঁহার মাতুলগণের সুপারিশে শ্রীগোপাল্লা সেই ভদ্রাচল-অঞ্চলের তহশীলদার অর্থাৎ খাজনা আদায়কারী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীগোপাল্লার রামভক্তিতে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন। তাহার উপর তহশীলদার-পদে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবিকা দামাক্কা তখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি শ্রীগোপাল্লার বিশেষ রামভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই পরবর্তী সেবক-রূপে স্থির করিলেন। গোপাল্লাও অতি হৃষ্টচিত্তে ভদ্রাচলমের শ্রীরামমন্দিরের সেবার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহাই প্রকৃত সেবকের লক্ষণ—প্রভুর সেবায় তাঁহারা সর্বদা সমর্পিত-প্রাণ। গোপাল্লা শ্রীরাম-মন্দিরের সেবা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা—ভগবান্ অত্যন্ত সুরম্য শ্রীমন্দিরে অবস্থিত থাকুন—ষোড়শ-উপাচারে তাঁহার নিত্য সেবাপূজা চলিতে থাকুক—মণিমাণিক্য-অলঙ্কারে তাঁহার আরাধ্য সানুজ শ্রীরাম-সীতা নিত্য সজ্জিত থাকুন—সর্বদা উৎসবের আয়োজন হউক—তাহাতে প্রতিদিন অজস্র ভগবৎদর্শনার্থী ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।

সেই ইচ্ছাপূরণ করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা গোপাল্লা কল্পনাও করিতে পারেন না। ইহা যেন তাঁহার ছিন্ন-কছায় শুইয়া লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন দেখার মত। গোপাল্লা ভাবিতে লাগিলেন, ‘ভগবৎইচ্ছায় যখন আমি তহশীলদার-পদে নিযুক্ত আছি—তখন এই অর্থই ভগবানের সেবায় সদব্যবহার করি। অসুরগণ আমার প্রভুর সংসার সবসময় লুটিয়া খাইতেছে। সুতরাং তাহাদের সেই অন্যায়-সঞ্চিত ধন প্রভুর সেবায় নিয়োগ করিলে তাহাতে বরং সকলেরই কল্যাণ হইবে। নবাব-সাহেব ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত-অনুসারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে ‘পুতুল’ বলিয়া ভাবেন। সুতরাং ভগবানের সবিশেষ নিত্য প্রেমময় মূর্তির প্রতি তাঁহার কোন আদর নাই। তিনি কখনই ভগবানের সেবার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে সন্মত হইবেন না। তাহা হইলে নবাবের এই সঞ্চিত অর্থের সার্থকতা কোথায়? তিনি বিস্তৃষ্টা-দোষে বরং অধঃপতিত হইবেন। আমি নবাবের অধঃপতন কখনই কামনা করি না। সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতেই আমি তাঁহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিব। তিনি যদি তাহাতে পরে আমাকে ভুল বুঝিয়া শাস্তি প্রদান করিতে চাহেন, তাহা করুন। কিন্তু আমি তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই শাস্তির ভয়ে তাঁহার প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হইতে নিবৃত্ত হইবে কেন? আমার কর্মফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব সাধিত হইতে পারিলে নবাব এবং নবাবের অধীন সমস্ত প্রজার মঙ্গল সাধন হইবে। তাঁহারা সকলে অজ্ঞানতাবশতঃ আমাকে ভুল বুঝিয়া দোষারোপ করিবেন,

সন্দেহ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমি তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা হইতে বিরত হইতে পারি না।’

পাঠকগণ, গোপাল্লাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। ধর্ম-বিজ্ঞান যাঁহাদের যথার্থ অধিগত হইয়াছে, তাঁহারা গোপাল্লার এইপ্রকার সিদ্ধান্তকে কখনও অন্যায় মনে করিবেন না। জগতে যত নীতি-অনীতি আছে, তাহার সকলই উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। অত্যন্ত সদাচার ব্যক্তি, আবার সুদুরাচার ব্যক্তি উভয়েই যেমন অনন্য-ভগবদ্ভজনে অধিকারী, তদ্রূপ সুনীতি ও দুর্নীতি—উভয়েরই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যেকালে সুদুরাচার ব্যক্তি ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হন, সেকালে তাকে আর দুরাচারী না বলিয়া যেমন ‘সাধু’ বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ দুর্নীতি যেকালে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়, সেকালে তাকে আর দুর্নীতি না বলিয়া ‘সাধুদুর্নীতি’ বলাই বিধি—নতুবা ইহাতে প্রত্যবায় হইবে। গোপাল্লা নবাব-বাহাদুরের অর্থ আত্মসাৎ করেন নাই—পরমাত্মসাৎ করাইয়াছেন। প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানী গোপাল্লার মহিমার কথা সমগ্র জন্ম ধরিয়া কীর্তন করিয়াও শেষ করিতে পারিবেন না।

গোপাল্লা নবাবের তহবিল হইতে অর্থ সর্ব-জগদীশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিতে থাকিলেন। সুরম্য শ্রীমন্দির নির্মিত হইল—অতিমূল্যবান অলঙ্কারে শ্রীবিগ্রহ ভূষিত হইতে লাগিলেন—প্রত্যহ অজস্র লোক ভগবৎদর্শনার্থী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। একদিন দেখা গেল, গোলোকানন্দ-নবাবের তহবিলে প্রায় ছয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উধাও। কি ব্যাপার? নবাব-সাহেব তহশীলদার গোপাল্লাকে ডাকিয়া হিসাব চাহিলেন। গোপাল্লা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত সমস্ত অর্থের হিসাব প্রদান করিলেন। কিন্তু নবাব গোপাল্লার সেই হিসাব মানিয়া লইতে পারিলেন না,—“বল কি! তুমি এত অর্থ কিছু প্রস্তুত-খণ্ডের জন্য ব্যয় করিয়া দিয়াছ? কাহার আদেশে করিয়াছ?” তিনি গোপাল্লাকে আটক করিয়া পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিলেন। তাহার পর তাকে অশেষ শাস্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই জগদীশ্বরের। তাঁহার সৃষ্ট দ্রব্য—সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে। গোপাল্লা তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞান জীব মৃত্যুবশতঃ নিজেকে বা অপর কাহাকেও জগদীশ্বর জানিয়া প্রকৃত জগদীশ্বরের সেবা হইতে বিমুখ হয়। তাহারা অনেকেই গোপাল্লার নবাবের অজ্ঞাতে সাধিত এই কার্যকে মানিয়া লইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নীতির উদ্দেশ্যই ভগবৎসেবা—তাহা ভগবৎ-বিমুখ জীব কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

এদিকে গোপাল্লা নবাবের প্রদত্ত সমস্ত শাস্তি নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে সেই শাস্তি বরং ভগবানের অশেষ কৃপা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে ‘চোর’, কেহ ‘ভণ্ড’—ইত্যাদিভাবে নানা গালিগালাজ দিতে লাগিল। কিন্তু ভগবদ্ভজন-প্রভাবে তাঁহার চিত্ত “ক্ষান্তিরব্যর্থকালতঃ বিরক্তির্মানশূন্যতা”—প্রভৃতি গুণে এমন মহিমাঘূষিত হইয়াছে যে, তাহার কোন মান বা অপমানে বিকার হইত না।

অভক্তগণ নিজেদের ভোগের ব্যবস্থায় কোনরূপ বাধা আসিলে তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া ভগবানের প্রতি কতপ্রকার দোষারোপ করিতে থাকে। আবার, কেহ পূর্বে কোনপ্রকারে ভগবানকে কোন সেবা করিবার অভিনয় করিয়া থাকিলে, তখন তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতে থাকেন,—“ঠাকুর, তোমার জন্য পূর্বে কত কিছু করিয়াছি, আর আজ তাহার পরিবর্তে এত দুঃখ!” কিন্তু গোপান্না ভগবানকে কখনও কোনরকম দোষারোপ করেন নাই। একদিন, দুইদিন নহে, সুদীর্ঘ ১২ বৎসরকাল তিনি পিঞ্জরের মধ্যে থাকিয়া নবাবের দেওয়া অশেষ শাস্তি নির্বিকারদে মানিয়া লইতে লাগিলেন এবং মানসেই শ্রীরামচন্দ্রের নিরন্তর সেবাসুখ বিধান করিতে লাগিলেন।

একদিন নবাব আবদুল্লা রাজপ্রাসাদে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন, সুন্দর দুইটি নবকিশোর আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—“নবাব-সাহেব! গোপান্নার কাছে আপনার যত মুদ্রা পাওনা আছে, তা সমস্ত এই আপনার সম্মুখে প্রদান করিলাম। আপনি তাহার প্রাপ্তিস্বীকারের কোন পত্র দিয়া গোপান্নাকে এখনই মুক্ত করিয়া দিন।” “কে তোমরা? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমাদের পরিচয় কি?”—নবাব তাঁহাদের প্রশ্ন করিলেন। তাঁহাদের মনোরম অঙ্গকান্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নবাবের চোখের পলক নিষ্পন্দ হইয়া পড়িল। “আমার নাম রাম, আর সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ—সূর্য্যবংশে আমাদের জন্ম। গোপান্না আমাদের অত্যন্ত নিকট আত্মীয়। আপনি যখন আপনার পাওনা অর্থ পাইয়াছেন, তখন গোপান্নাকে আর কষ্ট দিবেন না, তাহাকে এখনই ছাড়িয়া দিন।”

পাঠকগণ, ভাবুন! যে নবাব কখনও ভগবদর্শনের কামনা করেন নাই—কামনা করবেন কি—যিনি ভগবানের রূপই স্বীকার করেন নাই, তিনি মহাভাগবত গোপান্নার সূত্রে তাঁহার সুদুর্লভ দর্শন লাভ করিলেন। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণ কোটা কোটা বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়া যাঁহার চরণকমলের নখাগ্রের দর্শন কচিৎ লাভ করেন, তাঁহার সহিত সেই নবাব বাক্যলাপ পর্য্যন্ত করিলেন। সেই বালক দুইটির সান্নিধ্যে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হইতে লাগিল। তিনি বালক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোপান্নাকে তখনই মুক্ত করিয়া দিলেন। তারপর তিনি অর্থপ্রাপ্তির একটা স্বীকার-পত্র বালকদুইটিকে লিখিয়া দিলে, তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন।

নবাব আবদুল্লার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেই বালকদুইটিকে তৃষ্ণাৰ্ত্তনয়নে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার ছয়লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার একটা স্তুপ পড়িয়া আছে। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘হায় আল্লা, আজ আমার উপর তোমার কিপ্রকার দয়া!’ তিনি গোপান্নাকে কারাগার হইতে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার অশেষ মহিমা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া নবাব তাঁহার প্রতি নতমস্তক হইলেন,—“সত্যি আপনি ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক। আপনার মত ভাগ্যবান ব্যক্তি আমি জগতে আর একটাও দেখি নাই। আমি আপনাকে বুঝিতে না পারিয়া আপনার প্রতি অনেক

অন্যায় আচরণ করিয়াছি। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন, এই বিশেষ নিবেদন। সম্মুখে যে স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ দেখিতেছেন, ইহা আপনার প্রভুই এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। আপনি এইগুলি ইচ্ছানুরূপ আপনার প্রভুর সেবাতেই নিযুক্ত করুন। তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। আপনি পুনরায় কর্মস্থলে ফিরিয়া গিয়া পূর্ববৎ তহশীলদার-পদে আপনার কার্য আরম্ভ করুন। আজ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি পরমভক্ত শ্রীরামদাস বলিয়া পরিচিত হইবেন।”

গোপান্নার শুদ্ধভক্তি স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য আপাততঃ অনৈতিক কোন কার্য করিলেও তাহা বস্তুতঃ অনৈতিক কিছু নহে। “ধর্মমূলং হি ভগবান্”—সুতরাং সেই মূলকে অতিক্রম করিয়া কোনকিছুই নীতি বা ধর্ম বলিয়া গণিত হইতে পারে না। ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, তাহাই নীতি। যাহা ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হয় না—তাহাই অধর্ম ও অনীতি।

গোপান্না পূর্বজন্মে একটা টিয়াপাখীকে অন্যায়ভাবে বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া নাকি এইজন্মে তাঁহাকে সুদীর্ঘ ১২ বৎসর পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তের কোন কর্মফল-ভোগ নাই। ভগবান্ গোপান্নার কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং সকল বিপদ মধ্যেও তাঁহার নিরন্তর সেবাপরায়ণতা—প্রভৃতি শুদ্ধভক্তের যে-সকল দুর্লভ লক্ষণ থাকে, তাহাই গোপান্নার মাধ্যমে সকল লোকের সম্মুখে দৃষ্টান্ত-রূপে স্থাপন করাইলেন। আবার জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপমাত্রই এই জন্মে না হোক, ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে, তাহাই সকলকে সতর্ক করাইতে ভগবান্ নিজভক্তকে দিয়াই প্রমাণ করিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে ভগবদ্ভক্তগণও কর্মফল-ভোগী—তাহা বিচার করা বিশেষ অপরাধজনক হইবে।

—সংগ্রহীত

শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

সব জিনিসটাই একটা Art। Science টাও একটা Arts —আবার Artsও একটা Science। পাশাপাশি রেখে বিচার করলে তা সব বুঝা যাবে। কোন জিনিসই বাদ দেবার নয়। সমাজনীতি আমাকে মানতে হচ্ছে, অর্থনীতি মানতে হচ্ছে, ধর্মনীতি মানতে হচ্ছে, আবার রাজনীতিও মানতে হচ্ছে। কিন্তু যে রাজনীতি ধর্মনীতিকে অস্বীকার করছে, তাকে রাজনীতি বলা যায় না। যে সমাজনীতি ধর্মনীতিকে অস্বীকার করছে, সে সমাজনীতি—সমাজনীতি নয়। এইজন্যই একজন বক্তা পূর্বের দৈববর্ণাশ্রমের কথা বলেছেন—তিনি এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর “এহ বাহ্য, আগে কহ আর”—এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন। আপনারা সবাই শুনে হয়ত মনে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

করবেন,—এ আবার কেমন কথা, বর্ণাশ্রমের এমন সুন্দর কথা অস্বীকার করছেন—এ দেখি, সবই উশ্টো। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। একটা হচ্ছে নাস্তিক্য বর্ণাশ্রম, এবং আরেকটা হচ্ছে আস্তিক্য বর্ণাশ্রম অর্থাৎ দৈব-বর্ণাশ্রম। নাস্তিক্য বর্ণাশ্রম মানে আসুর-বর্ণাশ্রম। দুইরকমের বর্ণাশ্রমের বিচার আছে—সেই হিসাবে তাদের বিশেষণগুলিও পৃথক্ পৃথক্। দৈববর্ণাশ্রম যেখানে, সেখানে গুণগতবিচারের বিশ্লেষণ আছে। আর যখন গুণটিকে অস্বীকার করছি, তখনই আমরা সাধারণের মধ্যে পড়ে গেলাম। গীতার মধ্যে আছে,—“মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃস্তুয়ো বৈশ্যাস্থথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্।।”

স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—এদেরও পরাগতি-লাভের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সকলের, কেবল মনুষ্য নয়, এমন কি মনুষ্যোত্তর যত পশু-পাখী, বৃক্ষ-গুল্ম-তৃণলতা আছে—তাদেরও পরাগতি লাভ হতে পারে। এটাকেই বলা হচ্ছে সনাতন ধর্ম, আত্ম-ধর্ম। সেটাই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি। সেই ধর্মে পশু-পক্ষী-বৃক্ষ—সকলের আত্যন্তিক মঙ্গললাভের ব্যবস্থা আছে ; সেখানে “কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।”—পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ভক্তগণ বা রাজর্ষিগণ, এদের কথা আর কি বলব? সুতরাং সকলের জন্যই বিধি-ব্যবস্থা রাখা আছে। এইজন্য, এই ধর্ম আলোচনার এবং অনুশীলনের অধিকার ভগবান্ প্রত্যেককেই দিয়েছেন। কারও অধিকার তিনি হরণ করেননি।

একবার মাথাভাঙ্গায় মুসেক দত্তবাবু স্বামী স্ত্রী দুজনেই এসেছিলেন—দুজনেইটা Phylosophy-পড়া। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “স্বামীজী, শাস্ত্র পড়ে-টড়ে আমি যা বুঝেছি, হয়ত আপনি আমাকে নাস্তিক বলে ভাববেন—কিন্তু দেখছি, মুনি-ঋষিগণের মধ্যেও পক্ষপাতিত্ব রয়েছে—এটা কি রকম? জিজ্ঞাসা করলাম,—‘আপনি কোন শাস্ত্রের কথা বলছেন?’ তিনি বললেন—‘মনু সংহিতার কথা বলছি।’ আমি বললাম,—‘পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দক্যে চ সুতো রক্ষ্যেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমাপ্নুয়াৎ।।—আপনি কি মনুসংহিতার এই শ্লোকটা দেখেই ঐপ্রকার ভেবেছেন?’ তিনি বললেন,—‘আপনি ঠিক বলেছেন—কিন্তু কিভাবে আপনি তা জানলেন?’ বললাম,—‘এরকম আলোচনা প্রায়ই হয়, তাই বললাম। কিন্তু আপনারা দুজনেই ত’ সংস্কৃত ভাষা জানেন—দর্শনশাস্ত্র পড়েছেন। এর অর্থ অন্যভাবে বুঝার ত’ কারণ নেই। ‘পিতা রক্ষতি কৌমারে’—ছোটবেলায় পিতাই কন্যাকে খাওয়ান, পড়ান, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ; ‘ভর্তা রক্ষতি যৌবনে’—যুবতী-বয়সে যখন তার বিবাহ হয়, তখন স্বামীই হন তার অভিভাবক ; ‘বার্দক্যে চ সুতো রক্ষ্যেৎ’—বৃদ্ধকাল যখন আসে, তখন পুত্রই তার দেখাশোনা করে। এজন্য ‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমাপ্নুয়াৎ’—স্ত্রীর স্বাধীন হওয়ার অবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু বর্তমানে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে অপব্যখ্যা দেওয়া হচ্ছে—শাস্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থগুলি নেওয়া হচ্ছে না। ওদের স্বাধীন ভাবে চলার অবস্থাটাই যখন নাই, তখন ‘স্ত্রী-স্বাধীনতা’ কথার অর্থ কি? স্বাধীনতা

তো ভগবান্ সকলকেই দিয়ে বসে আছেন। শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা হচ্ছে ধর্ম-অনুশীলন—এর চেয়ে বড় স্বাধীনতা আর নেই। ‘স্বাধীনতা’কে শাস্ত্রে ‘রত্ন’ বলেছেন।

যে সময় আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ হল—১৯৪৭ সালে তা হয়েছিল, সে-সময় আমরা দেওঘরে ছিলাম—আমার গুরুমহারাজও দেওঘরে ছিলেন। সে-সময় একটা কবিতা দেখেছিলাম—সেটা আমাদের পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার Heading ছিল “স্বাধীন ভারত আজি”।

“স্বাধীন ভারত আজি,

শত কোটি কণ্ঠে উঠে ‘জয়হিন্দ’ ধ্বনি।

আনন্দে প্রমত্ত সবে স্বরূপ ভুলিয়া।

কিন্তু হায়! কোথায় স্বাধীনতা?

হয়েছে কি জীব মুক্ত, ভবকারা হতে?

খসি’ কি পড়েছে জীবের মায়ার শৃঙ্খল?”

—ঠিক এইরকম সেখানে বর্ণনাগুলি ছিল। অর্থাৎ ‘স্বাধীনতা’র যে বাস্তব অর্থ, তা সেখানে ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ঠিক এই অর্থই প্রকাশিত আছে। ‘স্বাধীনতা’ বলতে আমরা কি বুঝি—আমরা কতটুকু পেতে পারি—কতটুকু পেয়েছি—কতটুকু পেলো সম্ভব? এ সমস্ত নিয়ে শাস্ত্রে খুব ভালই আলোচনা আছে। স্বাধীনতা আমরা কাকে বলছি? আমরা যাকে স্বাধীনতা বলছি—সেটা আসলে চরম পরাধীনতা। বাস্তব স্বাধীনতা—সেটা আত্মকল্যাণ চিন্তার মধ্যেই লাভ হয়। জীবের স্বরূপের যে স্বাধীনতা—সেটা শাস্ত্রীয় বিচারে ‘পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা’। ‘স্বাধীনতা’-মানে স্বতন্ত্রতা। জীবের স্বতন্ত্রতা কিরকম? ভগবানের guidance-এ সেই স্বতন্ত্রতা। সুতরাং আমি একেবারে পূর্ণ Autocracy পেয়ে গেছি—তা কখনই নয়। ভগবানের অধীনে আমাদের থাকতে হবে। তাঁর যে উপদেশ, নির্দেশ,—তাঁর যে বাণী, সেটা আমাদের মনে নিতে হবে, সেই অনুসারে আমাদের সাধন-ভজন করতে হবে। এইগুলি শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—সেখানে প্রত্যেকটি কথারই সুন্দর মীমাংসা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ‘গায়ত্রী, দিয়েই আরম্ভ হয়েছে—আর, সেখানে চরম শেষ কথাটা কি আছে? নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন। “নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনং যস্য সর্বপাপ-প্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নামামি হরিং পরম্।।” শ্রীমদ্ভাগবতে নামসঙ্কীৰ্ত্তনই আমাদের চরম উপায় ও চরম উপেয় বলে নির্দ্বারিত হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয় উল্লেখ করেছেন—

“এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিয়োগে ভগবতি তন্মাত্রগ্রহণাদিভিঃ।।” আবার, “বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিয়োগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।”—সুতরাং সর্বত্রই তো ভক্তির কথাই বলা আছে—ভক্তি ছাড়া তো কোন কথাই নেই। আরও যেমন, “ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং, ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।” “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মল্লিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।”

ভক্তির দ্বারাই একমাত্র ভগবানকে যথাযথভাবে পাওয়া যায়—সুতরাং ভক্তিই হল আত্মকল্যাণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। ‘কন্মই করি, বা জ্ঞান করি বা যোগানুশীলন করি—যাই করি না কেন, ভক্তিকে বাদ দিয়ে করলে, সবই নিষ্পল। সেই বিচারটাই শাস্ত্রে সর্বত্রই সুন্দর ভাবে বুঝানো হয়েছে। ভক্তিবৃত্তি কি? ভক্তিবৃত্তি হল লাভণ্য। উদাহরণ দিয়ে প্রায়ই আমরা সেই কথাটা বুঝিয়ে দেই। যেমন, লবনহীন সজ্জি বিস্বাদ লাগে, স্বাদযুক্ত হয় না—তেমনই ভক্তিরূপ যে লাভণ্য, সেই ভক্তিহীন হয়ে কন্ম, জ্ঞান বা যোগ, যাই সাধন করা হোক না কেন—সবই লাভণ্যহীন। সেই কথাই শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বুঝানো হয়েছে—আর কিছু নয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিশ্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে এবং সমিতির বর্তমান সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সেবানুগতো ও সমিতির সাধারণসম্পাদক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজের পরিচালনায় শ্রীসমিতির অন্যতম শাখামঠ দুর্গাপুরস্থ শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৯শে ফাল্গুন ১৪১০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৩।৩।২০০৪) শনিবার হইতে ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।২০০৪) সোমবার পর্যন্ত বাৎসরিক মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত মঠের একাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেই মহোৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রায় ২৫ জন সন্ন্যাসী, ও ৬০ জন ব্রহ্মচারী ও অগণিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সমাগমে দুই দিবস নগর-সংকীৰ্ত্তন, দিবসত্রয় ব্যাপী ধর্মসভা, শ্রীহরি-সঙ্কীৰ্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অত্যন্ত সূচ্ষ্ণভাবে পালিত হইয়াছিল।

প্রথম দিবস ২৯শে ফাল্গুন (১৩।৩।২০০৪), মঙ্গলারতি ও প্রাতঃকালীন পাঠ-কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ শিবিকায় আরোহণ করাইয়া ভক্তবৃন্দ নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বেনাচিতি গমন করেন। সেখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীরামময় রায় মহাশয় ও শ্রীপ্রদীপকুমার সাহা মহাশয় ভক্তবৃন্দকে নিজ নিজ বাসভবনে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করেন। তাঁহাদের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। দ্বিপ্রহরে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন দল মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন, তৎপশ্চাৎ সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর ধর্মসভা আরম্ভ হয়। ধর্মসভায় “শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভের উপায়” —এই বিষয়বস্তুর উপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বিশিষ্ট গৃহস্থভক্তগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ আলোচনা করিলে শ্রোতাগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিবস ৩০শে ফাল্গুন (১৪।৩।২০০৪), পূর্বদিনের ন্যায় ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিকা স্কন্ধে লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা-কালে তাঁহার শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড নিবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সাঁই মহাশয় ও চণ্ডীদাস বাজার-নিবাসী শ্রীনীরদকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের বাসভবনে

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

গমন করিয়া শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইয়া সঙ্কীৰ্তন মুখে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অপরাহ্নে পূৰ্ব্বদিনবৎ মহাজন-পদাবলী-কীৰ্তন ও সন্ধ্যায় আরতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর ধৰ্মসভা আরম্ভ হয়। তাহাতে “শ্রীগুরুদেব ও নামতত্ত্ব” এই বিষয়বস্তুর উপর বিশিষ্ট বক্তাগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় দিবস ১লা চৈত্র (১৫।৩।২০০৪) সোমবার, মঙ্গলারতির পর ও মহাজন-পদাবলী-কীৰ্তন হইতে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রোতাগণ সাধুগুরু-মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৃতার্থ হন। তৎপশ্চাৎ মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির পর প্রায় দশ সহস্রাধিক সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

অপরাহ্নে ৪ ঘটিকায় মহাজন পদাবলী কীৰ্তনের পর ৫ ঘটিকায় ধৰ্মসভার তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য’ ধার্য্য হয়। উক্ত ত্রিদিবসীয় মহোৎসবের ধৰ্মসভায় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সারস্বত সেবাশ্রমের আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রপন্ন পরিব্রাজকমহারাজ, বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জেরকুড়াস্থিত শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যচরণ ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্বক্তিসর্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ ও বৰ্হমান শহরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্বক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ এই তিন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী বিভিন্ন দিনে ক্রমান্বয়ে সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে বৃত্ত হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুরের পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্বক্তিসর্বস্ব সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিসম্বন্ধ যাচক মহারাজ, শ্রীমৎনির্মলানন্দ বন মহারাজ, হাওড়া জেলার মাজব্রাহ্মণ পাড়ার শ্রীপ্রপন্ন আশ্রমের শ্রীমদ্বক্তিপ্ৰজ্ঞান বোধায়ন মহারাজ, কলিকাতা বেলগাছিয়ায় স্থিত শ্রীগৌড়ীয় ভাগবত আশ্রমের শ্রীমদ্বক্তিবজয় ভারতী মহারাজ, নদীয়া-স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের শ্রীমদ্বক্তিরমণ নিক্ষিঞ্চন মহারাজ, শ্রীব্রজধামস্থিত শ্রীমৎ শ্যামদাস বাবাজী মহারাজ, টাটা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীমৎ হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহশয়, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যুগ্ম সম্পাক শ্রীমদ্বক্তিবদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিবদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিবদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্বক্তিবদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ ও দুর্গাপুর স্টীল-প্ল্যান্টের বিশিষ্ট অফিসার মাননীয় শ্রীজগদীশ দণ্ডপাট মহাশয় উপরিউক্ত ধৰ্মসভায় নিৰ্দ্ধারিত বিভিন্নবিষয়ের উপর অতি মনোহর শাস্ত্রীয় আলোচনা উপস্থাপন করেন।

পরিশেষে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তিবদান্ত পর্যটক মহারাজ উক্ত মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানকারী সকল সন্ন্যাসিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী, ও গৃহস্থ ভক্তগণকে যথাযোগ্য প্রণাম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য তথা বার্ষিক মহোৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিধাননগরে শ্রীসমিতির প্রচার

শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক মহোৎসব-সমাপ্তির পর দুর্গাপুর-সহরের অন্তর্গত বিধাননগরস্থ মঠাশ্রিত বৈষ্ণব শ্রীপ্রদীপ কুমার সাহা মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতি বন্দিতা দেবীর সাদর আমন্ত্রণে গত ২রা চৈত্র (১৬-৩-২০০৪) মঙ্গলবার, সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বাসযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ-সহ নাম-সঙ্কীৰ্তন করিতে করিতে তাঁহাদের মেঘমল্লার রোডস্থিত ‘সোনার তরী’ নামক বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। পূৰ্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে পরমপূজনীয় শ্রীমৎভক্তিসর্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে “জীবের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১; ১৩ জুন, ২০০৪

আত্মকল্যাণের পথ”-বিষয়ে ধর্মসভা আরম্ভ হয়। সকল সন্ন্যাসিগণ সে-বিষয়ে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিচার ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মনোরম ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে বিশেষ মহাপ্রসাদ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া অপরাহ্নে সকল ভক্তগণ মহাপ্রভুর শিবিকা লইয়া সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা সহকারে নগরপরিক্রমা করেন। রাত্রে মহাপ্রসাদ-সেবনান্তে সকল ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখামঠ শিলিগুড়িহু শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির বিশেষ জীর্ণ হইয়া পড়ায় উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহায়তায় সেইস্থলে নূতন সুরম্য শ্রীমন্দির নির্মিত হয়। গত অক্ষয় তৃতীয়া তিথি ৯ই বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ২২।৪।২০০৪) বৃহস্পতিবার উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর শুভবিজয় অনুষ্ঠান সমিতির বর্তমান সভাপতি আচার্য্য ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্-ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক পরমপূজনীয় ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের পরিচালনায় অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শুভবিজয় উপলক্ষে পূর্বদিবস ৮ই বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, (ইং ২১।৪।২০০৪) বুধবার, বৈকালে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা অনুসরণ পূর্বক বিশেষ নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। তৎপশ্চাৎ সন্ধ্যারতির পর উপস্থিত সকল সন্ন্যাসিগণ ধর্মসভায় ‘সনাতন ধর্ম’-বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনা উপস্থাপন করেন।

পরদিবস ৯ই বৈশাখ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতেই সঙ্কীর্তন মুখে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় বৈষ্ণবহোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সমগ্র শ্রীমন্দির পূর্বেরই পত্র-পুষ্পদ্বারা বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। হরিসঙ্কীর্তন মুখর সুন্দর মনোরম-পরিবেশে সপার্যদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-রাধাবিনোদবিহারী উক্ত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিলে সকল ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে আপ্ত হন। মধ্যাহ্নে শুভ-ভোগারতি-অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ ও আহুত-অনাহুত সকল ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মহাজন-পদাবলী কীর্তন আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরাট্রিক হইলে পর পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা আরম্ভ হয়। সভায় “শ্রীবিগ্রহ তত্ত্ব ও মঠ মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমৎ রসানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্যাগী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ ও পরিশেষে সভার সভাপতি-মহারাজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অত্যন্ত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাসের অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ মহোৎসব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত মঠের পরিচালক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ এবং মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দ ও মঠাশ্রিত বিশেষ কিছু গৃহস্থ ভক্তগণের নিরলস সেবাপ্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য।।	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।।
---	--

১৪ শ্রীধর, গর্ভোদশায়ী, ৫১৮ গৌরাদ
 ৫৬শ বর্ষ } ৩১ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪১১, ইং ১৬/৭/২০০৪ { ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্

[ত্রিদিগ্ভিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-মহারাজেন বিরচিতম্]

অমন্দ-কারুণ্য-গুণাকর-শ্রীচৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।

স গৌরশক্তিভবিতা পুনঃ কিং, পদং দৃশোভক্তিবিনোদদেবঃ।। ১।।

যে-কারুণ্যে কখনও মন্দ (অশুভ) উদ্ভিত হয় না, সেই 'কারুণ্য'-গুণের উৎসস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতার সেই গৌরশক্তি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন? ১।।

শ্রীমদ্ভজগ্নাথ-প্রভুপ্রিয়ো য, একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।

শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং, নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ।। ২।।

যিনি বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগ্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়জন এবং মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অভিন্ন-সুহৃদ স্বরূপ, সেই শ্রীগৌর-কারুণ্য অর্থাৎ 'ঔদার্য্য' পরিপূর্ণ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ কি নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিগোচর হইবেন? ২।।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১শে আষাঢ় ১৪১১, ১৬ই জুলাই ২০০৪

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারেরাদর্শমাচার-বিধৌ দধৌ যঃ।

স জাগরুকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং, নিত্যং ভবেদ ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ চিন্তামণির সম্যক প্রচারের দ্বারা যিনি আদর্শ আচার-প্রণালী জগতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি নিত্যকাল আমাদের স্মৃতি-মন্দিরে জাগরুক থাকিবেন? ৩।।

নামাপরাধৈ রহিতস্য নান্নো, মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।

জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং, কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৪॥

নামাপরাধ-শূন্য শ্রীনামের মহিমা যে কি-প্রকার, তাহা জগতে প্রকট করাইয়া যিনি অসীম দয়ালুতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি আমাদের স্মৃতির সিংহাসনে আরুঢ় থাকিবেন? ৪।।

গৌরস্য গুঢ়প্রকটালয়স্য, সতোহসতো হর্ষ-কুনাট্যয়োশ্চ।

প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং, স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৫॥

শ্রীগৌরসুন্দরের গুঢ় আবির্ভাব-স্থান প্রকাশ করিয়া যিনি যুগপৎ সজ্জনগণের হর্ষ ও দুর্জ্ঞানগণের বিভিন্নপ্রকার কুনাট্য জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি আমাদের স্মৃতির বিষয়ীভূত হইবেন? ৫।।

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-প্রবাহেনোদ্ধতসর্বলোকঃ।

ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং, ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৬॥

শুদ্ধভক্তির সর্বপ্রকার বিঘ্ন দূর করিয়া যিনি ভক্তিগঙ্গার প্রবাহদ্বারা নিখিল লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ‘ভগীরথ’-স্বরূপ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি নিত্যকাল আমাদের ধ্যানের বিষয় হইবেন? ৬।।

বিশ্বেষু চৈতন্য-কথাপ্রচারী, মাহাত্ম্যশংসী গুরু-বৈষ্ণবানাম্।

নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং, চিত্তে ভবেদ ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৭॥

যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার করিয়াছেন, এবং গুরু-বৈষ্ণবগণের মহিমা প্রকাশ ও শ্রীনামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে আমরা কি হৃদয়ে নিরন্তর স্মরণ করিতে পারিব? ৭।।

প্রয়োজনং সন্নভিধেয়ভক্তি, সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-।

কিশোরসম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং, চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৮॥

‘শ্রীগৌরকিশোর’-রূপ সম্বন্ধতত্ত্ব ও ‘ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী’-রূপ অভিধেয়-তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া প্রয়োজন-তত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি আমাদের হৃদয়গত হইবেন? ৮।।

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ, চিন্তামণিগাত্র সজৈবধর্ম্মম্।

প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং, চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ৯॥

‘শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত’, ‘সজ্জনতোষণী’ ‘শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি’, ‘জৈবধর্ম’, প্রভৃতি গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া যিনি জীবগণকে চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন, সেই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে আমরা কি চিন্তে ধারণ করিতে পারিব? ৯।।

আষাঢ়দর্শেহহনি গৌরশক্তি-গদাধরাভিন্ন-তনুর্জহৌ যঃ।

প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং, দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদেবঃ।। ১০।।

আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে যিনি প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন? ১০।।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অধ্যায়

তিনিঅখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবৎতত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধ-চৈতন্যরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব ; তাহা চিদ্বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য ; তাহাকেই ‘বেদ’ বা ‘আন্ন্য’ বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহাই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়-জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবৎতত্ত্ব জানা যায় কি না?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অর্তীত ; তজ্জন্যই তাঁহাকে ‘অধোক্ষজ’ বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্বদাই ভগবৎতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন কি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্য-প্রযুক্ত (তারতম্য-হেতু) ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধকস্বরূপে (জাগরণকারী-রূপে) লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য ; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম ‘ভক্তি’ ; পরতত্ত্বের সম্বন্ধনকে (অনুভবকে) কেহ ‘জ্ঞান’ বলেন, কেহ ‘ভক্তি’ বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন ; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তাহার ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্মসকলও চরমে ভগবান্কে উদ্দেশ্য করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ-অবস্থায় বিষয় ও নির্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ-পূর্বক ভগবান্কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে ; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। ‘সত্য’ ও ‘নিত্য’ এই দুইটি বিশেষণের অর্থ পৃথক্ ; বিশ্ব নিত্য নয় অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরশক্তি আছে, তাহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটি বিক্রমের পরিচয় আছে। সেই তিনটি বিক্রম—(১) চিদ্বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্বিক্রম হইতে ভগবৎতত্ত্বের স্থায়ী স্ফূর্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে ; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্য-পদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভূচৈতন্য এবং জীব—অণুচৈতন্য ; তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে ‘তাত্ত্বিক’ ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা ‘ব্যবহারিক’, না ‘তাত্ত্বিক’?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায়?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, ‘তুমি জীব, জড়-জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়।’ এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, ‘তুমি বিভূচৈতন্য।’

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা হইবে না?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয় ; ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে ; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদেদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-‘ভেদাভেদ-মত’ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই ; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উ। নির্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষম্য-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষম্যদিগের কয়টি সম্প্রদায়?

উ। চারিটি সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত।

প্র। ইহাদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ?

উ। ইহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই ; ইহারা সকলে সবিশেষবাদী। ইহারা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবৎশক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণান্বিত (বিশেষণ-যুক্ত), অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটি অত্যন্ত পরিস্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্বারা অন্য তিন মতের কোনপ্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

উড়ুপী-দর্শন

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত একটা সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এই শৈলমালা ভাষা ও দেশভেদে ‘সহ্যাদ্রি’, ‘কোল-পর্ব্বত’, ‘মলয়গিরি’ প্রভৃতি নামে খ্যাত। ঐ গিরিশ্রেণী একটা সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্ব্বদিকে মালিকাকারে বেষ্টিত থাকিয়া সেই পুণ্যস্থলীকে নিরন্তর অর্ঘ্যপ্রদানে পূজা করিতেছে। আর আকাশচুম্বিত বিশাল আরবসমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া সেই পুণ্য-তীর্থের পাদধৌত করিয়া দিতেছে। এই পবিত্র ভূভাগ ‘পরশুরামক্ষেত্র’-রূপে পরিচিত। পুরাকালে শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কন্মলেপরহিত হইলেও লোক-উপদেশার্থ মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্যা-কুমারিকা ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণপ্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নূতন

ভূভাগ নির্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। স্বন্দপুরাণের সহ্যদ্রিখণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তরসীমা হইতে দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আদিকেরল, মধ্যকেরল ও অন্তকেরল—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদিকেরল উত্তরকর্ণাট ও দক্ষিণকর্ণাট—এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত। উত্তরকর্ণাটকে ‘কেনারিজ্’ ভাষার প্রচার, আর দক্ষিণকর্ণাটকে ‘তুলু’ ভাষারই বিশেষ প্রচার লক্ষিত হয়। এই দক্ষিণ-কর্ণাটক-প্রদেশই ‘রজতপীঠপুর’ বা ‘রৌপ্যপীঠপুর’—এই প্রাচীন সংজ্ঞা পরিমণ্ডিত ‘উড়ুপী’ ক্ষেত্রদ্বারা সুশোভিত। সুতরাং উড়ুপীর অপর প্রাচীন নাম ‘রজতপীঠপুর’।

এই পবিত্র ক্ষেত্র ছয়কোশ-পরিধি-বিশিষ্ট। ইহার পশ্চিমদিকে আরব সাগর ও পূর্বদিকে বেধাচল-পর্বত বিরাজমান, দক্ষিণে ‘পাপনাশিনী’ এবং উত্তরে ‘সুবর্ণা’ নাম্নী নদীদ্বয় প্রবাহিত।

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বের পরশুরাম-ভক্ত ‘রামভোজ’-নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুপ্ৰীতির জন্য একটি মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী সুনিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে পাঞ্চাল-দেশান্তর্বর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র দেশ হইতে কন্মকাণ্ডনিপুণ, পরম পণ্ডিত, অগ্নিহোত্রী বিংশত্যাঙ্গুরশত (১২০) ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই বিংশত্যাঙ্গুরশত কুলীন ব্রাহ্মণবংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কালপ্রভাবে তাঁহাদের কয়েকটি বংশ লোপপ্রাপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণবংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবের পর মধ্বানুগত হইয়া ‘মাধ্বব্রাহ্মণ’ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটি মহাসর্প লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ উড়ুপীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় ‘তাস্জোড়ু’, ‘মাস্জোড়ু’, ‘অরিতোড়ু’, ‘মুচ্চিলকোড়ু’ নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্মাণ করাইয়া মধ্যপ্রদেশে ক্রোশব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি সুবর্ণ-‘শেষ’-প্রতিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়। যজ্ঞকালে ভগবান্ পরশুরাম রজতপীঠস্থ সুবর্ণসর্প-ফণার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী ‘অনন্তেশ্বর’ নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উড়ুপী ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রজতপীঠের সংস্থান-হেতু সেই ক্ষেত্র প্রাচীনকাল হইতে ‘রজতপীঠপুর’ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই ক্ষেত্রের ‘উড়ুপী’ আখ্যা বিষয়েও একটি উপাখ্যান পুরাণে শ্রুত হইয়া থাকে। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি-সংখ্যক তারকা চন্দ্রের পত্নী।

ইহারা সকলেই দক্ষকন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর পুত্রীগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাশক্ত ছিলেন। অপর পুত্রীগণের প্রার্থনায় দক্ষ চন্দ্রের এইরূপ অসমব্যবহারের জন্য শাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, চন্দ্র তাহার ঐরূপ কার্যের জন্য কলাহীন হইয়া পড়িবে। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্থায়ী কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশুরামক্ষেত্রে ‘অজারণ্য’* নামক স্থানে তপস্যাধারা রুদ্রকে পরিতুষ্ট করেন। রুদ্রদেব চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া রজতপীঠক্ষেত্রস্থ মহা-সরোবর-মধ্যে প্রকটিত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় নিবারণার্থ চন্দ্রকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাহার একপক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপরপক্ষে ক্রমে কলা বৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইয়াছে, এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। চন্দ্রের অপর নাম ‘উড়ুপ’। ‘উড়ু’ পদে নক্ষত্র এবং ‘প’—পতি। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবতার অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র বলিয়া এস্থানের নাম ‘উড়ুপী’ হইয়াছে। যে সরোবর-মধ্যে রুদ্রদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তটদেশে অধুনা শ্রীরুদ্র ‘চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব’ নামে খ্যাত হইয়া সুবৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। উড়ুপী-ক্ষেত্রস্থ বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিষ্ণু-নির্মাল্য ও বিষ্ণুপাদসরিং উপকরণ-সহযোগে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব বিষ্ণুপ্রিয়-বিগ্রহরূপে নিত্য সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

আমরা শ্রীঅনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে দ্বৈতবেদান্ত-পাঠশালা দর্শন করিলাম। উভয় দেবালয়ের উত্তরদিকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির, মধবসরোবর, কৃষ্ণপুর মঠ ও শীরুর মঠ ; পূর্বদিকে কাণুর মঠ, দক্ষিণে ‘সোদে’ মঠ, ‘পুন্ডিগে’ মঠ, ও ‘অদমার’ মঠ, পশ্চিমে পেজাবর মঠ, ‘উত্তরাদি’ মঠ, ‘রাঘবেন্দ’ মঠ বা ‘আর্কট’ মঠ, অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল শ্রীমূর্তিবিরাজিত। গোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমহুদ-দণ্ড ও অপর হস্তে মহুদদণ্ডসূত্র। শ্রীমূর্তির কমণীয়তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরসুন্দর উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দর্শন ও এইস্থানে প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত-সংকীর্্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।

উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি, তাঁহা হৈল প্রেমাষাদী॥

নর্তকগোপাল দেখে পরম মোহনে।

মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥

গোপীচন্দনতলে আছিল ডিপ্পাতে।

মধ্বাচার্য্য ঠাই আইলা কোন মতে॥

* উড়ুপী শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে এই ভূখণ্ড বিরাজিত। ইহা বর্তমানে পুষ্পবাটিকায় পরিণত। এই স্থানের পুষ্পদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে।

মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।

অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ।।

কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।

প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল।।”(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৫-২৪৯)

এই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে একটি উপাখ্যান শ্রুত হয়। উড়ুপী হইতে সপ্তকোশ দক্ষিণে অদমার গ্রামের অন্তঃপাতী যরমল্ দেশস্থ জনৈক নাবিক তাঁহার নৌকামধ্যে বিপণি সামগ্রী লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকায় তাঁহার সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত হইয়া যায়। গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভার ন্যস্ত করিবার জন্য দ্বারকাস্থ গোপীসরোবরতট হইতে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দন খণ্ড সংগ্রহ করিয়া স্বীয় নৌকায় স্থাপন করেন। আসিবার কালে তাঁহার নৌকা মাল্পী-বন্দরের নিকট সমুদ্র-উপকূলস্থ একটি চড়ায় ঠেকিয়া যায়। নাবিক তাহার শত চেষ্টায়ও নৌকাকে কিঞ্চিন্নাত্র চালিত করিতে না পারায় অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। এমন সময় সমুদ্রের উপকূলে একজন জ্যোতিষ্ময় পরম বলী সন্ন্যাসীকে ভগবচ্চিস্তায় নিমগ্ন দেখিতে পাইয়া নাবিক নৌকা হইতেই সেই সন্ন্যাসীর নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। এই তেজোময় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য। তিনি সমুদ্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভগবদ্ভ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নাবিকের উচ্চ-আহ্বান-শ্রবণে নাবিকের তাৎকালিক অবস্থা জানিতে পারিয়া মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক (কাহারও মতে বস্ত্রসঞ্চালনপূর্ব্বক) উক্ত নৌকাকে চালিত করিলেন। নাবিক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত শক্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম-উপকৃত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে মধ্বাচার্য্য নাবিকের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিবার অভিপ্রায়ে এক খণ্ড গোপীচন্দন মাত্র গ্রহণ করিলেন। সেই গোপীচন্দন ভগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকটিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেই শালগ্রামশিলাময়ী প্রতিমাকে লইয়া উড়ুপী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে যে-সকল অপূর্ব্ব মধুর স্তোত্রদ্বারা বন্দনা করিয়া ছিলেন তাহাই প্রসিদ্ধ 'দ্বাদশস্তোত্র' নামে খ্যাত। যে স্থানে প্রতিমা প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান 'বডভণ্ডেশ্বর' নামে পরবর্ত্তিকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এ স্থানে অধুনা 'বডভণ্ডেশ্বর' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। 'বডভণ্ড' শব্দটি কর্ণাটক-ভাষাজাত। (বড—ভিন্ন, ভণ্ড—পিণ্ড অর্থাৎ চন্দনপিণ্ড-ভগ্নস্থল)। শ্রীমধ্বাচার্য্য এই গোপীচন্দনালিপ্ত শ্রীমূর্ত্তিকে উড়ুপীতে আনয়ন করিয়া উড়ুপীস্থ সেই বৃহৎ সরোবরে শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করেন। এই বৃহৎ সরোবরই শ্রীমধ্ব-আবির্ভাবের পর হইতে 'মধ্বসরোবর' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার আট জন সন্ন্যাসী শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মধ্বানুগত সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও এই শ্রীমূর্ত্তির সেবাধিকার

নাই। পূর্বকালে দুইমাস অন্তর এক একজন সন্ন্যাসীর সেবাকাল নির্দ্ধারিত ছিল। সোদে মঠস্থ আচার্য-পরম্পরার পঞ্চদশ অধস্তন শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামীর সময় হইতে দুই বর্ষকাল প্রত্যেকের সেবার পালা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখনও সেই নিয়ম তথায় বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণমন্দির-চত্বরের বহির্দেশে পশ্চিম-উত্তরদিকে মুখ্যপ্রাণ বা শ্রীমদ হনুমদবিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্তির দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ্যপ্রাণের মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগুরুমূর্তি বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমন্মধবাচার্যের মূর্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীমূর্তি বাদিরাজ স্বামিকর্তৃক স্থাপিত হয়। শ্রীবাদিরাজ স্বামী মধ্বসম্প্রদায়ে ‘দ্বিতীয় মধবাচার্য’ বলিয়া উক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মণেতর-কুলজাত কনকদাস-নামক এক দাসকূটস্থ মাধব-ভাগবতের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনজন্য শ্রীমন্দিরের একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে। দূরে শ্রীকনকদাসের একটি গৃহও বর্তমান রহিয়াছে। অধুনা এই স্থানে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। শ্রীকনকদাসরচিত কনড়ভাষায় বই সুললিত পদ্যগ্রন্থ বিরাজিত আছে। তাঁহার রচিত ‘হরিভক্তিসার’ নামক গ্রন্থ মাধ্বসম্প্রদায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের একদিকে গোশালা। কিয়ৎদূরে কতিপয় মাধব সন্ন্যাসীর সমাধি বর্তমান। উড়ু পীক্ষেত্র হইতে কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে আটটি মঠ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সেই অষ্ট মঠের প্রতিভূসূত্রে উড়ু পীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আটটি মঠ বর্তমানকালে অবস্থিত। এই অষ্ট মঠের নাম মূলগ্রামী মঠের নামানুসারে হইয়াছে। মাধ্বসম্প্রদায়িগণ বলেন যে, মধবাচার্যের সময় মধবশিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র বাস করিতেন। পরবর্তিকালে এই আটজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন স্থানে আটটি মঠ স্থাপন করেন। এই আটটি মঠ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে অন্য। পালাক্রমে এই মঠাধীশ সন্ন্যাসীগণই অধুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই আটটি মঠ আবার দুইটি দুইটি করিয়া ‘দ্বন্দ্ব-মঠ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব-মঠের অন্যতম মঠের একজন সেবাকার্য্য আর একজনের সহযোগী। দ্বন্দ্বমঠাধীশ কোনও সন্ন্যাসী যদি শিষ্য না করিয়াই অপ্রকট হন, তাহা হইলে দ্বন্দ্বমঠের অন্যতম মঠের মঠাধীশ নিজ শিষ্যকে সেই মঠের অধিকারী করিতে পারেন। কথিত হয় যে, কণ্ঠতীর্থ শ্রীমন্মধবাচার্য্য তাঁহার আটজন শিষ্যকে সমকালেই সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস-মন্ত্রোপদেশ প্রদানান্তর সন্ন্যাস-বেদিকার চতুর্দিক হইতে এই আটজন সন্ন্যাসী দুই দুইজন করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হন। তাঁহারাই পরবর্তিকালে দ্বন্দ্বমঠাধিকারী হন।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তির প্রত্যহ নববিধা পূজার ব্যবস্থা আছে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপূজা-ক্রম যথা—

- ১) নির্মালা-বিসর্জন পূজা— পূর্বাহ্ন ৫ ঘটিকা
- ২) উষঃকাল-পূজা— পূর্বাহ্ন ৬ ঘটিকা

৩) পঞ্চামৃতপূজা ও অভিষেক	" ৮ "
৪) উদ্বর্তন পূজা	" ৯ "
৫) তীর্থপূজা ও মহাকলসাবিষেক	" ১০ "
৬) অলঙ্কার পূজা	" ১১ "
৭) অবসর পূজা	" ১১-৩০ "
৮) মহাপূজা	অপরাহ্ন ১২-৩০ হইতে ১টা
৯) রাত্রি-পূজা	অপরাহ্ন ৮-৩০ টা

এই নববিধা পূজা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উষঃকাল-পূজার পরে গো-পূজা, উদ্বর্তন পূজার পরে শ্রীনবনীত-পূজা, তদনন্তর সুবর্ণকলস-পূজা, সায়াহ্নে চামরসেবা প্রভৃতি পঞ্চপূজা হইয়া থাকে।

পলমার মঠ ও অদমার মঠ ইহারা দ্বন্দ্বমঠ। পলমার মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীহরীকেশতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীরামচন্দ্র। অদমার মঠে মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীনরহরি তীর্থ, বিগ্রহ—চতুর্ভূজ শ্রীকালীয়মর্দন কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণপুর মঠ ও পুত্তেগী মঠ দ্বন্দ্ব-মঠ। শ্রীকৃষ্ণপুর মঠের মূলমঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীজনার্দন তীর্থ, বিগ্রহ—দ্বিভূজ কালীয়মর্দন কৃষ্ণ। পুত্তেগী মঠের মূলমঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিষ্ঠলদেব। শীরুর মঠ ও সোদেমঠ দ্বন্দ্বমঠ। শীরুর মঠের মূলমঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীবামনতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিষ্ঠলদেব। সোদে মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবরাহদেব। কাণুরু মঠ ও পেজাবর মঠ দ্বন্দ্ব-মঠ, কাণুরু মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য শ্রীরামতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীনৃসিংহ। পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ—মধ্বশিষ্য শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিষ্ঠলদেব।

অ' রা যেকালে উড়ুপীগ্রামে গিয়াছিলাম, তখন কৃষ্ণপুর-মঠাধীশ শ্রীমদ বিদ্যাপূর্ণ তীর্থ কৃষ্ণদেবের সেবান্যাসপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মধ্বশিষ্য শ্রীজনার্দন তীর্থ হইতে উন ব্রহ্মাংশ অধস্তন। আমরা যেকালে শ্রীঅনন্তেশ্বরের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলাম, তৎকালে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরে স্বামিপাদ স্বয়ং গোশালায় উপস্থিত থাকা গবাদির শুশ্রূষা অবলোকন করিতেছিলেন ; আমরা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একটা ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সহিত দেবভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার সেবাসম্বন্ধীয় নামাপ্রকার বৈষয়িক কার্য উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা গৌড়দেশ হইতে তথায় গিয়াছি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন যে, আমরা কৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরা হইতে আগমন করিয়াছি। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উড়ুপী আগমন ও তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্তের কথা তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ বলিলে তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদবিচারে ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, প্রত্যহ তাঁহাকে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করা সকলেরই কর্তব্য। তিনি

আমাদিগকে কিছু ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিলেন এবং দিবসত্রয় উড়ুপী ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভগবৎশৃঙ্গারাদি দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমাদের সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন তথায় অবস্থান সম্ভবপর হইল না। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বদেশী শিল্প বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী। উপাধ্যায় মহাশয় মীমাংসা শাস্ত্রে ‘শিরোমণি’ উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং কিছুকাল বরদারাজ্যে কিউরেটরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বিশেষ সদালাপী। আমরা উড়ুপী হইতে কতিপয় সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিলাম। একটি ব্রাহ্মণ-গৃহে আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। তথায় পাকাদি করিয়া প্রসাদ সেবার পরে, মোটরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেইকালে উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আরও দুই-তিনটি স্বদেশী বন্ধু সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপের পর ম্যাস্গালোর যাত্রার জন্য উদ্যোগ হইলাম। শুনিলাম, তথাকার দেওয়ানী আদালতের মুন্সেফ মহাশয় শ্রীমধ্বশাস্ত্র স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তৎপ্রচারে বিশেষ উৎসাহবিশিষ্ট। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ের অভাবের জন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। আসিবার কালে উপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীমধ্বশাস্ত্রধীত একজন সুযোগ্য অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। ম্যাস্গালোরে আসিতে পথিমধ্যে চারিটি স্থানে চারিবার নদী পার হইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ পাঁচবার মোটরবদল করিতে হইয়াছিল। সর্বত্রই পারের জন্য নৌকা পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাস্গালোর হইতে উড়ুপী ৩৬ মাইল। প্রত্যহই অনেক যাত্রী উড়ুপী হইতে ম্যাস্গালোরে যাতায়াত করেন। কয়েকটি কোম্পানির মোটর লরী যাত্রীদিগের বহনকার্যে নিযুক্ত আছে। আমরা অপরাহ্নে ম্যাস্গালোরে উপস্থিত হইলাম।

(প্রভুপাদের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত)

বেদান্তে-শব্দবাদ

জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

শব্দ দুই প্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-শব্দ—যা আপনারা এই শিক্ষা-বিভাগ হতে লাভ করছেন বা করেছেন। একে প্রাকৃত-শব্দ বলবার কারণ এই যে, প্রাকৃত-শব্দ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যে আকাশ, তা হতে উৎপন্ন। বৈজ্ঞানিকগণের মতে—মরুৎ বা বায়ুর আলোড়নে শব্দের উৎপত্তি হয়। তা ছাড়া বৈয়াকরণিকগণ শব্দের

উৎপত্তিস্থান হিসাবে এই প্রাকৃত দেহগত কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্ত—এইপ্রকার নিরূপণ করেছেন। সুতরাং আপনারা যে-সমস্ত শব্দ শিক্ষা করেছেন, তার উৎপত্তিস্থান প্রকৃতি। এইজন্যই এ'কে 'প্রাকৃত-শব্দ' বলে উল্লেখ করছি। অপ্রাকৃত-শব্দের সাথে ঐ শব্দের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃত-শব্দ আমাদের প্রাকৃত-ভাবই উদ্দীপন করে। অপ্রাকৃত-শব্দ আমাদেরকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে।

এইস্থানে পূর্বপক্ষ হতে পারে—যদিও কণ্ঠ অন্যান্য চারটি ইন্দ্রিয়ের অধিকার হতে পৃথক্, তথাপি কণ্ঠও যে একটি ইন্দ্রিয়-বিশেষ, এতে কোন সংশয় নেই। সুতরাং সেই কণ্ঠ-ইন্দ্রিয়টি যে-বস্তু গ্রহণ করতে সমর্থ, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ল। তা হলে আপনার ঐ অপ্রাকৃত-শব্দ কিভাবে কণ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে? আর হলেও ত' তাতে দোষ থেকে যাবে।

এই পূর্বপক্ষের উত্তরে আমি আপনাদের সামনে একটা উদাহরণ দিয়ে এর মীমাংসা করছি। অবশ্য উদাহরণটি সর্বাপেক্ষ সুন্দর না হলেও আমার বক্তব্য-বিষয়ের প্রমাণে Nearer Approach হবে। আমরা জানি—লৌহ-বস্তুতে নিজস্ব দাহিকা শক্তি নাই এবং তা কঠিন আর কাল রঙের হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে তেজোধর্ম-বিশিষ্ট অগ্নি যখন প্রবেশ করে, তখন সেই লৌহের দহনক্ষমতা দেখা যায়। কঠিন্য-ভাব পরিবর্তিত হয়ে তার কোমলতার-ভাব লাভ হয়—সাথে সাথে তা নিজ বর্ণ ত্যাগ করে অগ্নির বর্ণ লাভ করে। আপনারা এখন বিবেচনা করে দেখুন, প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত বস্তুর দ্বারাই যদি এইপ্রকার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়, তবে অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত-শব্দ তা হতেও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ফলদায়ক হবে না কেন? লক্ষ্যেতে সহস্রের অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে সন্দেহ করার কি আছে? 'পৌরাণিক'-গণের 'সম্ভব'-নামক প্রমাণের দ্বারা এটা স্থাপিত হয়েছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শব্দের ঐপ্রকার ক্ষমতা কিপ্রকারে সম্ভব হবে এবং শব্দই যে ঐপ্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট, তার প্রমাণ কি? এস্থলে আপনাদের কাছে আমার নিবেদন—আমরা বাল্যকাল থেকেই আস্তিকতার কথা শুনে আসছি। আমাদেরকে কেহ নাস্তিক বললে আমাদের মনে অশান্তি বোধ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে। কারণ, আমরা ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই বেদকে বিশ্বাস করে থাকি। আস্তিক বললে সাধুবাক্য, বেদবাক্য, ও ভগবান—এই তিনটি তত্ত্বে বিশ্বাসকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সাধুর বাক্য অর্থাৎ 'শব্দ', বেদের বাক্য অর্থাৎ 'শব্দ' এবং ভগবান বললেও 'শব্দ'কেই বুঝতে হবে। কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করতে হলে 'প্রমাণ-প্রমেয়'-বিচার বিশেষ প্রয়োজন। প্রমাণতত্ত্ব প্রমেয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হলে অর্থাৎ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট হলে তাতে ব্যবধান-জন্য নানাপ্রকার দোষ হওয়ার সম্ভাবনা। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—আমি আমার পরিচয় দিলে যে-প্রকার সুষ্ঠু হয়, অপর ব্যক্তি যিনি আমার পরিচয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা কিছুমাত্র অভিজ্ঞ, তিনি আমার পরিচয় দিতে

গেলে তা সর্বাসুন্দর হতে পারে না। এর দ্বারা আমি বলতে চাই—‘শব্দ’ই ‘শব্দে’র পরিচয় প্রদান করবে। শব্দ ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা পরিচয় পেতে গেলে তা কখনই সূষ্ঠু পরিচয় হবে না। এইজন্য শব্দবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শব্দকেই মূল প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন।

প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়। চার্বাক একটা মাত্র ‘প্রত্যক্ষ’-প্রমাণকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। কণাদ ও গৌতম ‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘অনুমান’—এই দুইটা মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনে ‘প্রত্যক্ষ’ ‘অনুমান’, ও ‘শব্দ’ অর্থাৎ আপ্তবাক্য—এই তিনটা প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়-দর্শনে ৪টা প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও ‘উপমান’ স্বীকৃত হয়েছে। প্রভাকর ঐ ৪টা আর ‘অর্থাপত্তি’ নিয়ে ৫টা প্রমাণ স্বীকার করেছেন। ভট্ট ঐ ৫টা ও ‘অভাব’ বা ‘অনুপলব্ধি’ নিয়ে ৬টা প্রমাণ স্বীকার করেছেন। পৌরাণিকগণ ঐ ৬টা প্রমাণের উপর ‘সম্ভব’ ও ‘ঐতিহ্য’ নিয়ে ৮টা প্রমাণ স্বীকার করেছেন। এইভাবে নানাপ্রকার দার্শনিকগণের প্রমাণতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু সৎ-সম্প্রদায়ী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শব্দকেই একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি বলে গ্রহণ করেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল দার্শনিক আচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে বলেছেন,—

“পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্টত্বাৎ সূত্রাং অচিন্ত্য-অলৌকিক-বস্তু-স্পর্শাযোগ্যত্বাৎ চ তৎপ্রত্যক্ষাদিন্যপি সদোষাণি; ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যানাদিসিদ্ধ-সর্বপুরুষ-পরম্পরাসু সর্বলৌকীকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাৎ অপ্রাকৃতবচন-লক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্বাভীত-সর্বাশ্রয়-সর্বাচিন্ত্য-আশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদযতাং প্রমাণম্।”*

এই মহাপুরুষ-বচনে আমরা জানতে পারি—‘শব্দ’ ছাড়া অর্থাৎ বৈষ্ণবী ভাষায় আশ্রয়-বাক্য ছাড়া সমস্ত প্রমাণগুলিতেই পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতারূপ করণাপাটব দোষগুলি অবশ্যই থাকে—সেইজন্য ঐগুলিকে বিশুদ্ধ প্রমাণ বলে স্বীকার করা যেতে পারে না; পূর্বেই আপনাদের বলেছি,—প্রমাণ যদি প্রমেয়ের সমজাতীয় না হয়, তাহলে প্রমাণ নির্ণয়ে ব্যাঘাত উৎপত্তি হয়। আর ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষে পরিপূর্ণ প্রমাণদ্বারা প্রমেয় নির্ণয় করতে গেলে তাতে প্রমেয় নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে না। সূত্রাং শব্দ-সম্বন্ধে আপনাদের সংশয় দূর করতে নির্দোষ শব্দই একমাত্র সমর্থ।

* মানবগণ এই জগতে ‘ভ্রম’ প্রভৃতি চারিটা দোষযুক্ত হওয়ায় এবং সেইজন্য অলৌকিক অচিন্ত্য-স্বভাব-বস্তু স্পর্শ করিতে অযোগ্য হওয়ায়, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলিও অতএব দোষযুক্ত। সূত্রাং ঐগুলি প্রমাণ নহে। সকলের অতীত, অচিন্ত্য ও আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু জানিতে ইচ্ছুক আমাদের পক্ষে অনাদিসিদ্ধ, সর্বপুরুষ-পরম্পরাক্রমে সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক-জ্ঞানের নিদানরূপ অপ্রাকৃতবচনযুক্ত বেদই একমাত্র প্রমাণ।

প্রত্যক্ষাদি যে-সব প্রমাণের কথা বলা হ'ল, তার বিস্তারিত আলোচনা না করে দুই একটা মাত্র প্রমাণের দোষ দর্শন করিয়ে আমি প্রমাণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করব। আপনারা এই হলের ভিতর বসে আছেন, আপনাদের পিছনে এই সুবৃহৎ অটালিকার প্রাচীর বর্তমান। এই স্থানে বসে এই প্রাচীরের অন্যপার্শ্বে কোন বস্তু আছে কি না, তা আপনারা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না। এখন যদি আমরা কেহ বলি—এই প্রাচীরের অন্যপার্শ্বে কোন বস্তুই নাই, তাহলে কিপ্রকার ভুল হয়—আপনারা চিন্তা করে দেখুন। কলম্বাসের 'New world' আবিষ্কারের পূর্বে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা চালিত হয়ে তার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কেমন অজ্ঞ ছিলাম! সুতরাং দেখুন, চার্বাকের মত একটা মাত্র 'প্রত্যক্ষ'-প্রমাণ স্বীকার করলে প্রমেয়-সম্বন্ধে অর্থাৎ কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞানলাভের মধ্যে কতটা ভ্রম প্রবেশ করে! চার্বাক বলেন যে-বস্তু প্রত্যক্ষ হয়নি, তার অনুমান সম্ভব নয়; সুতরাং অন্যান্য প্রমাণসমস্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব অধিক প্রমাণ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। চার্বাকের মত-অনুসারে—অন্য প্রমাণগুলিকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত ব'লে স্বীকার করলে মূল ও পূর্ণবস্তুতে দোষ প্রমাণিত হয় এবং সাথে সাথে তাঁর শাখা ও অন্তর্ভুক্ত বস্তুতেও দোষ প্রবেশ করে—এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। আমি এই অল্পসময়ের মধ্যে এই বিষয়ের আর অধিক আলোচনা-দ্বারা সময় নষ্ট না করে বরং 'শব্দ'-প্রমাণরূপ প্রমেয়কে শব্দ-প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। (ক্রমশঃ)

শ্রীল গুরুমহারাজের পত্র

শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ,
কঙ্কাল, হরিদ্বার।

স্নেহাঙ্গদেব,

তোমাদের স্নেহলিপি পাইয়া তাহার উত্তর দিয়াছি। সাক্ষাৎভাবেও শ্রী——র সহিত মঠ-মিশনে সেবকরূপে অবস্থানের নীতি-আদর্শ, আইন-শৃঙ্খলা লইয়াও কিছু আলোচনা করিয়াছি। তোমাদের ৩ জনের মধ্যে——দাসই সর্বাপেক্ষা বয়ঃ কনিষ্ঠ, সুতরাং তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা রাখিয়া তোমরা ২ জন মঠ-মন্দিরের আইন-শৃঙ্খলা স্নেহাঙ্গদেব বর্ষণ করিবেন।

শ্রী——দাসকে শ্রী——গৌড়ীয়-মঠের মঠরক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহার নির্দেশ ও ইচ্ছানুসারেই তোমাদের মঠের সেবা কার্যাদি করা উচিত। তাহাকে সর্বদা মান্য করিয়া চলা উচিত। তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, অনুমতি না লইয়া খেয়াল খুশিমতো যেখানে সেখানে যাতায়াত করা

মঠবাসিগণের কখনই কর্তব্য নহে। বৈষ্ণবধর্ম আনুগত্যের ধর্ম, আনুগত্যহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে, আত্মধর্ম হইতে পতিত হহতে হয়। শ্রীগুরুদেব, ভগবান্ কখনও ভ্রষ্টাচারীকে কৃপা করেন না। তাহাদের জীবন বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ঐরূপ ব্যক্তিগণের গুরুগৃহে, মঠ-মন্দিরে বাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় ব্যতীত অন্যকিছু সংশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। আশাকরি সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমরা কখনও ঐরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিবে না।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত বিচার-অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের সেবাময় জীবনাদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলে বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। কোন দিন তাহাদের অনুকরণ করিতে যাইও না। সেবক হইতে গিয়া “প্রভু” সাজিও না, চরম দুর্দশা বরণ করিও না। অপরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজ আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করিলে অধিক উপকার হইবে। শাসন গ্রহণ করিয়া শিষ্য হওয়া শ্রেয়ঃ। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-উপদেশ নির্বিচারে পালন করিতে পারিলে “শিষ্য” বা “সেবক” হওয়া যায়। প্রত্যহ নির্বন্ধ সহকারে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে সেবককে কোন দিনই প্রাকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, ত্যাগী, যোগী, অন্যভিলাষী হইতে হয় না। উচ্চৈশ্বরে মহামন্ত্র কীর্তন করিলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয় ও জাড্যভাব পলায়ন করে। সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া কোন সেবকেরই উচিত নয়। সর্ব্বদা ভগবৎ ও ভাগবতের সেবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়াই সেবকের একমাত্র ধর্ম্ম। গ্রাম্য ব্যক্তিগণের নিকট গ্রাম্য কথা আদরের বস্তু হইলেও, সেবকগণ উহাতে উৎসাহ লাভ করেন না। বহির্মুখ ব্যক্তিগণের প্রার্থিত সম্মান দিতে পারিলেই ভাল। তাহাদের লৌকিক-ব্যবহার কখনই আদর বা অনুমোদন করিতে হইবে না। ভগবৎসেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া গৃহস্থগণের ব্যবহারিক সম্মান রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু কোনদিনই তাহাদের গোলাম হইয়া যাইতে হইবে না।

“বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মনে নাহি কৃষ্ণের স্মরণ।।”

—এই নির্দেশনামা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ব্রজে বাস করিলেই সকলে ব্রজবাসী হয় না। অপ্রাকৃত ব্রজবাসীরই মাধুকরী ভিক্ষায় অধিকার জানিবে। অপ্রাকৃত নিগূর্ত্তহে জড় প্রাকৃত বিচার আরোপ করাই প্রাকৃত সহজিয়া বিচার। সজ্জনকে অসাধু বলা ও ভ্রষ্টাচারীকে ভক্ত বলা সমান অপরাধ। অধিকার বিচার সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অনধিকারীকে অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা আর অধিকারী ব্যক্তির সামর্থ্য অস্বীকার করা দুইই সমান দোষত্রুটি রূপে পরিগণিত।

“নিজের মান-সম্মান-প্রতিপত্তি জাহির করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণবের সম্মান-খর্ব্ব করা বা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অবমাননা করা কোন বৈষ্ণবেরই উচিত নহে।” অপরের দোষানুসন্ধান না করিয়া তাহার সামান্য গুণের প্রশংসা করিলেও মানসিক

শান্তি লাভ হয়। বদ্ধজীবের পক্ষে অপরের গুণ-দোষ-বিচার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অপরের গুণের প্রশংসা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। অপরের দোষানুসন্ধান করিতে গেলে অনেক সময়ে মানুষকে সেই দোষই আক্রমণ করিয়া বসে এবং ভজন-সাধন পথে অধঃপতন ঘটায়। ইহাতে নিজের চিত্তও কলুষিত হয় এবং নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মানসিক ভাব কার্য্যে নষ্ট হয়। এ বিষয়ে গীতার—

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ক্রোধাভুবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥” শ্লোক যথার্থ উদাহরণ।

তোমরা সকল সেবক মিলিয়া মিশিয়া মঠে সেবা-কার্য্যাদি করিবে এবং মঠের দৈনন্দিন সেবা বজায় রাখিবে। যদি পরস্পর ঝগড়া-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হও, তবে সুবিধাবাদী দল তোমাদের উপহাস করিবার সুযোগ পাইবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখিয়া গুরু-বৈষ্ণবের সেবা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কাহারও কোনদিন মঙ্গল হইতে পারে না। যিনি গুরুসেবা বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা বা শিক্ষাগুরু, নামগুরুর অধিক মহিমা মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা একই পর্য্যায়ভুক্ত ; তোমরা আমার স্নেহাশীষ জানিবে। —ইতি

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

প্রীতভক্তিবদান্ত বামন।

২৭।৮।১৯৮৯



উপনিষদ্-বাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৫১ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থপ্রশ্ন—‘গার্গ্যমুনি’ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই মনুষ্য শরীর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলে পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে এবং কাহার নিদ্রাভিভূত হয়? স্বপ্নাবস্থাতে ইহাদের মধ্যে কে স্বপ্নজাত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে? নিদ্রাকালে নিদ্রা-সুখ অনুভব কাহার হয়? আর এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি কাহার আশ্রয়ে?

পিপ্পলাদ কহিলেন—সূর্য্যাস্তকালে যেরূপ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যের সমস্ত তেজঃপুঞ্জ মিলিত হইয়া সূর্য্যই অবস্থান করে, তদ্রূপ গাঢ় নিদ্রাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় মনে বিলীন হইয়া থাকে। এজন্য সে-সময়ে জীবাত্মা দেখে না—শুনে না—স্বাগ গ্রহণ করে না—আস্বাদ করে না—স্পর্শ করে না—বলে না—চলে না—গ্রহণ করে না—মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে না—মৈথুনাদি উপভোগও করে না। তৎকালে দশ

ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। তখন লোকে বলিয়া থাকে—এ’ব্যক্তি নিদ্রিত। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ সূর্য্যের কিরণসমূহ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ জাগ্রত হইলে পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে। নিদ্রার সময় মনুষ্য-শরীরে পঞ্চপ্রাণ জাগ্রত থাকে। নিদ্রাকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া প্রাণকে অগ্নিরূপ বর্ণন করিতেছেন। প্রাণের ‘অপান’ ভাগ—‘গার্হপত্য’ অগ্নি; ‘ব্যান’—‘অম্বাহার্য্য’-পতন নামক দক্ষিণাগ্নি; যজ্ঞে আহবনীয় অগ্নিকে ‘গার্হপত্য’ অগ্নি হইতে যেরূপ উঠাইয়া লওয়া হয়, তদ্রূপ গার্হপত্য অগ্নিরূপ অপান হইতে প্রাণ উঠিয়া থাকে ; এ’কারণে মুখ্যপ্রাণকেই আহবনীয় অগ্নিরূপে বলা হইয়াছে। প্রাণের শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ—এই দুইটি যজ্ঞের আত্মতি-প্রদানরূপে কল্পিত হইয়াছে। আত্মতিদ্বারা শরীরের পোষক তত্ত্বসকল শরীরে প্রবেশ করে। তাহাই হবিঃ-স্বরূপ। এই হবিকে প্রয়োজন-অনুসারে শরীরের সর্বত্র পৌছাইয়া দেওয়া কার্য্য ‘সমান’-বায়ুর। ইহাকে ‘হোতা’ বা ‘ঋত্বিক’ বলা হয়। মনই যজমান-স্বরূপ। উদান বায়ু তাহার অভীষ্ট ফল। কারণ, যেরূপ অগ্নিহোত্রকারী যজমানের অভীষ্ট ফল তাহাকে স্বর্গাদি লোকে ভোগ করাইবার জন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ উদান বায়ু প্রতিদিন নিদ্রার সময় মনকে কর্ম্মফলের ভোগস্বরূপ ব্রহ্মলোকে (পরমাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়গুহাতে) লইয়া যায়। তথায় মন দ্বারা জীবাত্মা নিদ্রাজনিত বিশ্রামসুখ অনুভব করে। জীবাত্মারও নিবাসস্থান সেইখানেই। নিদ্রাকালে ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না, তথায় গমন করিলে আর পুনরাবর্তন (ফিরিতে) হয় না। নিদ্রাসুখ—তামস-সুখ, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সুখ—ত্রিগুণাতীত।

কে স্বপ্ন দর্শন করেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মাই স্বপ্নাবস্থায় মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা নিজ বিভূতি অনুভব করে। পূর্ব্বে যেখানে যাহা বারম্বার দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, বা অনুভব করিয়াছে, সে-সকলই এসময়ে দেখে, শুনে, ও অনুভব করে। কিন্তু এরূপ নিয়ম নাই যে—জাগ্রত-অবস্থায় যে-প্রকারে, যে-ভাবে, যে-স্থানে, যে-ঘটনা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে, স্বপ্নেও তদ্রূপ অনুভব হইবে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থার জাগ্রতকালের কোন ঘটনার অংশ অন্য এক ঘটনার কতকাংশের সহিত মিলিত অবস্থায় এক নূতন রূপে দৃষ্ট হয়। এজন্য বলা হয় যে, স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থার দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বস্তুরও অনুভব হয়। বাস্তবিক যাহা আছে বা যাহা নাই, সবই স্বপ্নে দেখা, শুনা বা অনুভব করা যায়। এইপ্রকার স্বপ্নকালে বিচিত্র চক্ষে বিচিত্র ঘটনার দর্শন করে এবং জীবাত্মাও বিচিত্ররূপ ধারণ করে। তৎকালে জীবাত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

নিদ্রাসুখ অনুভব হয় কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—নিদ্রাকালে যখন মন উদান-বায়ুর অধীন হয় অর্থাৎ মনকে জীবাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়গুহায় লইয়া গিয়া মোহিত করিয়া রাখে, তখন জীবাত্মা মনের দ্বারা স্বপ্নের ঘটনা দেখে না। তখন

নিদ্রাজনিত সুখ জীবাত্তারই হয়। জীবাত্তাই শরীরের সুখ-দুঃখ ভোগ করার কর্তা। গীতাতেও বলিতেছেন—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্(১৩।২১)।

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি কাহার আশ্রিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ যেরূপ সন্ধ্যাকালে নিজ নিজ নিবাসভূত বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ পৃথ্বী হইতে প্রাণ-পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব সর্ব্বাত্তা পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকে। তিনিই সকলের পরম আশ্রয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, তাহাদের বিষয়—রূপরসাদি, চারিপ্রকার অস্তঃকরণ, আর পঞ্চ ভেদ-বিশিষ্ট প্রাণবায়ু সবই পরমাত্মার আশ্রিত। স্থূল পৃথিবী ও তাহার কারণ গন্ধ-তন্মাত্রা, স্থূল জগৎতত্ত্ব ও তাহার কারণ রস-তন্মাত্রা, স্থূল তেজঃতত্ত্ব ও তাহার কারণ রূপ-তন্মাত্রা, স্থূল বায়ুতত্ত্ব ও তৎকারণ স্পর্শ-তন্মাত্রা এবং স্থূল আকাশ ও তৎকারণ শব্দ-তন্মাত্রা, পঞ্চভূত, নেত্র-ইন্দ্রিয় ও তাহার দৃশ্যবস্তু-সকল, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা শ্রবণের বস্তুসকল, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার আত্মাণের বস্তুসকল, রসনা-ইন্দ্রিয় ও তাহার আত্মাদনের দ্রব্যসমূহ, ত্বক্-ইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা স্পর্শের বস্তুসকল, বাক্-ইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা কথনীয় শব্দসকল, হস্তদ্বয় ও তদ্বারা গ্রহণযোগ্য দ্রব্যাদি, চরণদ্বয় ও তাহাদের গমনের স্থান, উপস্থ-ইন্দ্রিয় ও তদ্বারা কৃত কর্মসকল, গুহ-ইন্দ্রিয় ও তদ্বারা মলত্যাগাদি, মন ও তদ্বারা মনন-কার্য্যসকল, বুদ্ধি এবং তদ্বারা জানিবার বস্তুসমূহ, অহঙ্কার ও তাহার বিষয়, চিত্ত ও তদ্বারা চিন্তনীয় বিষয়, এবং পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণ ও তদ্বারা ধৃত জীবন—সকলই পরমেশ্বরের আশ্রিত। দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, ঘ্রাণগ্রহণকারী, আত্মাদনকারী, মননকারী, সমস্তকর্ম্মের কর্তা বিজ্ঞান-স্বরূপ পুরুষ জীবাত্তাও সেই সর্ব্বাত্তা পরমেশ্বরের আশ্রিত এবং তাঁহাতেই স্থিত। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীবাত্তা পরমশান্তি লাভ করে। অতএব পরমেশ্বরই জীবাত্তার পরম-আশ্রয়। দৃঢ়তার সহিত ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে-কোন ব্যক্তি সেই ছায়া রহিত, প্রাকৃত শরীর-রহিত, বর্ণ-রহিত, গুহ্র(বিশুদ্ধ), অবিনাশী পরমাত্মাকে জানিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ হইয়া যায়।

পঞ্চম প্রশ্ন—‘সত্যকাম’ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যে-ব্যক্তি আজীবন উত্তমরূপে ওঁকারের উপাসনা করে, তাহার সেই উপাসনা-ফলে কোন্ লোক প্রাপ্তি হয়?

পিপ্পলাদ উত্তর করিলেন—ওঁকার ‘পর’ ও ‘অপর’ ব্রহ্ম-স্বরূপ। ‘পর’—পরমেশ্বর, আর ‘অপর’ তাঁহার বাহ্য বিরটি রূপ। এই ওঁকার অবলম্বনে জপ, স্মরণ ও চিন্তন করিয়া নিজ ইষ্ট অনুরূপ বস্তু প্রাপ্ত হয়। ওঁকারের এক মাত্রার চিন্তাকারী ব্যক্তি অর্থাৎ ভুলোকের ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া ওঁকারের উপাসনাকারী ব্যক্তির ভুলোকে জন্ম হয়। সেইখানে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উত্তম আচরণপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য উপভোগ করে। মৃত্যুর পরে পুনরায় মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নানাপ্রকার সুখভোগ করে।

যদি সাধক দ্বিমাত্রায় অর্থাৎ ভূঃ ও ভুব-লোকের ঐশ্বর্য্য অভিলাষী হইয়া উপাসনা করে, তবে সে মনোময় চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। সে স্বর্গলোকে নানাপ্রকার বিষয় উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং কৰ্ম্ম-অনুসারে মনুষ্য বা অন্য কোন যোনিতে গমন করে।

উপরিউক্ত উপাসনাদ্বয় ‘অপর’ ব্রহ্মের। এতদ্ব্যতীত যদি কেহ ওঁকার দ্বারা ত্রিমাত্রায়ুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই উপাসনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কৰ্ম্মবন্ধন-মুক্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয়। ওঁকারবাচ্য পরমেশ্বরের এই জগৎরূপ বিরাট-স্বরূপ তাঁহার অবিনাশী স্বরূপ নহে, ইহা পরিবর্তনশীল। এখানে অবস্থানকারী জীব অমর হইতে পারে না। কিন্তু উচ্চযোনি প্রাপ্ত হইলেও তথা হইতে পতিত হইয়া নীচ যোনিতে গমন করে এবং জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয় না। সুতরাং জাগতিক অভিলাষী পুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ শরীরের বাহ্য, অভ্যন্তর বা শরীরের মধ্যবর্তী হৃদয়-দেশে সর্বত্র সকল ক্রিয়াতে ওঁকারের বাচ্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ব্যাপ্ত জানিয়া উপাসনা করে, এবং তাঁহাকে পাইবার আশায় সাধনা করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং তথা হইতে বিচলিত হয় না—শান্ত অজর অমর ও অভয় হইয়া নিত্যধামে নিত্যকাল অবস্থান করে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোশল রাজকুমার হিরণ্যনাভ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তুমি ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষের বিষয় জান কি না? আমি তাহাকে ‘জানিনা’ বলিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। সেজন্য আমি আপনার নিকট সেই ষোড়শ কলা পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

পিপ্পলাদ বলিলেন—যে-পরমেশ্বর হইতে ষোড়শ কলাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ জগদ্ভা বিরাট শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, উনিই সেই পুরুষ। তাঁহাকে ‘অনুসন্ধানের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। তিনি আমাদের শরীরের ভিতরে বর্তমান।

মহাসর্গের আদিতে পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিচার করিয়াছিলেন—আমি যে ব্রহ্মাণ্ড রচনার্থ ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাতে এমন কি তত্ত্ব স্থাপন করা যায়, যাহা না থাকিলে আমি স্বয়ং তথায় থাকিতে পারিব না। প্রথমে তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, মন, ইন্দ্রিয়, অন্ন, বীর্য্য, তাহার পর তপ, মদ্র, কৰ্ম্ম, লোকসকল ও লোকসকলের নাম রচনা করেন। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামের নদীসকল নিজ উদ্যম-স্থান সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাতে যুক্ত হয়, তখন নদীর নিজ নামের আর পৃথক্ পরিচয় থাকে না, অর্থাৎ নাম-রূপাদি থাকে না, তাহারও সমুদ্রের ন্যায় হইয়া যায়, তদ্রূপ সর্বসাক্ষী সর্বব্যাপী পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই ষোড়শকলা ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়কালে নিজ পরম-আধার পরমেশ্বরে অবস্থিত হইয়া যায়।

তখন আর ইহার পৃথক্ নাম-রূপ থাকে না। তখন পরমাত্মার নামেই ইহার বর্ণন হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত কলারহিত অমৃতস্বরূপ। এই তত্ত্বকে জানিলে মনুষ্যও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অকল ও অমর হইয়া যায়। যে-প্রকার রথের নাভিতে সংযুক্ত ‘অরা’ সেই নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ প্রাণ আদি ষোল কলার যিনি আধার, এসকল যাঁহার আশ্রিত, যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যাঁহাতে অবস্থিত হয়, তিনিই সকলের জ্ঞাতব্য বস্তু—পরমেশ্বর। তাঁহাকে জানিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যুদেবের কবলে পুনরায় গমন করিয়া জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। চির দিনের জন্য অমর হইয়া যায়।

অতঃপর পিপ্পলাদ সেই ছয় জন ঋষিকে বলিলেন,—সেই পরমেশ্বরের বিষয় আমি যাহা জানি, তাহা তোমাদের নিকট বলিলাম। ইহার অধিক আর কিছুই বক্তব্য নাই। তৎপরে ঋষিগণ পিপ্পলাদের যথাযোগ্য পূজা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন—আপনিই আমাদের বাস্তবিক পিতা, যেহেতু আমাদের সৎসার-সমুদ্রের পারে পৌছাইয়া দিলেন। আপনাকে বারংবার নমস্কার।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রীতী মহারাজ

—ঃ০ঃ—

সাধুসঙ্গের মহিমা

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা। এজগতে যত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা একমাত্র সাধুসঙ্গের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদ-ধ্রুব-শুকদেব গোস্বামী-শ্রীনারদশিষ্য মৃগারি ব্যাধ, জড়ভরত, জগাই-মাধাই, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাধুসঙ্গের প্রভাবেই স্বনামধন্য হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে যে—

“কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।

ভক্তির ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয়।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২/৮০, ৫৯, ৫১)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৬/২৬) উক্ত আছে—“ততো দুঃসঙ্গমুৎসজ্য সংসু সজ্জাত বুদ্ধিমান্।” শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—“ভক্তি রেবৈনং নয়তি, ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।।” (মাঠর শ্রুতি বচন)

উপরোক্ত ও শ্লোক পয়ারগুলি ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে,—মূল না থাকিলে

যেমন গাছ বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গ না করিলে জীবের ভক্তিলতা বাঁচিবে না অর্থাৎ তাহার ভক্তি হইবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মূল কারণই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গক্রমে যদি জীবের কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলে ঐ ভক্তি ক্রমশঃ প্রেমফল প্রদান করিয়া থাকে। মহৎকৃপা না হইলে কোন ভাবেই ভক্তি হইবে না ; এমন কি ভক্তিতো দূরে থাকুক সংসার আসক্তিই যাইবে না। সেইজন্য সকল শাস্ত্র দুঃসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে ভক্তিলাভ হইলে ভক্তিই ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভগবানের দর্শন করাইয়া দেন। ভক্তিরই বশ ভগবান। এইজন্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জীবের যে চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও এই সাধুসঙ্গ হইতেই লাভ হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে,— সাধু কাহাকে বলিব?

উত্তরস্বরূপ বলা যাইতে পারে শুদ্ধ হরিভক্তকেই সাধু বলা যায়। ‘হরি ওঁ তৎসৎ’ অর্থাৎ শ্রীহরির একমাত্র শুদ্ধবস্তু। সেই ভগবান শ্রীহরির শ্রীচরণকমল যাঁহারা আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহরাই সাধু। এক কথায় বলা যায় শুদ্ধ বৈষ্ণবই সাধু। এখন শুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে তাহা তাহা এখানে বিবৃত হইতেছে।

কৃপালু, অকৃতদোহ, সত্যসার সম।
নির্দোশ, বদান্য, মৃদু শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্বোপকারক, শাস্ত, কৃষ্ণেকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ।।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।

সুতরাং সাধু হইতে হইলে এই সকল গুণাঙ্ঘিত হইতে হইবে। তথা স্ত্রীলোকে আসক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত আছে যে,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর।।

ব্যাখ্যা করিলে ইহা জনা যায় যে, যিনি সাধু হইবেন তিনি অবশ্যই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। অসৎসঙ্গ দুইটি—এক স্ত্রীলোকে আসক্তি, আর দ্বিতীয় কৃষ্ণ-অভক্তের সঙ্গ। এই দুইটির সঙ্গ সাধুকে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত গুণে গুণাঙ্ঘিত হইলে তবেই তাহাকে সাধু বলা যায়। সুতরাং জীব যদি এহেন সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অশেষ দুঃখের নিলয় এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীভগবৎ-সেবা প্রাপ্তিরূপ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে।

এক্ষণে দুএকটি উদাহরণ দিয়া সাধুসঙ্গের মহিমা বর্ণন করিতেছি। মালদহ জেলার কোন এক গ্রামে রাম নামে এক সিঁদেল চোর বাস করিত। লোকের বাড়ীতে সিঁদ

দিয়া যাহা পাইত তদ্বারা সে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। কোন এক সময়ে উক্ত রাম নিজগ্রাম হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরে জনৈক ধনীর বাড়ীতে সিঁদ দেওয়ার জন্য মধ্যরাতে বাহির হয়। প্রায় তিন মাইল যাওয়ার পর সে শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। ঐ রাস্তার ধারে একজন সাধু মাহাত্মা একটি আশ্রম করিয়া ভজন করিতেন। গরমের দিন ছিল—আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিতে-ছিলেন। মধ্যরাত্রে দ্রুতবেগে রামকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মিষ্টস্বরে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন। রাম উক্ত মিষ্টস্বর শ্রবণ করিয়া সাধুজীর নিকটে না যাইয়া পারিল না। সাধুজীর নিকট গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুজী তাহাকে একটি আসন দিয়া বসিতে বলিলেন। সাধুজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার নাম কি এবং এত রাত্রে হনহন করিয়া কোথায় যাইতেছ?” তখন সিঁদেল চোরটি বিপদে পড়িয়া গেল, সে সাধুর নিকট সত্য বলিবে কি মিথ্যা বলিবে ভাবিয়া কুল পাইল না। তখন সাধুজী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই, আমি পুলিশে কোন খবর দেব না, তুমি নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার।” সে কথা শুনিয়া চোরটি বলিল—“আমার নাম রাম। আমি এখান থেকে দুই মাইল দূরে জনৈক ধনীর বাড়ীতে সিঁদ দিতে যাইতেছি”। সাধুজী তখন তাহাকে বিবিধভাবে সৎউপদেশ দান করত বলিলেন—“চুরি করা মহাপাপ, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় কৰ্ম, সুতরাং তুমি এইরকম কার্য্য করিও না। কোন ভাল কৰ্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর।” রাম বলিল—“আমার পেটে বিদ্যা নাই যে চাকুরী করিব, কোন জমিজমা নাই যে চাষ করিব। বাল্যকালে আমি মাতৃপিতৃহীন হই। তারপর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এক সিঁদেল চোরের সঙ্গ হয়, তাহার সঙ্গক্রমে আমি একজন পাকা সিঁদেল চোর হইয়া যাই। রাতে রাতে কাজ করার ফলে দিনের গরম সহ্য করিতে পারি না, ফলে মাঠে খাটিতে বা অন্য কোন কৰ্ম করিতে রৌদ্রে খুব কষ্ট হয়। সে কারণে এই পাপ কৰ্মটি করিতেছি। আমার অন্য কোন উপায় নাই।” তখন সাধুজী বলিলেন,—“তুমি আমার একটি কথা শুনিবে?” রাম বলিল—“আমায় সিঁদ কাটার অনুমতি দিলে আপনার সব আদেশই আমি পালন করিব।” তখন সাধুজী বলিলেন,—“তুমি তোমার কৰ্ম ছাড়া প্রত্যহ ভোর পাঁচটায়, সন্ধ্যা সাতটায় এবং দুপুর বারোটায় পনের মিনিট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবে।” রাম বলিল—“আপনার এই আদেশ-পালনে আমার কোন অসুবিধা নাই। কারণ লোক জাগিবার পূর্বেই পাঁচটার মধ্যে আমি বাড়ী চলিয়া আসি, আর দুপুর ও সন্ধ্যায় তো আমি বাড়ীতেই থাকি। সুতরাং উক্ত সময়গুলিতে হরিনাম করিতে আমার কোন বাধা হইবে না। আমি দরজা বন্ধ করিয়া হরিনাম করিব। যাহাতে বাহিরের লোক শুনিতে না পায়।” তখন সাধুজী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম

হরে হরে।।”—এই মহামন্ত্রটি পুরা শুনাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধুজী তাহাকে আরও অনেক হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সাধুজীর কৃপায় সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করিয়াছিল। বিদায়কালে সাধুজী তাহাকে বলিলেন—“আজ তুমি সিঁদ দিয়া যাহা পাইবে তাহা আমাকে দেখাইয়া যাইবে।” রামের হাতে কোন ঘড়ি ছিল না, সে যখন সাধুজীর নিকট বিদায় লয়, তখন রাত তিনটা, তাহার পর সে যখন নিদ্রিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছায় তখন রাত চারটা, তাহার পর উক্ত ধনীর রান্না ঘরের সিঁদ দিয়া বাসনপত্র বাহির করতঃ যখন বস্তায় ভরিয়া লইল সেইসময় উক্ত ধনীর দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। রাম যখন শুনিল পাঁচটা বাজিয়া গেল তখন তাহার সাধুর কথা মনে পড়িয়া গেল, এবং সে যে চোর তাহা ভুলিয়া গেল। সে চাদর পাতিয়া পরিণাম কিছু চিন্তা না করিয়াই পূর্বোক্ত সাধুজীর কথামতো উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। হরিনাম শুনিয়া গৃহকর্তার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন “আজ সুপ্রভাত, শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিলাম।” গৃহটি দ্বিতল ছিল। গৃহকর্তা নীচে নামিয়া দেখিলেন, যেন তাঁহার নিজের বাড়ীর মধ্যেই হরিনাম হইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাহার রান্না ঘরের সামনে এক চোর চক্ষুমুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিতেছে। চুরি করা বাসনপত্র সামনে বস্তাতে ভরা আছে। সাধুজীর কথামতো প্রায় ১৫ মিনিট হরিনাম করিয়া সে চক্ষু খুলিল, দেখিল সকাল হইয়া গিয়াছে ; গৃহকর্তা সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া সিঁদেল চোর রাম খুব ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। গৃহকর্তার চরণে পড়িয়া বলিল,—“বাবু! আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে পুলিশে দিবেন না।” তখন গৃহকর্তা ধনী ব্যক্তিটি বলিতে লাগিলেন, “আরে! আমি অনেক সিঁদেল চোর দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত তো দেখি নাই! তুমি সিঁদ দিয়া বাসনপত্র লইয়াছ, কিন্তু সেগুলি লইয়া চলিয়া যাও নাই কেন? তুমি পাড়া পড়শীকে জানাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেছ, এবড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমাকে এই হরিনাম কে করিতে বলিয়াছেন?” তখন রাম সাধুর নিকট যাওয়া হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা গৃহকর্তাকে বলিলেন। গৃহকর্তা চিন্তা করিলেন যে, অভাবে পড়িয়াই সে এরূপ কুপথে আসিয়াছে। তবে হৃদয়ে ইহার কিছু ভাল ভাব রহিয়াছে, তাহা না হইলে সে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিত না। এই চিন্তা করিয়া তিনি রামকে বলিলেন, “তোমায় যদি আমি দশবিঘা জমি দান করি ; তাহা হইলে এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি করিবে না তো ?” রাম বলিলেন—“না বাবু, আপনি যদি আমায় কিছু জমি-জায়গা দেন, তাহা হইলে আমি আর কোনদিন কোন প্রকার অসৎকার্য্য করিব না।” গৃহকর্তা বলিলেন,—“তোমার সংসারে কে-কে আছে?” রাম বলিল, “আমার একটা ছোট ছেলে ও আমার স্ত্রী আছে।” গৃহকর্তা বলিলেন,—“তুমি বাড়ীতে যাও এবং তোমার স্ত্রী-পুত্রকে এখানে লইয়া আইস। আমি তোমাকে থাকিবার ঘর ও দশ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি করিয়া দিব, আর আমার যাহা জমি-জায়গা রহিয়াছে তাহা

তুমি ম্যানেজার হইয়া লোকজন খাটাইয়া চাষবাস করাইয়া দিবে। প্রথম বছর আমি তোমার জমির চাষের খরচ দিয়া দিব। এবং তুমি ম্যানেজার হইয়া আমার জমিগুলি চাষ করাইয়া দিলে উহার যাবতীয় খরচ ও তোমাকে একটি মাসিক মাহিনা দিয়া দিব। এবং আরও বলিলেন, তোমার মতো ব্যক্তির মুখেও যিনি শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিয়াছেন, সেই সাধুজী নিশ্চয়ই পরম বৈষ্ণব, মহাপুরুষ। তুমি সময় করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইও। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করিব। তুমি সত্বর চলিয়া আই।” তখন রাম গৃহকর্তাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে সে প্রথমে সাধুজীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সাধুজীকে প্রণাম করিল। সাধুজী হাসিয়া কহিলেন,— “কি রাম! আজ তোমায় খালি হাতে দেখিতেছি কেন? কিছু পাও নাই?” রাম কহিল,— “গুরুদেব! আজ আপনার কৃপায় যাহা পাইয়াছি তাহাতে আমাকে জীবনে আর চৌর্য্যবৃত্তি করিতে হইবে না।” রাম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত সাধুজীকে শ্রবণ করাইলেন। সাধুজী সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,— “তোমার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হইয়াছে, এখন হইতে তুমি আর কোনপ্রকার অসৎ কর্ম্ম করিও না। উক্ত ধনী ব্যক্তিটি তোমায় যে জমি জায়গা দিবেন তাহার ফসল লইয়াই তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। বাবুর জমি জায়গা চাষ করাইয়া দিবে, কিন্তু উক্ত জমির ফসল তুমি কিছুমাত্র গ্রহণ করিবে না। গৃহকর্তাকে সমস্ত ফসল বুঝাইয়া দিবে। সৎপথে থাকিলে ভগবান তাঁহার সহায় হন। পূর্ব্বের আমি ১৫ মিনিট করিয়া হরিনাম করিতে বলিয়া-ছিলাম, এখন সর্ব্বদা হরিনাম করিবে।

অতঃপর রাম সাধুজীকে সান্ত্বিত প্রণাম করতঃ গৃহেতে প্রস্থান করিল। এবং একটি শুভদিন দেখিয়া স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ধনী গৃহকর্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। গৃহকর্তা পূর্ব্বকথা মতো রামকে জমি ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ একদিন সন্ত্রীক ধনীব্যক্তিটিকে লইয়া রাম স্ত্রীসহ সাধুজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং সাধুজীর নিকট হইতে সকলে শ্রীহরিনাম-দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তারপর সাধুজীর নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ চারিজনে শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দে দিন কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরশমণির স্পর্শের ন্যায় রাম সাধুজীর কৃপায় পরম বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। অহো! সাধু-সঙ্গের কি অপূর্ব্ব মহিমা!— কি অপূর্ব্ব মহিমা! সেইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,— “সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।” সংস্কৃতে উপদেশ যথা— ‘ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি রেকা ভবতি ভবান্নব তরণে নৌকা।’ ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে—Men are known by their company they keep. (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

ভৃগু-পদচিহ্ন

সরস্বতী-তীরে, বনের ভিতরে, যজ্ঞ করে মুনিগণ।
বিশ্বে তিন ঈশ্বর, মধ্যে কে হন বড়, বাধিল তর্ক ভীষণ॥
যোগ্যতা বিচারে, ভৃগু-মুনিবরে, প্রেরিল তিনের পাশ।
তাপসী-সভার, সমস্যা-সম্ভার, সমাধানে করি' আশ॥
ব্রহ্মার কুমার, গেল ব্রহ্মাগার, ব্রহ্মত্ব পরীক্ষা তরে।
স্তুতি-নতিহীন, অবজ্ঞার চিন, দাঁড়ালো পিতার ধারে॥
হেরি প্রজাপতি, পুত্রের কু-রীতি, অতি ক্রোধে মৌনী রয়।
পিতৃভাব হেরি', ব্রহ্মলোক ছাড়ি', শিবলোকে মুনি যায়॥
ব্রহ্মার কুমারে, সম্মুখেতে হে'রে, আলিঙ্গিতে যায় শিব।
অতি সমাদরে, দু'হাত প্রসারে, নম্রযুত পঞ্চগ্রীব॥
মুনি বলে, শিব! হীন তুচ্ছভাব, (ওহে) অপবিত্র অনাচারী।
পরশে তোমার, কিবা অধিকার, নিরমল শুদ্ধাচারী॥
শুনি' মুনি-বোল, শঙ্কর বিভোল, ত্রিশূল ধরিয়া করে।
তাপসে বধিতে, ধায় আচম্বিতে, শঙ্করী চরণে ধরে॥
ঈশ্বরের যোগ্য, নহে কস্মি-বিজ্ঞ, যোগ-তপ-সিদ্ধগণ।
চিন্তি' ভৃগুমুনি, চলেন তখনি, যেথা আছে নারায়ণ॥
রতন পর্য্যক্ষে, পদ লক্ষ্মী-অঙ্কে, সেবিত শায়িত রূপ।
ত্বরা যেয়ে তাৎ, করে পদাঘাত, হরিবক্ষে করি' কোপ॥
এস্তে ব্যস্তে হরি, ভৃগুপদ ধরি', সর্বিনয় বলে বাণী—
ক্ষম এ অক্ষমে, নিজ কৃপাশুণে, ঘোর দোষে দোষী আমি॥
তব আগমন, করিনু হেলন, রৈনু হ'য়ে পুরে নারীবশ।
হয়ে হতজ্ঞান, করি অবজ্ঞান, তব যোগ্য ভক্তিরস॥
কঠোর নিষ্পন্ন, বজ্রের সম, বক্ষঃস্থল রক্ষ মোর।
ও পদকমল, কুসুম-কোমল, যাতে ব্যাথা পেলে ঘোর॥
বৈকুণ্ঠ-শ্রীপতি, এবে হ'ল খ্যাতি, 'ভৃগু-পদচিহ্ন-ধারী'।
করিহে প্রণতি, সভকতি স্তুতি, লক্ষ্মীসহ পদে পড়ি॥
একথা শুনিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, (ভৃগু) ফিরে যান তপোবনে।
কহে আদি-অস্ত, যতেক বৃত্তান্ত, মুনিবৃন্দ-সন্নিধানে॥
শুনি' মুনিগণ, বিস্ময়ে মগন, বুঝিল শ্রীহরি-তত্ত্ব।
ব্রহ্মা মহেশ্বর, নহে সর্বেশ্বর, বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব॥
'শ্রীঅদ্বৈতদাস', ছাড় নীচ আশ, ব্রজবাস যদি চাও।
ইতর বাসনা, থাকিতে হবে না, ভব-তৃষা ছাড়ি দাও॥

—শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রজবাসী

সবার নাথ—শ্রীজগন্নাথ

(নাটিকা)

চরিত্র

বাদশাহ আওরঙ্গজেব—(মোগল সম্রাট)

সহিদ খাঁ—(ঐ সংবাদ-বাহক)

মীর মহম্মদ—(ঐ সেনাপতি)

মূর্শিদকুলি খাঁ—(ঐ সুবেদার)

গোলকুণ্ডার নগরপাল—(ঐ কর্মচারী)

দিব্যসিংহদেব—(উড়িষ্যার রাজা গজপতি)

রামদয়িত গোস্বামী (ওরফে দীননাথ)—(জগন্নাথ মন্দিরের মোহান্ত)

জনৈক ভক্ত—(গায়ক)

প্রথম অঙ্ক (১ম দৃশ্য)

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ

আওরঙ্গজেব—(খোদার নিকট প্রার্থনা) হে খোদা, আশীর্বাদ করুন—যেন উড়িষ্যার সকল সৌভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তমিত করে দিতে পারি! জগন্নাথ-মন্দিরকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি! জগন্নাথ-মন্দির লুণ্ঠন করে পৌত্তলিক কাফের হিন্দুদের জগন্নাথ-সেবা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে পারি! জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় হিন্দুরা বহু ধূম-ধাম করে' যে আনন্দ-উৎসব করে, তাও যেন তাদের বন্ধ করে দিতে সমর্থ হই! হে আল্লা, আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে এমন সাহস ও শক্তি প্রদান করুন, যেন জগন্নাথ-মন্দিরকে সহজেই আমার অধীনে আনতে পারি ও উড়িষ্যার রাজা গজপতি দিব্যসিংহকে বন্দী করে দিল্লীতে এনে তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতে পারি! তবেই সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্য সহজেই আমার করায়ত্ত্ব হবে।

হত্যাবসরে সহিদ খাঁর প্রবেশ)

সহিদ খাঁ—(কূর্ণিশ করতঃ) জাঁহাপনা! আমি আপনার সেনাপতি আক্রম খাঁর নিঃশেষে গোলকুণ্ডা হতে আসছি। আক্রম খাঁর প্রতি আপনার কোন আদেশ আছে কিনা তা' জানবার জন্যই এসেছি। আপনার হুকুম তাঁকে অবশ্যই জানাব। হুজুর! এই সহিদ খাঁ আপনারই নফর। আপনার আঙা পালনে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

আওরঙ্গজেব—শোন সহিদ খাঁ, তুমি এখনই গোলকুণ্ডায় যাও। সেনাপতি আক্রম খাঁকে জানাবে সে যেন বহু সৈন্য সহ এই মুহূর্তে জগন্নাথ-মন্দির আক্রমণ করে মন্দিরের যাবতীয় বস্তু লুণ্ঠন করে আনে ও মন্দির ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আরও জানাবে কিছুদিন পরে হিন্দুদের রথযাত্রা উৎসব হবে; সেই রথযাত্রা চিরতরে বন্ধ করার জন্য সে যেন প্রয়োজনীয় সর্ববিধ কৌশল অবলম্বন করে। আমার এই আদেশ যেন অবশ্যই পালিত হয়।

সহিদ খাঁ—জি আজ্ঞা হজুর। (কূর্ণিশ করতঃ প্রস্থান)

আওরঙ্গজেব—হিন্দুরা বলে তারা নাকি সনাতন ধর্মাবলম্বী! তা'দের জগন্নাথদেব নাকি সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হ'তে পুরীধামে অবস্থান করছেন। আমরা ঐ জড়-স্বরূপ পূজাকে 'ব্যুৎ-পূজা' বলি। ঐরূপ ব্যুৎ-পূজা করলে পরাৎপরের পূজা হয় না। আমাদের পয়গম্বর সাহেব ঐরূপ ব্যুৎপরন্তকে বিশেষভাবে তিরস্কার করেছেন। তাই ব্যুৎ-পূজাকে দুনিয়া হতে চিরতরে লোপ করে দিতে হবে। তবেই আল্লাকে খুশী করতে পারবো। এইবার দেখি, পুরীধামের জগন্নাথ ও তার মন্দিরকে কে রক্ষা করে? হা-হা-হা- - - - - (অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান)

(২য় দৃশ্য)

স্থান—পুরীধাম

(শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গন)

দিব্যসিংহদেব—ওগো উড়িষ্যা জাতির প্রাণ-প্রিয়তম হৃদয় সর্বস্বধন—জগন্নাথ-দেব! তুমি ব্যতীত আমাদের আর কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। তোমার শ্রীপাদপদ্মেই আমাদের স্বভাবগত অনুরাগ বিদ্যমান। হে প্রভু জগন্নাথদেব! তোমার কথা 'ঋগ্বেদে' সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে—“অদো যদ্ দারুঃ প্লবতে সিন্ধোঃ পারে তদ-

পুরুষং তদারভস্ব দুর্হণ তেন গচ্ছ পরস্তরম।।”

‘ঐ বিপ্রকৃষ্টদেশে—দূরবর্তীস্থানে সিন্ধু তীরে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজমান পুরুষোত্তম ভগবান্ কোন পুরুষ রচিত ন'ন, হে জীব তাঁর উপাসনা কর, সেই উপাসনা বা আরাধনা-প্রভাবে তুমি পরস্তর গোলোক-বৈকুণ্ঠ লাভ করতে পারবে।’

সত্যযুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট নীলাদ্রিস্থ শ্রীনীলমাধব দারুব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখনকার নির্মিত মন্দির বহু সংস্কার, বহু পরিবর্তন ও বহু পরিবর্দ্ধন হ'য়েও অদ্যাবধি এই নীলাস্বুধিতটে শ্রীপুরুষোত্তমধামে নিত্য বিরাজিত।

হে প্রভু জগন্নাথদেব! হে প্রভু নীলমাধবদেব! উড়িষ্যা-বাসিগণের প্রতি তোমার এবন্দিহ অপার করুণা স্মরণ করে তোমাকে বারংবার ভক্তিপূর্ণ চিন্তে প্রণাম জানাই।

(সহসা মোহন্ত দীননাথের প্রবেশ)

মোহন্ত—(উদ্বিগ্নচিন্তে) মহারাজ! সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। (দণ্ডবৎ করতঃ) আমি আপনার দাসানুদাস; এইমাত্র সংবাদ পেলাম—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অদূরে নবাব আওরঙ্গজেব বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছেন। সৈন্যদের পরিচালকরূপে সাহিদ খাঁ সেখানে সেনাপতি আক্রাম খাঁর অনুমতির অপেক্ষায় অবস্থান করছে। এখনও সেনাপতি আক্রাম খাঁ সে' স্থলে পৌছায় নি। আক্রাম খাঁর অনুমতি পেলেই সৈন্যরা মন্দির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হ'বে। এমন কি নবাবের দুর্দান্ত সৈন্যবাহিনী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের বিগ্রহের ক্ষতিসাধনও করতে পারে।

দিব্যসিংহদেব—একি নিদারুণ দুঃসংবাদ শোনালেন মোহন্তজী! ইচ্ছাময় প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের যা' ইচ্ছা তাইই হ'বে। মাভেঃ মোহন্তজী! অধর্ম, পাপ ও অন্যায় যা'র হৃদয়ে নেই, অথবা যে ধর্মানুসারে ভগবদ্ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কর্তব্য পালন করে, তা'র হৃদয়ে কি ভয় থাকতে পারে? পাণ্ডবগণ সর্বদাই ধর্মের আশ্রয়ে থাকায় ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দুর্য্যোধনদের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের বাদ্যযন্ত্রের শব্দে তাঁরা আদৌ ভীত হন নি। পরন্তু পাণ্ডবদের শঙ্খাদির বাদ্যধ্বনি এতই বিশাল ও উচ্চরব সম্পন্ন ছিল যে, তাহাতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করায় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের ও তদপক্ষীয় যোদ্ধাগণের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়েছিল ও হৃদয়ে মহাভয় সঞ্চার হ'য়েছিল। গীতায় সঞ্জয় জানিয়েছেন—

“স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভাননাদয়ন্॥”

মহাভারতেও উক্ত হয়—কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ও অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি শুনে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করতে লাগল; যথা—

“পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষণং দেবদত্তস্য চোভয়োঃ।

শ্রদ্ধা তু নিনাদং যোধাঃ সঙ্কমূত্রং প্রসুস্ববুঃ॥”

অধর্ম ও অন্যায় কর্মের ফল-স্বরূপে মানুষের হৃদয় শক্তিহীন ও দুর্বল হ'য়ে পড়ে এবং হৃদয়ে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হয়। আমাদের কি এমন শক্তি আছে যে প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু-বিদ্রোহী বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করব? তবে তিনি যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ইহা যেন মশা মারতে কামান দাগার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মোহন্ত—মহারাজ! আপনি ত' উড়িষ্যার রাজা 'গজপতি'—এই নামেই বিশেষ পরিচিত। 'রাজা'—এই নাম থাকার কারণে সম্ভবতঃ মোগল সম্রাটের যুদ্ধ ঘোষণা।

দিব্যসিংহদেব—আপনি এবং দেশবাসী সকলেই জানেন আমি 'গজপতি' হ'লেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-সূত্রেই রাজকর্ম্য পরিচালনা করি। আমি তাঁরই প্রতিনিধিস্বরূপ মাত্র। আমি বা আমার পূর্ববংশীয় গজপতি রাজাগণ প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে রথের সম্মুখস্থান ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে প্রকাশ্যভাবে 'ছেরা-পহারা'—সেবা সম্পাদনপূর্বক জানাই যে, গজপতি কখনও রাজা ন'ন। 'ছেরা পহারা'তে ইহাই প্রমাণিত। আমি রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একান্ত ভূত্যানুভূত মাত্র। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি—

“তুয়া পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।

আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ'ভব সংসারে॥”

যদি প্রাণভরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের তুষ্টি বিধান রূপ সেবা করতে পারি, তা'হলে তিনি অবশ্যই আমাদের ন্যায় দীনহীন অভাগার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করবেন। সুতরাং বিধর্মী মোক্লেম নবাবের আক্রমণ চিন্তা করে বাহিক ও আভ্যন্তরীন কোন ভয়েই আমরা বিচলিত হই না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কি আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম? তাঁর

ন্যায় ভক্ত-বৎসল আর কে আছে? ভগবান্ যোগী-বৎসল বা জ্ঞানী-বৎসল ন'ন। কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—এঁরা সকলেই স্ব-সুখকামী। ভগবান্কে সুখ দিয়ে যিনি সুখ পান, তিনি ভক্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সুখই যেহেতু একমাত্রকাম্য, সেহেতু সকল বিপদকেই আমরা তুচ্ছ মনে করি। তাঁর বাৎসল্য, তাঁর প্রিয়তা গুণ, তাঁর আত্মপর্যাপ্ত বদান্যতা স্বভাবটি কি আমরা ভুলে গেছি? মোহন্তজী! তিনি আমাদের রক্ষা করবেনই। মাইভেঃ!

মোহন্ত—মহারাজ! আপনি ঠিকই বলেছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শ্রীমন্দির-আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য একটা কৌশল তো অবলম্বন করতে হবে। সেজন্য আমি চিন্তা করেছি—প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে জানিয়ে রথের কাষ্ঠনির্মিত সারথি, অশ্বগুলি এবং অন্যান্য মূর্তি কাষ্ঠের দ্বারা নির্মাণ করে সহিদ খাঁকে অর্পণ করলে তিনি যদি সেইগুলি উড়িয়া-আক্রমণের চিহ্নস্বরূপ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দেখান, তাহলে মনে হয় সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমন্দির-আক্রমণ হতে বিরত হবেন। এই দীন সেবকের চিন্তা-প্রসূত কৌশলটি অনুমোদন করলে সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

দিব্যসিংহদেব—আপনার এই প্রস্তাবটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাতেই আপনার উর্বর মস্তিষ্কে ঐরূপ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। আর বিলম্ব নয়, আপনি সত্ত্বর ঐ মূর্তিগুলি নির্মাণ করে তাহা যথাযথ বহন করতঃ সহিদ খাঁকে অর্পণ করুন। ভগবদিচ্ছায় সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহা বিশ্বাস করলে মঙ্গল হয়!

মোহন্ত—মহারাজ! আপনার আজ্ঞা পালনার্থে আমি এখনই মূর্তিসমূহ কাষ্ঠদ্বারা যথাযথ নির্মাণ করে তাহা সহিদ খাঁকে অর্পণ করব এবং সম্রাটকে তাহা দেখা'বার জন্যও অনুরোধ করব। এক্ষণে আমি ঐ কার্য সম্পন্ন করতে গমন করছি। আপনার আশীর্বাদ ও প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের করুণা প্রার্থনা করি। দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন!

(দণ্ডবৎ পূর্বক প্রস্থান)

দিব্যসিংহদেব—আমিও রাজপ্রসাদে যাই ও প্রাসাদের ছাদে উঠে নবাবের সেন্য সমাবেশ অবলোকন করব। (প্রস্থান)

(৩য় দৃশ্য)

স্থান—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ

আওরঙ্গজেব—(দরবারে পায়চারি করিতে করিতে) সেনাপতি আক্রামখাঁকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির আক্রমণ করে সমস্ত দ্রব্যাদি তথা মূর্তিগুলি পর্যাপ্ত লুণ্ঠন করে আনতে পাঠিয়েছি ও মন্দির ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করারও আদেশ দিয়েছি। আর রথযাত্রা উৎসব বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি। এইমাত্র দূত-মুখে সংবাদ পেলাম—সহিদ খাঁ মন্দির আক্রমণের চিহ্নস্বরূপ কিছু সামগ্রী নিয়ে আমাকে দেখাবার জন্য আসছে।

যাইহোক, হিন্দুদের রথযাত্রা-উৎসব চিরতরে বন্ধ করতেই হ'বে। ঐ পৌত্তলিক পূজাদি আমার রাজত্বে চলবে না। এইবার আমার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মহম্মদকে

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১শে আষাঢ় ১৪১১, ১৬ই জুলাই ২০০৪

ঐ কার্যের জন্য পাঠা'ব। সেজন্য তা'কে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। (চিন্তিত মনে) সে তো এখনও এলো না!

(এমন সময়ে মীর মহম্মদের প্রবেশ)

মীর মহম্মদ—(কুর্নিশ করতঃ) হুজুর, আপনার এই ভৃত্যের প্রতি কি আদেশ তা' জানাবার জন্য প্রার্থনা করি।

আওরঙ্গজেব—মীর মহম্মদ! তুমি আমার বিশেষ আস্থাভাজন সেনাপতি। তুমি অবিলম্বে বহু সৈন্য নিয়ে রাজা গজপতির রাজ্য বিপুল উদ্যমে আক্রমণ কর এবং ছত্রিশ গড়, পশ্চিম উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান, বঙ্গদেশ, ও ভারতের যে সমস্ত স্থান দিয়ে রথযাত্রাকালে অগণিত যাত্রী পুরীধামে সমবেত হয়, সেই সমস্ত স্থান দিয়ে যা'তে কোন একটি যাত্রীও পুরীধামে প্রবেশ করে রথযাত্রায় যোগদান করতে না পারে, সে'জন্য সেই পথগুলিতে সৈন্য মোতায়েন রেখে দাও। এ' বৎসর এবং ভবিষ্যতে কোন বৎসরই পুরীধামে যা'তে রথযাত্রা উৎসবের কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তদুপযোগী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর। এইভাবে যাত্রীদের বাধা দান ও ভীতি প্রদর্শন কর। ইহাই আমার আদেশ। রাজা গজপতিকে আমার এই আদেশ জানাবার জন্য সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁকে বলবে।

মীর মহম্মদ—হুজুর! কোনও দুঃসাহসী ও দুর্দান্ত যাত্রী যদি সৈন্যের বাধা না মেনে জোরপূর্বক পুরীধামে প্রবেশ করতে চায়, তখন কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

আওরঙ্গজেব—আমি দিল্লীশ্বর বাদশাহ আলমগীর! আমার আদেশ অমান্য করার কি পরিণাম হয়, তোমার তো তাহা অবিদিত নেই। আমার আদেশ অমান্যকারীকে তৎক্ষণাৎ কোতল করবে।

মীর মহম্মদ—তাই হবে জাঁহাপনা! আপনার প্রতিটি আদেশ অবশ্যই মান্য করব। হিন্দুদের রথযাত্রা-উৎসব চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবো। আমি এখনই যথাস্থানে সৈন্য মোতায়েন ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে রওনা হচ্ছি।

(কুর্নিশ করত প্রস্থান)

আওরঙ্গজেব—উড়িষ্যাবাসী হিন্দু আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে স্বাভাবিকী প্রীতি যুগ যুগ ধরে বর্তমান থাকায় তা'দের আচারে-ব্যবহারে শ্রীজগন্নাথের আনুগত্যই প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হয়। এমন কি উড়িয়াগণ বিবাহ ও ব্রতাদিতে সর্বপ্রাণে শ্রীজগন্নাথদেবকে নিমন্ত্ৰণ জ্ঞাপন করে। উড়িয়াবাসীর জীবনের জীবন শ্রীজগন্নাথদেব তা'দের সেবায় সম্ভুষ্ট হ'য়ে তা'দের সর্বদাই নাকি রক্ষা করেন! এইবার ঐসকল কাফের হিন্দুদের ঐ ব্যুৎপূজা চিরতরে বন্ধ করে দেবো। দেখি কাঠের পুতুল জগন্নাথদেব তা'দের কিরূপে রক্ষা করেন!

(রাজপ্রসাদ হইতে অন্তঃপুরে গমন) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—ঃঃ—

ভয় হয়

বদ্ধজীবের ভয় থাকিবেই। শাস্ত্রে আছে—জীবের অভিনিবেশ যখন সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কোন বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়, তখন হইতেই ‘ভয়’, ‘শোক’, ‘মোহ’ প্রভৃতি তাহাকে পাইয়া বসে। সেই অভিনিবেশ পুনরায় ভগবানে সংস্থাপিত হইলে তখন ‘ভয়’ প্রভৃতির কবল হইতে মুক্তি লাভ হয়। সেইজন্য ভগবান্—“অশোক-অভয়-অমৃত-আধার” এবং ভগবদ্ভক্তি—“শোক-মোহ-ভয়াপহা”—এইরূপে শাস্ত্রে কথিত আছে।

তত্ত্ব-বিচারে যাহা কথিত আছে, তাহা যথার্থই সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বদ্ধজীব সেই তত্ত্ব-বিচার-অনুসারে অগ্রসর হইতে গেলেও তাহাকে অশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। যে-ভক্তি জীবাত্মার ‘সহজাত-ধর্ম’, ‘নিত্যধর্ম’ বলিয়া শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—সেই নিজস্ব সম্পদই তাহার নিকট ‘সুদুর্লভ’। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রমাণ উল্লেখ করিয়া স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন—“হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা।” আর হইবেই বা না কেন? যে ‘মুক্তি’ ‘ভুক্তি’ ‘সিদ্ধি’ প্রভৃতি লাভের জন্য এই জগতের লোক সকলেই সর্বদাই ব্যাকুল হইয়া কত শত চেষ্টা করিয়াও করতলগত করিতে পারে না, সেই মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিগণও মহাদেবী হরিভক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে দাসীর ন্যায় গমন করে। কেবল কি তাহাই? সেই ‘হরিভক্তি’ যাঁহার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটও ‘মুক্তি’ করজোড়ে তাঁহার শুভদৃষ্টির আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর এদিকে ধর্ম-অর্থ-কাম, মুক্তির ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া নিকটে যাইবার আর সাহস না করিয়া কেবল দূরে দাঁড়াইয়া সময়ের প্রতিক্ষা করে। সুতরাং এইরূপ মহিমাময়ী ভক্তিদেবী যে জীবের নিকট সহজে লভ্য হইতে পারেন না, তাহা বুঝা কঠিন নহে।

হরিভক্তি সুদুর্লভা—কারণ, ইঁহার প্রতি জীবের আগ্রহ সহসা উদয় হয় না। যেস্থলে পাপ-পুণ্যের প্রতি আসক্তি প্রবল অথবা মোক্ষ-বাসনা বর্তমান, সেস্থলে হরিভক্তির প্রতি আদর নিতান্তই অসম্ভব। বদ্ধজীব অবিদ্যার প্রভাবে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে জন্ম জন্ম ধরিয়া হরিভক্তি এবং হরিভক্তের নিকট যে অসংখ্য অপরাধ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রাবল্যেই জীবের হরিভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা সহজে উদয় হইতে চাহে না। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের কথায় ইহারই একটি নমুনা দেখা যায়,—

“লক্ষ্মেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিষপ্যকো বুধ্যতে।

ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ।।”

অর্থাৎ, লক্ষের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই হরিভক্তির কথা শ্রবণ করেন। এইপ্রকারে যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের কোটির মধ্যে একজন হরিভক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই তাহা সম্পূর্ণভাবে

আচরণ করিতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যায়, হরিভক্তির প্রতি যথার্থ আদর উদয় হওয়া জীবের পক্ষে একপ্রকার দুর্ঘট। আর, যথার্থ আদরের অভাবে “সেয়ং সাধন-সাহস্রৈঃ হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা”—সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় না।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘জৈবধর্ম’-গ্রন্থে জানাইয়াছেন, বহু চেষ্টাতেও যে হরিভক্তি-লাভে কোন অগ্রসর দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে হরিভক্তি-লাভের জন্য নিতান্তই অনুপযুক্ত। ঐপ্রকার চেষ্টায় এক জন্ম কেন, বহু জন্মেও হরিভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। “বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্জন। তবু ত’ না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।” (চৈঃ চঃ আদিঃ ৮।৯৬)। জীব প্রকৃতপক্ষে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর স্বার্থের সিদ্ধিতেই বরং উন্মুখ। তাহারা শ্রীনামের প্রতি সেবান্মুখতা সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন ; শ্রীকৃষ্ণনামই স্বয়ং নামি-কৃষ্ণ—এইরূপ বিচারে তাহারা নিজেকে নাম-প্রভুর দাস বলিয়া জ্ঞান করিতে পরাজুখ। সেই কারণে শ্রীনামের প্রতি যথার্থ আদরের অভাবে তাহাদের শত চেষ্টাও নিষ্ফল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হরিভক্তি সুদুর্লভা হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীহরি সহসা কাহাকেও হরিভক্তি প্রদান করেন না। তিনি তাঁহার ভজনাকারিগণকে বরং মুক্তি দান করেন, কিন্তু হরিভক্তি শীঘ্র দেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হরিভক্তির প্রতি সঠিক আগ্রহের অভাবে উহার সাধন-কার্য্যে ঐকান্তিকতা, নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি সাধিত হয় না—আবার, সেই ঐকান্তিকতা, নৈরন্তর্য্য থাকিলেও স্বয়ং শ্রীহরি হরিভক্তি-প্রদানে ইচ্ছুক না হইলে উহা লাভের সম্ভাবনাও নাই।

এইস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন—‘শ্রীহরি শীঘ্র হরিভক্তি কাহাকেও দেন না’—ইহাতে এই অর্থ বুঝা যায় যে, শীঘ্র না হইলেও, বিলম্বেও তিনি তাহা প্রদান করেন। সুতরাং এস্থলে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন। শ্রীহরি কাহাকেও হরিভক্তি-প্রদানের পূর্ব্বে সে যথার্থই হরিভক্তি-প্রার্থী কি না, নাকি হরিভক্তির নামে সে প্রকৃতপক্ষে ভোগ বা মোক্ষ-প্রার্থী,—তাহা ধৈর্য্যের পরীক্ষাদ্বারা তিনি যাচাই করিয়া লয়েন। উক্ত পরীক্ষা আবার হরিভক্তির প্রতি ঐকান্তিক ব্যক্তিগণের জন্যই—আমার মত নিষ্ঠা বা আগ্রহশূন্য ব্যক্তিগণের জন্য নহে। যাহা হউক, হরিভক্তি ‘অলভ্যা’—এইরূপ নহে, কেবল, তিনি সুদুর্লভা—এইমাত্র।

আবার ইহাও বিবেচ্য, যে, হরিভক্তি যখন সুদুর্লভা, তখন নিশ্চয়ই হরিভক্তও সুদুর্লভ। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—“মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্ নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে।।” অর্থাৎ নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্ত-ভক্ত সুদুর্লভ—কোটির মধ্যে একজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের সূত্রেই “সাধু-সঙ্গের প্রণালী বিচার”—নামক প্রবন্ধে জানাইয়াছেন,—“দাস্য-রসাপ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাপ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা

কি বলিব।” ইহাতে বুঝা যায়, কৃষ্ণভক্তির বিশেষতঃ মধুর-রসযুক্ত কৃষ্ণভক্তির পাত্র আপাততঃ প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেলেও প্রকৃত অনুভবী ব্যক্তি অতি অতি দুর্লভ। ইহা সত্য যে, “চক্চক্ করিলেই সোনা হয় না”—অনেক মেকি জিনিষেও প্রচুর চাকচিক্য দৃষ্ট হয়।

এই সুদুর্লভ হরিভক্তি লাভের জন্য উৎসাহ, নিশ্চয় এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত ‘উপযুক্ত চেষ্টা’ বিশেষ প্রয়োজন—নতুবা তাঁহা অলভ্যাই, বলিতে হইবে। ‘উপযুক্ত চেষ্টা’ বলিতে ছয়প্রকার শরণাগতি অবলম্বন করা বুঝাইতেছে।

(১) “দৈন্য, (২) আত্মনিবেদন, (৩) গোপুত্রে বরণ।

(৪) ‘অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ’—বিশ্বাস-পালন।।

(৫) ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার।

(৬) ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জন অঙ্গীকার।

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।

তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।”

এই ছয়প্রকার শরণাগতি যদি যথাযথ-ভাবে পালন করা যায়, তবেই তাহা ‘উপযুক্ত চেষ্টা’ বলিয়া গণ্য হইবে। এবং এই উপযুক্ত চেষ্টাতেই ভক্তি সুদুর্লভা অর্থাৎ বহু বিলম্বে লভ্য—নতুবা, অনুপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা সেই হরিভক্তি লাভের তো সম্ভাবনাই নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, কি প্রকার ধৈর্যের সহিত ও নৈরন্তর্যের সহিত ‘উপযুক্ত চেষ্টা’ রক্ষা করিয়া যাইতে হইবে, তবেই শ্রীহরি কোন জন্মে কোনদিন কৃপাপরবশ হইয়া হরিভক্তি প্রদান করিবেন—যে-ভক্তি প্রদান করিয়া তিনি স্বয়ংই বশীভূত হইয়া থাকেন।

তাহাতেই ভয় হইতেছে—কারণ, “কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরীবর্গাঃ। শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটী-রুদ্ধঃ।।” সময়টা হইতেছে কলিযুগ—ইহা বহিঃ শত্রুঃ; নিজের ইন্দ্রিয়গুলি আমার ঘরশত্রু এবং সর্বোপরি শ্রীভক্তিমার্গ—এই জগতে তাহা কোটা কণ্টকে আকীর্ণ। এই অবস্থায় ‘উপযুক্ত চেষ্টা’ রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ কঠিন। ‘বিপ্রলিঙ্গা’—জীবের আজন্ম-সঙ্গী একটি দোষ, ইহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ চারিটি দোষের একটি। বিপ্রলিঙ্গা অর্থাৎ বঞ্চনার ইচ্ছা—ইহা অপেক্ষা বিপদজনক দোষ আর একটিও নাই। ইহা জীবের স্বরূপকে তাহারই নিকটে ভ্রান্তরূপে, তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে। সেই বিপ্রলিঙ্গা বশতঃ জীব ভক্তির ‘প্রতিবিশ্ব’ আভাসকেই সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া মনে করে—নিজের লঘুত্ব না বুঝিয়া সে নিজের মধ্যে গুরুত্ব কল্পনা করে—ভক্ত্যর্থ অনর্থকে ভক্তির ‘শুভদা’ বৃত্তি বলিয়া বিচার করে ইত্যাদি।

‘আভাস’ দুই প্রকার—‘ছায়া’ এবং ‘প্রতিবিশ্ব’। কোন বস্তুর ছায়া যেমন সাক্ষাৎ সেই বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া, স্পর্শ করিয়া অবস্থান করে—তদ্রূপ ভক্তির ‘ছায়া’ নামক আভাসটি সাক্ষাৎ ভক্তিরই সম্পর্কে অবস্থিত, তজ্জন্য এই আভাসটিও যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ। কিন্তু ভক্তির প্রতিবিশ্ব-আভাসটি ভক্তিরই একটি

বঞ্চনাকর রূপ। কোন বস্তুর প্রতিবিশ্ব যেমন সেই বস্তু হইতে পৃথক—যেমন, কোথায় সূর্য্য, আর কোথায় কোন এক জলাশয়ে তাহার প্রতিবিশ্ব—সেইপ্রকার, ভক্তির ‘প্রতিবিশ্ব-আভাস’ প্রকৃত ভক্তি-বস্তু হইতে বহু দূরে। জীব ‘বিপ্রলিপ্সা’ বশতঃ ভক্তির এই প্রতিবিশ্ব-আভাসকে চিনিতে না পারিয়া সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া ভ্রম করে। এই ‘প্রতিবিশ্ব-আভাস’ জীবের নিকট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সম্ভার লইয়া আসে। সেই সম্ভার দেখিয়া সে নিজেকে ‘গুরু’ বলিয়া মনে করিতে থাকে। প্রকৃত ‘গুরু’-বস্তুর সহিত সম্পর্কিত না হইয়াও ‘গুরুত্ব’ তাঁহার আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করে। ‘অবরোহ’-পন্থায় যে-গুরুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়—তাহাই যথার্থ। কিন্তু আরোহ-পন্থায় যে সমৃদ্ধ (autocrat) গুরুত্ব, তাহা নিতান্তই জগদ্বঞ্চনাকর—প্রকৃত গুরুত্বের সহিত বিরোধাচরণ ও ভক্তিরাজ্যে উৎপাত আনয়নই তাহার ‘বশিষ্ঠ্য’। কিন্তু বিপ্রলিপ্সাময় জগদ্বাসী তাহাকেই জগদগুরু বলিয়া বরণ করে।

“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।

কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।।” (চৈঃ চঃ আদি ৮।১৮)

কিন্তু ভক্ত তো কখনও ভুক্তি-মুক্তি প্রার্থনা করেন না, তবে ভগবান্ এইসকল তাহাকে দিয়া কিভাবে ছুটিয়া যান? না, প্রকৃত ভজন-চতুর ব্যক্তির নিকট হইতে ভগবানের ভুক্তি-মুক্তি দিয়া ছুটিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই—তাঁহারা ভগবানের চাতুরী তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলেন। বলি মহারাজকে সমগ্র ‘সুতল’-লোক ভগবান্ প্রদান করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে ছুটিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রহ্লাদ মহারাজকে বারম্বার মুক্তি প্রদানের লোভ দেখাইলেও তিনি ভগবানের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ও ‘স্বরূপসিদ্ধা’ ভক্তি যাজন করিতেছেন বলিয়া যাহারা ‘ভক্ত’ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন—কিন্তু অন্তরে তাহাদের কোন না কোনভাবে ভোগের স্পৃহা বর্তমান, এবং জগতের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান, ভগবান্ সেইপ্রকার ভক্তকেই ভুক্তি মুক্তি প্রদান করিলে তাঁহারা উহাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া তৃপ্ত হন, তখন মূল সেব্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়ে—ফলে ভগবান্ তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া যান এবং তাহাকে ভক্তিলাভের অনুপযুক্ত দেখিয়া আর ভক্তি প্রদান করেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তিয়াজনের ফলে যে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা সেই ভক্তি হইতে উদ্ভিত (জাত) একপ্রকার অনর্থ বিশেষ। তাহা হইলে ভক্তিয়াজনেও কি অনর্থ উদয় হয়? এস্থলে বিচার এই যে, অন্যাভিলাষিতা-যুক্তা যে ভক্তি, সেই ভক্তির যাজনেই ভক্তির ‘প্রতিবিশ্ব-আভাস’ বহুরূপিণী মায়াব বেষ ধারণ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উপটোকন লইয়া আসে—হতভাগ্য জীব আমরা তাহাতেই থলুক হইয়া তাহাকে বরণ করি বা ঐপ্রকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হই। কিন্তু কৃষ্ণবস্তু তাঁহাতে নাই—আছে ‘নামাক্ষর’ মাত্র—যাহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভের কেবল এক যন্ত্র বিশেষ।

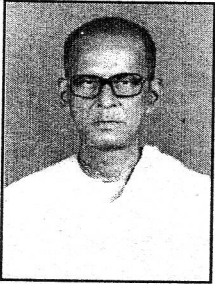
ভক্তির ‘শুভদা’-বৃত্তিতে যাহা লাভ হয়, তাহাতে জীবের কোন অশুভ উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি তথা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভক্তি যাজন করিলেই কেবল লাভ হয়। জীব বিপ্রলিপ্সাবশতঃ অন্যাভিলাষিতা-যুক্তা ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া ভ্রম করে—অনধিকারী হইয়াও নিজেকে অধিকারী জ্ঞান করে—বিধিমাগী হইয়াও রাগানুগ বলিয়া কল্পনা করে। ফলে ভক্তিলভের প্রাথমিক শিক্ষাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অথচ খুব উচ্চস্তরের শিক্ষাকে বহুমানন করে। ইহার দ্বারা বরং কিছু উৎপাতই মাত্র আবাহন হইয়া থাকে।

জগৎ আজ বিধিমাগের ক্রমপস্থা-অনুসরণের ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া হঠাৎই এক জন্মেই ‘ব্রজলোকানুসারতঃ’ করিয়া যে উন্মার্গ অবলম্বন করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক। রূপানুগত্বের নামে যে কিছু বিরূপ-চর্চ্চা হইয়া পড়িতেছে, তাহা খেয়াল করিবার অবসর যেন কাহারও হইতেছে না। প্রকৃত গুরুপ্রদর্শিত পন্থায় বহুপ্রকার পরিবর্তন ও পরিত্যাগ বিধান হওয়ায় শুদ্ধভক্তির প্রকৃত অনুশীলনের পদ্ধতিই জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাই ভীত হইতেছি। —“নরোত্তম দাসে কয়, দেখি’ শুনি’ লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজ পাশ।।”

—শ্রীভক্তিবাদান্ত তপস্বী

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভুর নির্য্যাণ

আমাদের পরম-পূজনীয় শ্রীমৎ নারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ,



১৪১১, শনিবার (ইং ১২। ৬। ২০০৪) রাত্রি ১১-৩০ টার সময় নিজ নিত্য ভগবদ্ধামের উদ্দেশ্যে এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামে নিজ বসতবাটিতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্মিতহাস্য সম্বলিত শ্রীমুখদর্শন, মধুর-ব্যবহার ও হরিকথাময় সান্নিধ্যে আর আমাদের কৃতার্থ হইবার সুযোগ হইবে না ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি।

শ্রীমৎ নারায়ণ চন্দ্র প্রভু আদর্শ-স্থানীয় গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন।

তাঁহার ভক্তিময় জীবনের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করিলে সত্যিই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার পিতার নাম—শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। এস্থলে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপরিহার্য। শরৎচন্দ্র মহাশয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিগোষ্ঠী নেমী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করা অবধি তাঁহার প্রচার কার্যে সর্বতোভাবে সহায়তা করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি সন্থীক ১৯২৯ সালে জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ‘শ্রীসনাতন দাসাধিকারী’ নামে বিশেষ পরিচিত হন। সনাতন প্রভু

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১শে আষাঢ় ১৪১১, ১৬ই জুলাই ২০০৪

নিজহস্তে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।* তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত বস্ত্র স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক-রূপে পরিগণিত হন। তিনি গৃহস্থাত্মমেই অবস্থিত থাকিয়া যে-প্রকারে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা বিধান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত গৃহস্থাত্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সাধারণ গৃহস্থ দীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন নাই। মঠ-মন্দিরের উন্নতির জন্য তাঁহার অকপট ও নিরন্তর চেষ্টা সত্যই দৃষ্টান্তমূলক ছিল। অবশেষে অতিবৃদ্ধাবস্থায় ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া “শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ” নামে পরিচিত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকে যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ISKCON) প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজও একই সাথে দুইজন সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ নারায়ণ প্রভু উক্ত শ্রীশরৎচন্দ্র-দাস মহাশয় তথা শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে ১৩ আশ্বিন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৩) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতা শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর সুদৃঢ় নিয়মনিষ্ঠা তিনি শিশুকাল হইতেই দর্শন করিয়া ও শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণববিচার সম্বন্ধে দৃঢ়শ্রদ্ধা উদয় হয়। তিনি পিতার সহিত মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহু হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পিতার অনুগমনপূর্বক তিনি তৎকালে শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিগভস্তি নেমী মহারাজের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন। পূজনীয় সনাতন প্রভুর আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিবার কারণে আমাদের নারায়ণ প্রভু বিদ্যালয়ে জড়বিদ্যা সংগ্রহের বিশেষ সুযোগ লাভ করেন নাই। তবে তাঁহার পারমার্থিক বিদ্যাসংগ্রহ কখনও বন্ধ ছিল না। ব্রহ্মা-শিবাদি মহাজনগণ সর্বদা যে-বিদ্যা আলোচনা করেন, সেই বিদ্যাসংগ্রহের সুযোগ তাঁহার জন্য সর্বদাই প্রশস্ত ছিল।

পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিগভস্তি নেমী মহারাজের অপ্রকটের পর শ্রীল নারায়ণ প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের নিকট সত্বীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই তিনি পিতার আদর্শে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পিতাকে অনুসরণ করিয়াই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আশ্রয়ে পারমার্থিক জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুবরও আমাদের শ্রীল নারায়ণপ্রভুকে অপত্য-স্নেহে তাঁহাকে নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি রসিকতা করিয়া সকলের নিকট আমাদের নারায়ণপ্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন,—

“এ আমার পারকীয় শিষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট পারকীয় বিচারই সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। সুতরাং এই শিষ্য আমার বিশেষ আদরের।” নারায়ণপ্রভু যথার্থই শ্রীকেশবগত প্রাণ ছিলেন। তৎকালে নবাগত কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে, নারায়ণ প্রভু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকেশবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন না। নারায়ণ প্রভু পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার তাঁত-ব্যবসায় হইতে উপার্জিত অর্থ শ্রীকেশব-চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত থাকিতেন। তৎকালে শ্রীসমিতিতে ভীষণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল। এইজন্য শ্রীকেশবগোস্বামী প্রায়ই বিশেষ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বাৎসরিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করিতে নারায়ণপ্রভুর প্রদত্ত অর্থের উপরই বিশেষ নির্ভর করিতেন। কায়-মন-বুদ্ধি-অর্থ সকল কিছু উজাড় করিয়া নারায়ণ প্রভু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাহা সমিতির সকল সেবকবৃন্দ বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। তিনি এইপ্রকার সেবা করিয়াও তাঁহার নিরতিমান-স্বভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পরিশেষে নারায়ণ প্রভুকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দ্বাদশ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

নারায়ণপ্রভুর পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপাল দাসাধিকারী মহাশয়ও তাঁহার পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক মহারাজের শ্রীচরণ-আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যাহা হউক আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীমৎ নারায়ণ প্রভু জগদগুরু শ্রীকেশব গোস্বামীর নির্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীসমিতির পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতমরূপে দীর্ঘ ৩৬ বৎসর নিরলসভাবে শ্রীসমিতির সেবা বিধান করিয়াছেন। সত্যই শ্রীসমিতিতে তাঁহার অবদানের সীমা নাই। তিনি শেষ জীবনে সমিতির কোন কোন সদস্য ও সেবককে তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীকেশব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীসমিতির ক্ষতিসাধন করিতে দেখিয়া ভীষণ ব্যথিত হন।

নারায়ণ প্রভুর সহধর্ম্মিণী প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর একাকী তিনি তাঁহার সঙ্গগুরু-চরণাশ্রিতা (সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্বামন গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতা) এক পুত্রবধুর নিকট নিরলস সেবা গ্রহণ করেন। অবশেষে প্রায় ৮১বৎসর বয়সে তিনি ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১, (ইং ১২।৬।০৪) শনিবার রাত্রি ১১-৩০ মিঃ-এ একাদশী তিথিতে অটুট হরিস্মৃতি-সহ নিজ নিত্যধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরদিবস যোগিনী একাদশীর ব্রতোপবাস ছিল। তাঁহার অগ্রকট সংবাদ পাইয়া সমিতির সেবকগণ বেগমপুরস্থ গৃহে গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র-পরিজনের সহিত সংকীর্ত্তন সহকারে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীরামপুর-শ্মশানঘাটে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করেন।

৭ই আষাঢ়, ১৪১১, (২২।৬।০৪) মঙ্গলবার তাঁহার বেগমপুরস্থ গৃহে সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমন্তজিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ ও সেবকবৃন্দের উপস্থিতিতে এক বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার অপ্রাকৃত ও নিত্যস্মরণীয় জীবন-চরিতের বিভিন্ন দিক্ আলোচনামুখে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ যজ্ঞাদি সমস্ত ক্রিয়া ও শ্রীগিরিধারীর বিশেষসেবা বিধানপূর্বক মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। পরমপূজনীয় শ্রীমৎ নারায়ণচন্দ্র প্রভু তাঁহার নিত্যধাম হইতে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শ্রীকেশবচরণে সমিতির সকল সদস্য ও সেবকবৃন্দের কেবল মৌখিক নহে, আন্তরিক নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়—যে নিষ্ঠা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিহার করিয়া সকলে এক বৃহৎস্বার্থে প্রণোদিত হন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার

সম্মানিত গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীপত্রিকার বার্ষিক আনুকূল্য এখনও কাহারও ১বর্ষ, কাহারও ২বর্ষ বাকী আছে। যাঁহাদের ১বর্ষ বাকী আছে, তাঁহারা ৫০টাকা এবং ২বর্ষ বাকী থাকিলে ৯০ টাকা শীঘ্রই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

প্রতি ইংরাজী বর্ষের প্রারম্ভে পত্রিকার আনুকূল্য পাঠাইতে অথবা পত্রিকা না লইতে চাহিলে জানাইয়া দিতে বিশেষ নিবেদন।

পত্রিকা না পাইলে, পত্রিকা পাঠানো হয় নাই—এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। পোস্টঅফিসের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার কারণেই পত্রিকা ঠিকমতো পৌঁছায় না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় পোস্ট-অফিসে সংবাদ নিন্ ও অভিযোগ করুন এবং নিম্ন ঠিকানায় আমাদের নিকট পোস্টকার্ড-যোগে লিখিত অভিযোগ করুন। আপনাদের লিখিত অভিযোগ পাইলে উহা দ্বারা আমরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিতে পারিব।

পত্রিকা না পাইলে সাক্ষাৎভাবে অথবা কাহারও মাধ্যমে নবদ্বীপস্থ কার্যালয় হইতে পত্রিকা সংগ্রহ করিলে আমাদের খুবই সুবিধা হয়। কারণ, ডাকযোগে অন্য মাসের পত্রিকা পাঠানো আইন-বিরুদ্ধ।

পত্রিকার আনুকূল্য ও অভিযোগ পাঠাইবার ঠিকানা—

SHRI GOUDIYA PATRIKA
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O.—NABADWIP, PIN-741302
DIST—NADIA, WEST BENGAL



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিদ্যশূন্য ॥	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন । হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
--	---

১৬ শ্রীধর, প্রদ্যুম্ন, ৫১৮ শ্রীগৌরাঙ্গ
৫৬শ বর্ষ } ৩২ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪১১, ইং ১৭/৮/২০০৪ { ষষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীল-গৌরকিশোরাস্তকম্

[ত্রিদিগ্ভিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিদৈশিক-আচার্য্য-মহারাজেন বিরচিতম্]

শ্রীগৌরধামাশ্রিত-শুদ্ধভক্তং রূপানুগাদ্যং নিরবদ্যরূপম্ ।

বৈরাগ্যধর্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ১ ॥

যিনি গৌরধামের আশ্রিত শুদ্ধভক্ত, রূপানুগগণের মধ্যে প্রধান এবং বৈরাগ্যধর্মের নিষ্কলঙ্ক-রূপবিশিষ্ট উজ্জ্বল বিগ্রহ, 'সেই গৌর-কিশোর' নামক প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহার্য্য নিত্যং গৌরাঙ্গ-সেবারত-মগ্নচিত্তম্ ।

গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ২ ॥

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিত্যকাল শ্রীগৌরসুন্দরের সেবারতে মগ্নচিত্ত এবং গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল যে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন—এইপ্রকার অনুভববিশিষ্ট, সেই শ্রীগৌরকিশোর নামক প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-দিব্য-গুঢ়-মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্।

ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৩॥

শ্রীধাম-মায়াপুরের অপ্রাকৃত নিগূঢ় মাহাত্ম্য কীর্তনে যিনি সর্বদা মুখর এবং মহাভাগবতগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, সেই সর্ববরণীয় ও প্রশংসনীয় শ্রীগৌরকিশোর নামক প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৩॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং শ্রীরাধিকাক্ষং-নিগূঢ়-ভক্তম্।

সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৪॥

যিনি পরম-পবিত্র অবধূতগণের মধ্যে শিরোমণি ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিগূঢ় ভজনকারী এবং যাঁহার সকলপ্রকার চেষ্টা সর্বদা ব্রজভাবে আবেশময় রাগযুক্ত, সেই গৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৪॥

শোকাম্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং মূঢ়েরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্।

নিত্যানুভূতাত্যুত-সদ্বিলাসং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৫॥

যাঁহার রমণীয় প্রভাবে শোকের বিষয় গত হয়, যাঁহাকে মূঢ়গণ জানিতে পারে না, কেবল শরণাগত ব্যক্তিই জানিতে পারেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিদ্বিলাসের অনুভবকারী, সেই শ্রীগৌরকিশোর নামক প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৫॥

কাপট্যধর্ম্মাশ্রিত-চণ্ড-দণ্ড-বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদাঙ্ক-ভৃঙ্গং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৬॥

কাপট্য-ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি যিনি প্রচণ্ড দণ্ডবিধান করেন, অপরদিকে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গে বিলাসশীল, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৬॥

দামোদরোত্থানদিনে-প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।

প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবস্ত্রং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৭॥

দামোদর (কার্তিক)মাসে প্রসিদ্ধ শ্রীহরির উত্থান দিনে (উত্থানেকাদশী-তিথিতে) ও কুলিয়া (কোলবীপ)-নামক পবিত্র-স্থানে যিনি প্রপঞ্চলীলা পরিহার করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৭॥

তব হি 'দয়িতদাসে' সত্যসূর্য্য-প্রকাশে

জগতি দুরিতনাশে প্রোদ্যতে চিদ্বিলাসে।

বয়মনুগতভূত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্ন

অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ॥ ৮ ॥

(হে পরমহংসবাবাজী মহারাজ!) আপনারই অধস্তন যিনি জগতে পাপনাশকর ও চিদ্বিলাস-বিকিরণশীল অকৈতব-সত্য-সূর্য্যের প্রকাশ-স্বরূপ, সেই 'শ্রীবার্ভানবী-দয়িতদাস' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আমরা অনুগত নগণ্য ভূত্যগণ; অতএব আমরা আপনার পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া অনুক্ষণ করুণা প্রার্থনা করিতেছি॥ ৮॥

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—শ্রীহরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম কি?

উত্তর। কৃষ্ণদাসাই জীবের নিত্যধর্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্য কি?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্বক স্থায়ী নিব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্য।

প্র। সে সমস্ত কার্যকে কেন বৈধর্ম্য বলি?

উ। জীব—চিন্ময় ; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নিব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-বাদে জীবের চিদ্রম্মের বিশেষ হানি। নিব্বিশেষ-বাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারো অন্বেষণ করেন?

উ। কর্মজড় পুরুষগণই কর্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারো অন্বেষণ করেন?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড়-সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নিব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাপ্ত (পূর্বে কথিত) দুই প্রকার সুখই সোপাধিক (উপাধি-যুক্ত অর্থাৎ গুণ) ; নিজসুখ-অনুভূতিই নিরূপাধিক।

প্র। নিজসুখ-অনুভূতি কি?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত (হইয়া) জীবের যে শুদ্ধচেতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কতপ্রকার তারতম্য আছে?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য আছে—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহ জীবের উপাধি।

১। বৈধর্ম্য—প্রকৃত ধর্মের যাহা বিপরীত।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই ; তাঁহাদের কৃষ্ণসামুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থমানে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত ; কেন তাহা করিলেন না ?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীব স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত ; তাহাতে চিদ্বস্তুর যে স্বতন্ত্র আনন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি ?

উ। জীব চিদ্বস্তু ; আনন্দই তাহার ধর্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিদ্রূপগত যে পাঁচটি নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হওয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি ?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটি শব্দের অর্থ বলুন।

উ। ১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণগুরুত্তির নাম—শান্তরতি ; ২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সন্ত্রমপূর্ণ কৃষ্ণগুরুত্তির নাম—দাস্যরতি ; ৩) সম্বন্ধযুক্ত, সন্ত্রমহীন অথচ বিশ্রমযুক্ত কৃষ্ণগুরুত্তির নাম—সখ্যরতি ; ৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণগুরুত্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং ৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি ?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার ; যথা—১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি ; ২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী ; ৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার ; যথা—১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত, ২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে কিন্তু আবদ্ধ নয় ; ৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহার মধ্যে কাহারো নিত্যবদ্ধ ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধনভক্ত ; ২) পূর্ণবিকচিত চেতন অর্থাৎ ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে?

উ। চিদ্রূপে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিত-চেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার?

উ। অনেক প্রকার ; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—

১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি-সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—শ্বেচ্ছাদি।

৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধগণ।

৪) কল্লিত-ঈশ্বরবাদ-যুক্ত নীতি-পরায়ণ ; যেমন—কর্মা-বাদিগণ।

৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

৬) নির্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর ; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্য-তনুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঞ্জিলাভই—মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার?

উত্তর। লোকে—সালোকা, সার্গিক, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্ব-নাম-লব্ধ যে মোক্ষচিন্তা, তাহা নির্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয় ; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদ ও অভেদেই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলে?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকে কেন মোক্ষ বলিব?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচনকার্য্যটি

ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত(সমাপ্ত) হয়। কৃষ্ণচরণামৃত-পানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত ; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব ?

প্র। একটা উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়া অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকারনাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃত-স্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য, আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, তাহা কোন সময় হইয়া থাকে ; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মানদান ও হানি

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈশুন্যব্রণপীড়িত^১ মৎসর সমাজের কল্যাণ-উদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপ-প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মবঞ্চিত জনগণেরও প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিত জনগণকে সর্বদা হরিকীর্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিতসহিষ্ণুতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অসূয়াপর জনগণ দৌরাভ্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথা দ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহ্যগুণের দ্বারা তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব যতই স্থগিত করিবেন, ততই পাপপ্রবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই ‘ধর্ম’ নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। সুতরাং পাপচিন্ত জনগণ স্থায়ী দুরভিসন্ধি মূলে ‘বৈষ্ণবের মান নাই’ এই উক্তিবেশে মানবজাতির সর্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহলাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিमानে কতই না কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল! রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অম্বরীশ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার অর্কচীন জনসাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের ‘সর্ব্বাধমতা’ এবং ‘সর্ব্বসহিষ্ণুতা’ এই অপরিহার্য্য গুণদ্বয় ঐসকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহলাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্দাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার

১। পৈশুন্যব্রণপীড়িত—পৈশুন্য অর্থাৎ পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশ, ব্রণ অর্থাৎ ক্ষত বা ঘা ; কাহারও পরোক্ষ দোষপ্রকাশের স্বভাব ক্ষত বা ঘা তুল্য—উহার দ্বারা যাহারা আক্রান্ত।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১শে আষাঢ় ১৪১১, ১৬ই জুলাই ২০০৪

উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র-রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদির প্রার্থনায় শ্রীহরিদাসের নির্যাতন-কারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুঝিতে পারেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তখন তিনি তাঁহার বিদ্রোহ ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য-প্রভাবেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ-অবস্থিতিলক্ষ্য করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের হেয়তা নাই, পরন্তু উপাদেয়তা বর্তমান। ইহারই নাম—‘সম্বন্ধজ্ঞান’ বা ‘দিব্যজ্ঞানলাভ’ বা ‘দীক্ষা’। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারাই জড়ভেদের হেয়ত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাদেয় রাজ্যে বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সম্যকরূপ ক্ষয় হয় এবং দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য নয়ন পথে পতিত হয়। অর্কবাটিনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মুখের অনুভূতিতে ‘অমানী’ ‘মানদ’ ‘সহিষু’ প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান লইয়া মুখের অর্কবাটিনা ধারণা পরিবর্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে ‘অভিজ্ঞ’ মনে করিয়া যেরূপ ‘সহিষু’, ‘মানদ’ প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিদ্বজ্জনানুমোদিত নহে।

ভগবদ্ভিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের ‘সকলকে সম্মান প্রদান কর’ এবং ‘আপনি নিরতিমানী হও’—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণব-গুরুবর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্যম বৈষ্ণববিদ্রোহীদের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যে অনাস্থাবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও ভক্তবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুন্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আনুষ্ঠানিক কণ্ঠ্যনের দ্বারা সুখলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং সহিষু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ-জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরুদেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোনও ব্যক্তির কল্লিত গুরুদেব

বৈষ্ণবের বিদ্রোহ করেন, তাহা হইলে, লঘুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগীকে কখনই কেহ ‘গুরু’ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ন্যায়রহিত আদেশকারী গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্রোহকে শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই ‘গুরু’ বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে ‘গুরু’পদে বরণ করিলে যথেষ্টাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাঁহারা ‘অমানী’ ও ‘সহিষু’ শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্রোহ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মান্য সমজাতীয় নহে। যাঁহারা জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভক্তিপথশ্রিত নহেন, জানিতে হইবে। বিষুঃ অপ্রাকৃত বস্তু ; দিব্যজ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই জড়প্রতিষ্ঠাশাকেই ‘শৌকরীবিষ্ঠা’ বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে শৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্বনাশ কামনা না করায় তাঁহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষ্ঠার বাহক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাই, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্রোহ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যের বাসনা এবং তদুদ্দেশ্যে গৌণভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টাদ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঈর্ষামূলে ব্রহ্মচার্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঈর্ষামূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীরও ‘গুরু’ সাজিয়া তাঁহাকে ঈর্ষামূলে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানদ ধর্ম্ম নহে। এইরূপ করিয়া তাঁহাদের অসম্মান করিবার প্রয়াস করিলে বা রূপ-সনাতনকে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিলে তাঁহাদের মানহানি করা হয়। এইসকল সর্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে সকলেই পরমার্থবিদ্রোহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ রক্ষাকারীর এই সকল ব্যক্তির বিবর্ত্ত ছলনায় ঈর্ষা ও পরদ্রোহিতা পাপমূলক, সুতরাং কর্ম্মবাদীর বিচারে পাপের শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞতার ছলনায় দৌরাণ্য চলিতে থাকিবে। ব্যবস্থাবক সভায় পরস্পর ধর্ম্ম বিদ্রোহের যে বিধি গঠিত হইতেছে, তদ্বারা যদি ধর্ম্মজগৎ লাভবান হন, শুভানুধ্যায়িগণের তাহার প্রতিরোধ করা উচিত নহে। শিক্ষকের শিশুর মঙ্গলের জন্য তাড়না, ধর্ম্মপ্রচারকের সন্ধর্ম্মাণুসরণের জন্য শাসন, ধর্ম্মের প্রতিকূল বিচার পরিত্যাগরূপ অনুনয়-বিনয়,

কখনই সাধুসহায়ের বিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে ধর্মযাজনের ভাণে ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাকে ধর্ম্মাধিকরণে বাধ্য করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্যতম। কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া মহাপ্রভুকে রাজবিত্তাপহারক পটুনাযক বংশ্য বাণীনাথের শুভানুধ্যানের বিরোধী মনে করিতে পারে, গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিতে পারে, জনসাধারণকে অসদভিপ্রায়ে বিপথগামী করিতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা ব্যতীত যাহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাঁহারা ইহাদিগের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

দ্যুত, পান, স্ত্রী, সূনা ও নিজেদ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থার্জ্জন পরমার্থ-জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিক্ষিপ্ত ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চা নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধি জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না বলিলে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া মৎসরতা-মূলে যে সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহা স্তব্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের সাধুচেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডাদিবিধান সাধুদিগের সাহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়পিপাসা উত্তীর্ণ হইয়া খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু চেষ্টা। তাহার লৌকিক প্রতীকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবানই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধুত্বে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতাময় অসাধুতায় পরিগণিত হইবে। সাধুদিগেরই প্রকৃত সম্মান আছে। অবৈধভাবে তাঁহাদের মৌনধর্ম্মের সুবিধা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য, যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতের কোন উপকার করে না। কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দৌরাণ্য করা হয়। সাধুগণ অসাধুকর্তৃক প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ায় অনেকে এইরূপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃতদোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব-স্ব প্রভুর সম্মান নষ্ট করিবার জন্যই গৌণভাবে চেষ্টাষিত হইয়া সেবার ভাণ করেন। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র কর্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্তব্য। ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচার-প্রণালীদ্বারা সাধুতা ও সাধুগণ চিরদিনই অক্লান্ত। এইপ্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্ম্মের নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

অধুনা কোন কোন গ্রাম্য বার্তাবহ বা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত কেনেডি সাহেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে-প্রকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্বারা পাঠকগণ তাঁহার লেখনীতে শ্রদ্ধাষিত হইলেই অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সামাজিক দুর্বলতা ও দুর্নীতিকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করেন। পারমার্থিকগণ

গ্রাম্যবার্তাবহের বা কেনেডি সাহেবের বিচারে দুর্নৈতিক বলিয়া প্রচারিত হইলেও নীতিপরায়ণ শুদ্ধ-ভক্তগণ ইহার প্রতিবাদ করিবেন। স্মার্তকূল পরমার্থের নানাপ্রকারে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন, ও করিতে উদ্যত আছেন, বা করিবেন, তাহার হস্ত হইতে ভাটী ভক্তগণ মুক্তিলাভ প্রার্থনা করেন। যাহারা সেই অনুগ্রহ করিতে বঞ্চিত, তাহারাই গুরু-বৈষ্ণববিদ্রোহী এবং তাহাদের বিচারেই গুরু-বৈষ্ণবের সম্মানের পরিবর্তে তাহাদিগকে অসম্মানিত করাই তাহাদের নীতি ও ধর্ম। গুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই বৈষ্ণবধর্ম। তাহাদিগকে অপরে আক্রমণ করিবে ও তাহাদের সম্মান হানি করিবে ইহাই পঞ্চষষ্টিতম ভক্তির সাধন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সমাজের শুভানুধ্যানের পরিবর্তে দৌরাভ্য করিবার জন্যই খড়্গহস্ত ও হিংসাপরায়ণ। হিংসিত সাধুসমাজ নিজেরা প্রতিহিংসা করেন না বলিয়াই তাহাদিগের অসম্মান করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সুনীতি-সঙ্গত নহে। বাগবিতণ্ডা দ্বারা, জনবল দ্বারা বিচারকগণের ধারণা বিপর্যয় করিবার জগতে এইসকল প্রথার আদর থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাগবতগণের গুরুদ্রোহিতার সাহায্য করা ভাগবতধর্ম প্রচারক দ্বাদশবৈষ্ণবের তাৎপর্য ছিল না। তাহারা সকলেই গুরু-বৈষ্ণবের সেবক ও রক্ষক। যদি প্রকৃত বৈষ্ণবদাস গুরু-বৈষ্ণবের অসম্মান আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদ্রোহীর মতাবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি পরিশেষে নিজ কর্মদোষে বিপাকে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অবৈধ অসৎকার্যের প্রশংসা করা নীতিসঙ্গত নহে। আবার পক্ষান্তরে ভাগবতের স্বক্ষে অবৈধভাবে দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। গুরু-বৈষ্ণবকে কায়-মনোবাক্যে সেবা করিতে হইবে। ত্রিদিগুণকে নির্যাতন করিতে হইবে না। ত্রিদিগু ব্যতীত পারমার্থিক হইবার অন্যের যোগ্যতা নাই। গৌরসুন্দরের আশ্রিত সকলেই ত্রিদিগু, কেহ বা ব্যক্ত, কেহ বা রাগানুগা প্রবৃত্তিবলে অব্যক্ত। তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া নহেন।

(প্রভু পাদের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত)



বেদান্তে শব্দবাদ

জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

উপনিষদ্ সাধুর লক্ষণ-সম্বন্ধে বলেন—“শব্দে পরে চ নিষ্ণাতঃ”, এখানে ‘শব্দ’ অর্থে ‘শাস্ত্র’ বা ‘বেদ’। বেদের শিরোভাগ বা সারভাগের নাম ‘বেদান্ত’। আপনারা এই বেদান্ত-সূত্রের কথা সকলেই জানেন। বেদান্ত-সূত্রে একমাত্র শব্দই পতিপাদ্য বিষয়। আপনারদেরকে শব্দ-সম্বন্ধে বেদান্ত-সূত্রকারের উপদেশগুলি জানাতে পারলে আপনারদের নিশ্চয়ই সংশয় দূর হবে। বৈয়াসকি হিন্দু-সম্প্রদায় ‘বেদান্ত’-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেই তাঁদের ধর্মপথ স্থাপন করেছেন। একমাত্র শব্দেরই আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ চৈতন্যশব্দের শ্রবণ অঙ্গীকার করে আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হবে। বেদান্তের

প্রথম সূত্র—“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। এই সূত্রে ‘অথ’ অর্থাৎ ‘অনন্তর এই শব্দের দ্বারা প্রাকৃত শব্দসমূহের হেয়ত্ব, অনুপাদেয়ত্ব ও অপ্রমাণত্ব উপলব্ধির পর’—বুঝাচ্ছে। এবং ‘শব্দ’ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রমাণদ্বারা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে, এইপ্রকার জ্ঞান হলে পর অপ্রাকৃত শব্দ কি—এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ‘ব্রহ্ম’-শব্দের অর্থ ‘শব্দ’। ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ বললে ‘অথাতো শব্দ জিজ্ঞাসা’ বুঝাবে। আপানারা ‘নাদব্রহ্ম’ ‘শব্দব্রহ্মে’র কথা শুনে থাকবেন। ‘ব্রহ্ম’ বলতে অপ্রাকৃত শব্দকেই বুঝায়। ব্রহ্মকাণ্ডে স্বয়ং হরি এই সম্পর্কে বলেছেন—শব্দতত্ত্বই ব্রহ্ম। যেমন—

“অনাদিনিধানং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরঃ।

নিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।”

এই শ্লোকের দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য শব্দতত্ত্বই যে ব্রহ্ম, তা প্রতিপাদিত হচ্ছে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থে শব্দজিজ্ঞাসাই বুঝায়। আমার বক্তব্য-বিষয় শ্রবণের পর আপনাদের মনে যেপ্রকার শব্দ-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উদয় হচ্ছে, ব্যাসদেব অন্তর্যামিসূত্রে তা জেনে তারই উত্তর সূত্রাকারে আমাদের মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই শব্দতত্ত্বটা কি—তা নিরূপণ করতে গিয়ে ব্যাসদেব তাঁর দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন—“জন্মাদস্য যতঃ”। ‘জন্মাদি’ অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গম্। ‘অস্য’ অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়ে থাকে। সুতরাং শব্দ হতেই এই বিশ্বের আবির্ভাব-তিরোভাব হচ্ছে—ব্রহ্মসূত্রকার এইরূপ বলেছেন। ব্রহ্মকাণ্ডীয় সেই শ্লোকটার শেষ চরণই অর্থাৎ “নিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ”—এই চরণটা আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করছে। যে শব্দতত্ত্ব-রূপ ব্রহ্ম হতে জগতের প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকাশ, স্থিতি ও নিবৃত্তি সাধিত হয়, সেই ব্রহ্মতত্ত্বই ‘শব্দ’। এই প্রসঙ্গে আমি দুই একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বিশেষ প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা করব যে, শব্দ হতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ সম্ভব। উদাহরণগুলি সর্ব্বাসুন্দর না হলেও আপনাদের সংশয় দূর করতে পারবে আশা করি।—

আধুনিক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, শঙ্খধ্বনিতে বহু অস্বাস্থ্যকর বীজানু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শঙ্খ আমাদের পবিত্র জিনিস। জীবের কোন অস্থি সাধারণতঃ কোন দৈব-ব্যাপারে লাগে না ; কিন্তু শঙ্খ অস্থি হলেও আমাদের দৈবকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শঙ্খের ধ্বনিতে আমাদের পবিত্রতা লাভ হয়। এখন চিন্তা করে দেখুন, শব্দের ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে কি না ? এছাড়া আপনারা বহু পৌরাণিক ঘটনা শুনেছেন, যাতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বাক্যতেজে বা অভিসম্পাতে বহু অসুরের বিনাশ-সাধন হয়েছে। ঋষিবাক্যের এমনই ক্ষমতা যে, তাঁর বাক্যপ্রভাবে কোন এক পুরুষের গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং সেই গর্ভে একটা মুঘল জন্মগ্রহণ করে। সেই মুঘল যদুবংশের বিনাশের কারণ হয়েছিল। সুতরাং শব্দের প্রভাবে জন্ম হতে পারে—তা প্রতিষ্ঠিত হল। আপ্তবাক্য বা আন্নায়-বাক্যের এমনই শক্তি যে, তার প্রভাবে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়ে থাকে।

এইপ্রকার শব্দতত্ত্ব ব্যাসদেব শাস্ত্র হতেই নিরূপণ করেছেন। আমরাও শাস্ত্র হতেই

শব্দতত্ত্বের অভিজ্ঞান লাভ করব—অন্য কোনপ্রকার প্রাকৃত উৎস থেকে নয়। এইজন্য বেদান্তের তৃতীয়সূত্রে ব্যাসদেব বলেছেন,—“শাস্ত্রযোনিহ্মাৎ”। অতএব আমরা শাস্ত্র ত্যাগ করে যথেষ্ট স্বকপোল-কল্পনাদ্বারা যেন আমাদের আত্মমঙ্গলজনক পথ নিরূপণ করবার বৃথা চেষ্টা না করি।

প্রাকৃত জগতে শব্দ আর শব্দদ্বারা উদ্ভিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ দেখা যায়—বাচক ও বাচ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, (যেমন, ‘আম’-শব্দই স্বয়ং আম নয়)। কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দী বা বাচ্য ও বাচকের মধ্যে কোন মায়ার ব্যবধান নাই—তাই অদ্বয়জ্ঞান বিচারে তা’রা একই তত্ত্ব। ব্রহ্মকাণ্ডের আর এক স্থানে স্বয়ং শ্রীহরি বলেছেন—“বাচ্যা সা সর্ব্বশব্দানাং শব্দাশ্চ ন পৃথক্ ততঃ।” সুতরাং বাচ্য-বাচকে, শব্দ-শব্দীতে যে কোন বেদ নাই—তা শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হ’ল। এই শব্দের আলোচনা করতে গেলে শব্দান্তর বস্তুর আলোচনা দ্বারা শব্দের সাধন হতে পারে না। বেদান্তের চতুর্থসূত্র—“তৎ তু সমন্বয়াৎ” তা’র প্রমাণ। ‘সমন্বয়াৎ’-সূত্রের অর্থ সম্—সম্যক্রূপে অর্থাৎ একমাত্র। অন্বয়াৎ অর্থাৎ অন্বয় বা অনুকূল অনুশীলন। সূত্রকার এখানে ‘সম্’-শব্দের দ্বারা ব্যতিরেক-পথের নিরাস করছেন। নৈয়ায়িকগণ এক বস্তু হতে অন্য বস্তুর ব্যতিরেক চেষ্টা-মুখে যে আলোচনা করেন—নির্ব্বিশেষবাদিগণ ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচারে যে ব্যতিরেক চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন—তাকে ব্যাসদেব ‘সম্’ ও ‘অন্বয়াৎ’ এই উভয় শব্দের দ্বারা নিরস্ত করেছেন। অন্বয়-পথই আমাদের একমাত্র পথ—তা’ স্বীকার করতে হবে। নৈয়ায়িক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের অপ্রাকৃত ‘শব্দ’-প্রমাণে আস্থা না থাকার জন্য তা’রা প্রত্যক্ষ অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রমেয়-নির্ণয় করবার যে চেষ্টা করেন, তাতে আমাদের বস্তুতঃ কোনপ্রকার মঙ্গলের কথা নাই। শব্দই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। অপ্রাকৃত শব্দ অর্থাৎ মহাপুরুষগণের বাণী আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশ করলে আমাদের মন্বস্পর্শ করে প্রাণকে আকুল করে তুলে। আপনারা বৈষ্ণবকবির পদ শুনে থাকবেন—“কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।” এখন আমার পূর্বে দেওয়া লৌহ-অগ্নির দৃষ্টান্তটা স্মরণ করুণ। আমাদের হৃদয় লোহার মত কঠিন হলেও অপ্রাকৃত শব্দ-শ্রবণের ফলে অগ্নিপ্রবিষ্ট লোহার মত তা’ কোমল হয়ে যাবে। কারণ, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং ভগবানের অভিন্ন শব্দও সর্ব্বশক্তিমান্। সুতরাং শব্দ আমাদেরকে সংপথে নিয়ে যাবে, এতে আর বিচিত্রতা কি?

‘শব্দ’, ‘আত্মা’, ‘বিষ্ণু’ ‘ব্রহ্ম’ ইত্যাদি একই তত্ত্বের বাচক সুতরাং এঁদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভেদ নাই। উপনিষদ্ বলেন—“আত্মা বা অরে শ্রোতব্য দ্রষ্টব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ”—আত্মাকে শ্রবণ করতে হবে, আত্মাকে দর্শন করতে হবে ও আত্মার ধ্যান করতে হবে। সুতরাং আমাদের শব্দের শ্রবণ করতে হবে এবং শব্দের দর্শন করতে হবে। উপনিষদের এই কথায় শব্দের যে দর্শন-ব্যাপার আছে, তা প্রমাণিত নয়। পূর্বে বলা হয়েছে, যা শ্রবণ-যোগ্য, তা দর্শন-যোগ্য নয় এবং যা দর্শন-যোগ্য, তা শ্রবণ-যোগ্য নয়। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে,—শব্দ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি প্রকারে গ্রাহ্য হতে পারে? চক্ষু কেবল রূপবিশিষ্ট বস্তুই দর্শন করে, কিন্তু শব্দ নিরাকার

বস্তু—সূতরাং রূপহীন শব্দ দর্শন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে না। সময় সংক্ষিপ্ত-জন্য আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না, তথাপি আপনাদের কিছু সংশয় নিরসন করছি। ‘সরীসৃপ’ অর্থাৎ সর্পের কর্ণ-ইন্দ্রিয় নাই— সে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই শ্রবণ করে থাকে, তা আপনারা যথেষ্ট লক্ষ্য করেছেন। সূতরাং ‘শব্দকে দর্শন করতে হবে’ ব’লে শাস্ত্রকারগণের যে উপদেশ, তার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তা ছাড়া শব্দের কোন আকার নাই—একথা বেদান্ত স্বীকার করেন না। বেদান্ত-সূত্রকার ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব এসমস্ত মত ও আপত্তি নিরসন করতে পঞ্চম সূত্রে বলেছেন—“ঈক্ষতের্নশব্দম্”। ঈক্ষতেঃ ন অশব্দম্ ; অর্থাৎ অশব্দ নয় এমন বস্তুকে অর্থাৎ শব্দকে দর্শন করতে হবে। এতে আমরা বুঝি যে, শব্দের রূপ আছে। এখানে আপনাদের পূর্বপক্ষ হতে পারে—‘ঈক্ষতের্নশব্দম্’ এইভাবে ঘুরিয়ে সূত্র না করে বরং ঝটিতি অর্থ প্রতিপাদনের জন্য ‘ঈক্ষতেঃ শব্দম্’ এইপ্রকার সূত্র হতে পারত কি না? এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা এই যে, ‘অশব্দ’ অর্থাৎ প্রাকৃত-শব্দের ব্যতিরেক-পথে যে দর্শন, তাকে প্রথমতঃ নিরাস করে পরে একমাত্র অবিমিশ্র অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-চেতনবিশিষ্ট শব্দের নিত্যরূপ দর্শন করতে হবে—বেদান্ত-সূত্রকার এইভাবেই শব্দের রূপ ও আকার নির্ণয় করেছেন।

এখন সে শব্দের আকার কি—তা আমাদের শ্রবণ করবার কৌতুহল হচ্ছে। আচার্যকূল-চূড়ামণি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শব্দের রূপ-সম্বন্ধে বলেছেন—“নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার”। ভগবান্ নামরূপ ধারণ করে কলিকালে আমাদের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। একমাত্র নামই শব্দের রূপ। শব্দ শাস্ত্র-আকারেও আমাদের কাছে প্রকাশিত আছেন। শাস্ত্রই হ’ল শব্দের অন্যরূপ। আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে—শব্দের নাম ও শাস্ত্র-রূপ কিভাবে সম্ভব হ’ল এবং নামেতে ও শাস্ত্রেতে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি জড়জগতেরই যে শব্দের রূপ আছে, তা বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব। আপনারা গ্রামোফোন দেখেছেন—একজন লোক গান করলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে গায়কের সেই শব্দগুলি একটা Plate-এ ধারণ করা হয়। ঐ Plate -এ আমরা Sound Box-এ পিন দিয়ে move করলেই গায়কের সেই শব্দগুলি শ্রবণ করতে পারি। সূতরাং শব্দের রূপ ধারণ সম্ভব না হলে এ কার্যটি সম্ভব হ’ত না। জীবগোস্বামী হরিনামামৃত-ব্যাকরণে বলেছেন—“নারায়ণাৎ উদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ”—নারায়ণ হতেই বর্ণক্রম অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সেই শব্দ ব্রহ্মার অপ্রাকৃত কর্ণে গৃহীত হয়েছে। পরে সেই শব্দ তাঁর অপ্রাকৃত জিহ্বায় কীর্তিত হয়েছে। নারদ তা শ্রবণ করে ব্যাসদেবের নিকট কীর্তন করেন। এইভাবে আমরা ক্রমে এই অপ্রাকৃত শব্দ ব্যাসদেবের কাছে এসে পৌঁছালে তিনি সেই অপ্রাকৃত শব্দকে Analogy-ক্রমে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অপ্রাকৃত Sound-box সঙ্গুরূপাদপদ্মের আশ্রয়ে সেই অপ্রাকৃত-শব্দ শ্রবণ করতে পারা যায়। প্রাকৃত জগতের উদাহরণ দিয়ে যতদূর সম্ভব আমি আপনাদেরকে বুঝাতে যত্ন করেছি।

এখন শাস্ত্ররূপ এবং নামরূপের সম্বন্ধে বলতে চাই। সূর্য্য তাঁর কিরণ সমস্ত দিকে বিস্তার করেন। সেই কিরণের দাহিকাশক্তি থাকলেও তা নানাস্থানে বিকীর্ণ হওয়ায় এত দূরের বস্তু দক্ষ করতে পারে না। আপনারা পড়েছেন—“অনন্তপারং কিল শব্দ-শাস্ত্রম্”। শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী প্রত্যেক শব্দকে এই সূর্য্য-কিরণের সাথে তুলনা করেন। প্রত্যেক শাস্ত্র-বাক্যেরই আমাদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমরা শাস্ত্র হতে বহুদূরে থাকার দরুণ সেইসব বাণী আমাদের প্রতি ক্রিয়াবতী হচ্ছে না। আবার সেই বিচ্ছিন্ন কিরণগুলি যখন আতস-পাথরের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তা যে-কোন দ্রব্য দক্ষ করতে পারে। শ্রীনামকে সেইপ্রকার জানতে হবে। বিচ্ছিন্ন ও বিস্তৃত সমস্ত শাস্ত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাই শ্রীনামে অবস্থিত আছে। সুতরাং ভগবন্নামই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। শাস্ত্রবাক্য আমাদের কাছে ক্রিয়াশীল না হলেও শ্রীনাম গ্রহণ-মাত্রই আমাদের মঙ্গল হবে। রাত্রি অধিক হয়েছে—বেদান্তের অন্য সূত্রগুলির আলোচনা করবার সুযোগ হল না। বেদান্ত-সূত্রের উপসংহারে শ্রীল ব্যাসদেব বলেছেন,—“অনাবৃতি শব্দাং অনাবৃতি শব্দাং”। অর্থাৎ শব্দ হতেই অনাবৃতি হবে। ‘শব্দ’-অর্থে শ্রীনাম বুঝতে হবে। শ্রীনামগ্রহণেই জীবের মুক্তি, অন্য উপায়ে মুক্তির সম্ভাবনা নেই, তা নিশ্চয় করে বুঝাতে সূত্রকার দুইবার একই পদের পুনরাবৃতি করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—“কীৰ্ত্তনীযঃ সদা হরিঃ”। নারদীয় বচনেও আমরা জানতে পারি—

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।”

তিনি একবার বা দুইবার বলে সমুপ্ত হননি, তিন বার করে ঐ নাগ্রহণের কথা বলেছেন। কলিকালে বদ্ধজীবের পক্ষে নামগ্রহণ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার গতি নেই—তা’ বেদান্তসম্মত, শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসম্মত। সুতরাং আপনাদের কাছে প্রার্থনা—নামগ্রহণ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার ধর্ম্মের অঙ্গীকার না করে বাস্তবিক সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত-শব্দ ‘শ্রীনাম’-শ্রবণ করুন। আজকের মত আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম। (সমাপ্ত)

উপনিষদ-বাণী

(ছান্দোগ্য ১)

এই চরাচর জীবের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার বা কারণ—জল; আবার জলের উপর নির্ভরশীল ওষধিসমূহ হইতে পোষণ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যাদি শরীরের উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের প্রধান অঙ্গ বাণী। এই বাণীর সার—ঋক্, ঋকের প্রধান অংশ সাম। যেহেতু উহা গীত হয়, তজ্জন্ম (কীৰ্ত্তন-প্রধান অঙ্গ বলিয়া) সামের শ্রেষ্ঠতা।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩১ আষাঢ় ১৪১১, ১৬ই জুলাই ১০০৪

সামমন্ত্ৰের দ্বারা দেবতাগণের স্তুতি করা হয়। এই সাম মধ্যে উদ্ধীথ অর্থাৎ ওঁকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম ব্রহ্মের ধাম অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ।

বাণী—ঋক্। প্রাণ—সাম এবং ওঁকার উদ্ধীথ (কীর্তনীয় বস্তু)। প্রাণ ও বাণী, ঋক্ ও সাম অভিন্ন বস্তু, একে অপরের পূরক। বাণী ও প্রাণকে ওঁকারের সহিত উত্তমরূপে সংযুক্ত করা হয়। তখন উহা সর্ব্বদা কৃতকৃত্য করে অর্থাৎ প্রাণযুক্ত প্রাণী বাণীদ্বারা ওঁকারের কীর্তন করিয়া ধন্য হইতে পারে। এই রহস্য যিনি জানেন, তিনি ওঁকাররূপ অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বকামনা পূরণে সমর্থ হন।

আবার এই ওঁকার অনুজ্ঞাসূচক। যখন কাহাকেও কোন বিষয়ের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ওঁকার উচ্চারণ করা হয়। ওঁকার দ্বারাই ত্রয়ী বেদের যজ্ঞাদি কর্ম্মারম্ভ করা হয়। এই ওঁকাররূপ অবিনাশী পরমাত্মার উপাসনার জন্য ‘অধ্বর্যু’ নামক ঋত্বিক আশ্রাবণ করেন অর্থাৎ মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ করিয়াই হোতা শংসন অর্থাৎ মন্ত্র পাঠ করেন এবং ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক উদ্ধাতা উদ্ধীথ গান করেন। যিনি এই ওঁকারের রহস্য জানেন এবং যিনি জানেন না, সকলেই ইহার উচ্চারণ করিয়া সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি এই ‘অক্ষর’-তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তিনি অধিক সামর্থ্যযুক্ত হন। এইরূপে ওঁকারের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।

দেবতা এবং অসুরগণ যখন পরস্পর যুদ্ধ করেন, তখন দেবগণ ওঁকারকে ধ্যেয়-স্বরূপে যজ্ঞদ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা এই উপাসনা দ্বারা অসুরগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা প্রথমে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্ধীথ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু অসুরগণ উহাকে রাগ-দ্বেষ্টরূপে পাপযুক্ত করিয়া দেয়। এজন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় কলুষিত হওয়ার উহাদ্বারা জীবগণ ভালমন্দ উভয়প্রকার গন্ধই গ্রহণ করে। অতঃপর দেবতাগণ বাণীকে (রসনাকে) উদ্ধীথ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। অসুরগণ তাহাকেও রাগ-দ্বেষ্টদ্বারা কলুষিত করে। এইজন্য ঐ রসনা দ্বারা মনুষ্যগণ সত্য-মিথ্যা উভয়প্রকার বাণীই উচ্চারণ করে। তৎপরে দেবতাগণ নেত্রকে উদ্ধীথরূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ উহাকেও রাগ-দ্বেষ্টদ্বারা মলিন করিয়া দেয়। তদবধি মনুষ্যগণ নেত্রদ্বারা শুভাশুভ সকলদৃশ্যই দেখিয়া থাকে। এইবার দেবতাগণ শ্রোত্রকে উদ্ধীথরূপে গ্রহণ করেন। অসুরগণ তাহাকেও দূষিত করিয়া দেয়। সেজন্য মনুষ্যগণ শ্রবণ-যোগ্য ও শ্রবণের অযোগ্য সকল কথাই শ্রবণ করে। পুনরায় দেবতাগণ মনকে উদ্ধীথ-রূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ মনকেও রাগ-দ্বেষ্টদ্বারা অভিভূত করে। এজন্য মনুষ্যগণ মনের দ্বারা ভাল-মন্দ সঙ্কল্প বা বিকল্প সকল চিন্তাই করে। সর্ব্বশেষে দেবগণ প্রাণকে উদ্ধীথ-রূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ উহাকেও দূষিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু উহা অচ্ছেদ্য প্রস্তরের মত সুদৃঢ়। কারণ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু করা হয়, ভোজনাদি-কার্য্যসকল প্রাণেরই পুষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়েরও পুষ্টি হয়। অন্তকালে এই প্রাণ বাহির হইয়া গেলে ইহার সঙ্গে অন্য সকলের সহিত জীবাত্মা

শরীর হইতে উৎক্রমণ করে অর্থাৎ নির্গত হয়। ইহাই প্রাণের মহিমা। প্রসিদ্ধি আছে যে, অঙ্গিরা ঋষি প্রাণকে প্রতীত ধরিয়া ওঁকার-রূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন; এজন্য লোকে ইহাকে অঙ্গিরস (অঙ্গিরা-উপাস্য) বলিয়া থাকেন। এই প্রাণ সমস্ত অঙ্গের রস (পোষক)। বৃহস্পতিও এই প্রাণদ্বারা ওঁকার-রূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে প্রাণকেই ‘বৃহস্পতি’ বলিয়া থাকে; কারণ বাণীর এক নাম ‘বৃহতী’, তাহার পতি (রক্ষক) বলিয়া ‘বৃহস্পতি’। ‘আয়াস্য’ নামক ঋষিও বৃহস্পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। এজন্য লোকে ইহাকে ‘আয়াস্য’ বলে। আস্য অর্থাৎ মুখদ্বারা যাতায়াত হয় বলিয়া ঐ নাম। দম্ভপুত্র বকও প্রাণের উপাসনা-রূপ সাধনের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করেন। তিনি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিগণের উদ্ধাতা হইয়াছিলেন। তিনি ঋষিগণের কামনা পূরণার্থ উল্লীখ গান করিয়াছিলেন। যিনি এই প্রকার প্রাণের মহত্ত্ব অবগত হইয়া ওঁকারের উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সঙ্কলিত বস্তুকে আকর্ষণে সমর্থ হন।

উত্তাপ-প্রদানকারী সূর্য উদিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণের প্রাণ-রক্ষক বলিয়া অন্ন উৎপাদনার্থ উদ্ভান করেন। তাহার উন্নতির কারণ বলিয়া সূর্যকেই উল্লীখ বলা হয়। কেবল ইহাই নহে, সূর্যের উদয়ে অন্ধকার ও ভয় নাশ হয়। যিনি সূর্যের প্রভাব অবগত হন, তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ।

প্রাণ ও সূর্য উভয়েই সমান। যেহেতু মুখ্য-প্রাণ—উষ্ণ; সূর্যও গরম। এই প্রাণকে লোকে ‘স্বর’ (ক্রিয়াশক্তিঃসম্পন্ন) বলে। সূর্যকেও ‘স্বর’ ও প্রত্যাস্বর (স্বয়ং ক্রিয়াশক্তিমান) বলা হয়। এজন্য প্রাণ ও সূর্যকে উল্লীখরূপে উপাসনা করা কর্তব্য।

অতঃপর অন্যপ্রকার উপাসনার কথা বলা হইতেছে,—ব্যানকেও উল্লীখ করিয়া উপাসনা করা উচিত। মনুষ্যগণ যে শ্বাসের দ্বারা ভিতরের বায়ুকে বাহিরে আনে, উহাই ব্যান। এবং বাহিরের যে বায়ুকে ভিতরে লইয়া যায়, তাহা অপান। প্রাণ অপানের সন্ধিই ব্যান। ব্যানই বাণী। (পূর্বে ‘প্রাণ’ শব্দে প্রাণের সমষ্টিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, কেবল শ্বাসের কার্যকেই প্রাণ বলা হয় নাই)। এজন্য মনুষ্য শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য না করিয়াও বাণী উচ্চারণ করিতে পারে। অর্থাৎ সামান্যরূপে কথা বলিবার সময় শ্বাসকার্য বন্ধ থাকে।

বাণীই ঋক্, বাক্যই সাম এবং সামই উল্লীখ। এজন্য মনুষ্য শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য (প্রাণ-অপানের কার্য) না করিয়াই উল্লীখ গান করিতে পারে। প্রাণ, অপান ও ব্যানের মধ্যে ব্যানেরই মুখ্যতা। অধিক অপেক্ষায়ুক্ত কর্ম ব্যানই করে। যথা, কাষ্ঠ মছন করিয়া অগ্নি প্রকট করা—ধনুতে গুণ যোজনা করা ইত্যাদি ক্রিয়া প্রাণ-অপানের কার্য বন্ধ রাখিয়া ব্যানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই প্রকারে ব্যানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়ায় ব্যানের রূপেই উল্লীখ হওয়া কর্তব্য।

এক্ষণে ‘উল্লীখ’-শব্দের অর্থ বলা হইতেছে,—উল্লীখে যে তিন অক্ষর, উহার মধ্যে ‘উৎ’ ‘উত্থান’-শব্দের বাচক; ‘গী’ ‘বাণীর’ দ্যোদক। কারণ ‘গী’ অর্থে বাণী বলা

হয়। তৃতীয় ‘থ’ অন্তিম অক্ষর ‘স্থিতি’-বোধক। ‘থ’ ‘অন্ন’-বাচক। কারণ জগতের সমস্ত প্রাণীর অন্নই আধার (স্থিতি)। ‘উৎ’ স্বর্গ লোক, ‘গী’ অন্তরীক্ষ এবং ‘থ’ ভূলোক। ‘উৎ’ অদিত্য, ‘গী’ বয়ু ও ‘থ’ অগ্নি। ‘উৎ’ সামবেদ, ‘গী’ যজুর্বেদ এবং ‘থ’ ঋগ্বেদ। এইপ্রকার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া যিনি উদ্দীপ্তকে ওঁকার-বাচ্য পরমাত্মার রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য বাণী তাঁহার সমস্ত রহস্য প্রকট করিয়া দেন অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য তিনি স্বতঃই অবগত হইতে সমর্থ হন এবং সর্বপ্রকার ভোগ্যপদার্থ ও ভোগের শক্তিতে সম্পন্ন হইতে পারেন।

এক্ষণে সাধনের সাতটি অঙ্গ বলা হইতেছে, তাহা প্রাণিধান করা কর্তব্য—

১ম অঙ্গ—যে সামদ্বারা সাধক ইষ্টদেবের স্তুতি করেন, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখা।

২য়—গেয় সাম যে ঋকে প্রতিষ্ঠিত তাহার স্মরণ রাখা।

৩য়—যে ঋষি ঐ মন্ত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে স্মরণ করা।

৪র্থ—উপাসক স্তুতিযোগ্য অভিষ্টদেবের স্মরণ রাখিবে।

৫ম—মন্ত্রের ছন্দকে স্মরণ রাকা (যেহেতু উহার উচ্চারণে ব্যতিক্রম ঘটিলে বিরুদ্ধ ক্রিয়া হয়।)

৬ষ্ঠ—সামবেদের স্তুতিযোগ্য স্তোত্রসকল স্মরণ রাখা।

৭ম—যে দিকে মুখ করিয়া স্তুতি করা হয় তাহা ঠিক রাখা।

প্রমাদ-রহিত হইয়া নিজ ধ্যেয়-বস্তুর উপাসনায় নিযুক্ত থাকিলে সত্ত্বর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এই প্রকরণে বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতিকে ধ্যেয় বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহা বাস্তবিক তাৎপর্য্য নহে। ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে এই সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নাম পরমাত্মারই বাচক ইহাই—সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

—ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধুসঙ্গের মহিমা

পূর্বসংখ্যায় সাধুসঙ্গের মহিমা সম্পর্কে কিছু নিবেদন করিয়াছিলাম। অধুনা সাধুসঙ্গের মহিমা আরও কিছু বর্ণন করিতেছি। কোন সময়ে হুগলীজেলার শ্রীরামপুর শহরের একপ্রান্তে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া এগারজন চোর-ডাকাত বসবাস করিত। তাহারা বিভিন্ন জায়গায় চুরি ডাকাতি করিয়া কে কি পাইয়াছে সকালবেলায় পরস্পর হিসাব-নিকাশ করিত। একদিন তাহারা বসিয়া পরস্পর যখন হিসাব-নিকাশ করিতেছে, সেই সময় একজন বৈষ্ণব-সাধু গৃহস্থের বাড়ী মনে করিয়া ভিক্ষা ব্যপদেশে সেখানে উপস্থিত হইলেন। উক্ত সাধুজী অনেকক্ষণ ধরিয়া মা! মা! বলিয়া ডাকিতেছিল। তাঁহার ডাক শুনিয়া তখন ঐ চোরের সর্দার উক্ত সাধুজীকে ভিতরে ডাকিয়া আনিল,

এবং বলিল—“তুমি এতক্ষণ মা মা বলিয়া কিজন্য চিৎকার করিতেছিলে?” সাধুজী বলিলেন, ‘আমি কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলাম।’ তখন চোর সর্দার বলিল—“আমরা চোর-ডাকাত, এতক্ষণ চোরাই মালের হিসাব করিতেছিলাম, তুমি দরজায় থাকিয়া সমস্তই শুনিয়াছ। তুমি তাহা হইলে পুলিশকে খবর দিয়া দিবে। তোমাকে আমরা ছাড়িব না, তোমাকে আমাদের দলে থাকিতে হইবে, নচেৎ এখনই খুন করিয়া দিব”। সাধুজী বলিলেন,—না না, আমি পুলিশে খবর দিব না, আপনাদের কোন ভয় নাই। চোর সর্দার বলিল—তোমায় কোন বিশ্বাস নাই, হয় আমাদের দলে থাক, নচেৎ তোমাকে আমরা হত্যা করিব। সাধুজী চিন্তা করিলেন, প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহাদের চরিত্র সংশোধন করার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। যাহা হউক দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, এবং কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধুজী আপাতত গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিলেন। তাহাদের সহিত মিলিয়া গেলেন। চোরেরা সাধুজীকে বলিল, “আমাদের সঙ্গে চুরি করতে পারবে ত”? উত্তরে সাধুজী বলিলেন, আমার ত কিছু জানা নাই তোমাদের কথা অনুসারে কাজ করিব। তারপর কিছুদিন সাধুজী চোরদের আনুগত্যে তাহারে সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ চোরেরা নিয়ম করিয়াছিল যে, প্রত্যেকে একমাস করিয়া চুরি ডাকাতির নেতৃত্ব প্রদান করিবেন। তখন সে দলের সর্দার হইবে। তাহাদের মধ্যে আরও কড়া নিয়ম ছিল, যখন যিনি দলের সর্দার হইবেন, তাহার আদেশ সকলকে নির্বিচারে পালন করিতে হইবে। কালক্রমে উক্ত সাধুজী যখন দলের সর্দার হইলেন, তখন তিনি একদিন সকালে সকলকে বলিলেন, “চল আজ আমরা সকলে গঙ্গা স্নানে যাই।” সাধুর কথামত সকলে গঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। সকলে উপস্থিত হইলেপর, সাধুজী সকলকে এক নাপিতের নিকট লইয়া গেলেন। নাপিতকে বলিলেন, “ইহাদের সকলের শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও। তখন চোর সকল সর্দারের কথা অনুসারে, শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিল এবং সাধুজীর কথা অনুসারে সকলে গঙ্গা স্নান করিলেন। সাধুজীর ব্যাগে গোপীচন্দন, শ্রীতুলসীমালা ছিল, স্নান সমাপান্তে তিনি সকলের গলায় তুলসীর মালা এবং তিলক করিয়া দিলেন। সাধুজীর ব্যাগে কয়েক জোড়া করতাল ছিল, তখন সাধুজী নিজে একজোড়া করতাল লইলেন, বাকি করতালগুলি চোরদের দিলেন। সাধুজী তাহাদের বলিলেন, “আমি যেমন করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিব, তোমরাও পিছনে পিছনে করতাল বাজাইয়া হরিনাম কর।”

এদিকে শহরের ধনাত্ম ব্যক্তির সেইদিন পিতৃশ্রাদ্ধ। তিনি তাহার বাড়ীতে সেদিন হরিনাম কীর্তন করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব অনুসন্ধান করিতেছিলেন। লোকমুখে গঙ্গাধারে কয়েকজন বৈষ্ণব হরিকীর্তন করিতেছেন, শুনিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আজ আমার পিতার শ্রাদ্ধবাসর, আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বাড়ীতে একটু হরিকীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তাহা হইলে আমি

বিশেষ আনন্দিত হইব।” সেই কথা শুনিয়া পূর্বোক্ত সাধুজী সম্মত হলেন। তিনি তখন সকলকে লইয়া উক্ত ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং একটি মৃদঙ্গ আনিতে বলিলেন। সাধুজী মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। কীর্তনের আসন হইয়া গেলে পর সাধুজী সকলকে লইয়া হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিলেন। সাধুজীর ব্যাণ্ডে একটি শ্রীভাগবত ছিল। কীর্তনের পর প্রায় দুইঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করাইয়া শুনাইলেন। পাঠমুখে সকলকে জানাইলেন “মনুষ্য জীবন দুর্লভ” কৌমারকাল হইতেই ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করা জীবের কর্তব্য। উক্ত পাঠ কীর্তন শ্রবণ করিয়া উক্ত ধনী ব্যক্তিটি খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। বিদায় কালে সকলকে একটি করিয়া সোনার মোহর, বিভিন্ন বস্ত্রাদি দান করেন। উক্ত শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত জনৈক ব্যক্তি, তাহার মাতার বাৎসরিক কার্য্য উপলক্ষে পরের দিনও পাঠ কীর্তন করিবার জন্য উক্ত সাধুজীকে আহ্বান করিলেন। এইভাবে মাসব্যাপী তাহাদের পাঠকীর্তন স্থানে স্থানে হইতে লাগিল। দান-দক্ষিণাও ভালমত পাইতে লাগিল। তখন চোরেরা চিন্তা করিল, আমাদের সর্দারজী বেস ভাল পছন্দ দেখাইয়াছেন। চুরি-ডাকাতি করিতে হইলে, রাত জাগিতে হয়, নানারূপ কষ্ট করিতে হয় মধ্যে মধ্যে গৃহস্থ ও পুলিশের নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। আর এখন আমরা বিনা রাত্রি জাগরণে, বিনা নির্যাতনে বেশ সোনা দানা, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, দান-দক্ষিণা, বিনা কষ্টে লাভ করিতেছি সুতরাং এই পথই ভাল, আর চুরি ডাকাতি করি কেন? সাধুজীও তাহাদের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ মুখে চুরি-ডাকাতি করা অসৎকাজ এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মানুষের কর্তব্য ইহা বুঝাইতেছেন। সৎপথে থাকিয়া হরিভজন করিলে মনুষ্য জীবন ধন্য হইবে। ধর্ম্মপথে থাকিলে অন্নবস্ত্রের ও অভাব হয় না। সাধুজীর এই উপদেশে তাহাদের চিন্তের পরিবর্তন হইল, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তখন সাধুজী উক্ত ভাড়া বাড়ীতেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ এবং রাধা-কৃষ্ণের ফটো স্থাপন করে পূজা ও সকাল সন্ধ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ শ্রোতা হইতে লাগিল। বাড়ীটি আশ্রমে পরিণত করিলেন। আশ্রমের সেবার জন্য সকলে ভিক্ষাও করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ও জন্মাষ্টমী ও শ্রীঅন্নকূট উপলক্ষে উৎসবও করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী জনগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রমের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুকাল চলার পর, সাধুজী সকলকে বলিলেন দেখ আমরা ভাড়া বাড়ীতে অযথা থাকিব না। নিজস্ব যায়গায় আশ্রম ও মন্দির স্থাপন করিব। তাহাতে শ্রীবিগ্রহ বসাইয়া সেবা-পূজা ও পাঠ-কীর্তন চালাইব। তোমরা তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ কর। তাঁহাদের উদ্যোগে সাধুজী একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া, তাহাতে কালক্রমে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্রমশঃ শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির করিয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করতঃ বিপুলভাবে পাঠ-কীর্তন মহোৎসব করাইয়া জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিলেন। আর উক্ত এগারজন চোর সাধুজীর পরামর্শমত সকল অসৎ কার্য্য ছাড়িয়া

দিল এবং সাধুজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবৎ ভজনানন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। সত্যই দেখুন সাধুসঙ্গের কি অপার মহিমা। মহা চোর ডাকাতও সাধুসঙ্গ প্রভাবে মহৎ হইলেন। অতএব সর্বদা অসৎসঙ্গ, অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর স্মরণাপন্ন হইলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ত্যজ দুর্জ্ঞান-সংসর্গং ভজ সাধু সমাগমম্।

কুরু পুণ্যং অহোরাত্র স্মর নিত্যমণিত্যতাম্॥

অর্থাৎ দুর্জ্ঞান সঙ্গ ত্যাগ করতঃ সর্বদা হরিভক্ত সাধু-সঙ্গ করিবেন, এবং সাধুসঙ্গে শ্রীভগবদ্ভজন ও সাধুসেবা করতঃ সর্বদা অহোরাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। তথা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

* * *

ভাগরণ

কৃষ্ণবহিস্মুখ জীব আমরা দিনরাত্রির চক্ৰিশ-ঘণ্টা ঘুমাইয়া রহিয়াছি—ইহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া ইহ জগতের কেহই তাহা বিশ্বাস করিবে না। যদি আমরা ঘুমাইয়া থাকি, তাহা হইলে কি করিয়া আমাদের নয়নদ্বয় প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মোহিত হইতেছে? কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার মধুর গীতি শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত হইতেছে? নাসিকা ঘ্রাণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে? জিহ্বা চতুর্দিকে বিচিত্র বিচিত্র রসের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে? মুখ অহর্নিশ গ্রাম্যকথা বলিবার জন্য পাগল হইতেছে? আমরা কিভাবেই বা আহার, বিশ্রাম, ভ্রমণ, আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত হাস্য-পরিহাসাদি সমুদয়ই নিয়মিত ভাবে করিতেছি? তাই আমার উপরোক্ত বাক্য বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে তাহা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবে।

সত্য সত্যই যে আমরা জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকি, তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদের দূরাবস্থার জন্য আক্ষেপের কোন সীমা থাকিবে না। ভুবনমোহিনী মায়াদেবী জড়াসক্তির অচেতন ক্রোড়ে অনাদিকাল হইতে আমাদেরকে শয়ন করাইয়া রাখিয়া আমাদের ভোগলোলুপ দেহমানে অতি নৈপুণ্যের সহিত করসঞ্চালন ও মৃদু মৃদু ব্যজন করিয়া যে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই ঘুম আর কিছুতেই ভাঙ্গিতেছে না। জন্ম, মরণ, শোক ও জ্বালারূপ দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়াও নিরত নব-নবায়মান কাম-পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না। স্ব-স্বরূপ বিস্মৃতিরূপ মোহনিদ্রার জন্যই আমরা দেহমনোধর্ম্মের লৌহনিগড় হইতে মুক্ত হইয়া পরমদয়াল অশোক অভয় ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কতি পারিতেছে না। অচেতন্য বিশ্বে অনর্থরোগে প্রপীড়িত হইয়া অচেতনতার নেশায় আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে আমাদের মঙ্গলের রাস্তাটি গ্রহণ করা কোনকালে হইয়া উঠে না। রোগী যেরূপ কুপথ্য খাইয়া

খাইয়া রোগ বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সবকিছু খরচ করিয়া অচেতনের কথা শুনিতে শুনিতে লোকে নিরয়ের পথ পরিষ্কার করে। অচেতন রাজ্যে মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া মায়ার দাসত্বই আমাদিগকে বরণ করিতে হইয়াছে। হরি পরায়ণগণ কখনও মাতৃকৃষ্ণিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না, কিন্তু বৈষ্ণবতার জন্যই আমরা জন্ম-মরণ মালা গলায় ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যগ্র হই, আমাদের ভগবদ্ভজনের সময় কোথায়? কলিযুগে মানুষের জন্য আয়ু যদি একশত বৎসর নির্দ্ধারিত হয়, তবে তাহার মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর নিদ্রায়, বিংশ বৎসর বাল্যে ও কৌমারে ক্রীড়ায় এবং বিংশ বৎসর জরাক্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট দশ বৎসর কর্তব্যানুসন্ধান শূন্য হইয়া গৃহে নিবিড়াসক্তির মাঝে বৃথা ব্যয়িত হয়। কৃষ্ণেণুখী না হইয়া দুষ্টাশয়বিশিষ্ট হইয়া বহিমুখ চেষ্টার দ্বারা যে আমরা একশত বৎসর বৃথা অতিক্রান্ত করিতেছি, তাহা আমাদের নিদ্রিত অবস্থার পরিচয়কেই বহন করে। স্বরূপ জ্ঞানের অভাবেই ইহজগতে আমাদের পতি-পত্নী সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, বন্ধু-বন্ধু সম্বন্ধ ও প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ এই চারটি অনিত্য সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহজগতের যত কিছু তাহা প্রথমমুখে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে নৈরাশ্য আর নৈরাশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জড় সুখের জন্য প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ অদৃষ্টবশতঃ সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অনেক সময় দেখা যায়, সুখের জন্য যত্ন করিলে দুঃখ আসিয়াই উপস্থিত হয়। ইহজগতের চারিটি সম্বন্ধের মধ্যে যে কোন একটি সম্বন্ধ লইয়া ভগবানের সেবা করিলে তবেই মঙ্গললাভ সম্ভবপর।

অজ্ঞানই নিশাস্বরূপা এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানই দিবাস্বরূপা। “অজ্ঞানং তু নিশা প্রোক্তা দিবা জ্ঞানমুদীর্যতে” (স্কন্দপুরাণ)। আবার একের পক্ষে যাহা দিবা, তাহা অন্যের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ হইয়া থাকে। যেরূপ দিবান্ব পিচকের পক্ষে রাত্রিই দিবা, আবার রাত্র্যান্ব কাকের নিকট তাহাই রাত্রি; তদ্রূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে যাহা রাত্রি, বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই দিবা। যাহারা বিষয়প্রবণা বুদ্ধিযুক্ত তাহারা সংসারী বা অজ্ঞ। অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে আত্মপ্রবণাবুদ্ধি রাত্রিস্বরূপা অর্থাৎ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে প্রাপ্যমান আত্মজ্ঞান জড়মুগ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির লাভ হইতে পারে না। বিষয়প্রবণা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপা তাহা আত্মপ্রবণাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে দিবাস্বরূপা অর্থাৎ তাহারা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিপ্রভাবে জাগ্রত থাকিয়া আত্মজ্ঞানস্বরূপ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়প্রবণা বুদ্ধির প্রভাবে শোক-মোহাদিজনিত যে বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের পক্ষে দিবাস্বরূপ; আবার তাহাই প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে রাত্রিস্বরূপা অর্থাৎ তিনি সুখ-দুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয়ব্যাপার সমূহ উদাসীনভাবে ও নির্লিপ্তভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সাধারণ মনুষ্যজাতির জড় চিন্তাশ্রোত যতপ্রকার ধর্মের আলোচনা করে, তাহার সবকিটাই ছলধর্ম, যেহেতু তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিভাবে সাধিত হইবে তাহার বিচারই প্রবল। ভগবৎসেবা ছাড়িয়া যাহারা সমাজসেবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গল করিতে পারে না। আজকাল “জাগরণী মঞ্চ” “নব জাগরণী সভা” এবং অন্যান্য অনেক সমাজসেবী সংস্থার মূল উদ্দেশ্য নিজের ও লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখ-সুবিধা বিধান করা। যাহারা নিজেরাই মায়ায় গর্তে নিদ্রিত, সেই সমাজসেবীরা কি করিয়া অপর মায়ায় গর্তে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরণ করিবে? নাট্যকার শব্দু বাগের “ঘুম ভাঙ্গার গান” নাটকে জাগরণের পরিবর্তে গরীবের অধিকার লাভের নিমিত্ত ধনী ও গরীবের মধ্যে সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। যেইক্ষেত্রে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণই সার, সেইক্ষেত্রে নিজের ও অপরের উভয়েরই অসুবিধা। ইহজগতে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়ই স্ব-স্ব অপস্বার্থ পূরণের অভাবকেই বিপদ মনে করেন। মোহনিদ্রিত আমাদের অন্তরে বহিস্থ বিবাহের নানা চিন্তাধারা বহু সমস্যার সমাধান লৌল্য ইত্যাদি ভোক্তৃত্বের ও কর্তৃত্বের একটা উগ্র উন্মাদনা আনিয়া সর্বনাশ করিতেছে। মায়ায় আপাত মনোহারিণী নানা কু-বিলাস দয়া নামে আমাদের চিত্তকে লুপ্ত করিতেছে। অপূর্ণ বস্তুর সেবা ও সঙ্গদ্বারা অমঙ্গল ও অপূর্ণবস্ত্র লাভ, আর পূর্ণ বস্তুর সেবা ও সঙ্গদ্বারা মঙ্গল ও পূর্ণবস্ত্র লাভ হইবে, তাহা আমার আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা পরাজিত স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত আমরা কেহই জানি না, প্রকৃতই কোন অভাব আমাদেরকে ক্রিষ্ট করিতেছে। ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি দেহমনের সাময়িক অভাব পূরিপূরণেই বুঝি আমাদের দুর্ব্বার বিষয় পিপাসার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। পশুরা কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও স্বজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্য যদি নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা স্বসুখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, ভগবৎ-সেবার বিচার অর্থাৎ ভগবানকে সুখ দেওয়ার প্রবৃত্তি যদি তাহাদের না থাকে তাহা হইলে সেই মনুষ্যের সঙ্গে পশুরপার্থক্য কোথায়? “ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ”। যাহারা পশুর ন্যায় কেবল আহার-বিহার লইয়াই ব্যস্ত আছেন, শাস্ত্র তাহাদিগকে “পশুতুল্য” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা বসিয়া যায়, তেমনি গৃহাসক্ত হইলে আমাদের ভয়ানক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। শুধু আহার, নিদ্রা, ভয়াদিরূপ পশু ধর্মাচরণেই ব্যস্ত থাকিলে আমাদের অমূল্য ধনলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে।

ক্ষুরের ধার যেরূপ সুতীক্ষ্ণ, একটু অসাবধান হইলেই বিপদ অনিবার্য; তদ্রূপ ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহুদুঃখদায়িনী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবৎসেবা ব্যতীত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। তাই স্বয়ং বেদপুরুষ (কঠ ১।৩।১৪) জীবগণকে হিতোপদেশ করিয়াছেন,—“উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরণ নিবোধত” অর্থাৎ হে জীব, নানাবিধ বিষয়চিন্তা অর্থাৎ দেহ-গেহ-কলত্রাদির জন্য নিরন্তর চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও,

মহদব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া ভগবানকে জানিবার জন্য সচেষ্টি হও।” মোহনিদ্রাভিত্ত জীব কৃষ্ণভজন না করিলে তাহার প্রকৃত জাগরণ অসম্ভব। কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইলেই আমরা ভোক্তারূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, তাহা হইতে ছুটি লাভ করিতে পারি। জগতের বহিস্মুখ লোককে মায়াঘুম হইতে জাগরিত করিয়া ভগবানের প্রতি উন্মুখ করাই সাধুর কার্য্য ও কর্তব্য এবং ইহাই প্রকৃত জীব দয়া। কৃষ্ণবিমুখতারূপ অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া জীবকে ধামসেবা, নামসেবা ও রাধাগোবিন্দের কামসেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধুগণের যতেক প্রচেষ্টা। বৈকুণ্ঠবার্ত্তা কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিয়া রুদ্ধ হৃদয়কে আলোড়িত করিলে আমাদের প্রকৃত জাগরণে জাগরিত হওয়া সম্ভবপর। পরমচেতন গৌরবাণীর মহামঙ্গলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে কেহই আর মায়াঘুমে ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।

কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে।।

ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।

ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।।

তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।

আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।।

এনেছি ঔষধি, মায়া নাশিবার লাগি’।

হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি’।।

হস্তী নিজেকে হস্তী, কুকুর নিজেকে কুকুর বলিয়া মনে করে, কিন্তু মনুষ্য নিজেকে ‘কৃষ্ণের নিত্যদাস’ বলিয়া স্বরূপের অভিনির্ভর করিবেন। জাগ্রত অর্থাৎ মুক্তাবস্থা আর কিছুই নহে—স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপায় আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। পরজন্মে আমরা যে আবার মনুষ্য হইব, তাহার কোন স্থিরতা নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ভূত, প্রেত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ প্রভৃতি জন্ম প্রাপ্ত হইলে তখন ভগবদ্ভজন করা সম্ভবপর হইবে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতেই প্রত্যেককে শীঘ্র শীঘ্র পরমার্থ অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী ভক্তিবৈদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগীকুল

আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সবার নাথ—শ্রীজগন্নাথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়-অঙ্ক (১ম দৃশ্য)

(জগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গন)

দিব্যসিংহদেব—(শ্রীশ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে প্রার্থনা রত) হে প্রভো জগন্নাথদেব! তুমি ভক্তের নিষ্কপট কাতর প্রার্থনায় পরমানন্দিত হ'য়ে স্বেচ্ছায় এই মন্দিরাভ্যন্তরে যুগ যুগ ধরে সর্বদাই অবস্থান করতঃ ভক্তের সেবা গ্রহণ করছ। তোমার কোনও কার্যো মায়িক গুণের লেশমাত্র নেই। প্রভো! এ বৎসর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তোমার রথযাত্রা চিরতরে বন্ধ করার জন্য মূর্শিদকুলিখাঁ মারফৎ আদেশ জারী করেছেন। আমরা এক্ষণে এবম্বিধ গুরুতর বিপদের সম্মুখীন! তুমিই একমাত্র এই ভয়ঙ্কর বিপদ হ'তে ত্রাণ করতে সমর্থ। প্রভো! প্রসীদ! প্রসীদ! প্রসীদ!

(ইত্যবসরে মোহন্ত দীননাথের প্রবেশ)

মোহন্ত—(দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক) মহারাজ! হিন্দু-বিদ্রোহী মোশ্লেম সম্রাট আওরঙ্গ জেব রথযাত্রা-উৎসব বন্ধ করার জন্য হুকুম জারী করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মান্বিত। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা হ'বে, সেজন্য আপনার উপদেশ ও আদেশ প্রার্থনা করি।

দিব্যসিংহদেব—সমগ্র শক্তির উৎস একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ জগন্নাথদেব—ইহা বাস্তব সত্য। সেই বাস্তব সত্য পরমেশ্বরের সহিত আমরা এক স্বার্থভূত হ'য়ে চলি; সুতরাং সেই পরমেশ্বরের জড়া শক্তির দ্বারা অথবা বিভিন্নাংশ তটস্থ শক্তি জীবের দ্বারা অনিষ্ট কি প্রকারে সম্ভব? জ্ঞানহীন অবিবেকী সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট থাকার জন্য সর্বদাই ভীতিগ্রস্ত জ্ঞানবেন। তাঁর মায়িক অভিমান থাকায় সমস্ত কার্য্যই জড়ীয়। আমাদের মধ্যে যে পরিমাণে শ্রীজগন্নাথদেব হ'তে তফাৎ থাকবার বাসনা অথবা বিচার থাকবে, সেই পরিমাণেই মায়া আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে অজ্ঞানজ দুঃখ, ভয় ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। আমরা তো শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই সম্পত্তি। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, তাঁর পাদপদ্মে আত্মনিবেদনে সকল রস-প্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। অনন্ত সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব নিশ্চয়ই এই বিপদ হ'তে আমাদের উদ্ধার করবেন। পূর্বের বহু বিধর্মী রাজা বিভিন্ন সময়ে এই শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণের চেষ্টা করেও বিফল হ'য়েছেন। আওরঙ্গজেব যতই প্রবল পরাক্রমশালী হউন, তাঁকেও এই অন্যায় নিন্দনীয় কার্য্য হ'তে বিরত থাকতেই হ'বে এবং তাহা সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ জগন্নাথদেবের ইচ্ছাতেই সম্ভবপর হ'বে—ইহা নিশ্চিত।

মোহন্ত—শুনেছি নবাব আওরঙ্গজেব বর্তমানে গোলকুণ্ডায় অবস্থান করছেন। আমি ভগবান্ নৃসিংহদেবকে জানিয়ে এসেছি যে, নবাবের নিকট হ'তে রথযাত্রার অনুমতি নিতে গোলকুণ্ডায় যাবো। এক্ষণে আপনার আদেশ পেলে আওরঙ্গজেবের নিকট রথযাত্রার অনুমতির জন্য প্রার্থনা করব।

দিব্যসিংহদেব—বেশ, তাই হোক! আপনি সত্ত্বর গোলকুণ্ডায় রওনা হউন। ভগবান, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় ও ইচ্ছায় হিন্দু-বিদ্বেষী আওরঙ্গজেবের নিকট যেন রথযাত্রা উৎসব করার অনুমতি প্রাপ্ত হই—ইহাই প্রার্থনা! জয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়! জয় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়!!

(জনৈক ভক্তের প্রবেশ)

জনৈক ভক্ত—(গীত)

‘জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে।।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত ভূদেব-পটলেঃ।

স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্গ্য সদয়ঃ।

দয়াসিদ্ধু-বন্ধু সকল জগতাং সিদ্ধু-সদয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে।।

পরং ব্রহ্মপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোহনন্ত শিরসি।

রসানন্দী রাধা-সরস বপুরালিঙ্গন সুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে।।”

সকলে একত্রে—(গীত) জয় জগন্নাথ জয় রাধানাথ।

জয় গোপীনাথ জয় ভক্ত-নাথ।।

(গান গাহিতে গাহিতে ও নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

(২য় দৃশ্য)

স্থান—গোলকুণ্ডা (আওরঙ্গজেবের শয়নকক্ষ)

(আওরঙ্গজেব গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—(আওরঙ্গজেবকে স্বপ্নে দর্শন দান করত) আওরঙ্গজেব! তুমি ভুলপথ অনুসরণ করেছো। তুমি আমায় চিন্তে পার নি; আমিই তোমার খোদা। ‘কোরাণে’ শুধুমাত্র ‘জিসমানি’—মূর্তি নিষেধ; ওর ‘মুজররদী’—মূর্তির নিষেধ নেই। স্বর্গরাজ্য বা বেহেস্ত নিরাকার স্থান হ’তে পারে না। বেহেস্তের দূত গারিয়েলের নিকট হজরত মহম্মদ ‘কোরাণ-সরিফ’ প্রাপ্ত হন। রাজারই দূত থাকে। তাই বেহেস্ত রাজ্যের রাজা খোদা,—ইহা কি তুমি অস্বীকার করতে পার? স্বর্গীয় দূত যদি মনুষ্যাকার হয়, তা’হলে স্বর্গ-রাজ্যের রাজা কি মনুষ্যাকার নহেন? আমিই স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর এবং সকল কারণের কারণ। আমার শ্রীমূর্তি নিত্য চিন্ময়। জীবের চিন্ময় শুদ্ধ-বিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; প্রেমাঙ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষে শুদ্ধ-ভক্তগণ অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট আমাকে হৃদয়ে অবলোকন করে। ভক্তির অনুশীলন দ্বারা যে পরিমাণে ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে আমার স্বরূপের শুদ্ধ দর্শন হয় হিন্দুরা আদৌ পৌত্তলিক বা ব্যুৎ-পরস্ত নয়। আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন। হিন্দুরা ভক্তিভাবে হৃদয়ে আমারই সেবা করে। আমার শ্রীমূর্তি কল্পিত নয়। জগতের লোক

কর্তা হ'য়ে আমার শ্রীমূর্তি নির্মাণ করে নি। আমিই শ্রীবিগ্রহ ধারণ করে, ভক্তগণকে সেবার সৌভাগ্য প্রদান করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছি। আমার শ্রীবিগ্রহকে নিম্নাধিকারী ব্যক্তি জড়ময় দেখে, মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি মনোময় দেখে, কিন্তু উত্তম অধিকারী ব্যক্তি চিন্ময়রূপে দর্শন করে থাকে। তুমি গোঁড়া ইসলামী মৌলবাদ পরিত্যাগ করে হিন্দুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনপূর্বক নিজ ভ্রাতার ন্যায় প্রীতিপূর্বক ব্যবহার কর। শ্রীবিগ্রহ অর্চাবতার। শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী ভেদ নেই। ভক্তের হৃদয়-দেবতাই বাহিরে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীমূর্তি—সচ্চিদানন্দাকার পরম কৃপাময়। তুমি শ্রীবিগ্রহ দেখবে,—পুতুল দেখবে না। তুমি কখনও আমার রথযাত্রায় বাধা দিবে না এবং রথযাত্রা পূর্বের ন্যায় যথাযথ অনুষ্ঠান করবার অনুমতি প্রদান কর। আমার আদেশ পালন করলে আমি খোদা তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবো। (সহসা অন্তর্হিত হইলেন)

আওরঙ্গজেব—(স্বপ্নের মধ্যেই) হে খোদা, আপনার হুকুম আমি অবশ্যই পালন করব। (অত্যন্ত ভীত হয়ে নিদ্রা হ'তে উঠে বসলেন)

(নিদ্রা ভঙ্গের পর) একি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম! জগন্নাথদেবই খোদা,—ইহা তো আমি কখনও শুনি নি ও জানি না।

(সহসা গীতকণ্ঠে জনৈক ভক্তের প্রবেশ)

ভক্ত—

ভেবে দেখ হে রাজন, জীবের আত্মা—চিদৃ কণ,

জীব-স্বরূপে তাই জাতি-কুল নাই।

জগন্নাথ ভগবানে, খোদা বলি' জেনো মনে,

খোদা ও জগন্নাথ অভিন্ন সদাই।।

হিংসা, দম্ভ পরিহর, হিন্দুদেরে প্রীতি কর,

মোশ্লেম বলি' কেন করিছ বড়াই?

মোশ্লেম নমাজে রত, হিন্দু সংকীর্ণনে মত্ত,

একই ঈশ্বর পূজিছে সবাই।।

সবার হৃদয়-নাথ, রাধানাথ-জগন্নাথ,

তোমাদেরও হন খোদা তিনি ভাই।

জগন্নাথ-পদে কেন, অপরাধী হও হেন,

শেষে হ'বে তব নরকেতে ঠাই।।

এখনো সময় আছে, যাও জগন্নাথ-কাছে,

শরণ' লহ তাঁরই পদে ভাই।

যদি আত্মহিত চাও, সদা তাঁর নাম গাও,

তিনি বিনা এ' বিশ্বে ভ্রাতা কেহ নাই।।

আওরঙ্গজেব—কে তুমি ভক্ত? তোমার পরিচয় প্রদান কর। তোমার ঐ সঙ্গীতের মধ্যে খোদার বাণী যেন শ্রবণ করলাম।

ভক্ত—আমি শ্রীপুরুষোত্তম ধামে পরমেশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভূত্যের ভূত্য ও তাঁর ভূত্যানুভূত্য মাত্র। তাঁর আজ্ঞায় আমি এখানে এসেছি। মহারাজ! আপনি এখনও মত পরিবর্তন করুন। নতুবা খোদার রোষ আপনার উপর পতিত হবেই।

আওরঙ্গজেব—হে পুরুষোত্তমদেবের ভক্ত! আমি তোমার শ্রীমুখে জগন্নাথদেবের কিছু মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

ভক্ত—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কোটি কোটি মুখেও বলে শেষ করা যায় না। তথাপি আপনার ইচ্ছা পূরণার্থ কিছু কীর্তন করছি,—শ্রবণ করুন!—(গীত)

“দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ ভগবান্ পুরুষোত্তমে।

ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষীরার্ণব-তীরে বিরাজতে ॥

মহাবিভূতিমান্ রাজ্যমৌৎকলং পালয়ন্ স্বয়ম্।

ব্যঞ্জয়ন্ নিজমাহাত্ম্যং সদা সেবকবৎসলঃ ॥

তস্যান্নং পাচিতং লক্ষ্ম্যা স্বয়ং ভুঞ্জা দয়ালুনা।

দত্তং তেন স্বভক্তেভ্যো লভ্যতে দেবদুর্লভম্ ॥

মহাপ্রসাদ-সংজ্ঞকং তৎস্পৃষ্টং যেন কেনচিৎ।

যত্র কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে ॥”

আওরঙ্গজেব—তোমার ঐ সংস্কৃত ভাষার কীর্তনটি বড়ই মনোমুগ্ধকর। হে ভক্ত, ঐ কীর্তনটির অনুবাদ শুনে ইচ্ছা করি।

ভক্ত—বেশ, আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ;—

“নীলাচলে লবন সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ বিরাজিত আছেন। তিনি মহাবিভূতিমান্। স্বয়ং উৎকল রাজ্য পালন এবং সর্বদা সেবকবৎসল রূপে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করে তিনি তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময় প্রভু তাহা ভোজন করে নিজ ভক্তগণকে বিতরণ করেন। তা’তেই ভক্তগণ ঐ দেবদুর্লভ অন্ন লাভ করতে পারেন। প্রভুর সেই প্রসাদের নাম—‘মহাপ্রসাদ’। তাহা যে কেহ স্পর্শ করলে বা যে কোন স্থানে নীত হ’লেও সকলেই অবিচারে ভোজন করতে পারেন।

আওরঙ্গজেব—তোমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত ‘শ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য’ শ্রবণ করে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হ’লাম। আমার এক্ষণে স্থির বিশ্বাস হ’য়েছে,—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনীলাচলধামে, অর্চামূর্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি নিছক কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি ন’ন,—তিনি সাক্ষাৎ খোদা বা ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব। হিন্দু—মুসলমান—সবারই নাথ—জগন্নাথ!

ভক্ত—জাঁহাপনা! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাতেই তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, আপনার মত পরিবর্তিত হয়েছে এবং আপনি কৃতকৃতার্থ হ’য়েছেন।

আওরঙ্গজেব—স্বয়ং জগন্নাথদেব আমাকে স্বপ্নে দর্শন দান করে জানিয়েছেন যে, তিনিই শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ ধারণ করে অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় আমি মন্দির আক্রমণ

হ'তে অবশ্যই বিরত থাকব। শ্রীজগন্নাথদেব ও খোদা অভিন্ন। হে ভক্ত! তুমি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক হওয়ায় তুমি ধন্য! ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের উজ্জ্বলিত আমার বোধগম্য হ'য়েছে যে, আমার তথা সাধারণ জীব-সকলের ইন্দ্রিয়গুলিকে আল্লা তাঁর বহিস্মুখ করে প্রস্তুত করেছেন, তাই আমরা বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছি। কেবল আল্লা যাঁকে কৃপা করেন, তিনিই বহিস্মুখ দৃষ্টি পরিত্যাগ করে আল্লাকে অবলোকন করতে সমর্থ হন। সেই আল্লা বা শ্রীজগন্নাথদেব চল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান। তিনি অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা অবশ্যই বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তোমার কীর্তিত শাস্ত্রশ্লোকে আরও জানা গেল যে, ভগবান্ বিগ্রহ ধরে বর্তমান থেকে ভক্তগণের প্রদত্ত অন্নাদি হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন ও ভোজন করেন। তিনি কর্ণদ্বারা ভক্তদের প্রার্থনা শুনতে পান ও চক্ষুদ্বারা সব কিছু দর্শন করেন। ভগবদ্বিগ্রহ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্তি। তাঁর বিগ্রহ চিৎ স্বরূপ হওয়ায় তাঁ'তে অঙ্গ-অঙ্গী, দেহ-দেহী, ধর্ম-ধর্মীয় ভেদ নেই। হে ভক্ত! তুমি নিশ্চিত মনে পুরীধামে গমন কর। মন্দির-সংক্রান্ত আমার আদেশ আমি এখনই প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

ভক্ত—ভগবান্ আপনার অশেষ কল্যাণ করুন, জাঁহাপনা। (দণ্ডবৎ করত প্রস্থান)
(এমন সময় গোলকুণ্ডার নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল—(কূর্ণিশ করত) জাঁহাপনা! আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য সুবেদারজী বাহিরে অপেক্ষা করছেন। তিনি এখানে আসবেন, না রাজদরবারে যা'বেন—তাহা জানবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, হুজুর!

আওরঙ্গজেব—সুবেদার মূর্শিদকুলিখাঁ এসেছেন?

নগরপাল—জি-হুজুর!

আওরঙ্গজেব—তা'কে এখনই এখানে আসতে বল।

নগরপাল—জি-হুজুর! (কূর্ণিশ করত প্রস্থান)

(সুবেদার মূর্শিদকুলিখাঁ প্রবেশ)

মূর্শিদকুলি খাঁ—(কূর্ণিশ করত) জাঁহাপনা! আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন?

আওরঙ্গজেব—হ্যাঁ, সুবেদার! আমি তোমাকে অন্য এক কার্যের জন্য ডেকেছিলাম। এক্ষণে ভাবছি সেই কার্য অপেক্ষাও অন্য একটি জরুরী কার্যের ভার তোমাকে অর্পণ করব। শোন সুবেদার! তুমি আমার অত্যন্ত হিতৈষী। আজ আমি অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি,—আমি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণের উদ্যোগ করে ও তাঁর রথযাত্রা উৎসব নিষিদ্ধ করে, আদেশ জারী করে এ'জীবনে মহা অপরাধ ও অন্যায় কার্য করেছি। গতরাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, স্বয়ং খোদা শ্রীজগন্নাথদেবের রূপ ধারণ করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর রথযাত্রায় বাধা দিতে নিষেধ করেছেন এবং পূর্বের মত হিন্দুদের ঐ ধর্মীয় উৎসব যা'তে পুনরায় প্রচলিত হয়, তজ্জন্য অনুমতি দিবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। এক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, খোদাই শ্রীজগন্নাথদেব।

(নিজ মস্তকে করাঘাত করতে করতে) হায়! হায়! আমি একি করলাম! শ্রীজগন্নাথ-মন্দির আক্রমণ মানেই তো খোদার মসজিদ আক্রমণ। হে সুবেদার; আমি খোদার সমীপে যে অপরাধ ও পাপ করেছি তা' হ'তে অব্যাহতি পা'বার জন্য আমার মার্কণ্ডপুর তহশীলের সমস্ত সম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে দান করলাম ও তৎসহ শ্রীজগন্নাথমন্দির আক্রমণের আদেশ এবং রথযাত্রা-উৎসবে বাধাদানের আদেশও প্রত্যাহার করে নিলাম। আমি আজই দরবারে গিয়ে দলিল সম্পাদন করে দিব এবং তুমি তাহা উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পাঠি য়ে দিও।

মূর্খিদকুলি খাঁ—জি-অজ্ঞে, জাঁহাপনা! (কুর্গিশ করত প্রস্থান) (দ্রুমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ



“শ্রীপুষ্কর তীর্থ”

‘কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।’

এইসকল তীর্থের কথা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত এইসকল স্থান। “গৌর আমার যেসব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সেসব স্থান হেরব আমি শ্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।।” ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্যই তীর্থ পরিক্রমার ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ জন ভাগবতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অন্যতম। সেই ব্রহ্মার মন্দির কেবলমাত্র পুষ্করে রহিয়াছে। সেই পুষ্কর তীর্থের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

সত্যযুগে এক সময় ব্রহ্মার যজ্ঞ করিবার বাসনা জাগিল। কিন্তু কোথায় যে যজ্ঞ করা যায়—তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন—মর্ত্যলোকে সকল দেবতার তীর্থ আছে। কিন্তু আমার নামে কোন তীর্থ নাই। আমি একটি তীর্থ একট করিব। যেমনই ভাবনা—তেমনই কাজ। তিনি “মঙ্গল মঙ্গল” বলিতে বলিতে তাঁহার হস্তস্থিত পদ্মফুল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার—যেস্থানে পদ্মফুল পড়িল, সেইস্থান পরিস্কার স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ হইল। ব্রহ্মা করের (হস্তের) দ্বারা পুষ্প ফেলিয়াছিলেন—সেইজন্য নাম হইল পুষ্কর। তিনি ঐ স্থানেই এক যোজন ভূমিতে যজ্ঞ করিবার মনস্থ করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার মানস করিয়াছেন—দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাগণকে এই সংবাদ দিলেন এবং দেবতাগণ সমভিব্যাহারে তিনি ঐ যজ্ঞস্থলে পুষ্করে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবাদিদেব মহাদেবও দ্বিজগণ সহ আগমন করিয়াছেন। ব্রহ্মার আনন্দের সীমা নেই। তিনি দেবতাগণকে করজোড়ে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন—“হে দেবগণ! ঐ ভূমিতে আমার যজ্ঞ করিবার বাসনা, আপনারা কৃপা করিয়া যে শুভাগমন করিয়াছেন—তাহাতে আমি বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি। আপনারা যজ্ঞস্থলে বিচা-ম করুন। যখন মন্ত্রদ্বারা আহ্বান হইবে, আপনারা তখন আপনাদের যজ্ঞের ভাগ

গ্রহণ করিবেন।” ব্রহ্মার এতাদৃশ বচনে দেবতাগণ খুবই প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন— “নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই”। আপনার এই যজ্ঞ খুব ভালই হইবে।” ব্রহ্মা দেবগণকে যথাযথ কর্মের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কুবেরকে ধন-বস্ত্রাদি যে যাহা চায় তাহা অকৃপণভাবে দেওয়ার জন্য কহিলেন। বিশ্বকর্মাকে দেবতাদিগের থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান প্রস্তুত করিতে বলিলেন। ভগবান্ বাসুদেবকে প্রার্থনা করিলেন—“প্রভো! আপনি সকলকে সদূপদেশ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। শিবকে তাঁহার নিজজন সহ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন। বৃহস্পতির উপর উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ-কর্মে নিযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পবনদেবকে ত্রিলোকে যজ্ঞবার্তা প্রেরণ করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে যজ্ঞের সমূহ কর্মের সুব্যবস্থা করিলেন।

পুলস্ত্য ঋষি ব্রহ্মাকে ডাকিয়া কহিলেন—“যজ্ঞের সমূহ কার্য্য প্রস্তুত, সময় যেন অতীত হইয়া না যায়। যথা সময়ে, শুভযোগে, শুভক্ষণে যজ্ঞ আরম্ভ করা প্রয়োজন। আপনি অতিসত্বের সাবিত্রীদেবীকে এই যজ্ঞস্থলে ডাকুন, এবং তত্বাহকে সঙ্গে লইয়া বসুন।” ব্রহ্মা নিজপুত্র নারদকে সাবিত্রীদেবীকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য ডাকিতে পাঠাইলেন। নারদ সাবিত্রীদেবীর নিকট গিয়া বলিলেন, “মাতঃ! পিতৃদেব মুনিঋষিগণ সহ যজ্ঞস্থলে বসিয়া আছেন, আপনাকে ডাকিতেছেন। আপনি না গেলে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে না, শীঘ্রই চলুন।” সাবিত্রী বলিলেন—“বাবা! ঋষিপত্নীদের আনিবার জন্য পবনদেবকে পাঠাইতেছি, তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি যজ্ঞস্থলে যাইতেছি,—তুমি এই কথা গিয়া বল।” নারদ পিতাকে এই সংবাদ দিলেন, সাবিত্রীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে। যজ্ঞারম্ভেরও শুভ সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, ব্রহ্মা খুবই চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন—“দেবরাজ! সাবিত্রী বোধহয় গৃহে বিশেষ কোন কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও ত’ আসিলেন না। সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, কি আর করিব। অগত্যা না হয় আমি অপর কোন স্ত্রীর সহিত যজ্ঞ পূর্ণ করিব। আপনি অন্য কোন স্ত্রী অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসুন।” তাঁহার কথায় ইন্দ্র কন্যার খোঁজে বাহির হইলেন। বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়া দেখিলেন—একটা গোয়ালার মেয়ে মাথায় করিয়া দই-ঘোল লইয়া যাইতেছে। ইন্দ্র তাহার নিকট গিয়া তাহার মাথা হইতে দই-ঘোল সব ফেলিয়া দিলেন। এবং তাহাকে লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিলেন। দেবতাগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিষুং সেই মেয়েটিকে গরুর মুখে প্রবেশ করাইলেন এবং পুচ্ছের দিক্ হইতে বাহির করিলেন। তাহাকে স্নান করান হইল এবং অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করা হইল। তাঁহারা মেয়েটিকে ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রী-নামে আপ্যায়িত করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। কোথা হইতে একটা ভিখারী একটা নরমুণ্ড লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থল হইতে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে সে মুণ্ডটা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—কেহই আর তাহকে দেখিতে পাইলেন

না। আরও আশ্চর্যের ব্যাবার হইল যে—ব্রাহ্মণগণ যখন মুণ্ডটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—তখন মুণ্ডটী এক হইতে দুই হইয়া গেল, এবং পরপর দুই হইতে চার, চার হইতে আট—এইভাবে কেটী কেটী মুণ্ড হইয়া গেল। যজ্ঞস্থল নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মা প্রথমে অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু পরমুহুর্তেই ধ্যানযোগে বুঝিলেন যে—ইহা মহাদেবের কাজ। ব্রহ্মা মহাদেবকে অনুনয় করিয়া বলিলেন—“আপনি উপস্থিত থাকিতে এইপ্রকার হওয়া উচিত নয়।” তদুত্তরে শিব বলিলেন—“আপনি আমার উত্তম পাত্রটিকে ঘৃণা করিতেছেন, এইটী আমার ভোজনের পাত্র। আপনারা আমার নামে যজ্ঞহবি আত্মতা দেন নাই।” ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন—“আপনি সভাস্থলে অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, যাহা হউক এইবার অষ্ট পটেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপন হইবে।” ব্রহ্মা যখন এই কথা বলিলেন—তখন সমস্ত মুণ্ডগুলি নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহারা পুষ্করে স্নান করিয়া এই অষ্ট পটেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিবে তাহাদের পরমগতি লাভ হইবে।

এমন সময় সাবিত্রীদেবী সখীগণ সহ যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন—ব্রহ্মার পার্শ্বে অপর একজন স্ত্রী উপবিষ্টা। ভাবিলেন—“বাঃ! ব্রহ্মার এ'কি কাজ। তিনি এত জ্ঞানী হইয়াও অন্য মেয়েকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আবার দেবতা গণেরও কি প্রকার বিচার, তাঁহারা সকলেই এই কার্য্যে সহায়তা করিলেন।” স্বামীর নিকট অপর স্ত্রীকে দেখিয়া সাবিত্রী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—“আমি কোন প্রকারে ইহা মানিয়া লইতে পারি না, বা সহ্য করিতে পারিব না, আমি সকলকে অভিশাপ দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি সকলকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন—পুষ্কর ব্যতীত অন্য কোথাও কেহই ব্রহ্মার পূজা করিবে না। ইন্দ্র কখনও যুদ্ধে জয়ী হইবেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইবে। বিষ্ণুকে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহার পত্নীকে অসূরে হরণ করিবে। শিবকে ছাই-ভস্ম মাখিয়া ভূতপ্রেতের সঙ্গে বাস করিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং নির্ধন হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। গরু মুখ দিয়া গায়ত্রীকে পবিত্র করিয়াছে, গরু মুখ দিয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করিবে। কুবের যেহেতু ধন দিয়াছেন—তজ্জন্য রাজারা তাহার ধন অপহরণ করিবে এবং তাহাকে দীন-দরিদ্র হইয়া থাকিতে হইবে। পবন যেহেতু সর্ব্বত্র নিমন্ত্ৰণ করিয়াছেন—সেইহেতু পবন দক্ষবহ হইবেন। সাবিত্রীকে এইপ্রকার রুষ্টা দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে শাস্ত করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। এবং যজ্ঞে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—“দেবি! আপনি রাগ করিবেন না। এই গায়ত্রী আপনার দাসী হইয়া রহিবে। আপনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুন, এবং সহায় হউন।” সাবিত্রী কোন মতেই আর সেখানে আসনে বসিলেন না। তিনি অদূরে পর্ব্বতের উপরে চলিয়া গেলেন এবং পর্ব্বতোপরি তপস্যায় নিমগ্না হইলেন।

ব্রহ্মা আর কি করেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ খুবই বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“সাবিত্রী

এইপ্রকার অভিষাপ দিলেন, গায়ত্রী দেবী ইহার কোন ব্যবস্থা করুন, অর্থাৎ শাপ-মোচনের উপায় কি বলুন।” তখন গায়ত্রী দেবী ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—“চিন্তা নাই, আমার মালা জপের দ্বারাই আপনাদের সকলের শাপ মোচন হইয়া যাইবে।” তিনি বলিলেন—বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে দশরথের গৃহে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার বনবাস হইবে। স্ত্রী সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, বানর সৈন্যের সাহায্যে সগণ রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবেন। শিবের লিঙ্গ পূজা হইবে। ইন্দ্র পুনরায় রাজত্ব ফিরিয়া পাইবেন, গুরু সর্বত্র পূজিত হইবে, ইত্যাদি।

গায়ত্রীদেবী এইপ্রকার বলিলে ধুমধামের সহিত যজ্ঞ হইল। দেবতাগণ সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মণ্যদেব গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী জগতের মঙ্গলকারী যজ্ঞেশ্বর হরির বন্দনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মাজীও গায়ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞান্তে ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন। পুঙ্করে শ্রীব্রহ্মামন্দিরে ব্রহ্মাজী পূজিত হইতেছেন। অনতিদূরে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব সমস্ত অমঙ্গলহারীরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীবরাহদেবের মন্দির, শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, প্রভৃতি দর্শন করিলে জীবের পরম মঙ্গল হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

“যৎ তৎ কৰ্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোহর্চয়েৎ।

ভেদেনৈকাস্তমদ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ (ভাঃ ৫/২০/৩৩)

জনঃ যৎ কৰ্ম্মময়ং স্বৈধর্ম্য নিষ্ঠঃ শত জন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চ্যতামেতি ইক্তেত্যা কৰ্ম্ম প্রাপ্যং) লিঙ্গং (মূর্ত্তি) ব্রহ্মলিঙ্গং (ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ তৎ) ভেদেন (সেব্য সেবক ভাব-ভেদেন) অর্চয়েৎ; ঐকাস্তম্ (একস্মিন্ পরমেশ্বরে অন্তঃ নিষ্ঠা यस্য তৎ অতএব বস্তুতঃ) অদ্বৈতং, তস্মৈ ভগবতে নমঃ ইতি।

“স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চ্যতামেতি”—অর্থাৎ “নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ শতজন্মে ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন”—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে যিনি (ব্রহ্মা)—কর্ম্মফলের মূর্ত্তিস্বরূপ, যাঁহা হইতে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকাশিত হন, পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়া যিনি তাঁহা হইতে অভিন্ন, সুতরাং সেব্য সেবক ভাবের সহিত তাঁহারই সেবা করা কর্তব্য; অতএব আমরা সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবানকে নমস্কার করি।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

“কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।”

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

অপরাধ ভঞ্জন

[ঠাকুর শ্রীনরোত্তমে হাতিবুদ্ধি করিয়া কোনও মোহান্ব মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে, শ্রীগঙ্গাদেবীর উপদেশে, শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরণে শরণ লইয়া ব্যাধি-মুক্ত ও কৃতার্থ হন।]

ধায় দ্বিজবর, ব্যাথায় কাতর,
ব্যাধির জ্বলনে জ্বলি'।
না সহে বেদন, করিয়াছে পণ,
ত্যজিবে জীবন বলি'।।
আসি গঙ্গাকূলে, বাহু দুটি তুলে,
তরঙ্গে ঢালিতে দেহ।
চমকিল ক্ষণে, গভীর গজ্জনে,
বাধা দিল যেন কেহ।।
কহিল সরোষে, জলদ-নির্ঘোষে,
“সাবধান রে দুশ্মতি!
মহাপাপী তুই, তোরে নাহি ছুই,
আমি গঙ্গা হরিমতি।।
কি বলিব ওরে, তুই মোহ-ঘোরে,
কুলের গরবে মরি’।
কোন্ মহাজনে, বৈষ্ণব-সন্তমে,
হীন শূদ্রজ্ঞান করি’!!
খেলি নিজ মাথা, কাল দণ্ডদাতা,
দিল উপযুক্ত ফল।
পলাবি কোথায়, নাহি রে উপায়,
পাবি কি গঙ্গায় স্থল??
সব পাপ লই, ও-পাপ না সই,
আমি হরিদাস-দাসী।
হরিদাস-দেঘ, সুদুঃসহ লেশ,
মহাপাপ সর্বনাশী।।
মনে কি রে নাই, অম্বরীষ ঠাই,
দুর্ভাসার সেই গতি।
শত শত আর, দৃষ্টান্ত অপার,
নহে কার অবগতি!!
যাহ, যাহ ছুটে, পড়ি গিয়া লুটে,
সেই পদে কায় মনে।

দেবারাধ্য ধন, ঠাকুর নরোত্তম,
 প্রিয়তম গৌরজনে ॥
 গতি নাহি আর, কৃপা বিনা তার,
 কৃপাময় মহাজন ।
 ধর তারি পদ, ঘুচিবে বিপদ,
 পাইবে পরম ধন ॥ ”
 শূন্যবাণী যেন, সুরধুনী হেন,
 করি' তা'রে সাবধান ।
 নীরবিল ক্ষণে, কি সুধা-সেচনে,
 শবে যেন দিল প্রাণ ॥
 ছুটিল ব্রাহ্মণ, অমনি তখন,
 জ্ঞানোদয়ে কুতূহলী ।
 “শিরোমণি মম, কোথা নরোত্তম !
 দাও শ্রীচরণে !”— বলি ॥
 লুটিল ধুলায়, নরোত্তম পায়,
 নরোত্তম নিল কোলে ।
 নাচে দুই জন, কি প্রেমে তখন,
 ‘হা গৌরানন্দ’ ঘন বোলে ॥
 হ’ল ব্যাধি নাশ, কাটি মেঘ পাশ,
 সুপ্রকাশ দ্বিজরাজ ।
 মোহিনী রূপসী, অবিদ্যা রাক্ষসী,
 পালা’ল লইয়া লাজ ॥

—ঃ০ঃ—

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব ও আসুর-বর্ণাশ্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । শুদ্ধসত্ত্ব জীব মায়া-কবলিত হইয়া জগতে আগমন করেন । বদ্ধাবস্থায় জীবের শুদ্ধসত্ত্ব বা নিৰ্গুণ অবস্থা প্রাকৃত গুণায়িত হইয়া প্রকাশিত থাকে । পুনরায় শুদ্ধসত্ত্বরূপ স্বরূপ-লাভে জীবের মুক্তাবস্থা প্রাপ্তি হয় । যে-সকল স্বভাব যে-সকল স্থানে অবস্থিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে, তাহাদিগকে দৈব-বর্ণ ও দৈব-আশ্রম বলিয়া থাকে, এবং যাহাদ্বারা স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, তাহা আসুর-বর্ণ ও আসুর-আশ্রম নামে পরিচিত । বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শুদ্ধ বর্ণাশ্রম- লাভে প্রযত্ন করেন এবং পশু-স্বভাব ব্যক্তিগণের আসুর-বর্ণাশ্রমেই রতি দেখা যায় । যথা—

“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।” (গীঃ ১৬।৬)

এই জগতে দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি দৃষ্ট হয়,—দৈব ও আসুর। শ্রীগীতা শুদ্ধ দৈব-বর্ণের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন,—“সত্ত্ব-সংশুদ্ধিই জীবের অভয় অবস্থা। সেস্থান হইতে আর পতন নাই। অর্থাৎ জীব যখন নিজ-স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করেন, তখনই পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জিত, দয়া, নিরোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা প্রভৃতি দৈব-সম্পদ লাভ হয়, তাঁহাকে দৈব-বর্ণাশ্রমী বলা হয়।

আসুর-বর্ণের লক্ষণও শ্রীগীতা এইরূপ বলিয়াছেন,—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে ধর্ম-ভেদ জানে না। শৌচ, আচার ও সত্যনিষ্ঠা তাহাদের নাই। তাহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হইয়াও কামভোগের জন্য অন্যান্য উপায়ে অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে—আজ এই অর্থ লাভ হইল, এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই অর্থ আছে, পুনরায় এই ধন লাভ হইবে। এইরূপে কেবল অর্থ-প্রাপ্তিরই গণনা করে। আবার মনে করে—আমিই ঈশ্বর, সকল বস্তু আমার ভোগের জন্য সৃষ্ট, আমি সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমি সম্পন্ন ব্যক্তি, আমিই কুলীন। আমার ন্যায় আর কে আছে? তাহার স্থায় দেহ ও পর দেহ অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে ঘেঁষ করে এবং সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণও বলেন,—যাঁহারা বিষুণ্ডে ভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা দৈব এবং যাহারা জড়ভিনিবিশিষ্ট জীব, তাহারা আসুর-সৃষ্টি। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্তমান, তাঁহার নিকট দেবতাবৃন্দ সমস্ত গুণের সহিত বিরাজিত। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদগুণ কোথায়? কারণ তাহাদের মনোরথ অসদ্ বিষয়ে ধাবিত। ভগবদ্ভক্তি-হীনের আভিজাত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জপ, তপ—কেবল প্রাকৃত লোক-রঞ্জন করিতে পারে মাত্র। ভগবদ্ভক্তিই জীবের প্রাণ-স্বরূপ। অতএব গুণেরই সর্বত্র আদর। শ্রীভগবান্ গুণ ও কর্ম-অনুসারে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতার কার্য্য-প্রাণালী সুপুত্রগণ অনুবর্তন করিয়া থাকেন। যদি ভগবানের এই অভিমত হইত যে, গুণ-কর্ম বিধানটা একবার মাত্র স্থিরীকৃত হইয়াই চিরকাল চলিতে থাকিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-সন্তান তৎতৎ গুণসম্পন্ন হইবেন, তবে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইত না। তবে ব্রাহ্মণ বিশ্বশ্রবা-পুত্র রাবণ বিষুণ্ডেবী হইতেন না ; আবার দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষুণ্ডভক্ত হইতেন না ; বেদ আর্জ্জব গুণ-দর্শনে গোত্র নির্ণয় করিতেন না ; পৌরাণিকগণ গুণ দেখিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতেন না ; শ্রীমদ্ভাগবত স্বভাব-দর্শনে বর্ণ-নির্ণয়ে আদেশ করিতেন না। যতদিন পর্য্যন্ত দৈব-বর্ণাশ্রম সংস্থাপিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরমার্থ বা জগতের কোনও মহৎ কার্য্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। এই জন্য শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু রায়-রামানন্দ-মুখে ‘দৈব-বর্ণাশ্রমই

পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। “পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণ-ধর্ম ও আশ্রম-ধর্ম-আচারযুক্ত পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন। ইহা ব্যতীত বিষ্ণুপ্রীতি-লাভের আর অন্য উপায় নাই।”

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-মুকুটমণি, বর্তমান শুদ্ধভক্তি-শ্রোতের মূল-পুরুষ, সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে আমাদেরকে জানাইয়াছেন—“ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,— ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।” “বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম অনেকদিন বিশুদ্ধ রূপে চলিয়া আসিলে ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অপদস্ত হইয়াছে।” বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে-পর্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদেরকে জঞ্জরিত করিবে। “যেখানে বর্ণাশ্রম নাই, সেখানে নিক্রাম কর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না।” “বর্ণ-ধর্মই সামাজিক মানবের জীবন-স্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব ‘পুনর্মুখিকো ভব’ এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে।”

তিনি কৃষ্ণ-সংহিতা গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন,—“প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্মটা ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎলোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও ক্রিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটা কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐরূপ অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম ব্যস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্তদিগের হস্তে ধর্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়াতে যে বিপদ আশঙ্কার বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। সু-বিধানের মধ্যে যে মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মূল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ। অতএব, হে স্বদেশ-হিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্বপুরুষদিগের নির্মল ব্যবস্থাসকল নির্মল করতঃ প্রচলিত করুন। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য। ঈশ্বর-ভাবমিশ্রিত কর্মানুষ্ঠানদ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।”

—শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

* * *

“যঁহারা নিজে অন্যভিলাষী বলিয়া অন্যভিলাষিতার সর্বতোভাবে গর্হণকে অনুমোদন করেন না, তাঁহারা অপ্রিয় সত্য গোপন করিয়া প্রিয়বাক্যদ্বারা আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপনে তৎপর হন।” —শ্রীল প্রভুপাদ

বক্ষ্য

গৌড়-অধিপতি সুবুদ্ধি রায় হ'লা যবে রাজ্যহারা,
 ভৃত্য হুসেন হইল রাজন্ পেয়ে মস্নদে ছাড়া।
 স্বামীর অঙ্গে মারণের চিন্ হেরিয়া একদা রাণী,
 পুছিলা রাজারে কে তোমা' মেরেছে, কহ এ'র বিবরণী!
 কহিল হুসেন,—“রায়ের অধীনে চাকুরী করিনু যবে,
 মন্সীব আদেশে দীঘী দর্শাতে ভুল হয়েছিল তবে।
 ছিদ্র পেয়ে মোরে মেরেছে চাবুক, তারি এই দাগ রহে,”
 —শুনি' এ বচন ভার্য্যা তাহার রায়কে মারিতে কহে।
 রাজা কহে,—মোর পিতা সুবুদ্ধি, মারি তারে কেমনে?
 কহিল স্ত্রী—জাতি লহো তার যদি না বধিবে প্রাণে।
 ইথেও রাজার নাহি আকাঙ্ক্ষা, রাণী যে বধিতে চায়,
 সঙ্কটে রাজা তাই রায়-মুখে করোঙার পানি দেয়।
 সুবুদ্ধি রায় ত্যজিয়া বিষয় গিয়া বারাণসী ধামে,
 প্রায়শ্চিত্ত লাগি' মাগেন বিধান সেথা পণ্ডিত-স্থানে।
 পণ্ডিতেরা কহে,—‘তৃপ্ত ঘৃত খেয়ে এখনি ত্যজহ প্রাণ,
 হেন মহাপাপ করিতে মোচন নাহি কোন বিধি আন।’
 এলেন গৌরান্দ্র বারাণসী ধামে বিলাইতে হরিনাম,
 মিলিলেন রায় প্রভু-সনে সেথা পেতে তাঁর কৃপাদান।
 কহিলেন প্রভু—‘যাহ বৃন্দাবন, নাম করি অবিরাম,
 এক নামে যত কলুষ নাশিবে, আর নামে পাবে শ্যাম।’
 প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনেতে গিয়া,
 নাম নিতে নিতে ঘুচে গেল পাপ, শুদ্ধ হ'ল তাঁর হিয়া।
 প্রভু যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন গুরু হ'য়ে উপদেশি',
 বিতরি' করুণা রক্ষিলেন রায়ে বিদূরিয়া পাপ-রাশি।

—সংগৃহীত

দেহ-যাত্রার জন্য যত প্রকার কৰ্ম্ম করা যায় এবং সমাজ-যাত্রার জন্য যে সকল নীতি, নৈমিত্তিক ও কাম্যকৰ্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত যদি ধৰ্ম্ম উদ্দেশে কৃত না হয় তবে নিতান্তই হয় ; ধৰ্ম্ম-উদ্দেশে কৃত হইলে কৰ্ম্মকে ‘ধৰ্ম্ম’ বলি। —ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ—নবদ্বীপ,

৭৪১৩০২

ফোন নং ০৩৪৭২/২৪০০৬৮

জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিন্ত ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অনুসৃত-ধারায় সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমত্ত্রিক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উল্লিখিত ঠিকানায় আগামী ৯ই ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ২৬-৮-২০০৪), বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ৩০-৮-২০০৪), সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চ-দিবস-ব্যাপী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ২০শে ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ৬-৯-২০০৪), সোমবার জন্মাষ্টমীর অধিবাস এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২১শে ভাদ্র, ১৪১১, (ইং ৭-৯-২০০৪), মঙ্গলবার বিশেষভাবে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে নগর পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, ভোগরাগ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতাাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে মহাপ্রসাদ বিতরণ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঞ্চবে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবানুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

ইতি—১৫ই আষাঢ়, ১৪১১।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী

সভাবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রাঃ—

৯ই ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ২৬-৮-২০০৪), বৃহস্পতিবাস,

হইতে ১৩ই ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ৩৮-৮-২০০৪), সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের হিন্দোল-লীলা অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচীঃ—

২০শে ভাদ্র, ১৪১১, (ইং ৬-৯-২০০৪) সোমবার—

অধিবাস সন্ধ্যা ৬টায়।

কীর্তন সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত—পাঠ রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

২১ভাদ্র, ১৪১১, (ইং ৭-৯-২০০৪), মঙ্গলবার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

মঙ্গলারতিটকটকান্তে সকাল ৮টা পর্য্যন্ত নগর-সকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী পারায়ণ সকাল ৮-৩০ হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

ধর্মসভা সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৭টা হইতে ১২ পর্য্যন্ত, তদনন্তর অভিষেক ও আরতি।

২২শে ভাদ্র, ১৪১১ (ইং ৮-৯-২০০৪) বুধবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়; তদনন্তর সকীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ,

পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩২ মধ্যে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাসের পারণ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক ও শ্রীনন্দোৎসব।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ।

দ্রষ্টব্যঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজের নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা সংস্করণ, ৮ পৃষ্ঠা

রবিবার, ১১ জুলাই, ২০০৪

লিগ্যাল নোটিস

জেলা জজ কোর্ট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

বিষয় : দেওয়ানী মোকদ্দমা আবেদন নং ৫৭ অফ ২০০৪,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি দীগর-----বাদী

বনাম

দি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট দীগর----- বিবাদী

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)-এর পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, আমাদের শ্রীসমিতির আর্থিক সহায়তার জন্য 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট' গঠিত হয়। কিন্তু বর্তমানে উক্ত ট্রাস্টের সম্পাদক, শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী/সত্যরাজ ব্রহ্মচারী ও হিসাবরক্ষক শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী শ্রীসমিতির ও ট্রাস্টের নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় উক্ত ট্রাস্টের বিরুদ্ধে উক্ত আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধির নং ৯২ (১) তথা ১৫১ ধারাবীনে মামলা রুজু হইয়াছে। অতএব সকল জনসাধারণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে, তাঁহারা এই ব্যাপারে যদি কোনভাবে অংশগ্রহণ করিতে চাহেন, তাহা গ্রাহ্য হইবে। ১-৬-২০০৪ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত লিড আবেদন উক্ত আদালত মঞ্জুর করিয়াছেন।

আবেদনকারী—

স্বামী ভক্তি বেদান্ত পর্যটক,

সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রাস্টী সদস্য

তারিখ : ২-৬-২০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

প্রধান কার্যালয় : শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন্-৭৪১৩০২

ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেনকথাসু যঃ।	<p style="text-align: center;">স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।</p> <div style="text-align: center;"> </div>	নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম।
শ্রী	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥	শ্রী

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮ হুযীকেশ, গর্ভোদশাস্তী, ৫১৮ গৌরাঙ্গ
{ ৫৬শ বর্ষ } ৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪১১, ইং ১৭/৯/২০০৪ { সপ্তম সংখ্যা }

সানুবাদং

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌড়দেশে সুর-দীর্ঘিকায়াস্তীরেহতি-রম্যে ইহ পুণ্যমঘ্যাঃ।

লসন্তুমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ১॥

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য-তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে
বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ১॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।

বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জগন্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ২॥

যাহাকে কেহ কেহ 'পরব্যোম', কেহ কেহ 'গোলোক' এবং তত্ত্বজ্ঞগণ 'বৃন্দাবন'
বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ২॥

□ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪১১, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

যঃ সৰ্ব্ব দিক্ সুসুৰিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সু-পবনৈঃ পরিতঃ।

শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৩॥

যে-স্থান নিরন্তর চতুর্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানা-বৃক্ষে শোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুযোগ দান করে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করি॥ ৩॥

শ্রীশর্ণদী যত্র বিহার-ভূমিঃ সুবর্ণ-সোপান-নিবদ্ধ-তীরা।

ব্যাপ্তোষ্মিভি-গৌরবগাহ-রূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৪॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ৪॥

মহান্ত্যনন্তাণি গৃহাণি যত্র সুসুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।

প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৫॥

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠগৃহ বর্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ৫॥

বিদ্যা-দয়া-ক্ষান্তি-মৈথৈঃ সমস্তৈঃ সন্তিগুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।

সংস্তুয়মানা ঋষি-দেব-সিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৬॥

যেখানে লোকসকল বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত সদগুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ৬॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুন্দরস্য স্বানন্দ-গম্যৈকপদং নিবাসঃ।

শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৭॥

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদি-লীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুন্দর মিশ্রের গৃহ বর্তমান, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি॥ ৭॥

গৌরো ভ্রমন যত্র হরিঃ স্বভট্টৈঃ সঙ্কীর্ণন-প্রেমভরেণ সর্বম্।

নিমজ্জয়ত্যজ্জল-ভাব-সিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥ ৮॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করত সঙ্কীৰ্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল-ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।। ৮।।

এতন্নবদ্বীপ বিচিন্ত্যনাঢ্যং পদ্যাস্তকং প্রীতমনাঃ পঠেদ যঃ।

শ্রীমচ্ছটীনন্দন-পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপুয়াং সঃ।। ৯।।

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপ-ধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাস্তক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশটীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্লভ প্রেম লাভ করেন।। ৯।।

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সেসমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া ‘আমি’, ‘আমার’ ইত্যাকার অভিমানের বশবর্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধিবিহীন বা যথেষ্টাচারী কেহ নৈতিক, কেহ কস্মী, এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমानी। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাহারা এই জগতে বর্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়-অবলম্বনহেতু তাহাদের মধ্যে কেহ কস্মযোগী, নিক্রাম ভগবদর্পিত কস্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী, বৈরাগ্য সহকারে ঈশ্বধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অস্তাস্থযোগী, আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত, সৰ্ববল্লিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানব মধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সৰ্ব্বোপনিষদস্বর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা কর্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর ব্যক্তিগণ বহুতর তর্ক সৃষ্টি করিয়াও এবিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কস্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার স্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন, যথা গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে,—

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কস্মিভ্যাস্তাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জুনঃ।। ৪৬।।

যোগীনাংপি সর্বেষাং মদ্যতেনাস্তরাগ্ননা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কৰ্ম্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অজ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-যোগী, এবং “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য”, একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কৰ্ম্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবগণ দেশভেদে ও অবস্থাভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেহ বা কৰ্ম্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্মিত এই জগতই বা কি, এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু, এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রূচি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্বোপাধিমুক্ত, ভগবৎ-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যিকতা উপলব্ধি করেন না, এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুক্ততার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

“ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥”

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবদ্ব্যত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীতা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দূর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

ভক্তিস্তু ভগবন্তু-সঙ্গেন পরিজাযতে।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতেঃ পূর্বসম্বিতৈঃ ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতি ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও সুকৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় না। এ-জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিন্ত জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিন্ত হইয়া পাছহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এবমিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে, শ্রীমন্তাগবতে,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ, নিখিল কার্য্যাকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।

মায়্যভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্ভৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয় চিন্তা, বিষয় সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জাষণাদাম্বপবর্গবত্বানি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্জ্জস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

নির্জ্ঞানবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জ্ঞানে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় ‘সাধুসঙ্গ’।
 কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
 মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়।
 কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয়॥
 ‘সাধুসঙ্গ’, ‘সাধুসঙ্গ’—সর্বশাস্ত্রে কয়।
 লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১, ৫৪)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (ক্রমশঃ)



ভাই কুতর্কিক!

আমি শ্রীতপস্বী, আর তুমি ভাই কুতর্কিক; আমরা দুই ভাই মানুষের মাথায় বসিয়া—ঘাড়ে পা দিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করি। আমরা দুই ভাই বটে, কিন্তু পরস্পর বৈমাত্রের ভাই; তাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না দিলে আমরা পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের মায়ের পরিচয় পূর্বের মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীরা বলিয়া গিয়াছেন।

মায়াবাদীরা বলেন,—‘জগৎ মিথ্যা, মানবজ্ঞান মিথ্যা’,—ব্যবহারিক মাত্র; তর্কদ্বারাই ‘একমেবাদিতীয়ম্’ স্থাপন করা যায়, অধ্যাসবশে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক হইলেও উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের আশ্রয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধনের policyতে অগ্রসর হইয়া নির্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুঝিব ও লোককে বুঝাইব।

তত্ত্ববাদী বলেন,—হরি নিত্য পরতত্ত্ব, অখিল-আন্মায়বেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, জীবমাত্রের বৈষ্ণব, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি।

সুতরাং দুই ভাইএর দুই মায়ের পরিচয়ে একটু তফাৎ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বৈমাত্রের ভাই। ভাই কুতর্কিক, আমি যে তোমাকে কুতর্কিক বলি, তুমি তোমার সেই দুর্গম কাটাইবার জন্য আপনাকে শ্রীতপস্বী বলিয়া গোজামিল দেও, তাহা ত’ তোমার আচার-বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

তুমি তোমার চোক, কান, নাক, জিহ্বা ও চামড়া দিয়া যে একঘেয়ে আংশিক ধারণা লাভ কর, সেই ধারণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিঁড়ি বাঁধিতে গিয়া আমার উপাস্য বস্তু জগন্মুখীকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে একটা ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও এবং সেই কল্পনায় গা ভাসাইয়া তুমি কখনও কৃষ্ণ সাজিতে চাও; পরের দ্রব্য হরণ করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সব এক বিচার করিয়া বাউল ধর্ম প্রচার কর; ভোক্তার বেশে আপনাকে ভগবদ্ভোগ্য বস্তুগুলিব

ভোক্তা সাজাও; কখনও বা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়; কখনও বা সমন্বয়বাদীর ভাণ করিয়া জগতের বোকা লোকগুলিকে ভোগা দেও; কখনও বা বল যে, “পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ”; কখনও বিচার দেখাও যে, মা ও বামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,— বন্ধবিচারে ভেদ মাত্র। কখনও আপনাকে মুক্তাভিমনে মাতৃবুদ্ধি পরিহার করিয়া বিকল্পে মাতৃ বুদ্ধিতে নিজ ভোগ্য বুদ্ধি কর, আর তর্কের সাহায্যে ‘আমার ভাল লাগে’ বলিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী তোমার ভাইকে সহস্র আকারে আক্রমণ কর, কিন্তু তোমার মঙ্গলপ্রার্থী ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে ‘ভাই’ বলিয়া যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়া তাকে বোকা বলিয়া তোমার দলে টানিয়া আনিবার যত্ন কর, তোমার ভাইএর সহিত নানা তর্ক-বিতর্ক কর, গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও ‘বাস্তব শ্রৌতপন্থী’ বলিবার পরিবর্তে ‘প্রচ্ছন্ন তর্কিক’ বলিয়া নিজের কুতর্ক-প্রবৃত্তি-কলঙ্কের লাঁঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টাদ্বারা শ্রুতি-ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতের পোষণ করিতেছ। তোমার এই সকল ছল-প্রবৃত্তি দেখিয়া তোমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে সম্বল মনে না করিয়া মহাজনের নিকট বেদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, তোমার বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রৌতপন্থীর বড়ই দয়া উপস্থিত হয়, তুমি কিন্তু সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের বোকামি মনে কর।

ভাই কুতর্কিক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের অগ্নেয়গিরি ছাই-চাপা দিয়া রাখিবে, —পদে পদেই যে কুতর্কানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। ‘সবিশেষত্ব’, ‘সর্বশক্তিমত্তা’ প্রভৃতি ভগবদ্গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব ছাইচাপা থাকিলেও, ছাই ফুঁড়ে ধোঁয়া বাহির হয়, আর তা’ থেকেই কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্রৌতপন্থী ভাই ‘ন্যায়সুধার’ সাহায্যে “পর্বতো বহিমান্ ধূমাৎ” প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া দিয়া তোমার কুতর্কেচ্ছামূলা ঈশ্বরনাশ-প্রবৃত্তি বা Vandalism চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, বলিয়া তোমার বেদানুগ ভাইটিকে তোমার ‘বৈমাত্র্যে’ অর্থাৎ ‘তোমার নিজ জননীর সপত্ন্যুচিত ঈর্ষাভাবের সন্তান’ মনে কর। তুমি কি ভাই, এই সকল কপটতা ছাড়িয়া দিয়া সরল হইতে পার না? জ্ঞানের বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, তুমি তাহা সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কার্যের বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন? আমার কোন সম্পত্তি নাই; তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,—এ অহঙ্কার তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়? ‘কাটখোট্টাই’ করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান, তোমার মুখে ‘নারায়ণ’ ‘নারায়ণ’ শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় অন্য দেবগুলির সহিত একপর্যায়ে গণিত হওয়ায় ‘মায়াই ব্রহ্ম’ বা ‘ব্রহ্মই মায়ী’ প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? ‘সকল ঘট তোমার’ আর ‘সকল ঘট তুমি’,—এই কথা বলিয়া কেন ধৃষ্টতা কর?

ইহা কি “অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে” এই মতের জ্বলন্ত উদাহরণ নহে? তুমি কখনও বা ‘কর্ত্তাভজা’ সাজিয়া ভক্তের ভাগ দেখাও, তুমি কখনও বা আউল-বাউল- নেড়া-কর্ত্তাভজাদির বেশে তোমার ভাইএর সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই স্বভাবটা কি নিগুণতা? হরিই ত একমাত্র নিগুণ, আর তোমার কল্পিত হরি ত নির্বিশেষ! তুমি লোক ঠকাইবার জন্য কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস কর না, কৃষ্ণলীলার আদশটি নিজেই উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর।

ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের স্মিতাধরটি অনিত্য, বংশীধ্বনিটি অনিত্য, অপাঙ্গদর্শনটি অনিত্য, কৃষ্ণের মথুরায় মাল্যলাভ ব্যাপারটি অনিত্য, রাসক्रीড়াটি অনিত্য, বলিয়া মনে কর? এইসব ধারণা যে কতগুলি নীতিরহিত মানুষের কল্পনাপ্রসূত, তাহা কি তুমি জাননা? ভগবত্তা লোপ পাইয়া নির্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল বলিয়া তুমি যে তিনপ্রকার-দুঃখ-আচ্ছন্ন সংসারে মজা লুটিবার ভাগ করিতেছ, আর নিত্য শাস্ত্রত ভগবদ্বস্ত কৃষ্ণের লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজে গোপনে সেই সকল ভোগে রত থাকিয়া পারদারিকের পরদব্যাপহরণের নিন্দা অঙ্কিত করিতেছ’ —ইহা কি তোমার সাধুতার পরিচয়, না আর কিছু?

তুমি নির্বিশেষবাদীর সজ্জায় তর্কের জাল পাতিয়া নির্বিশেষ ভাবের নিত্যত্ব-স্থাপন-ছলনায় ভগবানের উদ্দেশে ইহজগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠান-সমূহকে নির্বোধের চেষ্টা বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে নাস্তিক সাজিয়া মুক্তবায়ু সেবনে আনন্দ উপভোগ করিবে, চর্ব্যা, চুষ্যা, লেহ্য, পেয় দ্রব্যগুলি সমস্তই লুট করিবে, আর তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি “উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ” বলিবার ছলনা দেখাইয়া ভক্ত সাজিতে আসিবে,—এই শয়তানি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী ভাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর? তোমার এই সকল চেষ্টা জনকজ্ঞানের সম্পত্তির বন্ধক দেওয়া মাত্র। তাহা হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিয়া তুমি যে নিজের অসুবিধা আনয়ন করিবে,—ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়।

ভাই, তোমার অংশীদারকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিওনা; যদি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার বঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্কপন্থী হইয়া ভোগীর পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাহ্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সম্বয়বাদের ছলনায় বিবাদপ্রিয় মার্জ্জারদ্বয়ের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়া মর্কটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ-পিপাসা, তাহা শিশুপাঠ্য ঈশপের গল্পে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়বার অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত কেন?

তুমি কি জান না, যে কৃষ্ণভক্ত তোমার চেয়ে বেশী চতুর? সে ত’ তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা কর্ম্মকাণ্ডকে শুদ্ধজ্ঞানের ‘সাধন’ বলিয়া স্বীকার করে না! শুদ্ধজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার শ্রৌতপন্থী তোমার ন্যায় কপট অণুচানমানীর বিচার গুণালী হইতে পৃথক্ হইয়া নিজের অংশে যে চিহ্নিলাস-বিচার আবাহন করেন,

তাহা কি তোমার চিন্মাত্রবাদের মায়া-মরীচিকার প্রলোভন দ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর?

এইসকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতর্কিক, তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রৌতপন্থীর বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিলে? ঐ ঘূর্ণাবর্ত হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতে ও আমার অংশটুকুর দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বিগ্ন পাইতে হইয়াছে। কাহারও দ্রব্য অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়, সুতরাং আমার অংশ নষ্ট করিবার জন্য তোমার কুপিপাসা কেন হইল ভাই?

তুমি তোমার অংশে তর্ক-বিতর্কের জাহাজ লইয়া গৌরজন্মস্থানের অপরকূলে দাঁড়াইয়াছ বটে, কিন্তু আমি ত' তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার কুতর্ক ও জ্ঞান-গরিমার অংশ-লাভের প্রত্যাশী নহি। উহা মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জন করিবার পর সুস্থ হইয়া আমি মহাজনের অনুগমন করিয়া এখন নিশ্চিত আছি। আমার ত' কোনই চিন্তা নাই, ভাই! 'ভাই আমি তোমার সম্পত্তিতে ছোবল দিতে দৌড়াই না, আর আমার সম্পত্তিতেও ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি নির্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষসূত্রে মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান, তাহা আমি বেশ জানি; অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম্ম, আর অহিংসাই আমার ধর্ম্ম। শ্রৌতপন্থী—হিংসাপরায়ণ, আর কপট-শ্রৌতপন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতর্কিক—অহিংসক, এইরূপ ভোগ দিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি তোমার 'কারচুপি' ধরিয়া ফেলিতে পারি।

আমি কখনও পরদার, পরদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ অবলম্বন করি না;—আমি আরোহপন্থী নহি,—অবতারবাদী, আর তুমি—অবতার-বিদ্রোহী ও অধিরোহবাদী। তোমার আমার বৈমাত্রের ভাই সম্বন্ধ চিরদিনই আছে ও থাকিবে। গৌরহরির নির্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অনুমোদন নাই বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হওয়ায় তোমার সম্বল যে মৎসরতা, তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাখিয়া আমার কাছে যদি ঐরূপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব; তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে। তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার আছে। সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ স্বভাব দেখাইয়াও আমার সম্পত্তির নিকট কখনও আসিতে পারিবে না।

কাচভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধুপান করিবার নিমিত্ত কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে সাধারণ লোকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যা মুগ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু কোন মাধবগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চাতুরীর প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার

পূর্ব পর্যন্ত প্রবৃষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যশ্রিত, তাঁহারা যে, ‘তোমার চৈতন্যের’ ‘গণেশের চৈতন্যের’ ‘মনঃকল্পিত চৈতন্যের’ ধার ধারেন না, ভাই! ঐগুলি যে মহাজনবিরোধী লোকের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র!

ভাই; আমি—শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি শ্রীচৈতন্যের বিরোধী হইয়া ‘তোমার চৈতন্যের’ দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসগণের সহিত তোমার যে নিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্যদাস বলিয়া তোমার তুচ্ছ বাজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চৈতন্যদেবের কিন্তু তাহাতে সুখ হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? ভাই কুতর্কিক, একবার শ্রীচৈতন্যবাণীটি কি আমার নিকট শুনিবে? সেই শ্রীচৈতন্যবাণীটি এই,—

“নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজেনানুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।”

আবার বলি,—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশটি কি তুমি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

“অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণবোচ্চারণ।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর।।”

এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছা হয় ত আবার দেখা হবে।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ



হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ†

ভারতীয় লোকসভায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিগত ২৭শে জুলাই, ১৯৫৬ তারিখে একটি বিল (Bill) বা বিধান উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা এই বিলের সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইতে পারি নাই; তবে যতটুকু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত ও মর্মান্বিত হইলাম। এই বিধানের উদ্দেশ্য—“সাধু-সন্ন্যাসীগণের পাপাচার, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা, সমাজবিরোধী আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার দ্বারা খাঁটি সাধুগণের বদনাম দূর হইবে ইত্যাদি।” ভারতীয় লোকসভার বিস্তারিত বিধান প্রস্তাব—(Bill) অবগত হইতে পারিলে আমরা ইহার যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব। অবশ্য সাধুগণের বিরুদ্ধে কোনও আইন পাশ করিতে হইলে তাহাদিগকে ঐ বিধান বিষয়ে

† শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সর্বতোভাবে অবগত করান প্রয়োজন। তাহা না করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও বিধান প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

ভারতের যাবতীয় আইন, বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত কোন বিধি ভারতে চলিবে না। সাধু-সন্ন্যাসীগণকে শাস্ত্রই নিয়ন্ত্রিত করেন, কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেহেতু সমস্ত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই বাক্যের পোষকতা-প্রমাণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত একটা শ্লোক উদ্ধার করিতেছি—

সর্বত্রাশ্বলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদগুধৃক্।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥ (ভাঃ ৪/২১/১২)

অর্থাৎ মহারাজ পৃথু (যাঁহার নামানুসারে সমস্ত বিশ্বের নাম ‘পৃথিবী’ হইয়াছে) সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট ছিলেন। ঋষিকুল, ব্রাহ্মণ এবং অচ্যুত-গোত্রীয় বিষ্ণুভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলের উপর তাঁহার দণ্ড এবং বিধি অশ্বলিত ছিল। অর্থাৎ উক্ত ঋষি ও সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকলের উপরেই তাঁহার আইন প্রযুক্ত হইত।

সাধুগণই ভারতের গৌরব ও শোভা। সমগ্র পৃথিবী ভারতের এই গৌরব ও শোভায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের পারমার্থিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীগণ শান্তিপ্রিয়, তজ্জন্য সমগ্র পৃথিবী শান্তির জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট যত সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও শত-সহস্রগুণ অধিক সম্মান লাভ করিয়াছে—ধর্মনৈতিক কারণে। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। রাজনীতিদ্বারা ধর্মনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত অবিধি।

ভারতীয় সংবিধান-তন্ত্র হইতে সর্বপ্রথম ঘোষিত হইয়াছিল—ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতীয় লোকসভা কোনও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী (against the constitutional Law) হইবে। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন (Penal code) ও ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (Criminal Procedure code) প্রভৃতি আইন-সমূহের অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন করিতে হইবে, অথবা সেই সেই আইনগুলিকে সংশোধন করিতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—যিনি এই প্রস্তাব লোকসভায় অনয়ন করিয়াছেন, তিনি ভারতীয় দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন কি? তিনি কি জানেন না যে, দুর্নীতি দমন করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র একই আইন প্রচলিত আছে? দুর্নীতির মাপকাঠি বা মানযন্ত্র সাধু ও অসাধুপক্ষে একইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং দুর্নীতি দমনের জন্য পৃথক কোনও আইন প্রস্তুতের আবশ্যিকতা নাই। আমরা বলিতে চাহি,—সাধু চুরি করিলে বা অসাধু চুরি করিলে Penal code এর (দণ্ডবিধি আইন) ৩৭৯ ধারা কি নূতন করিয়া গড়িতে হইবে? একজন অসাধু পরদ্বী

হরণ করিলে বা একজন সাধু পরস্তী হরণ করিলে Rape case এর ৩৭৬ ধারা পরিবর্তিত হইবে কি? সাধু প্রতারণা করিলে বা অসাধু প্রতারণা করিলে ৪২০ ধারার কিছু পরিবর্তন হইবে কি? আমরা বুঝি,—ফৌজদারী দণ্ডবিধি সাধু-অসাধু সকলের উপরেই সমানভাবে প্রযুক্ত। দুর্নৈতিক ঘটনার তারতম্য ও গুরুত্বানুসারে দণ্ডেরও গুরুত্ব ও তারতম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য পৃথক আইন প্রস্তুতের কোনও আবশ্যিকতা নাই।

যদি সাধুদের দুর্নৈতিকতার জন্য পৃথক আইন প্রস্তুতের আবশ্যিকতা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাণাচার, সমাজ- বিরোধী কার্য্য ও দুর্নৈতিকতার জন্যও পৃথক আইন আবশ্যক হইবে। Congress এর কোন নিরপেক্ষ সভ্য লোকসভায় এইরূপ বিল উত্থাপন করিবেন কি? সাধু-সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান বা আচার্য্যের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে প্রথমে রাজনৈতিক পাণ্ডাগণের নিয়ন্ত্রণ হওয়া আবশ্যক। Black Marketing (চোরাবাজারী নিয়ন্ত্রণ) আইন আজও প্রস্তুত হয় নাই। আমরা শুনিতে পাইতেছি,—বর্তমান শাসনতন্ত্রের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ দুর্নৈতিকতার প্রশ্ন দিতেছেন। আমাদের (তৎকালীন) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী কোনও কোনও সময় ইহার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? অবশ্য “তেজীয়াসাং ন দোষায়”—এই বিচার অনুসারে হয়ত তাঁহারা রেহাই লইবেন।

সাধু ও সন্ন্যাসীর বিচার—সাধু-সন্ন্যাসীরাই করিয়া থাকেন। অসাধুগণ কিরূপে সাধু চিনিয়া লইতে পারিবেন? যাহারা কোনও দিনই সাধুর কাছে যান নাই, তাহারা সাধুত্বের বিচার কেমন করিয়া করিবেন? আইন প্রস্তুত করিতে হইলে ‘সাধু কাহাকে বলে’, তাহার একটি আইন-সঙ্গত Schedule অর্থাৎ তপশীল প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই তপশীলের বাহিরের লোকগুলিকে ‘অসাধু’ সংজ্ঞা দিতে হইবে এবং ‘অসাধু কাহাকে বলা হইবে’, ইহারও একটি তপশীল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যাহারা সাধু ও অসাধু—এই দুই তপশীলের বাহিরে থাকিবেন, তাহাদিগকেও একটি তপশীল করিয়া মনুষ্যজাতির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—এই জগতে দেবতা ও অসুর-নামক দুইটা সম্প্রদায় মনুষ্য-নামে খ্যাত। অন্যপ্রকার মানবজাতিকে মনুষ্য বলিয়া ধরা হয় নাই।

অসাধু নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নাই—সাধু-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার জন্য অসাধুগণ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। কলির বর্তমান সময়ে ভোটের যুগ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং অসাধুর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সাধুগণের উপর অত্যাচার চালাইবার আইন প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্টের রক্ষা হইবে কিরূপে? আজকাল পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দুগণের উপর যে প্রকার অত্যাচার-অবিচার চালাইতেছেন, ভারতবর্ষেও সেইপ্রকার সংখ্যালঘিষ্টের প্রতি

সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাকে আমরা সুশাসন বলিতে পারি না।

ইহার মূলে সাধুদের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অসাধুগণ নিজ নিজ দুষ্টতি ও দুর্নীতির জন্য সাধুগণের দ্বারা সমাজে হেয়-ঘৃণিত-অপমানিত-লজ্জিত হওয়ায় তাহার প্রতিহিংসা-স্বরূপ এইপ্রকার কলি-কালোচিত সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মূলে আমরা আরও একটি অসৎ-উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের যাবতীয় অসাধুগুলি সাধু-খাতায় নাম লেখাইয়া তাহাদের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রচুর সুযোগ লাভ করিবে। সুতরাং এইপ্রকার আইন প্রস্তুত হইলে দুর্নীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে;—কিন্তু হাস-প্রাপ্ত হইবে না।

সাধুগণ নিজদিগকে লোকসমাজে ‘সাধু’ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। আমি একজন ‘Registered সাধু’ অথবা ‘Licensed সাধু’, এইরূপ পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোনও সাধুই সরকারী সেরেস্তায় নাম Registry করাইতে যাইবেন না। বিশেষতঃ জেলাধীশ (Licence officer) যদি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোনও হিন্দু-বিরোধী ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত সাধুতার বিচার কি-প্রকার হইবে? উক্ত শ্রেণীর জেলাধীশ তাঁহার নিজ ধর্ম-চিন্তানুযায়ী বিচার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং সাধুগণ তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য এরূপ ব্যক্তির নিকট কেন যাইবেন?

‘সাধু’ বলিতে গৃহস্থ ব্যক্তিকে বুঝাইবে কি না? অবশ্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ নহেন। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীদিগকে সন্ন্যাসী বলা হয় না। তাঁহাদিগকে কি বলা হইবে? যদি তাঁহাদিগকে ‘সাধু’ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী—এই তিন শ্রেণীর লোককে ‘সাধু’ বলিতে হইবে। অথবা গৃহস্থগণকে বাদ দিলে তাঁহারা অসাধু-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এইরূপক্ষেত্রে কোনও গৃহস্থ উন্নত-স্তরের লোককে ‘অসাধু’ বলিয়া সম্বোধন করিলে দণ্ডবিধি আইনে ৩৫২ ধারার অপরাধ হইবে না। অথবা ঐ আইনে ৫০০ ধারা অনুসারে সম্মানের হানিও করা হইবে না।

কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি যদি সাধু হইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়াই যদি সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও লাইসেন্স লইতে হইবে এবং নাম রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। এরূপক্ষেত্রে আমরা অবগত আছি,—জেলাধীশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ-অধিকারী কর্মচারী ধর্ম-জীবন যাপন করেন। তাঁহারা উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকাদিসহ বিচার আদালতে বা অফিসাদিতে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ‘সাধু’-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলে তাঁহাদিগকেও জেলাধীশের নিকট তাঁহাদের সাধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। জেলাধীশ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে ‘সাধু’ বলিয়া লাইসেন্স দিবেন এবং অবশ্যক হইলে উহা কাড়িয়া লইবেন ও দণ্ড দিবেন—ইহা কি সম্ভব হইবে?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন ও সর্দার আইন বা বাল-বিবাহ আইন যেরূপ সংবিধানে পাশ হইলেও ভারতীয় জনতা তাহা গ্রহণ না করায় সংবিধানের

গ্রন্থাগারেই উহা সুরক্ষিত আছে, বর্তমান আইনটীও জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধানে পাশ করা হইয়া তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগে চাপাইতে গেলে ইহারও সেইরূপ অবস্থা হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি কথা আমরা শুনিতছি, ইহা আইনরূপে গৃহীত হইলে ভারতীয় Federal Courtএ এই সংবিধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে।

সুতরাং আমরা এইরূপ আইন নির্দ্ধারিত হইবার সর্ব্বতোভাবে বিরোধী এবং লোকসভার সভ্যগণের প্রতি আমাদের সকাতির নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এইরূপ আইন কখনও পাশ না করেন। ভারতের সমগ্র সংবাদপত্র-সেবীগণকে অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আমরা ভারতের সমগ্র জাতীয় সমাজকে, বিশেষতঃ সকল সাধু-সন্ন্যাসী-গণকে নিবেদন জানাইতেছি, —তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করুন।

সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! সাধু সাবধান!!!

—শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

উপনিষদ-বাণী

(ছান্দোগ্য ২)

“ওঁ” এই অক্ষর ‘উল্লীখ’—ইহা জানিয়া ওঁকারের উপাসনা করা কর্তব্য—উচ্চস্বরে গান করা কর্তব্য। প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা গায়ত্রী আদি ছন্দে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন। তাহা কবচস্বরূপ হইয়াছিল। আচ্ছাদনাথৈই ‘হৃন্দ’ নাম।

ধীবর যেরূপ জলমধ্যে মৎস্যের সন্ধান পায়, তদ্রূপ মৃত্যুও দেবতাগণের বেদ-মধ্যে গুপ্ত-অবস্থান অবগত হন। তখন দেবগণ ওঁকার মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং নির্ভয় হন। কারণ ওঁকার পরমাত্মার স্বরূপ। ঋক্, সাম, যজুঃ—সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণের প্রারম্ভে ওঁকার উচ্চস্বরে কীৰ্ত্তন করিতে হয়। অতএব ওঁকার ভগবৎস্বরূপ বলিয়া অমৃত। যাঁহারা ইহার উচ্চারণ করেন তাঁহারা তদ্বরাই পরমেশ্বরের স্তুতি করেন ; তাঁহারা সর্ব্বথা ভয়রহিত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাপন্ন হন এবং অমৃত প্রাপ্ত হন।

আকাশে বিচরণকারী সূর্য্য মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান। তজ্জন্য সূর্য্যে পরমেশ্বর ও তদ্বাচক ওঁকারের ভাবনা করা কর্তব্য। ‘স্বরন এতি’ উচ্চরণপূর্ব্বক গমন করে—এই অর্থে সূর্য্য পদ নিষ্পন্ন।

একসময় কৌষীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে বলেন যে, তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া ওঁকারের উপাসনা করায় পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে সূর্যরশ্মির চতুর্দিকে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া আবর্তন করার উপদেশ করেন। ইহা আধিদৈবিক উপাসনা।

এখন আধ্যাত্মিক উপাসনার কথা বলা হইতেছে—শ্বাস-বায়ুরূপে প্রবাহিত মুখ্য প্রাণকে অবলম্বন করিয়া ওঁকারের উপাসনা করা কর্তব্য। প্রাণের দ্বারা শ্বাসরূপে যাতায়াতকালে নিরন্তর ওঁকারের উপাসনা হয়। কৌষীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া ওঁকারের উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

সামের উদ্দীপ্ত অংশই প্রণব। কারণ প্রণবই উহার সার। কারণ প্রণব ব্যতীত কোন মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা যজ্ঞদির সমস্ত ক্রটি দূর হয়। কেননা সমস্ত কার্যের অন্তে ভগবান্নাম কীর্তনের দ্বারা সর্বপ্রকার ক্রটি দূর হইয়া সেই কর্ম পূর্ণতা লাভ করে।

পৃথিবী—ঋক্ এবং অগ্নি—সাম। অগ্নিরূপ সাম পৃথিবীরূপ ঋকে প্রতিষ্ঠিত। পৃথ্বী ‘সা’ ও অগ্নি ‘অম’ উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে। আবার অন্তরীক্ষ ঋক্ এবং বায়ু সাম। বায়ুরূপ সাম অন্তরীক্ষে অবস্থিত। পুনরায় ‘দু’ অর্থাৎ স্বর্গলোক ঋক্ এবং সূর্য্য সাম। কেননা সূর্য্য স্বর্গে অবস্থিত। সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল ঋক্ এবং চন্দ্র সাম। কারণ চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত।

প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সূর্য্যের শ্বেতবর্ণ আভা ঋক্ এবং উহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিত শ্যামরূপ সাম। অতএব উজ্জ্বল আভা ‘সা’ এবং শ্যামরূপ ‘অম’। আবার সূর্য্যের অন্তর্য্যামী স্বর্ণ-বর্ণ প্রকাশ-স্বরূপ স্বর্ণ-শ্মশ্রু পুরুষই পরমাত্মা। তাঁহার কেশ হইতে নখ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বর্ণ-বর্ণ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লাল কমলসদৃশ। তাঁহার নাম ‘উৎ’ অর্থাৎ সর্বোপরি অবস্থানকারী তিনি সমস্ত পাপেরও উপর অর্থাৎ অতীত। তাঁহাকে যিনি এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন নিঃসন্দেহে তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায়। ঋগ্বেদ ও সামবেদ পরমাত্মারই গুণগান-স্বরূপ। এজন্য উহা উদ্দীপ্ত। অতএব উদ্দীপ্তা পরমেশ্বরেরই গুণ কীর্তন করেন। পরমেশ্বরই স্বর্গ ও তদুপরিস্থিত সমস্তলোকের ভোগের নিয়ামক ও শাসক।

বাগিদ্রিয়—ঋক্ ও প্রাণ—সাম। প্রাণরূপ সাম বাণীতে প্রতিষ্ঠিত। নেত্র ঋক্ ও তাহার মধ্যের কালতারা সাম। আবার শ্রোত্র ঋক্ ও মন সাম। নেত্রমধ্যে অবস্থিত পুরুষই ঋক্, সাম, যজুর্বেদ এবং উক্থ অর্থাৎ স্তোত্রসকল। তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত। এজন্যই সূর্য্য চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পৃথিবীর নীচে ও পৃথিবীতে যত প্রাণী অবস্থিত তিনি সকলেরই শাসক ও নিয়ামক। এই রহস্য অবগত হইলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়।

শালাবানের পুত্র ‘শিলক’ চিকিতায়ন পুত্র ‘দাল্ভ্য’ জীবলের পুত্র ‘প্রবাহন’ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই উদ্দীপ্ত বিদ্যায় কুশল। অতএব তৎসম্বন্ধে চর্চা করিব। তখন প্রবাহন অপর দুই জনকে বলিলেন,—আপনারা উভয়ে চর্চারস্ত

করুন, আমি নীরবে শ্রবণ করিব। তৎপরে শিলক চিকিতায়ন-পুত্র দাল্ভ্যকে প্রশ্ন করিলেন,—সামের আশ্রয় কে? দাল্ভ্যের উত্তর—স্বর। পুনঃ প্রশ্ন—স্বরের আশ্রয় কে? উত্তর—প্রাণ। পুনঃ প্রশ্ন—প্রাণের আশ্রয় কে? উত্তর—প্রাণের আশ্রয় অন্ন। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল—অন্নের আশ্রয় কে? উত্তর—জল। আবার জিজ্ঞাসা হইল—জলের আশ্রয় কে? উত্তর—স্বর্গলোক। পুনরায় স্বর্গলোক কাহার আশ্রয়ে অবস্থিত—এই প্রশ্ন হইলে উত্তর হইল—স্বর্গের উপরে আর কিছু নাই। এই স্বর্গেই সামের পূর্ণরূপে স্থিতি। এজন্য শ্রুতির উক্তি—‘স্বর্গো বৈ লোকঃ সামবেদঃ’। তখন শিলক বলিলেন—দাল্ভ্য! তোমার কথিত সাম নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠাধীন অর্থাৎ স্বর্গই অস্তিম আশ্রয় নহে, তাহারও কোন আশ্রয় অবশ্যই আছে। তখন দাল্ভ্য শিলককে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শিলক বলেন—মনুষ্য-লোকই স্বর্গের আশ্রয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল—মনুষ্য-লোকের আধার কি? তাহার উত্তর—মনুষ্য-লোকেই সাম প্রতিষ্ঠিত, তদুপরি আর কোন প্রশ্ন আসে না। কেন-না সামকে সকলের প্রতিষ্ঠারূপ মনুষ্যালোক বলিয়া স্তুতি করা হয়। তখন নীরবে অবস্থানকারী প্রবাহন শিলককে বলিলেন—শিলক! তোমার কথিত তত্ত্ব ভিত্তিহীন। তৎপরে শিলক প্রবাহনকে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রবাহন বলিলেন—আকাশই মনুষ্যালোকের আশ্রয়। সমস্ত জীব আকাশেই উৎপন্ন এবং আকাশেই লয় হয়। আকাশই সকলের আশ্রয়। অতএব উহা পরমেশ্বরের স্বরূপ—যিনি এই প্রকার জানিয়া পরমেশ্বরকে সকলের আশ্রয়রূপে উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে উচ্চ হইতে উচ্চ হন এবং উচ্চ লোককেও জয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ উন্নত লোক প্রাপ্ত হন।

একবার অতিথ্য ঋষি শাণ্ডিল্য ঋষিকে এই পূর্ব্বকথিত উদ্দীপ্ত-রহস্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি—যিনি এই রহস্য অবগত হইবেন তিনি সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং অস্তিমে পরম শ্রেষ্ঠ লোকে স্থান পাইবেন।

কোন সময় অত্যধিক শিলাবৃষ্টির জন্য কুরুদেশের শস্যসকল নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত স্থানে নিবাসকারী উষন্তি ঋষি নিজ অপ্রাপ্ত-যৌবনা ভার্য্যাসহ অন্যত্র কোন চণ্ডালকুলজাত হস্তী-পালকের গ্রামে অবস্থান করেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকেন। একদিন উক্ত ঋষি কোনস্থানে কিছুমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া কলাই ভোজনরত হস্তিচালকের নিকট তাহারই কিয়দংশ যাজ্ঞ করেন। সে প্রথমে ঐ উচ্ছিষ্টদ্রব্য প্রদানে অস্বীকার করে। কিন্তু ঋষির অত্যন্ত আকুলতায় তাহার উচ্ছিষ্টবশেষ মাষকলাইসকল ঋষিকে প্রদান করে। ঋষি ঐসকল ভোজন করিলে হস্তি-চালক তাহার পাণ্ড্রাবশিষ্ট জল পান করিতে দেয়। কিন্তু ঋষি উহা গ্রহণ করেন নাই। কারণ ঋষির তখন প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। এজন্য তদুচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। হস্তি-চালক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি বলিয়াছিলেন—তোমার উচ্ছিষ্ট মাষকলাই ভক্ষণ না করিলে আমার প্রাণ নাশ হইত; কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ স্থির হইয়াছে। অতএব জলপান করা অকর্তব্য। এতৎপ্রসঙ্গে

বেদান্তে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থপাদে ২৮ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—‘সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদর্শনাৎ’। অর্থাৎ প্রাণ নাশ সম্ভাবনায় যে-কোন লোকের অন্ন ভোজনে পাপ নাই, আপংকাল ব্যতীত অন্যসময় উহা অকর্তব্য। কারণ আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্থিতি। সেই স্থিতি হইতেই সর্ববন্ধন নাশ হয়।

—ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

* * *

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

সর্বগ্রাণে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী বা জন্মজয়ন্তী। এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রতি বৎসরেই এই শুভতিথি সমাগতা হন আমাদের কিছু সেবার সুযোগ দান করবার জন্য। ভগবান্ যেমন যুগে যুগে বারে বারে অবতীর্ণ হন, তাঁর ভক্তগণও জগতের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হন। আমরা গীতাশাস্ত্রে দেখতে পাই ভগবানের এ জগতে আসবার কারণ। তিনি নিজমুখে তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে বলেছেন,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যখন এ জগতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আবির্ভূত হই। আরও কি কারণ?—আমার একান্ত ভক্তগণকে, সাধুগণকে রক্ষার জন্য আমি আবির্ভূত হই। ‘বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্’—দুষ্কৃত যারা আছে, তাদের বিনাশের জন্য আমি আবির্ভূত হই। এইভাবে ভগবানের আবির্ভাবের কথা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। ভগবানের এই আসবার কারণ মাঝে মাঝে ঘটছে, কিন্তু বিশেষ বক্তব্য বিষয়—ভগবান্ কতগুলো কাজ তাঁর অবতারাদির দ্বারা সম্পন্ন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।

যে কাজ তাঁর অন্যান্য অবতারের দ্বারা সম্ভব হয়, সেই কাজ থেকে আরও বিশেষ কিছু কার্যসাধন করতে গেলে ভগবান্কে স্বয়ং আবির্ভূত হতে হচ্ছে। যেটা অবতারের দ্বারা সম্ভব হবে না। ঠিক এই তত্ত্বদর্শনটা এর ভিতরে রয়েছে। সেটা কি

করে বুঝব? শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে সুন্দরভাবে মনোযোগ-সহকারে এবং সে শাস্ত্র আলোচনাও হবে উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুর আনুগত্যে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ‘জন্মান্তমী’-শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এ সব বিষয়ে অন্যত্রও কিছু কিছু আলোচনা করেছি। তথাপি পুনরায় একটু দিগ্‌দর্শন করে যেতে হবে। ‘জন্ম’-শব্দ ব্যবহার হল কেন? জন্ম-মৃত্যু শব্দ সাধারণ মানুষের বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মান্তমী একথা কেন ব্যবহার হচ্ছে? শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে ‘যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে।’—লাইনটা রয়েছে। কার্যক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন, যশোদানন্দন বলা হচ্ছে। এটা কিভাবে হচ্ছে? ভগবান্ যদি বসুদেবনন্দন, দেবকীনন্দন, তাহলে আবার নন্দনন্দন, যশোদানন্দন একথা আসছে কেন? বহু ব্যক্তির ধারণা নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে পালন-পোষণ করেছেন। সেখানে বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই—ভগবান্ তাঁর সমস্ত শক্তি সব জায়গায় প্রকাশ করেন না। সাধারণ মানুষের যে ক্ষমতা তার থেকে শত-সহস্রগুণে অধিক ক্ষমতা রাখেন ভগবান্। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর। “কর্তুমেকর্তুমন্যথাকর্তুম ইতি ঈশ্বরঃ।” ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন শাস্ত্রে। ঈশ্বর-শব্দে যদি আধিকারিক দেবদেবীগণকে লক্ষ্য করে, তাহলে পরমেশ্বর, পরমেশ্বরী-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে Supreme Command, Highest Authority, Supreme Lord, Almighty Lord ক্ষেত্রে। ঠিক সেইরূপ বিচার এখানে রয়েছে।

বসুদেবনন্দন বাসুদেব বা দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপর ভাবেতে সেবিত হচ্ছেন বসুদেব-দেবকীর কাছে। সেই কৃষ্ণ যখন গোকুলে নন্দালয়ে গেছেন তখন তাঁর ঐশ্বর্য্যভাবটা সেখানে শেষ হয়েছে। বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহেতে লালিত-পালিত হয়েছেন মা যশোদার কাছে, নন্দ মহারাজের কাছে। আপনারা পূর্বে শুনেছেন, একই সময়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বসুদেব-দেবকীর সামনে ভগবান্ কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছেন, ঠিক সেই একই সময়ে মা যশোমতী কৃষ্ণকে প্রসব করেছেন এবং নবমী তিথি যখন পড়েছে তখন তিনি যোগময়াকে প্রসব করেছেন। ঠিক সেই বিচারটা এখানে আসছে। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ, আর নন্দনন্দন-যশোদানন্দন কৃষ্ণ বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহে লালিত-পালিত মাধুর্য্যপর বিগ্রহ। ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহের বেলায় আবির্ভাব-শব্দটা এসেছে, আর নন্দ-যশোমতীর পুত্ররূপে যখন তিনি প্রকাশিত তখন জন্ম-শব্দটা এসেছে। এই জন্ম-শব্দটা হল স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ বাৎসল্যের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যভাব নাই। সুতরাং কৃষ্ণ-জন্মান্তমী শব্দটা বললে পরে এর ভিতরে গুঢ় রহস্য আছে, সেটুকু আমাদের বুঝতে হবে।

আর একটা বিষয় হচ্ছে এই,—‘শ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী’-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জয়ন্তী-শব্দের অর্থ কি? তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু আজ এই

‘জয়ন্তী’-শব্দের অপব্যবহার করা হচ্ছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী, কবি, সাহিত্যিক জয়ন্তী-শব্দটা ব্যবহার করছেন আজকাল জন্ম অর্থে। যেটা সম্পূর্ণ ভুল কথা এবং তাঁরা এই জয়ন্তী-শব্দটা রামা-শ্যামা, যদু-মধু সকলের ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছেন। গান্ধী-জয়ন্তী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নেতাজী সুভাষ জয়ন্তী ইত্যাদি। কিন্তু জয়ন্তী-শব্দের অর্থ ত’ জন্ম নয়। ওরা কিন্তু ব্যবহার করেছে জন্ম-জয়ন্তী। আমরা স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করে দেখছি এই শব্দটা ব্যবহার হয়েছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেলায়। এই শব্দটা ব্যবহৃত হতে পারে ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে। অন্য কারও ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহৃত হবে না। বিশেষ ক্ষেত্র কি? ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-অষ্টমী, তার মধ্যে রোহিণী নক্ষত্র যদি যুক্ত হয়, অভিজিৎ মুহূর্ত্ত যদি থাকে, তাহলে তাকে বলে জয়ন্তী। এই জয়ন্তী হল একটা যোগ শুভ মুহূর্ত্ত। কৃষ্ণ যে-সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ছিল এই শুভ যোগ। অথচ সাধারণ মানুষ জয়ন্তী-শব্দের অর্থ বোঝেন না। সবই বোঝেন, অথচ কিছু বোঝেন না! যে কোন জয়গায় জয়ন্তী-শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে সপ্তমীবিদ্যা অষ্টমী-তিথি পালন করতে নিষেধ করেছেন। শুদ্ধ অষ্টমী-তিথি পালন করতে হবে। শুদ্ধাষ্টমী-তিথির মধ্যে আবার বাছাবাছি আছে। যদি রোহিণী নক্ষত্র যোগ হয় তাহলে ভাল। আবার বলছেন—নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী যদি হয় তাহলে আরও উত্তম। নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী মানে—অষ্টমী-তিথিতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন, আর নবমী-তিথি যখন পড়েছে তখন যোগমায়া দেবী আবির্ভূত হয়েছেন। এইজন্য নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী-তিথিতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। এইজন্য নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী-তিথিকে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে ‘উমা মাহেশ্বরী তিথি’। এই যোগের বিশেষ আদর আছে। আবার যদি সোমবার বা বুধবার হয়, তাহলে আরও সুন্দর যোগ হয়। শাস্ত্রে এইভাবে কথাগুলো নির্দেশ করেছেন আমরা এইভাবে শুভযোগ যদি নাও পাই, তাহলে অন্ততঃ শুদ্ধ অষ্টমী-তিথি আমাদের পালন করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে-সময় সংসারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-সময়ে মৃদুমন্দ বারিবর্ষণ হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকচ্ছিল এবং কিছু কিছু দৈব-দুর্বিপাকও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওটা দৈব-দুর্বিপাক নয়, শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতিদেবীও ভগবানের সেবা করবার জন্য ঐরকম অবস্থাটা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ভগবানকে যদি আমরা ভালবাসতে চাই, ভগবৎ-তত্ত্ব যদি আমরা অনুশীলন করতে চাই, তাহলে শাস্ত্রীয় যে তত্ত্বদর্শন, বিচার-পদ্ধতি সেগুলো আমাদের মেনে নিতে হবে। এটা হল সবথেকে বড় কথা।

জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করলে ভগবান্ খুশি হবেন। যে কোন তিথি—ঋতুভিত্তিক মাত্রেই, যদি আমরা তাতে উপবাস করি, তার ভিতরে ভগবানের লীলাকথা জ্ঞাপন করি, কীর্তন করি, তাহলে আমাদের সর্বৈব কল্যাণ, ভক্তি লাভ হবে। সংসারে আমরা দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, এ দুঃখ-কষ্টটা দূর হয়ে যাবে, এটা বড় কথা নয়। শাস্ত্র

আলোচনা করে আমরা দেখছি—‘আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিহি মুক্তিঃ’। মুক্তি কাকে বলব? আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকে মুক্তি বলে। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কিরকম? আমার জ্বর হয়েছে, অসুখ হয়েছে, জ্বরটা ছেড়ে গেল, ওতে কি হবে? স্বাস্থ্য লাভ করা আমার প্রয়োজন আছে। আত্মার যে স্বাস্থ্যলাভ সেই লাভ করা হল বড় কথা। সেটা শাস্ত্রে বুঝিয়েছেন। শুধু দুঃখ-নিবৃত্তি হলে হবে না। তার সঙ্গে আছে মুক্তির কথা, ভক্তিলাভের কথা। আবার ভক্তিলাভের কথা যখন এসেছে তখন সাধনভক্তির কথা, ভাবভক্তির কথা, প্রেমভক্তির কথা এসেছে। সব জিনিসটাকে সুন্দরভাবে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা কতটুকু পেতে চাই, আর কতটুকু পেলে আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে, এটা বলতে হবে। সুতরাং জন্মান্তর্মী-তিথি পালন করা মানে হল ভগবানের সাক্ষাৎকার। হরিনাম করা আর ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই-ই একই বস্তু বলেছেন শাস্ত্রে। আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুটো একই জিনিষ, Identical। ভগবান্ এবং ভগবানের নাম দুই-ই এক। ভগবান্ স্বয়ংরূপ এবং তাঁর শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ—তিন একই। যতদিন পর্য্যন্ত এ বুদ্ধি আমাদের না হবে, যতদিন পর্য্যন্ত এ দর্শন আমাদের না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব।

শাস্ত্র আলোচনা করব কেন আমরা? —তত্ত্বদর্শন লাভ করার জন্য। বাচ্চা ছেলেদের Eshops Fables এর গল্পগুলো পড়ানো হয়। গল্পের শেষের দিকে একটা Moral—নীতি-শিক্ষা দেওয়া আছে দু-এক লাইন করে। সেটা হল মূল শিক্ষণীয় বিষয়। সেটা বুঝতে পারবে না বলে একটা করে গল্প দেওয়া হয়েছে, ঐ জিনিষটা বুঝাবার জন্য। সমস্ত শাস্ত্রটা যদি আমরা তুলোপাঁজা করি এবং তার মূল বিষয়বস্তুটা আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা না করি, তাহলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। ভগবান্কে ভালবাসতে হবে, এটা সবচেয়ে বড় কথা।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপপাতায়ৈব কেবলম্।।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রবিধিকে যদি বাদ দিয়ে আমরা নিজেদের কোন বক্তব্য রাখতে চাই, তাহলে বৃথা হয়ে যাবে, কেউ মানবে না। তত্ত্ববিৎ, শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণ নিশ্চয় স্বীকার করবেন না। তাঁরা শাস্ত্রীয় যুক্তি-সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনটা মানতে পারেন না। “যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।” —এটা শাস্ত্রের সর্বত্র লেখা আছে। আমরা যেন সেই প্রেমময় ভগবান্কে না ভুলি। ভগবান্কে ভালবাসা যাচ্ছে ৬৪ রকমে। একে বলে ভক্ত্যঙ্গ। সেইগুলো শুনলে পরে আমাদের ভয় হয়। এতগুলো পারা যাবে না কি? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ওটা সংক্ষিপ্ত করেছেন।

প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি পড়াশুনা করছ, তোমার যেটা ভাল পড়া তুমি সেটা আমাকে বল। বাপের কোলে বসে প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

ক্রিয়তে ভগবত্যদ্বা তন্মন্যেধীতমুত্তমম্॥

এই পাঠ আমি ভাল পড়েছি। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধাভক্তি যিনি যাজন করবেন, তিনি ভগবানকে ঠিক ঠিক ভাবে ভালবাসতে পারবেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্যাদ-পরমা-

ভুতৌদার্যং বর্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।

বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদ-মধুরপীযুষ-লহরীং

প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটম্॥ ১॥

অর্থ—ব্রজপতিকুমারং (ব্রজেন্দ্রনন্দনকে) বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদ-মধুরপীযুষ-লহরীং (নিজ নিম্নলিখিত প্রেমসমুদ্র হইতে উথিত মত্ততাজনক মধুর-অমৃত লহরী) রসয়িতুং (আশ্বাদন করাইবার জন্য) অন্যেভ্যঃ চ প্রদাতুং (এবং অন্যকে প্রদান করিতে) [যঃ—যিনি] পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটং (নবদ্বীপ নামক পরমধামে অবতীর্ণ), তং অতিবিমর্যাদ-পরমাভুতৌদার্যং বর্যং (সেই অপরিসীম, পরম-অদ্ভুত ও ওঁদার্য্য শ্রেষ্ঠ) চৈতন্যাকৃতিং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পুরুষকে) [বর্যং—আমরা] স্তমঃ (স্তব করি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ব্রজেন্দ্রনন্দনকে (অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে) নিজ সুবিমল প্রেমসিন্ধু হইতে উথিত মত্ততাজনক মধুর-অমৃতলহরী আশ্বাদন করাইতে এবং অন্যকেও বিতরণ করিতে যিনি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ‘শ্রীনবদ্বীপ’-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অপরিসীম, পরম-অদ্ভুত ও ওঁদার্য্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ১ ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন-

স্বরূপ যে-জন,

রাধিকা-রমণ রাম।

উন্মদ মধুর-,

পীযুষ প্রচুর—

স্ব-প্রেম করিতে পান ॥

বিতরিতে আর,

সেই সুধাসার,

কি ভাবে উদার মরি!

পর-পদ ধাম,

‘নবদ্বীপ’ নাম

আসিলেন অবতরি’ ॥

চেতন্য-মুরতি

সেই ব্রজপতি

কুমার-মহিম-গাথা।

করি সবে গান,

ঢালি মনঃ প্রাণ

বিকাইয়ে পদে মাথা ॥ ১ ॥

ধর্মাস্পৃষ্টঃ সতত-পরমাবিস্তি এবাত্যধর্মো

দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।

যদন্ত-শ্রীহরি-রস-সুধাস্বাদ-মত্তঃ প্রনৃত্য-

ভূচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুষ্ঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ধর্মাস্পৃষ্টঃ (ধর্ম-কর্তৃক অস্পৃষ্ট), অত্যাধর্মো সতত-পরমাবিস্তি এব (মহা-অধর্মো নিরন্তর অত্যন্ত আবিষ্ট), ন হি খলু সতাং দৃষ্টিং প্রাপ্তঃ (সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই), [তেবাং] সৃষ্টিষু ক্বাপি চ নো সন্ (সেই সাধুগণের সৃষ্টি কোন স্থানেও অবস্থান করে নাই) [তাদৃশো জনঃ—সেইরূপ ব্যক্তিও] যদন্ত-শ্রীহরিরস-সুধাস্বাদ-মত্তঃ [সন্] (যাঁহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-সুধা অস্বাদনে মত্ত হইয়া) প্রনৃত্যতি (প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য করে), উচ্চৈঃ গায়তি (উচ্চৈশ্বরে গান করে), অথ বিলুষ্ঠতি চ (এবং ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হয়), তং কঞ্চিৎ ইশং (সেইরূপ কোনও শক্তিমান পুরুষকে) স্তৌমি (আমি স্তব করি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম বাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই (অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও যাহাতে নাই), যে নিরন্তর মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের কৃপাকটাক্ষ লাভ করে নাই, বা সাধুগণের প্রতিষ্ঠিত কোন পবিত্র স্থানেও কদাপি অবস্থান করে নাই, সেইরূপ পাপীয়ান ব্যক্তিও যাঁহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উদ্দাম-নৃত্য, উচ্চ-কীর্তন, এবং ভূতলে বিলুষ্ঠন করে, তাদৃশ শক্তিমান কোন অনির্বচনীয় পুরুষকে আমি স্তব করি ॥ ২ ॥

কে গো সে পরম-তত্ত্ব

কি বিভু সে আনিল!

কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-সেই,—

কে না তাহে মজিল?

পাষণ্ড পরম যেবা

মহাপাপী মরতে,

ধর্মের পরশও কভু

পায় নাই জগতে;

কুভাব-আবেশে সদা

বিভোর যে জীবনে,

কৃষ্ণ ভুলি' কষ্ট পায়

কাম-দস্যু-কাননে;

সাধু-জন-সন্মিলনে

যায় নাই কদাপি,

শোচনীয় শত দোষে

বজ্জনীয় যে পাপি;

হায় হায়, হরি হরি!

সেও যার শ্রীপদে,

লভি প্রেমামৃত সেই

মত্ত হয় কি মদে;

নৃত্য, গীত করে, ক্ষণে

পড়ে, লুটে ভূতলে,

হা গৌর, হা কৃষ্ণ ব'লে

মুগ্ধ করে সকলে;

পতিতপাবন-বর

সেই পর মহেশ,

গাহি আমি তাঁহারি গো

গুণ-গাথা অশেষ ॥ ২ ॥ (ব্রহ্মশঃ)

সাধুসঙ্গের মহিমা

সাধু-সঙ্গের মহিমা সম্পর্কে পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় কিছু নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে (পয়ার সংখ্যা ২২৩-২৩৬) সাধু-সঙ্গের মহিমা যে রূপ বর্ণন হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কোন এক সময়ে পরমারাধ্য জগদগুরু শ্রীশ্রীম্নারদমুনি শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শনকরতঃ প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য যাইতে ছিলেন। তিনি বনপথে দেখিলেন, একটি মৃগ পদে তীরবিদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছে; আর কতদূর গিয়া দেখেন যে একটি শূকরও বাণবিদ্ধ হইয়া ধড়ফড় করিতেছে, আবার কিছুদূরে গিয়া দেখিলেন যে একটি খরগোস এরূপ তীরবিদ্ধ হইয়া ঝটপট করিতেছে। তখন দেবর্ষি নারদ তীরবিদ্ধ প্রাণীগুলির দেহ হইতে তীরগুলি তুলিয়া বনজাত ঔষধ প্রদান করতঃ তাহাদের সুস্থ করিলেন। প্রাণীগুলি নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। জীবের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া শ্রীনারদমুনি অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং গিয়া দেখেন এক ব্যাধ একটি মৃগ মারিবার জন্য বাণ জুড়িয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবর ঐ ব্যাধের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন যে,—

কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওঁত হইয়া।

মৃগ মারিবারে আছে বাণ জুড়িয়া।।

শ্যামবর্ণ, রক্ত নেত্র, মহা ভয়ঙ্কর।

ধনুর্বাণ হস্তে যেন যমদণ্ড ধর।।

দেবর্ষি নারদ তখন রাস্তা ছাড়িয়া উক্ত ব্যাধের নিকট গেলেন। নারদের বীণা যন্ত্রের শব্দ শুনিয়া ব্যাধের নিশানাগ্রস্ত মৃগটি চলিয়া গেল। ইহাতে ব্যাধ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবর্ষিকে গালি দিতে ইচ্ছা করিলেও শ্রীনারদ প্রভাবে তার মুখের গালি মুখেই রহিয়া গেল, গালি দিতে পারিল না। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল “গোঁসাই রাস্তা ছাড়িয়া আপনি কেন এখানে আসিলেন। আপনাকে দেখিয়া আমার লক্ষীভূত মৃগটি পলাইয়া গেল। শ্রীনারদ কহিলেন, “পথ ভুলিয়া আমি তোমার নিকট এসে পড়েছি। তবে আমার মনে একটি সংশয় আছে, তাহা তোমার নিকট খণ্ডাইতে চাই। পথে তীরবিদ্ধ অবস্থায় শূকর, মৃগ ও খরগোস দেখিলাম। তুমিই কি উহাদের তীরবিদ্ধ করিয়াছ? ব্যাধ কহিল, ‘হ্যাঁ আমিই করিয়াছি।’ নারদ কহিলেন—“তুমি উহাদিগকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রাখিয়াছ কেন?” ব্যাধ কহিল,—“পিতার শিক্ষায় ঐছে শিক্ষিত। যন্ত্রণায় প্রাণী ছটপট করিতে করিতে মরিলে, তাহা দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হয়। সেইজন্য আমি এইরূপভাবে বধ করিয়া থাকি।” দেবর্ষি কহিলেন,—“তুমি ব্যাধ প্রাণী হত্যা কর, তাহাতে তোমার অপরাধ অল্প, কিন্তু কষ্টদিয়া মারিলে অপার পাপ হইয়া থাকে।”

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় যথা—

কদর্থিয়া তুমি যত মারিলা জীবেরে।

তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে।।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে যে- “Every action must have opposite and equal reaction”

সুতরাং তুমি তীর এমন ভাবে মারিবে, যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটি হত হয়। দীর্ঘ সময় যন্ত্রণা না পায়। তুমি যদি যন্ত্রণা দিয়া মার, তবে তোমাকেও ঐরূপ যন্ত্রণা পাইতে হইবে। শ্রীনারদের উপদেশে ব্যাধের মন প্রসন্ন তথা মনে বড় ভয় উপস্থিত হইল। সে চিন্তা করিল যে, সে বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কত যে প্রাণী ঐরূপ কষ্ট দিয়া মারিয়াছে তার কোন হিসাব নাই। সে তখন দেবর্ষির শ্রীচরণে পড়িয়া কাতরস্বরে কহিল, “ঠাকুর! আপনি আমায় উদ্ধার করুন।” শ্রীনারদ বলিলেন,—“যদি তুমি আমার কথা শুন, তাহা হইলে তোমার পাপ মোচনের ব্যবস্থা আমি করিয়া দিতে পারি।” ব্যাধ কহিল—“আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।” দেবর্ষি বলিলেন—“তুমি সর্ব্বাঙ্গে ধনুকটি ভাঙিয়া ফেল।” ব্যাধ কহিল “ধনুক ভাঙিলে আমি কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? আমি প্রত্যহ প্রাণীবধ করিয়া সেইগুলি বাজারে বিক্রয় করতঃ আমার জীবিকা নির্ব্বাহের দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিয়া থাকি, ধনুক ভাঙিয়া দিলে, আমি কিরূপে বাঁচিব?” দেবর্ষি কহিলেন, “আমি প্রত্যহ তোমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিব।” তখন ব্যাধ ধনুকটি ভাঙিয়া দেবর্ষির শ্রীচরণে পড়িলেন। দেবর্ষি তাহাকে উঠাইয়া বিবিধ সং-উপদেশ দান করতঃ বলিলেন, “তুমি ঘরে গিয়া সমস্ত ধন ব্রাহ্মণকে দান করতঃ সস্ত্রীক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া নদীতীরে আসিয়া একটি কুঁড়ে ঘর নির্মাণ কর। তাহাতে একটি তুলসী মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তন্নিকট নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিও।”

নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।

অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।।

আরও বলিলেন, “আমি তোমাকে অনেক অন্ন দিয়া পাঠাইব, কেবল তোমরা দুইজনের মত লইবে। অবশিষ্ট ফেরৎ দিয়া দিবে।” অনন্তর সেই ব্যাধ শ্রীগুরুদেব নারদ গোস্বামীকে প্রণাম করতঃ ঘরে আসিয়া তাঁহার উপদেশমত সকল কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এবং নদী তীরে গিয়া একখানি কুঁড়েঘর ও তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করতঃ প্রত্যহ শ্রী-তুলসী সেবা ও মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল, সেই ব্যাধ পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। লোকসকল কৌতুহল বশতঃ উক্ত মুগারী ব্যাধকে দর্শন করিতে আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভজন সাধন দর্শন করতঃ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, এ এক ভীষণ বিস্ময়কর ব্যাপার। যে ব্যক্তি দিনে শত শত প্রাণী বধ করিত তাহাদের দেহ হইতে বহির্গত রক্ত দেখিলে পরম আনন্দে নৃত্য করিত, সে আজ সর্ব্বপ্রকার হিংসা পরিত্যাগ করতঃ হরিনামে মত্ত হইয়াছে, এ বড় অদ্ভুত ও অকল্পনীয় ব্যাপার! যাহা হউক মুগারীর ভগবৎ ভক্তি দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, ও তাহাকে কিছু কিছু সামগ্রী উপহার দিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ এবং ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীগণও অনাদি লইয়া ভক্ত

দর্শনে যাইতে লাগিল। প্রচুর দ্রব্যাদি আসিলেও মৃগারী নিজেদের দুইজনের মত লইয়া সমস্তই ফেরত দিয়া দিত। তাহার নির্লোভতা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কিছুকাল পরে দেবর্ষি নারদ শ্রীপর্বত মুনিকে বলিলেন,—“চলুন আমার একটি শিষ্য আছে, তাহাকে দেখিতে যাইব। তখন সেই দুই ঋষি মৃগারীর নিকট যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন সেই মৃগারীর কুটিরের কিছুদূরে উপস্থিত হইলেন, মৃগারী দূর হইতে গুরুর দর্শন পাইয়া শশব্যাস্তে গুরুর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু রাস্তায় পিপীলিকা থাকিবার কারণে, দেখিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন, যাহাতে পাদপৃষ্ঠ হইয়া পিপীলিকা মরিয়া না যায়। তৎপরে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুকে যখন প্রণাম করিতে যাইবেন, দেখেন সেখানেও পিপীলিকা সারিবদ্ধ হইয়া চলিতেছে, বস্ত্রের দ্বারা পিপীলিকাগুলি সরাইয়া দিয়া শ্রীগুরুদেব দেবর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,—

নারদ কহে ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য।

হরি ভক্তৌ হিংসাসূন্য হয় সাধুবর্ষ্য॥

স্কন্দ বচন—

এতে ন হ্যভুতা ব্যাধ তবা হিংসাদয়ো গুণাঃ।

হরি ভক্ত্যে প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—তোমার যে হিংসাবৃত্তি আজ অহিংসায় পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুনাই, কারণ-যিনি হরিভক্তি সাধনে তৎপর, তিনি কখনও পরপীড়াদায়ক হন না।

তবে সেই ব্যাধ দোঁহারে অঙ্গনে আনিল।

কুশাসন আনি ভক্ত্যে দোঁহারে বসাইল॥

জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।

সেই জলে স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল॥

কম্প পুলকাক্ষ হৈল কৃষ্ণনাম গাঞা।

উর্দ্ধবাহু নৃত্যকরে বস্ত্র উরাঞা॥

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্বত মহামুনি।

নারদেরে কহে,—তুমি হও স্পর্শমণি॥

স্কন্দ বচন—

অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে কৃপয়া यस্য তৎক্ষণাৎ।

নীচোহপ্যং পুলকো লেভে লুন্ধকো রতিমুচ্যতে॥

শ্রীপর্বতমুনি কহিলেন, হে দেবর্ষে তুমিই ধন্য, তোমার কৃপায় নীচ লুন্ধক ব্যাধ উৎপুলক হইয়া কৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে।

নারদ কহে,—“বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়?”

ব্যাধ কহে,—“যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায়।।

এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য্য নাই।

সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই।।

নারদ কহে—“এঁছে রহ, তুমি ভাগ্যবান।

এত বলি’ দুইজন হইলা অন্তর্দ্বান।।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ সাধু সঙ্গের কি অপূর্ব চমৎকারিতা তাহা আপনারা উপলব্ধি করুন। সহস্র সহস্র প্রাণী হত্যাকারী নিষ্ঠুর এক ব্যাধ সাধুসঙ্গ প্রভাবে সর্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, পরিত্যাগ করতঃ এক কোমল হৃদয়সম্পন্ন মহা বৈষ্ণবে পরিণত হইলেন। অতঃ সাধুসঙ্গ জয়যুক্ত হউক। জয়যুক্ত হউক।

* * *

সবারনাথ-জগন্নাথ

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

পুনরায় নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল—(কুর্গিশ করত) জাঁহাপনা! পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মোহন্ত আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। আপনার অনুমতি পেলে তিনি এখানে আসবেন, হুজুর।

আওরঙ্গজেব—আচ্ছা, তাঁকে এখানেই আসতে বলবে।

নগরপাল—জি-আজ্ঞে! (কুর্গিশ করত প্রস্থান)

(শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মোহন্ত দীননাথের প্রবেশ)

মোহন্ত—নমস্কার জাঁহাপনা! উড়িষ্যার রাজা গজপতি দিব্যসিংহদেব আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী।

আওরঙ্গজেব—কোন বিষয়ে কিরূপ অনুগ্রহ তিনি বাঞ্ছা করেন।

মোহন্ত—হুজুর! সমগ্র উড়িষ্যাবাসীর পক্ষ হ’তে আপনার সমীপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উৎসব চালাবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। (করযোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন)

আওরঙ্গজেব—প্রার্থনা নয় মোহন্তজী! এই রথযাত্রা উৎসব যুগ যুগ ধরে চালু আছে, তাই এই উৎসব চালু রাখার জন্য আপনাদের দাবী ন্যায্য ও যথার্থ। আপনাদের এই ন্যায্য দাবী হ’তে বঞ্চিত করে আমি মহাভুল ও মহাপাপ করেছি। শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং রথারোহণ পূর্বক ভক্তদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করত তা’দের নিত্যমঙ্গল করে থাকেন। রথযাত্রা উৎসব বন্ধ থাকলে শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করতে সমর্থ হ’বেন না এবং ইহাতে তাঁর রথযাত্রা-লীলা বাধা প্রাপ্ত হ’বে। তাই রথযাত্রা উৎসব

বন্ধের আদেশ জারী করে আমি ভগবচ্চরণে অর্থাৎ খোদার শ্রীচরণে মহা অপরাধ করেছি। এমতাবস্থায় আমি মহা-অপরাধী ও মহাপাপী। গতরাতে শ্রীজগন্নাথদেব আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে যে শিক্ষা প্রদান করেছেন ও যে নির্দেশ দিয়েছেন তা'তে আমার ভুল আমি ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। আপনার আগমনের পূর্বেই আমার এবস্থি মহাপরাধ ও মহাপাপ হ'তে নিষ্কৃতি পা'বার জন্য সুবেদারকে ডেকে এনে আমার মার্কণ্ডপুর তহশীলের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দান করেছি। আর তাঁর রথযাত্রা-উৎসব বন্ধের আদেশও প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আপনি এই সুসংবাদ রাজা গজপতিকে জানাবেন। অতি শীঘ্রই ভূমিদানের দলিল ও রথযাত্রা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের নথী সহ রথযাত্রা পুনরায় প্রচলনের তথা বহাল রাখার জন্য আমার অনুমতি-পত্র রাজা গজপতিকে প্রেরণ করব। আপনারা নিশ্চিত মনে অতি অতি বিপুল উৎসাহের সহিত রথাদি নির্মাণ করিয়ে শুভ রথযাত্রা-মহোৎসব পরমানন্দে সুসম্পন্ন করুন।

মোহন্ত—জাঁহাপনা, আজ আপনার চিত্তের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, তা' ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। লীলাময় শ্রীজগন্নাথদেব আপনার হৃদয়ে খোদারূপে প্রবেশ করে আপনার চিত্তের সকল কাঠিন্য দূরীভূত করে আপনাকে সরল উদার মহান্ বাদশাহে রূপান্তরিত করেছেন, নইলে আপনার চিত্তে এইরূপ কমণীয়তার উদয় হ'ত না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবকগণের প্রতি আপনার সদ্বিচ্ছা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীতে অল্লান হ'য়ে থাকবে। প্রার্থনা করি,—শ্রীভগবান্ আপনার আত্মার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন! আপনি মহাভাগ্যবান্, তাই স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দান করেছেন। এইপ্রসঙ্গে মহাজনের একটি গীতি স্মরণ হয়;—

“হরি হে!

ভ্রমিতে সংসার-বনে, কভু-দেব সংঘটনে,

কোনমতে কোন ভাগ্যবান্।

তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হএগ,

একবার ওহে ভগবান্।।

সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,

সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।

আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,

তা'রে দেয় সর্বোত্তম গতি।।”

জাঁহাপনা! এই আনন্দ-সংবাদ আমি উড়িয়া-রাজকে অবগত করিয়ে রথযাত্রার সুবন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি।

আওরঙ্গজেব—ধন্য মোহন্তজী! শ্রীজগন্নাথসেবকরূপে আপনারা ধন্য! সেবক-বৎসলরূপে শ্রীজগন্নাথদেবজী ধন্য! আপনারা যেমন শ্রীজগন্নাথদেবকে কোন দিন,

কোনক্ষণ ভুলে থাকেন না ; তেমনি ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবও তাঁর নিজজনকে কোনক্ষণ পরিত্যাগ করে থাকেন না। ধন্য আপনাদের শ্রীজগন্নাথ-চরণ-প্রীতি! আবার আসবেন।

মোহন্ত— (সানন্দে) (গীতি)

জয় সম্রাট আলমগীর!

প্রজা-কল্যাণ ব্রত হোক তব

হও তুমি মহাধীর!!

ভক্ত-চিত্ত আজি আনন্দে মত্ত

শঙ্কা হইল দূর!

সত্যই তুমি মহান্ উদার।

বাদশাহ বাহাদুর!!

জয় সম্রাট আলমগীর!

প্রজা-কল্যাণ ব্রত হোক তব

হও তুমি মহাধীর!!

নমস্কার জাঁহাপনা! (কুর্নিশ করত প্রস্থান)

আওরঙ্গজেব—হা আল্লা! হা জগন্নাথদেব! মৎকৃত দুষ্কর্মের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে ক্ষমা করুন!! (এইরূপ বলিতে বলিতে স্থান ত্যাগ করিলেন)

(৩য় দৃশ্য)

স্থান—পুরীধাম

(শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গনে রাজা গজপতির প্রবেশ)

দিব্যসিংহদেব—(নতজানু হ'য়ে শ্রীজগন্নাথ-চরণে প্রার্থনা রত) হে দয়াল প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব! তোমার ইচ্ছায় সর্বকর্ম্য সংঘটিত হয়; তোমার করুণা ব্যতীত কোন কার্যই হ'তে পারে না। প্রভো! তুমি অহৈতুকী কৃপা করে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দাও। মোহন্তজী তাঁর কাছে রথযাত্রা বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার এবং পুনরায় রথযাত্রা চালু করার জন্য অনুমতি যাজ্ঞা করতে গেছেন। আওরঙ্গজেব যেন আমাদের প্রতি সদয় হ'য়ে সেইরূপ যথোপযুক্ত অনুমতি প্রদান করেন—ইহাই প্রার্থনা!

(ইত্যবসরে মোহন্ত দীননাথের প্রবেশ)

মোহন্ত—(দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক) মহারাজ! পরম কৃপালু শ্রীজগন্নাথদেবের অপার ও অত্যাশ্চর্য কৃপায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত।

দিব্যসিংহদেব—(সানন্দে) কি বললেন মোহন্তজী! দুর্দ্ধর্ষ বাদশাহ আওরঙ্গজেব আমাদের প্রতি সদয় হ'য়ে পূর্বতন মত পরিবর্তন করেছেন? ইহা কি সত্য? নাকি আপনি রহস্য করছেন?

মোহন্ত—না মহারাজ, আমি রহস্য করি নি। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আমি আপনাকে সত্য বার্তাই বলছি। আওরঙ্গজেবের উদারতা ও মহত্ত্ব দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছি।

দিব্যসিংহদেব—(উৎকণ্ঠিত হয়ে) বলুন মোহন্তজী, বলুন—সেই প্রবল পরাক্রম-শালী, পরশ্রীকাতর, হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহের কি উদারতা ও মহত্ত্ব আপনি লক্ষ্য করেছেন?

মোহন্ত—বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার মূলীভূত কারণ পরম দয়াল শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবের অপার করুণা! ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব আওরঙ্গজেবকে স্বপ্নে দর্শন দান করে তাঁকে মন্দির-আক্রমণ বন্ধ করার জন্য ও রথযাত্রা-বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার সহ পুনরায় পূর্বের ন্যায় রথযাত্রা চালু করার জন্য অনুমতি দিবার নির্দেশ দিয়েছেন। তদবধি বাদশাহের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। বাদশাহের চিন্তে প্রতীতি হয়েছে যে, শ্রীজগন্নাথদেবই স্বয়ং খোদা।

দিব্যসিংহদেব—(আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে সানন্দে) এত বড় আনন্দ-সংবাদ আপনি বহন করে এনেছেন? আপনি ধন্য! শ্রীভগবানের রথযাত্রা চালু করার উদ্দেশ্যে আপনার দৌতা কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়েছে বলেই মনে করি।

মোহন্ত—মহারাজ! আরও আনন্দ-সংবাদ আছে। সম্রাট তাঁর স্বকৃত পাপ ও অপরাধ হ'তে অব্যাহতি পা'বার জন্য তাঁর মার্কণ্ডপুর তহশীলের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নামে দান করেছেন। আর মন্দির-আক্রমণ প্রত্যাহারের আদেশ ও রথযাত্রা পুনরায় চালু করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। খুব শীঘ্রই সেই সমস্ত দলিলাদি আপনার নিকট প্রেরণ করবেন।

দিব্যসিংহদেব—সতাই এ' বড়ই আনন্দ-সংবাদ!

(এমন সময় জনৈক ভক্তের প্রবেশ)

ভক্ত—(দণ্ডবৎ করত) মহারাজ! এইমাত্র আপনার দরবারে গোলকুণ্ডার নগরপাল এসেছিলেন। কিন্তু তথায় আপনার অনুপস্থিতিবশতঃ তিনি আপনার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রেরিত দলিলসমূহ আপনাকে প্রদান করার জন্য আমার হস্তে অর্পণ করে তিনি গোলকুণ্ডা অভিমুখে গমন করেছেন। এক্ষণে এই দলিলগুলি আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন!

(রাজার হস্তে দলিলগুলি অর্পণ করলেন ও রাজা তাহা গ্রহণ করলেন।)

দিব্যসিংহদেব—(দলিলসমূহ গ্রহণ পূর্বক মনে মনে পাঠ করত) সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত ভূমিদানের দলিল, তাঁর মন্দির আক্রমণ যেভাবে বন্ধ হ'য়েছিল, সে সম্বন্ধেও দলিলাদি এবং রথযাত্রা পুনরায় পূর্ববৎ চালু করার অনুমতি-পত্রও একত্রে গ্রথিত করে তিনি আমার নিকট পাঠিয়েছেন। প্রিয় মোহন্তজী, আপনি এতক্ষণ যে সুসংবাদ জানালেন, তা'রই লিখিত প্রমাণ আমার হস্তগত হ'ল। সম্রাট একটি তাম্রফলকে লিখিত বিবরণও পাঠিয়েছেন। সতাই সম্রাটের চিন্তের এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভগবানের কৃপার মহিমাই প্রকাশ পায়।

ভক্ত—মহারাজ! আমি সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি গীতি ও ‘শ্রীজগন্নাথষ্টকম্’—এর কিছু অংশ কীর্তন করে শুনিয়েছিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করে খুবই খুশী হ’য়েছিলেন। তখনই আমি তাঁর চিত্তে কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা ও উদারতা লক্ষ্য করেছি। তখন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, মন্দির-সংক্রান্ত তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নেবেন। খোদা তথা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অসম্ভবত্ব ভয়েও যদি তাঁর চিত্তবৃত্তির এবশ্পকার পরিবর্তন হয়, তবে তাহাও শুভ লক্ষণ।

দিব্যসিংহদেব—তুমি সম্রাটের সমক্ষে শ্রীভগবানের কিছু কথামৃত কীর্তন করেছ শুনে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি। ভগবানের কথামৃত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পান করলে হৃদয় অবশ্যই পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। সম্রাট বড়ই সৌভাগ্যবান। তা’ না হ’লে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব কি তা’কে কৃপা করে স্বপ্নে দর্শন দেন? এক্ষণে উপলব্ধি হয়, সম্রাটের চিত্তের এই আকস্মিক পরিবর্তনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছা ও কৃপা বিদ্যমান। শ্রীভগবানের অহৈতুকী দয়ায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

মোহন্ত—মহারাজ! বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে আমরা সকলে সত্যই আনন্দিত। অতএব, আপনার আনুগত্যে এ’ বৎসর রথযাত্রা উৎসব বিপুল উদ্যমে নবভাবে কীর্তনাদি সহ চালু করার ব্যবস্থা করার জন্য আপনার অনুমতি যাজ্ঞা করি।

দিব্যসিংহদেব—এ শুভ রথযাত্রা উৎসব সত্ত্বর নিবির্বয়ে সম্পাদনের জন্য আপনাকেই বিশেষ ভার অর্পণ করছি। মোহন্তজী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে অত্র মন্দিরে বিরাজিত আছেন—ইহাই নীলাচল ;—এই নীলাচল দ্বারকা-স্বরূপ। তিনি যেখানে রথে শুভবিজয় করেন, তাহা সুন্দরাচল—বৃন্দাবনস্বরূপ। শ্রীজগন্নাথদেবের ঐশ্বর্য্যলীলা-পীঠ নীলাচল হ’তে মাধুর্য্যলীলা-পীঠ সুন্দরাচল যাত্রা অর্থাৎ দ্বারকা হ’তে বৃন্দাবন যাত্রার লীলা,—ইহাই রথযাত্রা নামে খ্যাত। সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে ব্রজের গোপীরা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন; তিস্ত তাহাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হ’তে না পারায় শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আনার জন্য যত্ন করেছিলেন। নীলাচলে শ্রীরথযাত্রা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবারই প্রদর্শনী। রথযাত্রাকালে গোপীগণের ভাব—“কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজে যাই এ’ ভাব অন্তর”। শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রাজী রথে আরোহণ করলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আনন্দ কোলাহলে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে ও ভক্তহৃদয়ে অপূর্ব শিহরণ সৃষ্টি হয়। এ’ বৎসর রথের সাজ-সজ্জা এমনভাবে সংযোজন ও পরিবর্দ্ধন করুন, যা’তে রথের অবর্ণনীয় উজ্জ্বল শোভাদর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী ভক্ত চমৎকৃত, পুলকিত ও আকৃষ্ট হয়। সুন্দরাচলে যে মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করেন,—তা’র নাম—‘গুণ্ডিচামন্দির’। শ্রীরথযাত্রার পূর্বদিন শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের সর্ব্বাংশ সম্মার্জ্জন ও ধৌত করা একান্ত প্রয়োজন হয়। অন্য্যভিলাষাদি চেষ্টা প্রভৃতি আবর্জ্জনাশ্বরূপ অনর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ে বিদ্যমান থাকলে হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীভগবান্কে বসানো যায় না। সেই কারণে সর্ব্বাঙ্গে

গুণ্ডিচামন্দির মার্জনাতির ব্যবস্থা করুন। তৎপরে রথযাত্রার সুবন্দোবস্ত করুন!

“বিশ্বস্তর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে।

আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে।।”

এই রথযাত্রা-উৎসবে যোগদানের জন্য উড়িষ্যার সকল শ্রেণীর জনগণকে আমন্ত্রণ ও আহ্বান জানান। মঠেঃ আর বিলম্ব নয়; যত শীঘ্র সম্ভব রথযাত্রার সমুদয় আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হউন।

“শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুট-রত্ন হে।

দারুব্রহ্মাণ্ ঘনশ্যাম প্রসাদ পুরুষোত্তম।।”

মোহন্ত—মহারাজ! আপনার আদেশ আমরা যথাযথ মান্য করে রথযাত্রা-উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রয়াসী হ'ব।

দিব্যসিংহদেব—চলুন, আপনাদের সাথে আমিও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় সর্বদা যোগদান করত তাঁ'র সেবাকার্য্যে নিরত থাক্‌ব।

(ইত্যবসরে জনৈকভক্তের 'উৎকল গীতি' গাইতে গাইতে প্রবেশ এবং তৎসহ রাজা ও মোহন্তজীও প্রেমানন্দে নৃত্য করতে করতে গাইতে লাগলেন।)

(গীতি)

“মণিমা শুনিমা হেউ গরীবর ডাক।

নিরক্ষ জনকু রক্ষ পক্ষজমুখ।। (মণি- - - -)

কৃপাসাগর কাঁহিকি, সো বেড়কু গল শুখি।

জানিলি মো কস্ম-বাংক নুহে শড়খ।।

আতঙ্ক নাশন বাণা, নো শুন ভৃত্য বেদনা।

এবে হেইযিব মনা কেদেব ডাক।।

দাস এবে নাশযিব, ক্ষিত্তিরে অকীর্ত্তি হেব,

কীরতি চন্দ্রে লগি যিব কলঙ্ক।।

কহে সদানন্দ ছার, নাহি আন প্রতিকার,

এ দীন অবস্থা মোর নেত্রে ন দেখ।।”

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

(সকলে একত্রে উক্ত গীতি গাইতে গাইতে প্রস্থান)

(সমাপ্ত)

জগতে একটী মাত্র ধর্ম্ম; তাহা কেবলমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম;

অন্য ধর্ম্ম ছল, তর্ক ও বিবাদে পরিপূর্ণ।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

“সেবা”

ভগবানের সেবা কি প্রকার করিলে ভগবান্ বশীভূত হন তাহার উদাহরণ আমরা ভক্তগণের জীবনে দেখিতে পাই। সেইপ্রকার ভক্তের পূত জীবন চরিত কিঞ্চিৎমাত্র আশ্বাদন করিবার প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

(১)

রাঘব পণ্ডিতের ভগিনীর নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় এমনই উৎসর্গীতাপ্রাণা যে প্রভুর অহৈতুকী করুণা বারি তাঁহার উপর অফুরন্তভাবে বর্ষিত হইত। মহাপ্রভু নীলাচলে। মহাপ্রভু যাহা যাহা পছন্দ করেন, প্রতি বৎসর দময়ন্তী সেই সকল ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া সারা বৎসরের সেবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠাইতেন। মহাপ্রভু সেই সকল খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত প্রীতি সহকারে আশ্বাদন করিয়া প্রচুর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। কারণ দময়ন্তীর যে প্রভুর প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, স্নেহ, প্রীতি। তাহাতেই প্রভু বশীভূত। তিনি পাঠাইতেন— আম কাসুন্দি, আমতেলের আচার, তাহাতে পাটপাতা শুকনা গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া দিয়াছেন। ঝাল কাসুন্দি, আদা কাসুন্দি, প্রভৃতি কতরকমের আচার। মহাপ্রভু দময়ন্তীর প্রেরিত এই আচার আশ্বাদন করিয়া প্রেমে বিভোর। তিনি বলিলেন—“আহা! এমন সুন্দর জিনিষ ত’ আমি কোন দিন খাই নাই।” ভগবান্ প্রেমবশ। কেবল প্রীতির বশ চৈতন্য গৌসাই।

এইজন্যই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্য প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যপহতমশামি প্রযতাত্মনঃ।।” (গীঃ ৯/২৬)

ভগবান্ বলিলেন—প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা যাহা দেন তাহা আমি অত্যন্ত আদর পূর্বক আহাৰ করি। অর্থাৎ পরম কৃপানিদান পরমেশ্বর ভগবান্ সেই বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তৎসমস্ত অতিতুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। তিনি সর্বৈশ্বর, সর্বাত্মা ও সর্বত্র বিরাজিত। তাঁহার কোন অভাব নাই। তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তি ও প্রীতি প্রভাবে কৃপাপরবশ হইয়া তৎপ্রদত্ত সামান্য দ্রব্যসামগ্রীও সাদরে গ্রহণ ও উপভোগ করেন। ভক্তের ভক্তিই তাঁহার দ্রব্য গ্রহণ স্বীকারের কারণ। মূলে—“ভক্ত্য প্রযচ্ছতি” অর্থাৎ ভক্তিসহকারে প্রদান করেন—এইকথা বলিয়া পুনরায় “ভক্ত্যপহতম্” অর্থাৎ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উপহার এইকথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভক্তের উপহার তাঁহার গ্রহণীয় নহে। অভক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা ঋষি, তপস্বীই হউন, তাঁহার প্রদত্ত উপহার কদাপি ভগবানের গ্রহণ স্বীকারের কারণ হইতে পারে না। কেবল একান্ত ভগবদনুরক্তির সহিত নিষ্কামভাবে প্রদত্ত সামান্য বস্তুও তিনি সাদরে গ্রহণ ও উপভোগ করেন।

যাহাহউক, মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর এমনিই আপনবোধ 'যে, তিনি মনে করিলেন যদি আচার প্রভৃতি খাইয়া প্রভুর পেটের গোলমাল হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাতে পাটের পাতা গুঁড়া করিয়া দিয়াছেন। কারণ উহা পেটের অসুখের প্রতিষেধক। দময়ন্তীর এইপ্রকার নিৰ্মল স্নেহই প্রভুকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল। রাঘবের ঝালিতে দময়ন্তীর দ্রব্য সম্ভার বহুবিধ। ধনের লাড়ু, মৌরির লাড়ু, কুল-শুকনা করিয়া তাহার লাড়ু, নারিকেল লাড়ু—তাহাতে আবার কর্পূর, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি দিয়া সুস্বাদু করিয়াছেন। ভাল সরুধানের চিড়াভাজা, খইএর মুড়কি, ঘি দিয়া কলাইভাজা—এইরূপ অনেক প্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন। দময়ন্তী এমনভাবে পাঠাইলেন যে, সমগ্রবৎসর যেন প্রভুর সেবা হয়। খাবার দ্রব্য ছাড়াও দাঁত মাজার জন্য তিনি গঙ্গামৃত্তিকা ছাঁকিয়া প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। আরও কতপ্রকার যে দ্রব্য পাঠাইলেন তাহার হিসাব নাই। তিনি শ্রীতিভরে বহু দ্রব্য সম্ভার সহ তৈরী করিলেন—রাঘবের ঝালি। সেই রাঘবের ঝালি এমন ভারি হইল যে তিনজন বাহক উহা বহিয়া লইবার জন্য গেলেন। আর তাহার রক্ষক হইলেন—পরমভক্ত মকরধ্বজ কর! এইভাবে প্রতিবৎসর দময়ন্তী মহাপ্রভুর সেবা করিয়া যাইতেন। তাহার ভক্তিতে, সেবায়, আত্মনিবেদনে মহাপ্রভু বশীভূত। এই সেবা পরায়ণা দময়ন্তীর একটু খানি করুণা যদি আমরা পাই তবে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

(২)

শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক উৎসব হইতেছে। তাহারা পাঁচ ভাই,—নলিনী পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি পণ্ডিত। শ্রীবাসের চারি ভাই, পত্নী মালিনীদেবী এবং ভ্রাতৃবধূগণ সকলেই বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত। গৃহের দাসী দুঃখীরও অবসর নাই। তাহার কাজ ছিল—গঙ্গা হইতে গঙ্গাজল আনিবার। সে কেবল মাথায় করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া কলসি কলসি ভরিয়া রাখিতেছে। এই জল বহরূপ সেবাকার্য্য পাইয়া দুঃখীর এমন আনন্দ ও সুখ যে, সে আত্মহারা। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুকে ভালভাবে দর্শন করিবারও তাহার সময় নাই। তাহার আর সময় কোথায়? শ্রীবাসের গৃহে কত ভক্তের সমাগম। কত গঙ্গাজলের দরকার। সে ভাবিল—এই গঙ্গাজল আনিই আমার সেবা। অশ্রুসিক্ত নয়নে ভাবে বিভোর হইয়া দুঃখী ক্ষণেকের জন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিল। তদদর্শনে তাহার নয়ন সফল হইয়া গেল। বেশীক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিবার তাহার সময় কোথায়? সে আবার কলসি কলসি গঙ্গাজল বহিয়া আনিতে লাগিল। সেবাকার্য্যে সে বিভোর। তাহার এই অকৃত্রিম হৃদিক সেবানিষ্ঠা মহাপ্রভুর দৃষ্টি এড়াইল না। প্রভু—শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এত গঙ্গাজল কে বহিয়া আনিতেছে?” শ্রীবাস বলিলেন—“আমার গৃহের দাসী দুঃখী”। মহাপ্রভু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“আরে আরে ইহার নাম কে দুঃখী দিল। যে এইরূপ অমল হৃদয় সেবা-পরায়ণা—তাহার

নাম কি কোন দিন দুঃখী হয়? ইহার ন্যায় সুখী আর জগতে কে আছে। তোমরা আর কোনও দিন ইহাকে দুঃখী বলিয়া ডাকিও না। আজ হইতে ইহার নাম হইল—“সুখী”। ইহার সকল দুঃখই দূরে অপসারিত হইল। তোমরা ইহাকে ‘সুখী’ বলিয়া ডাকিও। দুঃখীর প্রতি প্রভুর এইপ্রকার করুণা দর্শন করিয়া সমস্ত ভক্তবৃন্দ পরম হর্ষভরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। দুঃখীর আনন্দ দেখে কে? তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বারবার করিয়া বহিতে লাগিল। সে অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিজ্ঞাপন করিল। তাহার সেবা নিষ্ঠাই তাহাকে প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত করাইল। দুঃখীর প্রতি মহাপ্রভুর এমন কৃপা হইল যে, যাহা কৃষ্ণসেবা চেষ্টা হীন সন্ন্যাস বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কোন কালেই সম্ভব নয়। “প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই। মাথা মুড়াইলে যম দণ্ড না এড়াই।” দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল। বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।২২)

সুতরাং দাসী হইয়াও দুঃখী সেবা দ্বারা যে প্রকার মহাপ্রভুর করুণা লাভ করিলেন—মহামহোপাধ্যায় অভিমানী পণ্ডিতগণের ভাগ্যে তাহা কোন কালে ঘটিবার নহে। এই সেবা পরায়ণা দুঃখীর কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। তাহার কৃপা হইলে মহাপ্রভুর করুণা লাভ সম্ভব হইবে।

(৩)

নবদ্বীপবাসী শ্রীশুক্লাশ্বর চক্রবর্তী অত্যন্ত গরীব ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করিয়া কোনপ্রকারে তাঁহার দিনাতিপাত হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ নাই। সর্বক্ষণই হস্তচিহ্নে তিনি কৃষ্ণনামে বিভোর। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরেন। গৃহে ফিরিয়া স্নান-আহ্নিকাদি সমাপনান্তে কৃষ্ণের ভোগ-রন্ধন সেবায় নিযুক্ত হন। রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই অন্ন পরমতৃপ্তির সহিত ভগবান গ্রহণ করেন। সেই অন্নামৃত ভগবৎপ্রসাদ শুক্লাশ্বর সেবা করিয়া সকল দুঃখই ভুলিয়া যান এবং রাধাকৃষ্ণের গুণগানে মত্ত হইয়া পড়েন। দারিদ্র্য দুঃখ তাঁহাকে কোন মতেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ—তিনি যে কৃষ্ণনাম ধনে ধনী। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহের সন্নিকটেই শুক্লাশ্বরের বাস। শুক্লাশ্বরকে সর্বদা কৃষ্ণনামে বিভোর দেখিয়া শচীনন্দন গৌরহরি তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে খুবই ভালবাসিতেন। একদিন শুক্লাশ্বর ঝুলি কাঁধে করিয়া ভিক্ষা হইতে ফিরিতেছেন। ভিক্ষায় কিছু খুদ-কুঁড়া মিশ্রিত চাউল পাইয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎহইলে প্রভু তাঁহাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন এবং হঠাৎ আচম্বিতে তাঁহার ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া মুষ্টি মুষ্টি চাউল লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। শুক্লাশ্বর কাঁদিয়া উঠিলেন। গৌরহরির হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—“ছি, ছি, ঠাকুর! আমার এই অপরিষ্কৃত ভিক্ষার চাউল কি এমন করিয়া খাইতে হয়। ইহার মধ্যে কত কাঁকর, ধূলি, খুদ রহিয়াছে। ইহা তোমার খাওয়ার যোগ্য নয়। আর খাইও না।” মহাপ্রভু সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে

তাকইয়া কহিলেন—“শুক্লাশ্বর! এমন সুন্দর খাদ্য আমি আর কোথায় পাইব? জন্মে জন্মে তুমি আমার দাস। দ্বারকাতেও ত’ আমি তোমার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য খুদ-কুঁড়া জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছি। তোমার সেবা ও প্রেমে আমি চিরদিনই বশীভূত। আমি সর্বসময় তোমার নিকটেই থাকি। তুমি যেখানে যাও আমিও সেখানে যাই। তোমার হৃদয়ই আমার বিশ্রামস্থল। তুমি আমার প্রাণস্বরূপ। আজ আমি তোমাকে প্রেমভক্তি দান করিলাম।” প্রভুর কৃপায় শুক্লাশ্বরের জীবন সার্থক হইয়া গেল।

এই শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভুর নিত্যই লীলা-সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু গয়া হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি সমস্ত ভক্তবৃন্দকে এই শুক্লাশ্বরের গৃহেই আসিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের সময়, সন্ধ্যায় কীর্তনের আসরে, নগর সঙ্কীৰ্তনের সময়—সর্বসময়েই প্রভু শুক্লাশ্বরকে সঙ্গে রাখিয়াছেন। তাঁহার সেবায় প্রভু এমনি বশীভূত। একদিন শুক্লাশ্বরকে ডাকিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—“শুক্লাশ্বর! আমি আজ তোমার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। তুমি নিজে রান্না করিয়া কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিবে। সেই প্রসাদান্ন আমি আজ পাইব।” শুক্লাশ্বর মহাচিন্তায় পড়িলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলিলেন—“এ’কি কথা প্রভু! আমি একজন পতিত অধম, অপবিত্র, দীন হীন দরিদ্র ভিক্ষুক। আমার কিই বা আছে যে আমি তোমাকে খাওয়াইব।” প্রভু বলিলেন—“যাও, যাও, আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাই না। শীঘ্র গিয়া রন্ধন কর, আমি যাইতেছি।” শুক্লাশ্বর কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তবৃন্দের নিকট গিয়া সমূহ নিবেদন করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বলিলেন—“শুক্লাশ্বর! ইহাত খুবই আনন্দের বিষয়। প্রভু যখন নিজেই তোমার গৃহে তোমার হস্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিবেন-ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—তখন আর চিন্তার কি আছে। তবে তুমি যখন ইতঃস্তত করিতেছ, তখন আলগোছে রান্না করিও। ভক্তের দ্রব্যই ত’ প্রভু চাহিয়া খান। তুমি ভোগ রান্না কর। তোমার ভাগ্যের সীমা নাই।”

শুক্লাশ্বর গৃহে গিয়া ভিক্ষার চাউল ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিলেন এবং সেই চাউলের সঙ্গে গৰ্ভখোড় দিয়া প্রেমভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ লাগাইলেন। মধ্যাহ্নকালে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আহারে বসিলেন। খাইতে খাইতে শুক্লাশ্বরের রান্নার প্রশংসা করিয়া প্রভু বলিলেন—“আহা! এমন সুন্দর অন্ন ও গৰ্ভখোড় আর আমি কোনওদিন খাই নাই। শুক্লাশ্বর! তুমি কেমন করিয়া এমন সুন্দর রান্না করিলে।” এখানে দেখিবার বিষয় যে—ধনের প্রয়োজন নাই, আয়োজনের আবশ্যিকতা নাই, সহায়-সম্পদের অপেক্ষা নাই—সহজেই মনোহৰীষ্টি পূর্ণ হইবে। এমন অনায়াসসাধ্য প্রীতিপ্রদ, পরম ফলদায়ক, সুখ সন্তোষময় ব্যবস্থা আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। ভক্তের প্রতি-ভক্তবৎসল ভগবানের কি অপারিসীম দয়া। ভক্তিসহকারে যিনি যাহাই কেন তাঁহাকে অর্পণ করুন না, তিনি

তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ ও ভোজন করেন। ক্ষুৎ-পিপাসা বিবর্জিত হইলেও ভক্তের প্রীতি হেতু তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসার উদ্রেক হয় এবং তখন তিনি সেই প্রীতিপ্রদ তুচ্ছ সামগ্রীও যথোচিত ভাবে গ্রহণ করেন। এমন অনায়াস সাধ্য, প্রীতিপ্রদ পরম ফল দায়ক সুখ সন্তোষময় ব্যবস্থা আর কিছুতেই কল্পনা করা যাইতে পারে না। এই শুক্লাশ্বরের কি ভাগ্য। ভগবান গৌরহরি তাঁহার প্রতি কতই করুণা করিলেন। ভগবানের সেবার দ্বারাই তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়। এই শুক্লাশ্বরই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “জয় শ্রীশুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারী কি জয়”। —শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী (ক্রমশঃ)

বেঁচে মরা

এ কি অন্যায় কথা! আমার নাম রাখা হবে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে! যে-নামে বিশ্বময় নরনারী আমাকে ডাকবে, যে নাম আমাকে কত শত বার লিখতে হবে, যে-নামে কত নরনারী মুচ্ছা যাবে—সেই নামকরণ করার সময় আমার অনুমতি নেওয়া হয়নি কেন? এ কি অন্যায় কথা!

আচ্ছা না হয় অনুমতি না-ই নেওয়া হলো, অত ভাল ভাল নাম থাকতে এমন একটা বিচ্ছিরি নাম বেছে-গুছে রাখা হলো কেন? বাবা মা বড় আদর করে নাম রেখেছিলেন—‘অক্ষয়কুমার’। এখন ত’ আমার প্রাণান্ত—নানা দিক দিয়ে! কেউ ত’ পুরো নামটা উচ্চারণ করেই না—যার যা খুসী তাই বলে ডাকে। পীরিত করে কেউ বলে—‘অখু’, রেগে বলে ‘অক্খা’, আর যদি কেহ শুদ্ধ করে উচ্চারণ করেন, তবে আমি দাঁড়াই—‘অক্শয়’। জ্বালাতন আর কি? অফিসে সেই ছোট সাহেব বলেন—‘য়্যাক্শয়’, বড় সাহেবে বলেন—‘উক্খোয়’। বল আমি আর যাই কোথায়?

আচ্ছা, না হয় ডাকাডাকিতেই লোকে এই প্রকার দৌরাভ্য করে করুক, কিন্তু বাবা মা কোন্ আক্কেলে আমার এই নাম রেখেছিলেন? আমি কিনা ‘অক্ষয়’ আবার ‘কুমার’! যদি আমাকে অত সাধ করে ‘অক্ষয়কুমার’ করবার ইচ্ছা ছিল, তবে যৌবনের রেখাপাত হতে না হতেই আমাকে কুমারীগণের হাটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? আর আজ যে আমাকে ক্ষয়রোগ যক্ষ্মা ধরেছে, তার ব্যবস্থা ষোলোআনা করেছিলেন কেন? হায় রে, কোথায় আমার ‘অক্ষয়কুমারের’ সেই ক্ষয়হীনতা এবং কৌমার? তাহলে ক্ষয়যুক্ত অকুমারের নামই কি ‘অক্ষয়কুমার’? আজ মাতাপিতার সাধের অক্ষয়কুমারের এই দশা কে দেখবে? ওগো পিতা! ওগো মাতা! তোমরা আজ তোমাদের অক্ষয়কুমারের এই ক্ষয়ের সময় কোথায় রইলে? একবার এসে দেখে যাও, তোমাদের বোকামিটা কত দূর!!

এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে কাসির জোড় এত বাড়িল যে, অক্ষয়কুমার কাসিতে কাসিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। অক্ষয়কুমারের কৌমারের পরিচয়—এক পত্নী,

তিনপুত্র, ও দুই কন্যা; তাহারা চতুর্দশার্শে উপবিষ্ট। সকলে ভীত সম্ভ্রান্ত হইয়া প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত। অক্ষয়কুমারের চক্ষু নিমীলিত—দেহ অচেতনপ্রায়; বহিজ্জগতের কোন উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে না। পত্নীর সেবা, পুত্রের শুশ্রূষা বুঝিবার সামর্থ্য আর অক্ষয়কুমারের নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দেখিতে পাইল (কোন নৈত্রে তাহা সেই জানে)—তাঁহার সম্মুখে এক দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্তি দণ্ডায়মান। গৈরিকবসন, হস্তে ত্রিদণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক, দ্বাদশতিলকে দেহ সুশোভিত—সঙ্গে কতিপয় ব্রহ্মচারী। সকলের বদনে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্তিত হইতেছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অক্ষয়কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মচারিগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অক্ষয়কুমারের উত্তণ্ড ললাটদেশ মহারাজের হস্তস্পর্শে সুশীতল হইয়া উঠিল এবং তাহার সুমধুর কীর্তনে অক্ষয়ের বধিরপ্রায় কর্ণকূহর যেন ভরপুর হইয়া গেল—

“তন্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদাশ্বপুভির্বিদধনমস্তে জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।”

“গুরু ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দেবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।।”

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে চাহিল—যেন স্বপ্নোথিতের ন্যায়। যেন সে ইহজগতে নাই—শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য চাহিয়া রহিল, আর কোটরগত নিশ্চল চক্ষুদুইটা যেন উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। চক্ষুকোণ হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ দেখিয়া অবাক্।

এমনসময় কক্ষস্থিত সকলের চিন্তা স্তব্ধ করিয়া কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অক্ষয়কুমার দেখিল—সেই সন্ন্যাসী, সেই ব্রহ্মচারিগণ। তাহার আত্মীয়গণ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যথোচিত সম্ভ্রম ও আদরে তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন। অক্ষয়ের কর্ণে সেই শ্লোক ধ্বনিত হইতেছিল। এক্ষণে সেই শ্লোক যেন মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয়কুমার অতি দুর্বল—উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু সেই সময় কি এক অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে উঠিয়া বসিল এবং ভিক্ষুকগণকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী মহারাজ তখন আবার সেই শ্লোক কীর্তন করিয়া কহিলেন,—অক্ষয়কুমার! তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। তোমার বড়ই শুভদিন উপস্থিত। এমন সৌভাগ্য অতি অল্প জীবের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। কেন না, জীব আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিবার কালে উহা যে নিজের ভোগপ্রবৃত্তিরই ফল, তাহা ভুলিয়া যায়। তদুপরি আবার সেই দুর্ভোগের জন্য ভগবানের প্রতিই দোষারোপ করিয়া সে অপরাধী হইয়া পড়ে। তুমি আজ বুদ্ধিতে পারিয়াছ—তোমার ব্যাধি বা এই ক্লেশ তোমার নিজের কৃত; ইহার ফলভোগ

তোমাকেই করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মানুসারে যে ফল প্রদান করেন— তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার ত্রিতাপ মুক্ত করিবার জন্য, তোমার ভোগবুদ্ধির সম্যক বিনাশের জন্য। আজ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমাকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদি সকল প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে—এক্ষণেই তাহা হইতে পারে। ইহাদের সহিত তোমার নিত্যসম্বন্ধ নাই—ইহারা তোমার ব্যাধির ক্লেশের বিন্দুমাত্র অংশ লইতে পারেন না—বা কেহই তোমার মৃত্যু রোধ করিতে পারে না। সুতরাং যদি নিত্যকালের জন্য সুস্থ হইতে চাও—যদি নিত্য বাসস্থানে নিত্যকাল ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নিত্য আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে চাও, তবে নিত্য সুস্থ, নিত্য বান্ধব ও নিত্য আত্মীয়ের সন্ধান লও—তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর।

একই কথায় অক্ষয়কুমারের তৃষিত কর্ণে সুখার লহরী এবং অন্যদিকে তাহার স্ত্রী-কন্যাগণের কণবিবরে বিষের তীব্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অক্ষয়ের অপ্রাকৃত চক্ষু উন্মীলিত হইবার উপক্রম হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনরাশি স্নান হইতে স্নানতর হইতে লাগিল। পূর্বগগনে অরুণের আভা উদিত হইতে থাকিলে যেমন চোর-ডাকাতদের বিষাদ কিন্তু সজ্জনগণের আনন্দ হইতে থাকে, তদ্রূপ সন্ন্যাসীর উপদেশ-রাশি অক্ষয়কুমারের নিকট অত্যন্ত প্রীতিকর ও তাহার স্ত্রীকন্যা গণের নিকট হৃদয়বিদারক বোধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় বুঝিয়াছে—মৃত্যু কি? যে কোন মুহূর্ত্তে এখন সে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? “হায় হায়! জীবন ভরিয়া একি করিলাম! বালুকারাশিতে জলসিঞ্চন করিলাম! অনিত্য, অপ্রিয় বস্তুগুলিকে এতদিন নিত্য ও প্রিয়জ্ঞান করিয়া এই অমূল্য জীবন বৃথাই কাটাইলাম! এখন উপায় কি? যমরাজ যে আমাকে লইয়া টানটানি করিতেছেন!” এই ভাবিয়া অক্ষয়কুমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে প্রণত হইয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—“ঠাকুর, আমার উপায় করুন। দেহ ত’ আর থাকিল না। যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া আছি, সেই সময়টুকু যাহাতে এই ভুলে না কাটাই, কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।”

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—“অক্ষয়কুমার! ভগবানের অশেষ কৃপায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, বাঁচা ও মরা কি? তুমি বাস্তবিকই বাঁচিয়া নও। তুমি মৃত। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে জান, তুমি যক্ষ্মায় দেহত্যাগ করিয়া তোমার স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাগণকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তুমি অক্ষয়কুমার-রূপে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির পতি, ঐ পুরুষমূর্ত্তির পিতা—এই জাতীয় অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। আজ তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তোমার ঐ ভোগের মূর্ত্তিগুলিকে জানাও তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তুমি এইদেহ ত্যাগ করিলে তোমার সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ, আজ তোমার দেহ থাকিতেও তোমার সহিত ইহাদের সেই সম্বন্ধ। আজ তুমি মৃত্যুশয্যাশায়ী বলিয়া এই নিদারুণ সত্যটি

উপলব্ধি করা সহজে সম্ভব হইবে। এই মর্ত্যজগতে মরণশীল কতগুলি প্রাণীর সহিত, নশ্বর কতগুলি বস্তুর সহিত বাঁচিয়া থাকার অর্থই মৃত্যুকে আহ্বান করা। সেই মৃত্যুই এখন তোমার দ্বারদেশে উপস্থিত।

কিন্তু কেহই মরিতে চাহে না—সকলেই বাঁচিতে চাহে। চাহিলে কি হইবে—মরণশীল, নশ্বর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কি বাঁচিতে পারা যায়, ‘অমৃত’ হওয়া যায়? যদি বাঁচিতে চাহ, তবে ‘অমৃতের’ আশ্রয় লহ। সেই ‘অমৃত’ কি—জানিতে চাহ? তবে বলি, প্রেমময় ভগবানই কেবল ‘অমৃত’—তাঁহার শ্রীনাম ‘অমৃত’—তাঁহার প্রতি অকপট অহৈতুকী ভক্তি ‘অমৃত’—তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণ ‘অমৃত’। তুমি অমৃতের আশ্রয় লইয়া অমৃত হও।

তোমার এই ক্ষয়শীল দেহের মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু নূতন করিয়া আর মরণশীল জীবন বরণ করিয়া লইও না। এই জগতে যতদিন আছ, যতক্ষণ আছ, সেই অমৃতকেই পূর্ণরূপে সম্যকরূপে আশ্রয় কর, আর, জাগতিক সমস্ত কিছুর সহিত নিজেকে বাঁচিয়াও মৃত বলিয়া জান—তাহা হইলে অনন্তজীবন তুমি বাঁচিয়া রহিবে।

—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়



অভাব ও স্বভাব

‘অভাবে’ স্বভাব যায়,	‘স্বভাবে’ আনন্দ হয়,
নাহি জানি মায়ার কারণে।	
লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরি,	বন্ধদশা ভোগ করি,
ঘুরিতেছি মরত ভুবনে॥ ১॥	
জড়িতে আনন্দ পাই,	কিন্তু তাহা বৃথা, ভাই,
তথাপি তাহাতে মন মজে।	
সদাই হইল ভ্রম,	ত্রিগুণ বাড়িল ক্রম,
সর্বকালে মায়াদেবী ভজে॥ ২॥	
কৃষ্ণ-দাস্য গেল ভুলি’,	বিষয়েতে সদা কেলি,
ভোক্তা অভিমানে হয় হত।	
জীব কভু ভোক্তা নয়,	কৃষ্ণদাস্য সত্য হয়,
তাহা ভুলি বন্ধ অবিরত॥ ৩॥	
এভব সিদ্ধুর জলে,	কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
বাসনার নাহি পায় অন্ত।	

কৰ্মফলসে বদ্ধ হয়, মরণেতে সদা ভয়,
 আশাপাশে মন মোর হত ॥ ৪ ॥
 কাম, ক্রোধ, লোভ দ্বারে, ত্রিবিধ তাপেতে জারে,
 রিপু সবে করয়ে পীড়ন।
 রিপুর পীড়ন ছাড়ি, ভোগবাঞ্ছা কিসে এড়ি,
 মনে জাগে মুক্তির চিস্তন ॥ ৫ ॥
 মায়া মোরে নাহি ছাড়ে, মিথ্যা সুখ দিয়া ফিরে,
 ভুক্তি মুক্তি যাচে অবিরত।
 মায়াদত্ত ভোগ পাঞা, দাস্য-ভাব ছাড়ে হিয়া,
 প্রতিষ্ঠা পিশাচী করে হত ॥ ৬ ॥
 ভুক্তি মুক্তি যোগ ছাড়ি', শুদ্ধ ভক্তিপথ ধরি,
 স্বভাবের করয়ে সাধন।
 সাধিতে সাধিতে তার, ঘুচে মায়া-অন্ধকার,
 হৃদে হয় ভক্তির আসন ॥ ৭ ॥
 সাধনের ক্রম ধরি', ভজে পাদপদ্ম হরি,
 আত্মভাব হয় উদ্বোধন।
 উপাধি রহিত হ'লে, চিত্ত শুদ্ধি তা'র মিলে,
 ক্রমে পায় ভক্তি মহাধন ॥ ৮ ॥
 আনন্দে সে অনুক্ষণ, থাকে তার তনু মন,
 সেবামগ্ন তাহার জীবন।
 হরি-গুরু-বৈষ্ণবেতে, শুদ্ধারতি হয় তাতে,
 সদা করে আত্মনিবেদন ॥ ৯ ॥
 সকল অভাব যায়, স্বভাবে আনন্দ পায়,
 অসদ্ ভাব নাহি পায় স্থান।
 সর্বকাল নামানন্দে, সেবা করে ভক্তবৃন্দে,
 নিত্যানন্দ পায় অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥

—প্রকাশক কর্তৃক সংগৃহীত

যাঁহার অমন্দোদয় দয়া হেলায় স্তম্ভীকৃত ত্রিতাপ আবর্জনারূপে
 ধুলির ন্যায় অনায়াসে উড়াইয়া দেয়, সেই দয়ানিধির
 দয়াই আমাদের প্রার্থনীয়।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ম। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য ॥	অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে যেই জন। হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
---	--

১৯ পদ্মনাভ, বাসুদেব, ৫১৮ শ্রীগৌরান্দ
৫৬শ বর্ষ } ৩০ আশ্বিন, রবিবার, ১৪১১, ইং ১৭/৯/২০০৪ { অষ্টম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীষড়্গোশ্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য-বিরচিতম্]

কৃষ্ণেৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতান্তোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মলসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃ পাভরৌ ভুবি ভুবোভারাবহস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুমুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, রঘুনাথদাস, শ্রীজীব এবং গোপালভট্ট-
নামক ষড়্গোশ্বামিদিগের বন্দনা করি,—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির
কীর্তন, গান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে নৃত্যপরায়ণ থাকিতেন, প্রেমামৃতির সমুদ্রস্বরূপ
ছিলেন; বিদ্বান্-অবিদ্বান্ জনগণের প্রিয় ছিলেন এবং প্রত্যেকের প্রিয়কার্য্য করিতেন,
যাঁহারা মাৎসর্য্যরহিত, সর্বলোক পূজিত ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র
ছিলেন এবং ভূতলে ভক্তিরস বিস্তারপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্থামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা বহুবিধ
শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিতে সুনিপুণ ছিলেন, শুদ্ধভক্তিরূপ পরমধর্মের
সংস্থাপক, সর্বজনের মঙ্গলসাধক পরমহিতৈষী, ত্রিভুবনে বন্দ্যমান, শরণাগতবৎসল
এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণারবিন্দের ভজনরূপ আনন্দরসে মত্ত মধুকরস্বরূপ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যস্থিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভূতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ ।
আনন্দাস্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্থামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা ভগবান্
গৌরসুন্দরের বিবিধ গুণানুবর্ণনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরূপ
অমৃতবৃষ্টিদ্বারা প্রাণীমাত্রের পাপ-তাপ দূর করিয়াছিলেন, প্রতি পদে (জীবের)
আনন্দসিন্ধুবর্দ্ধন-পূর্ব্বক জগন্মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন এবং ভক্তিরস-সিঞ্চন করিয়া
জীবকে কৈবল্য-নামক মুক্তি হইতে উদ্ধারপরায়ণ ছিলেন ॥ ৩ ॥

ত্যাগ্য তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগনেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কহ্মাশ্রিতৌ ।
গোপীভাব-রসামৃতান্নি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মূহ-
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্থামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সমস্ত
মণ্ডলাধিপতিকে লোকান্তর বৈরাগ্যের দ্বারা অতি তুচ্ছজ্ঞানে চিরতরে ত্যাগ করিয়া
কৃপাপূর্ব্বক দীনভাব ধারণ করত কৌপীন-কহ্মাশ্রিত হইয়া হৃদ ও মধুরিমায়ুক্ত
গোপীভাবরূপ রসামৃত-সমুদ্রের আনন্দতরঙ্গ-কল্লোলে নিবিড়ভাবে মগ্ন থাকিতেন ॥ ৪ ॥

কুজং-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে ।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্থামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা কলরব
মুখরিত, কোকিল-হংস-সারসাদি-পক্ষিশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত, ময়ূরের কেকারবে আকুল
ও বহুরত্ন-নিবদ্ধমূল বৃক্ষরাজি দ্বারা শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্রি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের
ভজন করিতেন এবং জীবমাত্রের আনন্দপ্রদানকারী ভক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-প্রদাতা
ছিলেন ॥ ৫ ॥

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।

রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সন্মোহিতৌ

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সংখ্যাপূর্বক নাম-জপাদি, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন এবং প্রণামাদি দ্বারা কালযাপন করিতেন, নিদ্রা-আহার-বিহারাদিতে বিজিত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দৈন্যবিশিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ-স্মরণের মাধুর্য্যজনিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥ ৬ ॥

রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে

প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।

গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগের চরণ বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা প্রেমোন্মাদ-বশতঃ বিরহোখ অশেষদশাদিগ্রস্ত হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কখনও রাধাকুণ্ড তটে, কখনও যমুনার তটে, কখনও বা বংশীবটে সর্বদাই ভ্রমণ করিতেন এবং শ্রীহরির উন্নত গুণগাথা হর্ষভরে গান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥ ৭ ॥

হে রাধে! ব্রজদেবিকে! চ ললিতে! হে নন্দসূনৌ! কুতঃ

শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ।

ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ

বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা “হে ব্রজদেবি রাধিকে! হে ললিতে! হে নন্দনন্দন! তোমরা কোথায়? শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পবৃক্ষতলে অথবা কালিন্দীর কমনীয় কূলে অবস্থিত বনসমূহে ভ্রমণ করিতেছ কি? —এই প্রকার আর্তনাদ-সহকারে বিরহ-পীড়ায় মহাবিহ্বল হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৮ ॥

সাধুজনসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধু-কৃপা ব্যতীত কোন কর্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ-কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যা নিব্বপণাদগৃহায়া।

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যেবিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ (ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহুগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈর্য্যাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্স্থিৎ স্পৃশত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে-পর্য্যন্ত ঐসকল ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষেক না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান উরুরুমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিস্ত হয় না।]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তার্কিকগণ মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকাল মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছরাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব।]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যিক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটি বাক্য আছে, যথা—

নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দস্তাহঙ্কারবজ্জিতঃ।

নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে ॥

পাঠক! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।

সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।

সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।

তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণ গুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহা দ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জনা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব—আচার।

স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণভক্ত' আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবস্থিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার; তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে?

সাধুসঙ্গ কি? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্মাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ (উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণসম্বন্ধ-সূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া 'এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে' ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশ্নকারীর কথার দু'একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকটে যাইয়া

প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া, কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই, যেকথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা। আর যে কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ কারয়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যিকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যিকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান্ সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটি সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের ‘শ্রদ্ধা’ যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

‘নিত্যবদ্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিস্মুখ।

নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবেদ্য পায়।

তাঁর উপদেশ মস্ত্রে পিশাচী পলায় ॥

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২; ১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।

সব ত্যজি’ তবে তিহোঁ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥

কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥ (প্রেমবিবর্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা! এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ!!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছেন, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা জগাই-মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া “জয় রাধাশ্যাম” বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

(সঙ্জনতোষণী ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত

শক্তি ও শক্তিমানের একত্র উপাসনাই কর্তব্য

ব্যবহারিক জগতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সুচুঁবিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক ভগবানের উপাসক, তাহার উপাস্য তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। “শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ” এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূন্য শক্তিমান উপাসিত হইতে পারেন না, অথবা শক্তিমান হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, নির্মল সেবাধর্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্মল সেবাবুদ্ধির ব্যত্যয় অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়।

গুণজাত উপাসনা অনিত্য

গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধন পূর্বক তাহার শক্তিমানসহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগেরই আবাহন করায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আসিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে ধর্ম তাহা নিত্য ধর্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও

গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তাৎকালিক ধর্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নিম্নল সেবাই তাঁহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদ্ভাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে ঐ রজস্তুমোধিকৃত ভোগীর ধর্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম বলা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবা বুদ্ধি নাই তৎতন্মূলে স্ব স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টা বিরাজিত।

গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণশাক্ত

ধন, যশ, শত্রুনাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট এ পৃথিবীতে থাকাকালে সুবিধার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনাই আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্মের যজন। সুতারং মূলে নিষ্কাম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উভয়কে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারা ই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিষ্কাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। যেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুশক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নিম্নল সেবা, ধর্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই।

শক্তিমান ব্যতীত কেবল শক্তির কর্তৃত্ব বেদ বিরুদ্ধ

স্বীয় ভোগোপরকরণ-সংগ্রহ জন্য বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই শক্তিসঞ্জাত। তাই, ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়াশক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি ততস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান ছাড়িয়া পূর্বের শক্তি ও পরে শক্তিমান, তাহা বেদবিরুদ্ধ কপিলমতানুবর্তিত। তাহারা প্রকৃতিকেই কর্ত্রী করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই।

শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির আশ্রয় অসম্ভব

ব্রাহ্মণ, যাঁহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, সুষ্ঠুবিচারে শক্তিমান অস্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদ্বস্ত বা তত্ত্ববস্ত অর্থাৎ শক্তিমান্তত্ত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তুমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নিগুণতা অবলম্বন পূর্বক ক্রমশঃ যথার্থ বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-

তত্ত্ব বা শক্তি, সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র ভোগ প্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবারূপ নিত্যস্বরূপ ধর্ম অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাঁহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না, তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভুক্তিমূলা প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না।

ভোক্তা ভক্ত নহে

মায়ের কাছে আশ্রয় করিয়া, যত পারা যায়, আদায় করিবার যত্নকে মাতৃভক্তি বলা যায় কি? “কারও দুখে চিনি, আমার শাকে বালি” এই শ্লোককে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না, আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তনামে অভিহিত হয়েন নাই।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহারাজে পার্থক্য

ধ্রুব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ-নিরাকরণ মানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষিনারদের পদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে দুর্বুদ্ধি দূরিভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তাগ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাস্ত্র ধর্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব ও শাস্ত্রের শিবপূজা

সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাস্ত্রগণকে শৈবধর্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধনে-তৎপর হ'ন, তখন তাঁহারা শাস্ত্রের শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ের নিকট আশ্রয় করেন, “এ সংসার-গারদে আর আমি থাকিতে পারি না, আমায় এ গারদ হইতে উদ্ধার কর,” অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখ-ভোগ মিশ্রিত, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞতাক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু ঐরূপ মোক্ষ-প্রবৃত্তিতে শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাৎকালিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র।

নির্মলা ভক্তির লক্ষণ

নির্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-দুষ্ট নহে। নির্মল বৈষ্ণব বা বিষুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাস্ত্র-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায়?

—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী



শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাষ-দোষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ৩।১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্ব্বিকেষম্—

তোমার ২৫।১২।৫৯ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উল্ল কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্যত্র কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারি না।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব-বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না। কিন্তু রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই সাক্ষাৎকৃষ্ণের অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব-তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমত্ততত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি অর্চারূপে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মীপতি। শ্রীমতী রাধারাণীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাণীর থাকিতে রসাভাস দোষ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, বলদেব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত-বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। যেখানে রসাভাস-দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক থাকেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাবিধায় দেবরূপে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্রস্বরূপে অবস্থান করিলে রসাভাস দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জনার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিস্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



উপনিষদ-বাণী

(ছান্দোগ্য-৩)

অতঃপর উষস্তি ঋষি কোন রাজার যজ্ঞ-স্থলে গমন করেন। তথায় চিনি উদ্ধাতাদি ঋত্বিক-সকলের নিকট বলেন,—আপনারা যে দেবতার সম্বন্ধে স্তুতি করিতেছেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে না জানিয়া স্তুতি করিলে আপনাদের মন্তক ভূপতিত হইবে। তাহা শুনিয়া ঋত্বিকগণ নিজ নিজ কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে থাকিলেন। তখন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী রাজা উক্ত ঋষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উষস্তি নিজ পরিচয় প্রদান করিলে রাজা জানাইলেন যে, তিনি উক্ত ঋষির অনুসন্ধান না পাইয়া অপর ঋষিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি তাহা স্বীকার করিয়া ঋত্বিকগণকে কার্য্যারম্ভের আদেশ করেন।

অতঃপর প্রস্তুত উষস্তির নিকট জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যে বলিয়াছেন,—‘তোমরা যে দেবতার স্তুতি করিতেছ, তাঁহাকে উত্তমরূপে না জানিয়া স্তুতি করিলে তোমাদের মন্তক ভূপতিত হইবে।’ সুতরাং উক্ত দেবতার পরিচয় প্রদান করুন। উষস্তি বলিলেন,—প্রাণই ঐ দেবতা, সমস্ত প্রাণী প্রাণ হইতেই প্রকটিত হয় এবং প্রলয়ে প্রাণ-মধ্যেই বিলীন হয়। সেই প্রাণই স্তুতিযোগ্য দেবতা।

পুনরায় উদ্ধাতা উষস্তির নিকট উক্ত প্রশ্ন করিলে উষস্তি বলেন যে, ঐ দেবতা সূর্য্য। সমস্ত প্রাণী আকাশে স্থিত ঐ সূর্য্যেরই উপাসনা করে।

অতঃপর প্রতিহর্তা উষস্তির নিকট পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করেন। উষস্তি ঐ দেবতার নাম করেন—অন্ন। কারণ অন্নের দ্বারাই সমস্ত জীবের জীবন রক্ষা হয়।

সিদ্ধান্ত এই যে,—প্রাণ, সূর্য্য, অন্ন আদি নাম পরমাত্মারই। তাঁহারই কৃপায় সকল বস্তুর অবস্থান।

দল্ভ ঋষির পুত্র বক অথবা মিত্রের পুত্র গালব ঋষি স্বাধ্যায়ের জন্য কোন নির্জ্ঞন প্রদেশে গমন করেন। উক্ত ঋষিকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কোন ছদ্মবেশী ঋষি শ্বেতবর্ণ কুকুরের রূপে তথায় আগমন করেন। তাহার পশ্চাতে অপর একটি কুকুর আসিয়া প্রথম কুকুরকে বলে—আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, অতএব আপনি উদ্দীথ গান করিয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন প্রস্তুত করুন। শ্বেতবর্ণের কুকুর বলিল,—আগামীকল্য প্রাতে এইখানে আসিও। তাহাদের এই কথা উক্ত ঋষি শ্রবণ করিয়া কৌতুহলাঘিত হইয়া কুকুরের অন্ন সংগ্রহের কার্য্য দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে কুকুরগুলি একত্রিত হইয়া, যজ্ঞকৰ্ম্মে বহিষ্ণবমান স্তোত্রে উদ্ধাতা যে-প্রকার স্তুতি আরম্ভ করেন, তদ্রূপ সকলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; তৎপশ্চাৎ সকলে উপবেশন করিয়া হিং করিতে লাগিল অর্থাৎ হিং স্তোত্রের প্রয়োগ করিয়া সামগান করিতে লাগিল। গানের ভাবার্থ এই—হে সর্ব্বরক্ষক পরমেশ্বর! আমরা ভোজন ও জলপানেচ্ছু। আপনি প্রকাশ-স্বরূপ দেবতা, অভীষ্টবস্তুর বর্ষণকারী বরুণ।

সমস্ত প্রজার পালনকারী প্রজাপতি এবং সকলের উৎপাদনকারী সবিতা। আপনি আমাদের জন্য অন্ন প্রদান করুন। সামগানের সময় যে ‘হা’ ‘উ’ আদি তের (১৩) প্রকার শব্দ ব্যবহার করা হয়, উহার নাম স্তোভ।

এস্থলে ইহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, প্রকাশ-স্বরূপ সবিতা, বরুণ, প্রজাপতি আদি নামসকল পরমেশ্বরেরই নাম। সমস্ত সামকে সাধু ও অসামকে অসাধু বলে। কেহ যদি বলে যে, আমার ‘সাম’ হইয়াছে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সাধু অর্থাৎ শুভ হইয়াছে। সুতরাং অসাম অশুভ।

পঞ্চপ্রকার সামোপাসনা জগতে প্রসিদ্ধ। পৃথ্বী—হিংকার, অগ্নি—প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ—উদ্বীথ, আদিত্য—প্রতিহার, এবং দ্যুলোক—নিধন। এইপ্রকার উর্দ্ধলোকের সামদৃষ্টি করিতে হয়। অধোলোকের সামোপাসনার নিরূপণ,—দ্যুলোক—হিংকার, আদিত্য—প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ—উদ্বীথ, অগ্নি—প্রতিহার এবং পৃথ্বী—নিধন। এইপ্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তি (এই উভয়প্রকার) পঞ্চবিধ নামের উপাসনা করিলে তাহার প্রতি উর্দ্ধ ও অধোমুখ লোক ভোগরূপে উপস্থিত হয়।

ধর্মের তিনটি স্কন্ধ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান প্রথম স্কন্ধ। ‘তপ’ দ্বিতীয় স্কন্ধ এবং ব্রহ্মচারীর আচার্য্যগৃহে বাস তৃতীয় স্কন্ধ। এ সকলই পুণ্যলোকের ভাগী। ব্রহ্মো সম্যকপ্রকারে অবস্থিত চতুর্থাশ্রমী যতি অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ধ্যানরূপ তপ করিয়াছিলেন। তদ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ উৎপন্ন হয়। পুনরায় তপঃপ্রভাবে ওঁকার উৎপন্ন হয়। ওঁকারেই সমস্ত বাণী ব্যাপ্ত আছে। ওঁকারই সব।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—প্রাতঃ-সবন বসুগণের। মধ্যাহ্ন-সবন রুদ্রের এবং তৃতীয় অপরাহ্ন-সবন আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের। প্রাতঃ-সবনারস্ত্রে যজমান গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিमुखে বসিয়া বসুদেবতা-সম্বন্ধী গান করেন—হে অগ্নে! আপনি ইহলোকের দ্বার খুলিয়া দিন, যদ্বারা আমি রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে পারি। তৎপরে যজমান এইমন্ত্রে হোম করেন—পৃথিবীতে অবস্থানকারী অগ্নিদেবকে নমস্কার। আপনি আমাকে পৃথিবী লোক প্রাপ্তি করাইয়া দিন। বসুগণ উক্ত যজমানকে প্রাতঃ-সবন প্রদান করেন। মধ্যাহ্ন-সবনারস্ত্রের পূর্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিमुखে বসিয়া রুদ্রদেব সম্বন্ধী গান করেন—হে বায়ো! আপনি অন্তরীক্ষ লোকের দ্বার খুলিয়া দিন, যদ্বারা আমি ‘বৈরাজ’-পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে পারি। অনন্তর যজমান এই মন্ত্রে হোম করেন,—অন্তরীক্ষে অবস্থানকারী বায়ুদেবকে নমস্কার। আপনি আমাকে অন্তরীক্ষ লোক প্রাপ্তি করাইয়া দিন। রুদ্রগণ উহাকে মধ্যাহ্ন-সবন প্রদান করেন।

তৃতীয় সবনের আরস্ত্রে প্রথমে যজমান আত্মনীয়াগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিमुखে বসিয়া আদিত্য ও বিশ্বদেব-সম্বন্ধী সাম-গান করেন—হে আদিত্য ও বিশ্বদেব! দ্যুলোকের দ্বার খুলুন, যদ্বারা আমি সাম্রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে

পারি। স্বর্গস্থিত দ্যুলোক-নিবাসী আদিত্য ও বিশ্বদেবকে নমস্কার। আমাকে আপনার পুণ্যলোকের প্রাপ্তি করাইয়া দিন। তাহাকে আদিত্য ও বিশ্বদেব তৃতীয় সর্বন প্রদান করেন।

ওঁ এই আদিত্য দেবতাগণের মধু। দ্যুলোকই তাহার আশ্রয় বক্র-বংশস্বরূপ, অন্তরীক্ষ ছত্র এবং কিরণমালা মধুমক্ষিকার শাবক-সদৃশ। আদিত্যের পূর্বদিকস্থিত কিরণসকল অন্তরীক্ষ ছত্রের পূর্বদিকবর্তী ছিদ্র। ঋক্ মধুকর, ঋগ্বেদ পুষ্প এবং সামাদি অমৃত জল। ঐ ঋক্‌রূপ মধুকর ঋগ্বেদের অভিভাপ করেন। তাহা হইতে যশ তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য, ও অনাদি রস উৎপন্ন হয়। যশ আদি রস আদিত্যের পূর্বভাগ আশ্রয় করে। আদিত্যের লালবর্ণই ঐ রস। আদিত্যের দক্ষিণদিকস্থ কিরণ দক্ষিণদিকবর্তী মধুনাড়ী। যজুঃ শ্রুতিসকল মধুকর, যজুর্বেদ পুষ্প এবং সোমাদিরূপ অমৃত জল। এই যজুঃ শ্রুতিসকল যজুর্বেদের অভিভাপ করেন। তদ্বারা যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য ও অনাদিরস উৎপন্ন হয়। ঐ রস আদিত্যের দক্ষিণভাগে আশ্রয় লয়। তাহা আদিত্যের শুক্রবর্ণ রূপ।

আদিত্যের পশ্চিমদিকের রশ্মিসকল পশ্চিমীয় মধুনাড়ী। সামশ্রুতি মধুকর, সামবেদ-বিহিত কৰ্ম্ম পুষ্প এবং সোমাদিরূপ অমৃতজল। ঐ সামশ্রুতি সামবেদ-বিহিত কৰ্ম্মের অভিভাপ করে। তাহা হইতে যশ-তেজাদি রসের উৎপত্তি হয়। ঐ রস আদিত্যের পশ্চিমভাগ আশ্রয় করে। আদিত্যের কৃষ্ণতেজই ঐ রস। আদিত্যের উত্তরদিকস্থ কিরণসকল উত্তরদিকস্থ মধুনাড়ী। অথর্বব্রাহ্মস শ্রুতিসকল মধুকর, ইতিহাস-পুরাণ পুষ্প এবং সোমাদি অমৃতজল। ঐ অথর্বব্রাহ্মস শ্রুতিসকল ইতিহাস-পুরাণকে অভিভাপ করে, তদ্বারা যশ-তেজাদি রসের উৎপত্তি হয়। ঐ রস আদিত্যের উত্তরভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে। আদিত্যের অত্যন্ত কৃষ্ণরূপই ঐ রস।

আদিত্যের উর্দ্ধ রশ্মিসকল উর্দ্ধদিকস্থ মধুনাড়ী। গুহ্য আদেশ মধুকর, প্রণবরূপ ব্রহ্ম পুষ্প ও সোমাদি অমৃতজল। ঐ গুহ্য আদেশ প্রণবসংজ্ঞা ব্রহ্মকে অভিভাপ করে। তাহা হইতে যশাদি রসের উৎপত্তি। ঐ রস আদিত্যের উর্দ্ধভাগে আশ্রয় লয়। আদিত্যের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ভাব আছে উহাই মধু। পূর্বেব্রাহ্ম লোহিতাদিরূপ রসের রস এবং অমৃতেরও অমৃত।

প্রথম অমৃত অগ্নিপ্রধান বসুগণের জীবনস্বরূপ। দেবগণ উহা পান-ভোজনাদি করেন না, কেবল দর্শনের দ্বারাই তৃপ্ত ও উৎসাহিত হন। আদিত্যের পূর্বদিকে উদয় হইতে পশ্চিমদিকে অস্তগমন পর্য্যন্ত বসুগণের আধিপত্য ও স্বারাজ্য।

দ্বিতীয় অমৃতের দ্বারা রুদ্রগণ ইন্দ্রপ্রধান হইয়া তাহার আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। দেবগণ উহা পান-ভোজন করেন না, কেবল উহার দর্শনেই তৃপ্ত ও উদ্যমশীল হন। আদিত্যের পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগমন কালের দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তগমন পর্য্যন্ত রুদ্রগণের আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্তি হয়।

তৃতীয় অমৃতের দ্বারা আদিত্যের বরুণপ্রধান হইয়া এই অমৃতের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। দেবগণ উহা পান বা ভোজন করেন না, কেবল দর্শনে তৃপ্ত ও উদাসীন এবং তপস্যায়ই উদ্যমশীল থাকেন। যিনি এই অমৃতকে জানেন তিনি আদিত্যগণের মধ্যে কোন একজন হইয়া বরুণের প্রধানতায় অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত হন। এইরূপেই তিনি উদাসীন ও উদ্যমশীল হন। আদিত্যের দক্ষিণে উদয় ও উত্তরে অস্তগমন কালের দ্বিগুণ সময় ইনি পশ্চিমে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগমন করেন, এই সময়টুকুই উহার আধিপত্য ও স্বরাজ্য প্রাপ্তির কাল।

চতুর্থ অমৃত সোমপ্রধান মরুদগণের জীবনধারণের উপায়-স্বরূপ। দেবগণ তাহা পান-ভোজন না করিয়া কেবল দর্শনে তৃপ্ত, উদাসীন ও উদ্যমশীল থাকেন। এই অমৃতকে যিনি জানেন, তিনি মরুদগণের মধ্যে কোন একজন হইয়া সোমের প্রধানতায় এই অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত থাকেন। আদিত্যের যে-সময় পশ্চিমে উদয় ; ও পূর্বে অস্তকাল তাহার দ্বিগুণ সময় এই দেবতা উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্ত যান। এই সময়ই তাহার আধিপত্য ও স্বরাজ্যের কাল।

পঞ্চম অমৃত ব্রহ্মাপ্রধান সাধ্যগণের জীবন-ধারণোপায়। উহা দেবগণের ভোগ্য নহে, কেবল দর্শনে তৃপ্তি-উৎসাহাদি লাভ হয়। এই অমৃতের জ্ঞাতা সাধ্যগণের মধ্যে কেহ হইয়া ব্রহ্মার প্রধানতায় এই অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত, উদাসীন ও উৎসাহিত থাকেন। আদিত্যের উত্তরে উদয় ও দক্ষিণে অস্তকালের দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত উদ্ধৃদিকে তাহার উদয় ও অধোদিকে অস্তগমন হয়। এই সময়ই সাধ্যের আধিপত্য ও স্বরাজ্য কাল।

এই মধু-বিজ্ঞান ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু প্রজাগণের নিকট উপদেশ করেন। ইহা দুর্বোধ্য এবং সকলের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় ধনের বিনিময়েও ইহা প্রকাশ না করিলে অধিক ফল লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রীতী মহারাজ



শিম্বরুকের গুরুসেবা ও হরিভজন

কৃষ্ণ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

কৃষ্ণ—নিত্য-প্রভু, আর জীব—নিত্যদাস।

কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যজীব-স্বভাব প্রকাশ।। (প্রেমবিবর্ত)

সর্বশক্তির মূলাধার অখিল-রসামৃতমূর্তি মায়াধীশ শ্রীহরিই একমাত্র পরতত্ত্ব।

জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের সাধ্যবস্ত। ইহাই শুদ্ধজীবের বা তাঁহার সিদ্ধস্বরূপের পরিচয়। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্রস্তু, জীব অণুচেতন্য। কৃষ্ণ চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য, জীব তাঁহার কিরণকণ-সদৃশ। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব ক্ষুদ্র। কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার তত্বশক্তির পরিণাম হইতেই জীবের সত্তা। জীব—জড় ও চিৎ, এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া পৃথক। তজ্জন্য ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব সত্য ও নিত্য।

জীবের বদ্ধদশার কারণ

কৃষ্ণ-ভুলি সেই জীব অনাদি-বহিস্মুখ।

অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

কৃষ্ণ-বহিস্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।

নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥

‘আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস’—এই কথা ভুলে’।

মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব চিদ্রস্মী হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ্য, এবং ভগবান চিদ্রস্তু, জীবও স্বরূপতঃ চিদ্রস্তু। অতএব এই উভয়স্থলেই ভগবানের সহিত জীবের নিত্যভেদ ও নিত্য-অভেদ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রভুর সেবা করাই দাসের একমাত্র কৃত্য। জীব সেই কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইয়া মায়ার চাকচিক্যে প্রলুপ্ত হইয়াছে এবং মায়িক সংসারে অধঃপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ লাভ করিতেছে। ভগবানকে ভুলিয়াই জীব অনাশ্রিত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া ইহজগতে দুর্দশা বরণ করিয়াছে।

বদ্ধজীবের দুর্দশা

জীবের দুইটা অবস্থা—শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধাবস্থায় জীবের জড়সম্বন্ধ থাকে না। ‘কৃষ্ণদাস’ অভিমানই জীবের শুদ্ধ পরিচয়। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম। সেব্যের প্রতি সেবকের যে সহজ আনুগত্য-ভাব, তাহাই প্রেম বা প্রীতির মূলীভূত কারণ। সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটি বস্তুই নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। নিত্যমুক্তগণ নিত্যকাল ভগবদ্ধামে থাকিয়া ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। আর নিত্যবদ্ধ জীবগণ স্বরূপ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া স্থূল-লিঙ্গদেহে ‘আমি-আমার’-অভিমানবশে “আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী” পরিচয়ে কর্ম্মফলের ভোজ্য সাজিয়া বসেন। তখন সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বेष তাহার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীরে এবং ক্ষুৎ-পিপাসা, জড়সঙ্গ-স্পৃহা তাহার স্থূলশরীরে প্রবেশ লাভ করে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের নিত্যধর্ম্ম অবিকৃত থাকে, বদ্ধাবস্থায় উহা বিকৃত হইয়া হয়, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক ধর্ম্মে পরিণত হয়।

বদ্ধাবস্থায় জীব আবার অনিত্য-ধর্মের বা অধর্মের আবাহন করিয়া নিরীশ্বর নাস্তিক হইয়া পড়ে। ইহাই তাহার চরম বিপর্যয়। এই অবস্থায় তাহার উদ্ধারের আর কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকে না—সে চির রৌরব ভোগ করে।

গুরুপদাশ্রয়ে সংসার-মুক্তি ও প্রেম-প্রাপ্তি

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।

সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন।।

নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।

'কেন বা ভজিনু মায়া' করে হয় হয়।।

কেঁদে বলে, “ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।

তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্বনাশ।।

সদগুরু-চরণে জীব শ্রদ্ধা-সহকারে।

প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে।।

তবে সেই জীব সাধু-গুরুর কৃপায়।

সম্বন্ধজ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায়।।

তবে পায় প্রেমধন—সর্বধর্মসার। (প্রেমবিবর্ত)

জীব ভব-কারণারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় যখন ক্লিষ্ট হইতে থাকে, সংসার-জলধিমাধ্যে নক্র-মকররূপ কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নে অস্থির হইয়া হাবুডুবু খায়, তখন সুকৃতিবশে সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তাহার নিজের ভুল কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া তখন ভগবানের কৃপাভিক্ষা করে।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।

জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।।

শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।

'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১২২-১২৩)

তাই জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের নিমিত্ত পরমকরণাময় জীব-দুঃখদুঃখী ভগবান্ স্বীয় প্রেষ্ঠজনকে এজগতে গুরুরূপে প্রেরণ করেন। আবার কখনও তিনি স্বয়ং সাধু-গুরুশাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মূঢ় জীবগণকে স্বীয় তত্ত্ব জানাইয়া থাকেন। এজন্য সাধু-গুরুরূপেই ভগবৎকৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। ভগবৎ-সেবোন্মুখ জীব সদগুরুর নির্দেশক্রমেই তাহার অপগতির কারণ এবং স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় অবগত হন। এই সংসারের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, কে আমি, আমার কি কর্তব্য, কেন আমি ইহ সংসারে বদ্ধ হইয়াছি, কিরূপে পুনরায় মুক্ত

হইব—প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধ-মোক্ষবিৎ তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবই সংশয় নিরসন ও সদুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। সদগুরুর নিকট হইতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া জীব পুনরায় তাহার স্বধর্ম্মে—প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

গুরুকরণের আবশ্যিকতা

কি আর্থিক, কি পারমার্থিক সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত গুরু ব্যতীত কোন কার্যই সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিত্যকল্যাণপ্রদ ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্ব জানিতে গেলে নিশ্চয়ই সদগুরুর প্রয়োজন। গুরুকৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় কখনই জীবের বন্ধদশা নিরাকৃত ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইতে পারে না। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলকামী সানাতন ধর্ম্মাশ্রয়ীর সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অবশ্যই সদগুরু-পদাশ্রয় কর্তব্য। শ্রদ্ধালু তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা-কর্তব্য। দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে জন্ম-জন্মান্তরে অশেষ দুঃখ লাভ হয় ও সন্ধ্যাতি হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির জীবন বৃথা। তাহার প্রদত্ত কোন দ্রবাই ভগবান গ্রহণ করেন না এবং তাহার সকল প্রকার চেষ্টাই বিফল হয়। অজিতেন্দ্রিয়গণ গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত চঞ্চল মনকে স্থির করিবার যত্ন করে এবং নিজচেষ্টায় সংসার-দুঃখ বিনাশের প্রয়াসী হইয়া আরও অধিক বিপদগ্রস্ত হয়। তাই সমুদ্রে বিপন্ন কর্ণধারবিহীন নিরাশ্রয় যাত্রীর ন্যায় তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই।

“আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মরে অকারণ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

সংসারে পার হই ভক্তির সাগরে।

যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭)

গুরুপাদপদ্মে—গুরু-নিত্যানন্দে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কাহারও কোনপ্রকারে অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র বলেন,—ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত উপায়ন-হস্তে ভগবৎ-সেবাকামী ব্যক্তি সদগুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। শব্দব্রহ্মে (শাস্ত্র) ও পরব্রহ্মে নিষগত (কৃষ্ণেকশরণ) আচারবান্ সদগুরুর আশ্রয় লইলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়।

তৎবিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। (মুঃ ১।২।১২)

আচার্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শব্দে পরে চ নিষগতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১।১।৩।২১)

গুরুপাদপদ্মই ভগবদ্ভক্তি-বীজ লাভের আকর এবং গুরুপদাশ্রয়ই ভক্তিলাভের দ্বার। এইজন্যই অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।

বিশ্রভ্ণেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্তানুবর্ত্তনম্॥

সৎশিষ্য সদগুরুপদাশ্রয়ের পর তাঁহার নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ, বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা ও সাধুপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবেন। এখন সৎশিষ্য ও সদগুরু কে, তাহাই আলোচ্য। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ



ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশামৃত

অসুর সম্রাট হিরণ্যকশিপু ত্বদীয় পুত্র ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ পঞ্চবর্ষে উপনীত হইলে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অসুরগুরু শুক্ৰাচার্য্যের নিকট প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেই সময় শুক্ৰাচার্য্য গৃহে না থাকায় ত্বদীয় পুত্রদ্বয় যশ ও অমর্কের উপর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইল। প্রহ্লাদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না। কোনও একদিন গৃহ-কর্ম্মানুরোধে আচার্য্যগণ অধ্যাপনা স্থান হইতে গৃহে গমন করিলে সমবয়স্ক বালকগণ ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রহ্লাদকে আহ্বান করিল। অনন্তর মহাজ্ঞানী প্রহ্লাদ সেইসব বালকগণকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করতঃ এই সংসারের পরিণাম কি তদ্বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন। একে প্রহ্লাদ রাজপুত্র, তদুপরি বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অন্যান্য ছাত্রসকল প্রহ্লাদকে অত্যন্ত সম্মান করিত। তাহারা তখন প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য তাহার দিকে চিত্ত ও দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিল। অসুর-কুলোদ্ভব পরহিতকারী মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ বালকদিগকে নিমিত্ত করিয়া জগদ্বাসীকে এই বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—আত্মকল্যাণেচ্ছা ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই অন্য প্রয়াস ত্যাগ করিয়া যদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, সেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ সংসারে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। দুর্লভ এই কারণে যে আমরা বিভিন্ন যোনিতে আশি লক্ষবার ভ্রমণান্তে তথা বহু দুঃখ কষ্ট ভোগান্তে এই মনুষ্য-দেহটি পাইয়াছি। তাহাতে আবার এই দেহটি অনিত্য শতবর্ষ বৎসরের মধ্যেই এই দেহটি নষ্ট হইয়া যাইবে। তথাপি ইহা অর্থদ, অর্থাতঃ পরমার্থপ্রদ।

দেহটি ক্ষণস্থায়ী হইলেও এই দেহদ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যদি এখন প্রশ্ন করা হয় যে, কৌমার বয়স হইতে কি ধর্ম আচরণ করা সম্ভব? সে বিষয়ে উত্তর এই যে, —শাস্ত্র বলিতেছেন—

হরেনার্ম, হরেনার্ম, হরেনার্মৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অর্থাৎ কলিতে হরিনাম কীর্তনই একমাত্র ধর্ম। সুতরাং কৌমার বয়সে অর্থাৎ পঞ্চ বৎসরের ছেলে বাবা, মা বলিয়া ডাকিতে পারে এবং সেই বয়সে বালক অনেক শব্দও উচ্চারণ করিতে পারে। কলিতে শ্রীহরিনামই ধর্ম, সুতরাং মনুষ্য কৌমার বয়সেই অর্থাৎ পঞ্চবর্ষ বয়সে সে বালক স্বচ্ছন্দে

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।”

এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে। অতএব কৌমার বয়স হইতে ধর্মাচরণে বাধা থাকিতে পারে না। যদি কেহ বলেন কৌমার বয়সে ভজন না করিয়া যৌবনেই করিব, তাহাতে পণ্ডিতগণ বলেন যে, কৌমার-অন্তেই যদি মৃত্যু হইয়া যায়, তাহা হইলে যৌবনে ভজন কিরূপে হইবে? তখন যদি যুক্তি দেখান—কৌমারান্তে যদি মৃত্যু হইয়া যায় তাহাতে চিন্তার কি কারণ আছে, জন্মান্তরেই না হয় ভজন সাধন করিব। তদুত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, জন্মান্তরে মনুষ্যদেহ পাওয়া যাইবে কি না তাহার কোন ঠিক নাই, যদি বা পাই তখন যদি কালা, বোবা, অন্ধ হই তাহা হইলে কিরূপে ভজন হইবে? যদি পশু-পক্ষী দেহ হয় তাহা হইলেই বা সেইরূপ দেহে কিরূপে ভজন-সাধন করিতে পারিব? সুতরাং আমরা যখন মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, এবং সুন্দর হস্তপদ, চক্ষুকর্ণ লাভ করিয়াছি, তখন এ জন্মেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এদেহটি অনিত্য হইলেও পরমার্থ প্রদান করিয়া থাকে। মহারাজ খট্টাসাদি সাধকগণ মুহূর্তমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাহার সহপাঠীগণকে আরও বলিলেন,—এই মনুষ্যজন্মে মানবের শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবন করাই একমাত্র কর্তব্য। যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। উত্তমরূপে বিচার করিলে জানা যায় মাতা, পিতা, পুত্র, পরিজনাদি অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রিয়, কারণ তিনিই সকল দেহের মধ্যে পরমাত্মা সাক্ষীরূপে, এবং তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবাত্ত্বারূপে বিরাজমান, তাহারা উভয়ে এই দেহ ত্যাগ করিলে তখন মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু কেহই আর প্রিয় থাকে না। বরং তাহাদিগকে দেখিলে ভয় পায়, স্পর্শ করিলে স্নান করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্ যতক্ষণ দেহের মধ্যে থাকিবেন, ততক্ষণই আত্মীয়-পরিজন প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলে, এ জগতে কোন বস্তুই আর প্রিয় থাকে না। সুতরাং ভগবান্ই যে প্রিয়, হাই প্রমাণিত হইতেছে। ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন যে, ভগবান্

আত্মা অর্থাৎ সকল দেহের মধ্যে তিনিই পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তিনিই জীবের পাপ-পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন। এইজন্য অভিন্ন কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন, “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা। তাঁহার করুণাতেই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, প্রতিপালিত হইতেছি, আবার সময় আসিলে তিনি সংহার করিয়া দিবেন। এইজন্য তিনি ঈশ্বর তথা জগৎপিতা। জগৎপিতার আরাধনা জীবমাত্রেরই কর্তব্য। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

সুতরাং তাঁহার আরাধনা করা আমাদের পরম কর্তব্য। কারণ তিনিই আমাদের পরম সুহৃদ, পরম বন্ধু। পাণ্ডবগণকে দুর্যোধনাদি ভ্রাতা, বন্ধু ও আত্মীয়গণ পরিত্যাগ করতঃ বনে প্রেরণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানেও তাঁহাদের পরমসুহৃদরূপে, মধ্যে মধ্যে দর্শন দিতেন ও সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন, সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র সুহৃদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিও বলিয়াছেন যে,—

“সু সময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।

অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়॥

কেবল ঈশ্বর এক বিশ্বপতি যিনি।

সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি॥

পরমভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ সহপাঠী দৈত্যবালকগণকে নিমিত্ত করিয়া জগদ্বাসীকে আরও উপদেশ করিতেছেন যে দেহযোগ-বশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধজন্য যে সুখ, তাহা পূর্ব্বাদৃষ্ট-অনুসারে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশুসকল লাভ করিয়া থাকে। অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্তব্য নয়। যেহেতু তাদৃশ প্রয়াসদ্বারা কেবল আয়ুক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সেরূপ যদি বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করা হয় কখনও তাদৃশ শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত মানব-শরীরটি বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতে তাবৎকাল পর্য্যন্ত পরম মঙ্গললাভের জন্য যত্ন করিবেন। মনুষ্যের আয়ুষ্কাল শতবর্ষ পর্য্যন্ত, আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুষ্কাল উহার অর্ধেক, কারণ পুরুষ, নিদ্রারূপ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া জীবনের অর্ধেক আয়ু বৃথা ব্যায় করিয়া থাকে। বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, বিদ্যার্জনে বিশ বৎসর, এবং আশি হইতে একশত— এই বিশ বৎসর জরাগ্রস্ত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। সুতরাং হিসাব করিলে দেখা যাইতেছে যে নিদ্রায় পঞ্চাশ বৎসর এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ বৎসর বাল্যকালে খেলাধুলায় বিদ্যার্জনে, জরাগ্রস্ত অবস্থায় ব্যয় হয়—এইভাবে একশত বৎসর আমাদের চলিয়া যায়। ভগবান্ শ্রীহরির ভজন আর করা হয় না। সেইজন্য ভক্তবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বাল্যকাল হইতে ভগবান্ শ্রীহরির ভজন করিবার উপদেশ করিতেছেন। (ক্রমশঃ) —শ্রীভক্তিবৈদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

কলির অনুকূল—ভক্তির প্রতিকূল

কলিকাল সর্বদোষের আকর, তাই জগতে আসল অপেক্ষা নকল বস্তুরই আদর বেশী। খাঁটি গহনা অপেক্ষা মেকী গহনা পরিতে লোকে বেশী পছন্দ করে। “কুভোজ্যেন দিনং নষ্টম্” অর্থাৎ কুখাদ্য গ্রহণ করিলে সেই দিনটাই যেরূপ নানা অসুখে নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ কলির অনুকূলকে গ্রহণ করিলে পরমার্থধন লাভে বঞ্চিত হইয়া দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথাই চলিয়া যাইবে। কলির অনুকূল বিষয়মাট্রেই অসার, অসারে সার বুদ্ধি করিতে গিয়াই লোকে ঠকিতেছে অর্থাৎ আত্মবঞ্চিত হইতেছে। তালপাতার ছায়া যেরূপ অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ, তদ্রূপ ভজনের বা ভক্তির প্রতিকূল যে-সকল ছলধর্ম গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের দ্বারা জগতে অশান্তি ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? থুথু দিয়া ছাতু গিলিতে গেলে যেরূপ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ কলির অনুকূল ধর্মগ্রহণে ভগবৎপ্রাপ্তি না হইয়া ভবপারের রাস্তা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নির্দিষ্ট বিনুকে মুক্তা থাকে, সকল বিনুকে খুঁজিলে যেরূপ তাহা পাওয়া যায় না ; তদ্রূপ ভক্তিপথেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, ছলধর্ম, উপধর্ম প্রভৃতির যাজকগণের নিকট তাহা অধরা থাকিয়াই যায়। পেঁপে গাছে জল ঢালিয়া তক্তা করিবার আশার ন্যায় যাহারা অসারের আশ্রয়ে সারবস্তুকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যন্ত মূর্থ।

যে কোন ব্যক্তি ভগবানের রাজ্যের পথ দেখাইতে পারে না এবং যে কোন প্রতিনিধিও আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারে না। জগতে জড়বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করা হয়, সবগুলিই অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। জগতের লোকের গোড়ায় গলদ। তাই গণগন্ডালিকা প্রকৃতপক্ষে কোনটি সৎ, কোনটিই বা অসৎ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে প্রস্তুত হয় না। কল্যাণ ও অকল্যাণের নির্বাচনে ত্রুটি থাকিয়া যাওয়ার ফলে ধর্মজীবন যাপন করিয়াও আমরা শ্রেয়োলাভ হইতে বঞ্চিত হই। একমাত্র শাস্ত্রই আমাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইতে পারে। যাহারা অশাস্ত্রজ্ঞ, তাহারা ভগবানের সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা পোষণ করেন, তাহা সমস্তই ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য বিষয় বিচার না করিয়া, সাধারণ লোক কতকগুলি লৌকিক যুক্তি ও সাধারণ ভ্রমের মোহে পতিত হইয়া কল্লিত ছড়া বা কথাকেই শাস্ত্রবচন বলিয়া ভ্রান্ত হয়। “আপন গ্রামে কুকুর রাজা”র ন্যায় লোকে ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ শাস্ত্রবহির্ভূত নিজ নিজ কাল্পনিক মতবাদসমূহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে। আমড়া গাছে যেরূপ আমড়াই ফলে, আম কখনই ফলে না ; তদ্রূপ অনিত্য মনগড়া ধর্মসমূহে অনিত্য বস্তুই লাভ হইবে, নিত্যবস্তু ভগবানের কোনদিনই সম্বান পাওয়া যাইবে না।

নানাবিধ জাগতিক দুর্বলতা লইয়া জাগতিক বস্তুর বিচারের ন্যায় পরমার্থের বিচার করিতে গেলে ঠকিয়া যাইতে হইবে। যাহারা চাক্ষুষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে

সম্বল করিয়া ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার অভিনয় করে, তাহারা কলির কবলে কবলিত অজ্ঞ জীব। গলাবাজির জোরে এক বস্তুকে আর এক বস্তু বলিয়া লোকের নিকট খিঁচুড়ি পাকাইলে তাহাতে নিজের বা জগতের কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। কলি অধর্মের প্রধান বপু। তাই পরোক্ষভাবে কলির অনুকূলও অধর্মের প্রধান পরিপোষক। দ্যুত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও জীবহিংসা—এই চতুর্বিধ অধর্ম যেখানে আছে, সেখানেই কলির অবস্থান। আবার স্বর্ণ বা অর্থের মধ্যেই মিথ্যা, গর্ব, স্ত্রীসঙ্গ-জনিত কাম ও হিংসা—এই চারিটি অধর্ম যুগপৎ বিরাজিত ও অধিকন্তু শত্রুতা নামক একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে। আসবমাত্রেরই কলির অন্যতম স্থান ‘পানের’ মধ্যে গণ্য। পান অনেক আকারে দৃষ্ট হয়। কোথাও দ্রব্যবস্তুর আকারে, কোথাও ধূম্রাকারে, কোথাও বা অন্যান্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্বুল, গুবাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, সুরা সকলেই পান মধ্যে গণ্য। তামাক-সেবনে মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বিহীনুখতা হয়। মতিভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সামান্য মায়াবদ্ধ জীব ব্যতীত কিরূপে ভগবান পুরুষোত্তম বলা হইবে? মায়াবদ্ধ জীবকে ভগবান জ্ঞান বা বুদ্ধি করা ভয়ানক অপরাধ। এইপ্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,

প্রভু কহে,—‘বিষ্ণু’ ‘বিষ্ণু’, ইহা না কহিবা।

জীবাধমে ‘কৃষ্ণ’ জ্ঞান কভু না করিবা।।

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে সম।

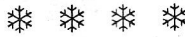
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফূলিঙ্গের কণ।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১, ১১৩)

বেদ-পুরাণ-মহাভারত-রামায়ণ-গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসমূহে যাহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যিনি জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয়টি লৌকিক বিকারগ্রস্ত, তিনি কিরূপে পুরুষোত্তমের আসন দখল করিতে পারেন? অসত্য বা মিথ্যার স্তাবকগণ অসত্যকে সত্য বলিয়া লোকের চক্ষে ধুলো দিতে পারিলেও ভগবানকে ফাঁকি দিতে পারিবেন না। ‘ইষ্টবত্তি’র নামে নিজের ভোগের অর্থ সংগ্রহ করিয়া অনর্থগ্রস্ত হওয়ার মধ্যেও রহিয়াছে কলির খেলা। ওল, কচু, মান—এই তিনটি গুণগতের দিক দিয়া যেরূপ প্রায় সমান, তদ্রূপ নাস্তিকতা ও ধর্মের মুখোশে অধর্ম—উভয়ই সমান। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিয়া যেরূপ প্রকৃত পদ্মলোচনকে অপমান করা হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবকে ‘পুরুষোত্তম’ বলিলে সর্বদেববন্দ্য মায়াভীত ‘পুরুষোত্তম’কে অসম্মান করা হইবে না কি? অন্য তিনযুগে যাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেই মনঃক্লিষ্ট ছলধর্ম কলিযুগে বর্দ্ধিত হইয়া খড়ের আগুনের ন্যায় একসময় শেষ হইয়া যাইবে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে যাওয়ার ন্যায় সমপ্রকৃতির লোকেরা সাধারণ মানুষকে কলির ভগবান সাজাইতে যে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন, অস্তিমে তাহার পরিণাম সুখকর হইবে না।

ভাঃ ৫।১৪।১৩ শ্লোক হইতে পাওয়া যায়, —“এই সংসারারণ্যে অসংসঙ্গে কখনও কখনও জীবের বুদ্ধি বিপর্যয় হয়। জলশূন্য নদীর গর্ভে পতিত হইলে

যেমন তৎক্ষণাৎ মস্তক ফাটিয়া যায়, পরে আরও ক্লেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমার্থলাভে বঞ্চিত ঐ জীব বেদ-বিরুদ্ধ পাষণ্ড-মতকে আশ্রয় করিয়া ইহকালে ও পরকালে দুঃখ পাইয়া থাকে।” “অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ” অর্থাৎ ইহজগতে হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা অত্যন্ত দুর্লভ। বিষ্ঠার কুমিকে গোলাপে স্থান দিলে সে যেরূপ তাহা সহ্য করিতে পারে না, সরিয়া গিয়া আবার বিষ্ঠাতেই বসে; তদ্রূপ অকল্যাণকামীকে শত শত হিতকর উপদেশ প্রদান করিলেও অকল্যাণের রাস্তা হইতে কিছুতেই সরিয়া আসিতে চাহে না। কলির ‘অনুকূল’ ভক্তিপথের প্রধান কণ্টক স্বরূপ, এই বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। কলির প্রতাপ শিষ্টজনের উপর কার্য্যকরী নহে, অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট কলি তাহার পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। শিষ্টজন সর্বদা সাধুসঙ্গে হরিকথায়, হরিসেবায় রত। তাহারা প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের সান্নিধ্য লাভ করেন। কলি অসাধুজনের উপর তাহার আধিপত্য প্রদর্শন করিয়া ভক্তিপথের পথিকগণের অর্থাৎ হরিভক্তের গৌণভাবে সেবাই করিয়া থাকে। কলিতে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, কলির অনুকূল বিষয়সমূহকে বর্জন করিয়া ভক্তির অনুকূলসমূহকে গ্রহণ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভাসিতে জীবের কোন অসুবিধা হইবে না।

— শ্রীভক্তিবৈদান্ত বোধায়ন



শ্রীরাধার ভাবে গোরা

ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহন না যায় ॥ ১ ॥
 বাহিরে সন্ন্যাসী বেশ, অন্তরে রাধা-আবেশ,
 সদা কৃষ্ণনাম গাহি যায়।
 রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানয়ে দিবা-রাতি,
 কোথা কৃষ্ণচন্দ্র বলি ধায় ॥ ২ ॥
 কভু নখে ভূমে লেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,
 ‘কৃষ্ণ’ বলি ভূমে গড়ি’ যায়।
 প্রভুর এহেন দশা দেখি, স্বরূপ-রাম-রায় আসি,
 গোপীগীত প্রভুরে শুনায় ॥ ৩ ॥
 স্বরূপের উচ্চগীতে, প্রভু ভাবাবেশে নাচে,
 কোথা বৃন্দাবনচন্দ্র মোর।
 কোথা গিরিবরধারী, কোথা বৃন্দাবনেশ্বরী,
 দেখা দাও বলে বারবার ॥ ৪ ॥

সাধারণ দেহাসক্ত গেহাসক্ত লোক যেখানে কেবল নিজের দেহকেই যথাসর্বস্ব জ্ঞান করে থাকে, সেখানে আরও দু'চারটা দেহকে সেই সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়ার এমন কথা—আহা কেমন উদারতা! কিন্তু, সত্যি কি তাই?

শাস্ত্র-আলোচনার অভাবে সাধারণ মানুষ এমন সব আপাত-মধুর কথা সহজেই লুফে নেয়। এক গ্রামের এক দঙ্গল মূর্খলোক একত্র হয়ে তাদের মোড়ল-মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করল—“আমাদের গ্রামেরই এই পার ভাঙ্গছে কেনে গা, নদীর ওপার কেনে ভাঙ্গে না?” মোড়ল-মহাশয় বললে—“আরে, ওটা যে নদীর ওপার, তাই ভাঙ্গে না, আর এটা তো এইপার, এইজন্য ভাঙ্গে। তোরা এমন মুখি রে—সোজা কথাটা বুঝিস্ নে!” গ্রামের লোকেরা সেই সোজা কথাটা তখন সহজেই বুঝে ফেলল—কে আর খামোকা ‘মুখি’ থাকতে চায়? এইভাবেই অনেকে বিশেষ অনুশীলন ছাড়াই বড় বড় দর্শনের কথা সহজে বুঝে ফেলে—আর ভীষণ বদহজম করে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

কিন্তু একবার যদি আত্মস্থ হয়ে, সমস্ত মনোবন্দন পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনপূর্বক বিচার করা যায়, তবে দেখা যাবে—ঐরূপ কথার প্রতিবর্ণে কেবল নাস্তিকতা। ‘ঈশ্বর নাই’, আর ‘সকলেই ঈশ্বর’—এই দুই কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ এক। জীবই ঈশ্বর হলে এবং সেই জীবের প্রেমই ঈশ্বর-সাধনা হলে ভারতবর্ষে মুনি-ঋষিগণের সহস্র বর্ষ যাবৎ ঈশ্বর-আরাধনা, তপস্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনই হত না—অথবা, ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ যে শ্রীহরির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে তাঁরই আরাধনায় প্রতিক্ষণ নিযুক্ত এবং যে শ্রীহরি-আরাধনার কথা নিজ, অনুগতগণের কাছে প্রতিমুহূর্ত্তে কীৰ্ত্তনে পঞ্চমুখ, তা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক বা মিথ্যা বলে বিবেচিত হত।

তাই বলছি, একবার বিচার করুন—বিচারহীন মেঘদের দলে মিশে যাবেন না। তা হলেই দেখবেন, দেখে শিউরে উঠবেন—ওঃ কি ভয়ংকর সে আসুরিকতা! ‘ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের কিনা কোন প্রয়োজন নাই! কারণ নাকি সেই ঈশ্বরই বহুরূপে তোমার সামনে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—যেমন, দেখ এইসব ‘দরিদ্র-নারায়ণ’, এমনকি যে চোর-ডাকাতগুলো দেখছ, তা’রা চোর-ডাকাত নয় গো, তা’রা সব ‘চোর-নারায়ণ’, ‘ডাকাত-নারায়ণ’! তুমি এদেরই সাথে প্রেম করো গো—তাতেই হবে ঈশ্বর-সেবা! আরাধনা, পূজা-পাঠ সব থাকুক পড়ে!! এসব কথাগুলো গীতা-ভাগবত পড়ে তা’ বুঝার কষ্ট করো, বরং তা’র থেকে ফুটবল খেললে শরীরটা ভাল থাকবে, বেগুন-গাছে জল দিলে বরং কিছু ফল পাওয়া যাবে!’

সে তো নিশ্চয়ই। কারণ সেই সব শাস্ত্র পড়লে আবার বস্তুজ্ঞান হয়ে যাবে যে, তখন ঐ সব কথার ফাঁক-ফোকর সকলই বেরিয়ে পড়বে। ‘আম’ ও ‘জাম’—দুটো ভিন্ন জাতীয় ফল। সেক্ষেত্রে কেউ যদি আমকে জাম বলে, অথবা জামকে আম, তাহলে এই-ই বুঝতে হয় যে—সে আম কি বস্তু, বা জাম কি পদার্থ, উভয়ের কোন

বিচারই জানে না, অর্থাৎ সে নিতান্তই বস্তুজ্ঞান-হীন। ঠিক সেইপ্রকার, ‘জীব’ ও ‘ঈশ্বর’—দুই ভিন্ন সত্ত্বা ; সেস্থলে ‘জীব’কে ‘ঈশ্বর’ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কোন্ ‘বিবেক’ বা ‘বস্তুজ্ঞানের’ পরিচয় বহন করে? ঐরকম বিবেকের আনন্দে থাকা কি ‘মুখের স্বর্গবাস’ নয়?

পাঠকগণ, উতলা হবেন না, ধৈর্য্য ধরুন—একদিন ফুটবল খেলা ছেড়ে শ্রীমদ্ভগবদ গীতার কথা একটু শুনুন। প্রথমেই কিছু বস্তুজ্ঞান হোক, তাহলেই এই সব আলোচনায় প্রবেশ-লাভ সম্ভব হবে। ‘জমিদারবাবু নায়েব-মশায়ের দ্বারা সমস্ত গ্রামবাসীর দেখাশুনা করেন’—আচ্ছা বলুন তো এই কথায় একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কি ধারণা করতে পারেন? এই কথায় এই স্পষ্ট ধারণা হয় যে, ‘জমিদারবাবু’ ‘নায়েব-মশায়’ ও ‘সমস্ত গ্রামবাসী’—সকলেই সব ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা। আরও ধারণা হয় যে, জমিদার-বাবু একজন এবং তিনি গ্রামের মূল কর্তা ও পরিচালক। আর নায়েব-মশায় জমিদার-বাবুর অধীন এক কর্মচারী—যাঁর মাধ্যমে জমিদার বাবু সমস্ত গ্রাম পরিচালনা করেন, এবং অন্য যে ‘সমস্ত গ্রামবাসী’, তাঁরা সংখ্যায় বহু ও জমিদার বাবুর দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। এস্থানে জমিদার-বাবুই ‘নায়েব-মশায়’ বা তিনিই ‘সমস্ত গ্রামবাসী’—এইপ্রকার ধারণা হবার কি কোন অবকাশ আছে? এইবার আসুন শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারাক্টানি মায়ায়া।।” অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত জীবগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি মায়ার দ্বারা কর্মযন্ত্রে আকৃষ্ট সমস্ত জীবগণকে ভ্রমণ করান। কেন ভ্রমণ করান, বা কিভাবে করান, সেই ব্যাখ্যা আলোচনা-ক্রমেই এসে উপস্থিত হবে। এখন যে বিষয় লক্ষিতব্য, সেটা হ’ল ‘ঈশ্বর’ ‘মায়া’ এবং ‘সমস্তজীব’ (সর্বভূতানি)—সকলেই সব পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বা। কিন্তু তন্মধ্যে এক ঈশ্বরই সর্বপরিচালক—মায়া তাঁর অধীন এবং সেই মায়ার দ্বারা অন্য সমস্ত জীবগণ ঈশ্বর-কর্তৃক পরিচালিত। এক্ষেত্রে ঈশ্বরই সেই মায়া বা ঈশ্বরই বহুরূপ ধারণ করে জীব হয়েছেন, অতএব জীবই ঈশ্বর—এইপ্রকার কষ্ট-কল্পনার কোন অবকাশই নেই। নতুবা গীতায় এই কথার অবতারণাই হ’ত না। সমস্ত শাস্ত্রেই ‘ঈশ্বর’ ‘মায়া’ ও ‘জীব’—এই তিন পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের বিচার রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যাঁদের সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের কোনদিন তত্ত্ববিভ্রমে পতিত হতে হয় না। সুতরাং To call spade a spade—অর্থাৎ “আম’কে ‘আম’ই বলতে হয়”—এই নিয়ম-অনুসারে ‘ঈশ্বর’,—ঈশ্বরই, তিনি সর্বকর্তা, সকল চরাচর জগতের প্রভু ও পরিচালক; ‘জীব’—ঈশ্বরের অধীন অণু অণু অসংখ্য সত্ত্বা, আর ‘মায়া’—ঈশ্বরের অধীনা এক শক্তি, যাঁর মাধ্যমে সকল সৃষ্টি পরিচালিত হয়। এই হলো ‘বস্তুজ্ঞান’।

জীব যখন এই বস্তুজ্ঞানকে অতিক্রম করে নিজেকে ‘ঈশ্বর’-রূপে ভাবে, তখন তাঁর মধ্যে আসুরিকভাব উদয় হয়। গীতায় ‘দৈবাসুর-সম্পদবিভাগ-যোগে’ ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ আসুরিক স্বভাবের বিভিন্ন লক্ষণের কথা বর্ণনার সময় একস্থানে বলেছেন,—“ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান সুখী॥” (গীঃ ১৬।১৪)। ‘আমিই ঈশ্বর’—জীবের এরূপ ভাবনাই যেখানে আসুরিকতা, সেখানে ‘সমস্ত জীবই ঈশ্বর, পৃথক্ ঈশ্বর-সম্বন্ধের প্রয়োজন নেই’—এইপ্রকার গণ-আসুরিক ভাবনায় সমস্ত অজ্ঞ জীবগণকে প্ররোচিত করা, বলুন তো আরও কত বড় আসুরিকতা, কি-প্রকার ঈশ্বর-দ্রোহিতা!

তাই বলছি, সেই প্রেমময় যিনি ঈশ্বর, তাঁর অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে জীবকেই ঈশ্বর ভেবে নিয়ে জীবের সাথেই প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে যাওয়া কেবল ঈশ্বর-দ্রোহিতাই নয়, মহা-ব্যাভিচারিতাও বটে—সে কথাও প্রসঙ্গক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হবে। কি বললেন? ‘একোহং বহু স্যাম্’—এক আমি বহু হব—সুতরাং এক ঈশ্বরই যখন বহুরূপ হয়েছেন, তখন এই বহুরূপগুলি কি ঈশ্বর নন?’ বাহু সুন্দর প্রশ্ন—তবে এর উত্তর ধৈর্য্য ধারণ করে শুনতে হবে। আমরা নিজেরাই কিছু মনগড়া উত্তর দিয়ে তো এর সমাধান করতে পারি না। শাস্ত্রীয় বিচার শাস্ত্র-অনুশীলনের দ্বারাই স্থির করতে হয়। তাহলে শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলার সময় একইপ্রকার বহুরূপ ধারণ করে যত সংখ্যক গোপী তত সংখ্যক কৃষ্ণ হয়েছিলেন—আবার, দ্বারকায় তিনি যত সংখ্যক মহিষী তত সংখ্যক কৃষ্ণ হয়ে মহিষীগণের সাথে বিলাস করতেন। সেই ‘এক’ যে ‘বহুরূপ’ হয়েছিলেন—তাঁরা সকলেই অবশ্যই ‘ঈশ্বর’। আবার তিনি তো সকলের নাথ—‘জগন্নাথ’, তাই তিনি একই সাথে জগতের সকলের সাথে অবস্থান করেন। সমস্ত জীব-হৃদয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-রূপে বিরাজ করেন—যত সংখ্যক ‘জীব’ তত সংখ্যক ‘পরমাত্মা’ হয়ে অবস্থিত আছেন। এইজন্যেই গীতায় বলা হয়েছে—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি॥” (গীঃ ১৮।৬৯)। সেই ‘এক’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু পরমাত্মা-রূপে সমস্ত জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন—এটা তাঁর পরম ঐশ্বর্য্য। এখানে ‘এক’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বহু ‘পরমাত্মা’-রূপ,—তা নিশ্চয়ই সকলই ‘ঈশ্বর-স্বরূপ’।

কিন্তু অনেকেই এস্থানে একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেন। তাঁরা ভাবেন—ঈশ্বরের সেই বহুরূপ বুঝি এই বহুপ্রকারেরই সমস্ত জীব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণ-কারণ—তাঁর থেকেই জগতে সমস্ত রূপের সৃষ্টি হয়েছে, এতে কোন সংশয় নেই। তথাপি এই সব রূপগুলি ‘ঈশ্বর-স্বরূপ’ নয়—এইগুলি ‘জীব-স্বরূপ’। “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (গীঃ ১৫।৭)—এই জীবলোকে যে ‘জীব’গণ আছে, তা শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য অংশ (বিভিন্নাংশ)-স্বরূপ। এইসমস্ত জীব কিভাবে জগতে সংস্থাপিত হয়েছে, সেটাও গীতায় স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—“মম যোনির্মহদ্রক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধ্যাম্যহম্। সন্তবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।” (গীঃ ১৪।৩)—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—‘দেখ, অজ্জুন, মহামায়া-রূপা যে মহত্বরক্ষ, সেটি আমার গর্ভাধানের স্থান, সেখানে আমি গর্ভাধান করি—অর্থাৎ

ঐ প্রকৃতিতে আমার ‘তটস্থ’-নামক শক্তি হ’তে উৎপন্ন জীবগণকে আধান করি। সেই গর্ভ হতে তখন ব্রহ্মা-আদি সমস্ত জীবের জন্ম হয়।’ এইভাবেই জগতে সমস্ত জীবের সংস্থাপন করে সেই ভগবান্ আবার অব্যক্তমূর্তিতে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকেন। গীতার নবম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটা তিনি বুঝিয়েছেন,—‘দেখ আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং পালক, তথাপি সেই সমস্ত জীব আমাতে অবস্থান করে না। হ্যাঁ, এটা আমার অসাধারণ ক্ষমতা—“পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্” (গীঃ ৯।৫)। এটা কিপ্রকার? উদাহরণ দিয়ে বলি, শুন—যেমন দেখ, এই সর্বব্যাপী আকাশ, সেখানে বায়ু সর্বত্র গমনাগমন করে। তথাপি সেই আকাশ বায়ুর সাথে সংযুক্ত নয়। ঠিক তেমনিই, আমি সমস্ত জীবের ধারক, পালক হয়েও তাদের সাথে সংযুক্ত নই। আমি উদাসীনের মতই সেই সমস্ত ধারণ-পালন কার্য্য করে থাকি—অথচ সেই সমস্ত কার্য্য আমাকে বন্ধন করতে পারে না।’ হ্যাঁ পাঠকগণ, ঈশ্বর এই সমস্ত জীবের সাথে এমন নির্লিপ্তভাবেই অবস্থান করে সমস্ত পালনাদি কার্য্য করে থাকেন। এখন বলুন, এর পরেও কি জীবগণকে ঈশ্বরেরই ‘বহুরূপ’ বলা যায়, যাতে ঈশ্বরকে আর পৃথকভাবে না খুঁজে জীবের সাথেই প্রেম করা যেতে পারে? (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবৈদান্ত তপস্বী

“সেবা”

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

গম্ভীরার দ্বারদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু শয়ন করিয়া আছেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ আসিয়া তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রসাদ পাওয়ার পর মহাপ্রভু শয়ন করিলে গোবিন্দের নিয়মই ছিল প্রভুর পাদ-সম্বাহন করা। তাঁহার এই পাদ-সম্বাহন সেবার ফলে প্রভুর নিদ্রা আসিয়া যাইত। প্রভু নিদ্রা গেলে পর গোবিন্দ তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু গৃহের সমগ্র দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়া আছেন। গোবিন্দ আর ভিতরে যাইতে পারিতেছেন না। পাদ-সম্বাহন সেবা করিবার জন্য কি করিয়াই বা প্রভুকে অতিক্রম করিয়া যান। তিনি প্রভুকে একপাশ ফিরিয়া শুইতে অনুরোধ করিলে প্রভু বলিলেন—“আমি খুব শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর অঙ্গ-সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা নাই।” গোবিন্দ কহিলেন—“প্রভো! আপনার শ্রান্তি অপনোদনের জন্যই ত’ পাদ-সম্বাহন করিতে গৃহ মধ্যে যাইব। এইভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে আমি কি করিয়া যাই? আপনি একটু পার্শ্ব পরিবর্তন করুন। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও প্রভুর একই উত্তর। তিনি বলিলেন—“তুমি সম্বাহন কর বা না কর—

আমি আর কি জানি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” গোবিন্দ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—যাহা হয় হইবে, সেবা ত’ করিতেই হইবে। সেবা বাদ দিলেও ত’ চলিবে না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার নিজের বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর উপরে ফেলিয়া দিয়া প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া পাদ-সম্বাহন সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবায় প্রভুর ক্রান্তি দূরে গেল। তিনি একঘণ্টা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর মহাপ্রভু দেখিলেন—গোবিন্দ অনাহারে বসিয়া আছেন। তাঁহার শুদ্ধ সেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য প্রভু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“গোবিন্দ! তুমি এখনও বসিয়া আছ কেন? আমি যখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, তখন তুমি প্রসাদ পাইতে গেলে না কেন?” গোবিন্দ বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন—“প্রভো! আপনি দ্বারে শুইয়া আছেন, যাইবার রাস্তা কোথায়। কেমন করিয়া প্রসাদ পাইতে যাই।” প্রভু বলিলেন—“বাঃ, বেশত। আমি এই একইভাবে শুইয়া আছি, তবে তুমি ভিতরে কি করিয়া আসিলে? যেক্ষপভাবে আসিলে, সেইরূপ ভাবেই ত’ তুমি প্রসাদ পাইতে যাইতে পারিতে।” তখন গোবিন্দ বলিলেন—“প্রভু, আমি আপনার সেবার জন্য আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিলাম। সেবাই আমার নিয়ম। আপনার সেবার জন্য যতই অপরাধ হউক, তাহাতে আমি কোনপ্রকার বিচলিত নহি। কিন্তু আমার ক্ষুদ্রবৃত্তিরূপ নিজ ভোগের জন্য আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া আমি কি প্রকারে যাইব? আপনার সেবার জন্য আমি কোটি কোটি অপরাধকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু নিজের ভোগের জন্য অপরাধের আভাসকেও আমি ভীষণ ভয় করি।” নিজভক্ত গোবিন্দের শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য-প্রকাশ অর্থাৎ ভক্তের সেবা-গুণ প্রকাশ করিবার জন্য প্রভুর এই লীলা।

গোবিন্দ মহাপ্রভুর এমন অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন যে, প্রভুর সেবার জন্য ভক্তগণ যে সকল নৈবেদ্যাদি আনিতেন সে সমস্ত দ্রব্য গোবিন্দের নিকটেই দিতেন। মহাপ্রভু যখন ভোজনে বসিতেন তখন গোবিন্দ প্রত্যেক নৈবেদ্যদাতার নাম এবং কি কি দ্রব্য দিয়াছেন এক একটা বলিতে থাকিতেন। প্রভুকে পরম সন্তোষে ভক্ত্যুপহৃত দ্রব্যগুলি ভোজন করাইতেন। এমনই গোবিন্দের মহিমা। গোবিন্দের এইপ্রকার সেবার আদর্শ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহা শ্রবণ করিলে আমাদেরও কিঞ্চিন্মাত্র সেবার অধিকার লাভ হইবে—সন্দেহ নাই।

(৫)

শ্রীমদমহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। দামোদর পণ্ডিত ও শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদের দুইজনের প্রতিই প্রভুর অকৃত্রিম প্রীতি ছিল। তবে শঙ্করের প্রতি প্রভুর বিশুদ্ধা প্রীতি। শঙ্করেরও প্রভুর প্রতি কোন সংকোচ ছিল না। তিনি প্রভুর নিকটেই রহিলেন। আনন্দমনে সর্ব্বদাই প্রভুর সেবা করিয়া চলিয়াছেন। বিন্দুমাত্র ক্রান্তি নাই। বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রধান ও আসল সেবা কাজ ছিল—প্রভুর পাদসেবা। এই সেবায় তিনি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব

করিতেন। কারণ তিনি প্রভুর সাহজিক প্রেমপাত্র ছিলেন। নিঃসঙ্কোচে প্রভু তাঁর সেবা গ্রহণ করিতেন, কোন দ্বিধা নাই।

গম্ভীরায় মহাপ্রভু শয়ন করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ দ্বারদেশে নিদ্রাভিভূত। হঠাৎ প্রভু কৃষ্ণবিরহে ব্যকুল হইয়া—কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন—হা রাধা ! হা কৃষ্ণ ! বলিয়া রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িলেন, এবং কৃষ্ণ অশ্বেষণের জন্য গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। গৃহের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছেন। ভাবোন্মত্ত অবস্থার জন্য কোথাও বহির্গমনের দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছেন না, দেওয়ালে মুখ ঘষিয়া ঘষিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন। এবং প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। প্রভুর এইপ্রকার দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখিয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ইহার প্রতিকার চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে—শঙ্করই একমাত্র সেবক, শঙ্করকেই প্রভুর প্রহরী রাখিতে হইবে। কারণ শঙ্করের প্রতি প্রভুর কোন সঙ্কোচ নাই। শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিবেন—প্রভুকে ইহা নিবেদন করিলে প্রভু শঙ্করকে নিষেধ করিলেন না। যাহা হউক সেইদিন হইতে শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি আনন্দমনে প্রভুর পাদসেবা করেন। প্রভুও তাঁহার শ্রীচরণ শঙ্করের গায়ের উপর দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। শঙ্কর হইলেন—“মহাপ্রভুর পাদোপধান”। এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া শঙ্কর নিরলসভাবে প্রভুর সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার ভয়ে আর রাত্রিতে বাহিরে যাইতে পারিলেন না।

শঙ্করের প্রতি মহাপ্রভুর কি প্রকার অস্বীয় বোধ বা আধান বোধ। একদিন মহাপ্রভু দেখিলেন যে প্রচণ্ড শীতে শঙ্কর খালি গায়ে নিদ্রামগ্ন। প্রশান্ত চিত্ত। মুখে কোন বিরক্তির ভাব নাই। প্রভু স্নেহ-পরবশ হইয়া তাঁহার নিজের গায়ের কাঁথাটি শঙ্করের গায়ে দিয়া দিলেন। কারণ শঙ্করের কষ্ট যে তাঁর নিজেরই কষ্ট। শঙ্কর জাগিয়া উঠিলেন। তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কারণ প্রভুর এই স্নেহ যে তাঁহার জীবনের পরম প্রাপ্তি। যাহা হউক তিনি আবার পদসেবায় নিযুক্ত হইয়া গেলেন। সেবার মহিমা যে, ভগবান ভক্তের সেবায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ধন্য ভক্তের সেবা।

(৬)

নবদ্বীপে শ্রীধর পণ্ডিত নামে এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরের একেবারে শেষের দিকে চাঁদ কাজির সমাধি রহিয়াছে। তাহার প্রায় একমাইল পূর্বদিকে শ্রীধর-অঙ্গন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীধরের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর পরমসমাদরে প্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ঘরের চালে খড় নাই। শ্রীধরের পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র। আহারের কোন সংস্থান নাই। কেবলমাত্র খোড় কলা বিক্রয় করিয়া কোনরকমে দিনাতিপাত করেন। কিই বা প্রভুর সেবা করিবেন। প্রভুর সেবার জন্য খোড়, কলা, মূলা কিছু দেন। প্রভু শ্রীধরকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—“শ্রীধর, তুমি যে সব সময় হরি হরি বল—ইহাতে তোমার কি লাভ? তোমার ত’ দুঃখের শেষ নাই। অন্নবস্ত্রের অভাবে সর্বদাই জঞ্জরিত। আর দেখ, অন্যান্য দেব-দেবীর আরাধনা করিয়া লোকে কত সুখে আছে।” প্রভুর কথায় শ্রীধর বলিলেন—“প্রভো ! আমার মনে ত’ কোন প্রকার দুঃখ বা অশান্তি নাই। আমি ত’ বেশ খাইয়া পরিয়া আছি। ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলবতী। তাঁহার ইচ্ছায় সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কাল কাটাইতেছে।” মহাপ্রভু শ্রীধরকে পরীক্ষা করিলেন মাত্র। শ্রীধরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তিনি ধীর, স্থির, অচঞ্চল। ভগবদ্ভক্তগণ কি প্রকার নিরবিরাম হন, তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ হইতেছেন শ্রীধর। সেবা-সুখ লাভ করিয়া তিনি এমনিই পরিতৃপ্ত যে—অপরধনের বাসনা তাঁহার নাই। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন—“না না শ্রীধর! কে বলিল তুমি দরিদ্র? তোমার বহু ধনসম্পত্তি আছে। তুমি বিশাল সম্পত্তির মালিক।” অর্থাৎ প্রভু বলিতে চাহিতেছেন যে, বৈষ্ণবগণ জাগতিক উন্নতির প্রতি অত্যাগ্রহী না হইয়া ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর পারমার্থিক ধনে ধনী। ভগবানের সেবায় সমর্পিতা আত্মা।

মহাপ্রভু বলিলেন—“শ্রীধর! আমাকে কি দিবে?” শ্রীধর হাতজোড় করিয়া কহিলেন—“আমি থোড় কলা বিক্রয় করিয়া কোনরকমে জীবন ধারণ করি। তোমাকে আর আমি কি দিব?” প্রভু নাছোড়বান্দা। তিনি জোর করিয়া ঐ থোড়, কলা, মূলা শ্রীধরের নিকট হইতে লইতে থাকেন—কখনও বিনামূল্যে, কখনও অর্দ্ধমূল্যে। শ্রীধর কি আর করেন। প্রভুর সঙ্গে পারেন না। প্রায়ই বিনামূল্যে থোড়-কলা-মূলাদি দিতে থাকেন। আর প্রভুও ভক্তের শ্রদ্ধা প্রদত্ত থোড়-কলা-মূলার নৈবেদ্য পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন। “শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়।”

শ্রীধরের সেবায় মহাপ্রভু এমনিই বশীভূত যে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ লীলা। শ্রীধরকে ত’ সেই লীলা সন্দর্শন করাইতেই হইবে। তজ্জন্য ভক্তগণকে শ্রীধরের গৃহে পাঠাইয়া শ্রীধরকে শ্রীবাস-অঙ্গনে লইয়া আসিলেন। এবং তাঁহাকে অপূর্ব ঐশ্বর্য্য মূর্তি দর্শন করাইলেন। উহা দেখিয়া শ্রীধর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় মূর্ছাভঙ্গের পর শ্রীধর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধিরূপ বরদিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার পাদপদ্ম সেবাই প্রার্থনা করিলেন।

“মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর।

শ্রীধর বলয়ে—প্রভু দেহ এইবর।।

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।।

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।

মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল।।” (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২৩।২২৫)

মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার প্রকাশ দেখাইলেন এবং বেদগোপ্য ভক্তিয়োগ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

প্রভু শ্রীধরের সেবায় এমনই আগ্রত যে একদিন শ্রীধরের ভাস্কায়েরে গিয়া উঠানে স্থিত একটি ফুটা লৌহ পাত্রের জল উল্লাসভরে পান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ম্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঠিক গৃহত্যাগের পূর্বেই একদিন শ্রীধর প্রভুর সেবার জন্য একটি লাউ লইয়া প্রভুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

“এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।

হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর।।

লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌর-সুন্দরে।

“কোথায় পাইলা?” প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে।।

নিজমনে জানে প্রভু কালি চলি যাও।

এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাও।।

শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।

এ’ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা।।”

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৩৩-৩৬)

শচীদেবী দুগ্ধলাউ রন্ধন করিয়া গৌরহরিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এমনই শ্রীধরের সেবা। যে সেবায় ভগবান একান্ত বশীভূত।

সুতরাং আমরা যদি শ্রীধরের কৃপা লাভ করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় মনোনিবেশ করিতে পারি—তবেই আমাদের জন্ম সার্থক হইবে—সন্দেহ নাই।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী



সমালোচনা

যোগীন্দ্র পাঠ্য “গীতার” আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভক্তি বিরোধী

আজকাল অষ্টাঙ্গ যোগিগণ বিভিন্ন গ্রামে তাঁদের সতীর্থগণ সহ প্রায়ই ‘গীতা-সভার’ আয়োজন করেন। উক্ত ‘গীতা-সভায়’ গীতার শ্লোকাবলীর পঠন-পাঠন তথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও পতঞ্জলির প্রণীত ব্যাখ্যার বিশদভাবে আলোচিত হয়। উক্ত ‘গীতা-সভায়’ ‘গীতার’ শ্লোকসমূহের বিরূপ ব্যাখ্যাতে অষ্টাঙ্গ-যোগিগণ আকৃষ্ট হন, তৎসম্বন্ধে উক্ত ‘গীতার’ কিয়দংশ হস্তগত হয়—তা’তে দেখা যায় ‘গীতার’ প্রতি শ্লোকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থখানি যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের ‘আধ্যাত্মিক-দীপিকা’ সম্বলিত এবং ভূপেন্দ্রনাথ স্যান্যাল কর্তৃক তাহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। ঐ গ্রন্থখানি ৭/১ আশুবিম্বাস রোড, কলিকাতা-২৫

—এই ঠিকানা হ’তে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থটির ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েক পৃষ্ঠার শ্লোকের ‘আধ্যাত্মিক’ ব্যাখ্যার কিছু অংশ-বিশেষ এস্থলে উল্লেখ করতঃ তাহা যে ভক্তি-বিরোধী ব্যাখ্যা তৎপ্রমাণে যত্নপর হ’য়েছি।

(১) ‘আধ্যাত্মিক’-অর্থেরূপক বা কাল্পনিক বুঝায়। ‘অধ্যাত্ম’—শব্দটি মনঃ সম্বন্ধীয়। ‘আত্মা’-অর্থের এস্থলে সূক্ষ্মদেহরূপ ‘মন’। মনঃ—সূক্ষ্মজড় বস্তু। কৃষ্ণ-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণলীলা,—সম্বলিত গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র ‘আধ্যাত্মিক’ নয় ; তাহা সর্ববৃত্ত-স্বাতন্ত্র্যময়ী, অপ্রাকৃত-মাধুর্য্য-সমম্বিত। মানুষের সৃষ্টি, প্রচেষ্টা ও কল্পনাদ্বারা তাহা জ্ঞেয় নয় ও হ’তে পারে না। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদের বাণী এস্থলে স্মরণীয়—“লিঙ্গ-শরীর দ্বারা অনুভূত আত্মা বা পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞানকে ‘আধ্যাত্মিক জ্ঞান’ বলা যায়। এই লিঙ্গ-শরীরই প্রাকৃত বলে ঐ জ্ঞান মায়িক জ্ঞান, তাহা শুদ্ধ সম্বিৎ নয়। সেই জ্ঞানগত বৃত্তি প্রেম নয়, তাহা কাম।” ‘গীতা’ কোনও প্রাকৃত গ্রন্থ নয়। গীতা শাস্ত্রকে আমরা অপ্রাকৃত মনে করি, ইহা আদৌ আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক নয়। পরমহংসকুল মুকুটমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—“রূপক বর্ণনদ্বারা শুদ্ধ অভেদবাদকে বুঝাবার জন্য যে সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। যে সকল বর্ণন পাঠ করে অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে। অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্য সত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। অপ্রাকৃত লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হ’লেও তা’তে ভৌতিকত্ব নেই ; সে সমস্তই চিন্ময়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বল্লে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝতে হ’বে ; তাহা চিন্ময় জীবের চিদ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।” অতএব ‘গীতার’ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিঙ্গ-দেহ তথা মন হ’তে উদ্ভূত হওয়ায় যোগিরাজের উক্তব্যাখ্যা কাল্পনিক মাত্র। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী যোগশাস্ত্রানুসারে কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব ব’লে স্থাপন করেছেন। উক্ত মতবাদিগণের মতে সর্বৈশ্বরেশ্বর সর্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করতঃ খণ্ড প্রতীতিময় পরমাত্মাই একমাত্র ভগবৎতত্ত্ব এবং এইভাবে যোগিগণ নিজমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সরল ও সহজ অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী আচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে জানালেন,—

“এই ত’ কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।

শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪১)

নির্বিশেষবাদী মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ‘বেদান্ত’ শ্রবণ করে ‘হাঁ’ বা ‘না’—কিছু না বলায় ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে জানাতে চাইলেন,—

“ভট্টাচার্য্য কহে,—না বুঝি, হেন জ্ঞান যার।

বুঝিবার লাগি’ সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥

তুমি শূনি' রহ মৌন মাত্র ধরি'।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি।।”

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১২৮-১২৯)

তখন ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর দিলেন,—

“প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নিশ্চল।

তোমার ব্যাখ্যা শূনি' মন হয় ত' বিকল।।

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।

ভাষ্য কহ তুমি—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।।

সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।

কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।।

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।

অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা।।

ব্যাস-সূত্রের অর্থ-যেছে সূর্য্যের কিরণ।

স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন।।

—(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩০-১৩২, ১৩৪, ১৩৮)

কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হটযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির সন্ধীর্ণতা ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে দোষাবহ ; উহাদের বিচারে আত্মস্তরিতা, দম্ভ ও অহঙ্কার প্রকাশিত থাকায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে এবং ভগবৎসেবা-রহিত হওয়ায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়। তাহারা মুক্তির কদর্থ করে ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলে। এমনই এক মুক্তি-পিপাসা-পরায়ণ নবদ্বীপ নিবাসী দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত-পাঠকালে ভগবান্ মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে পড়ায় ‘দেবানন্দের’ ব্যাখ্যা শ্রবণে বলেছিলেন,—

“---বেটা কি অর্থ ব্যাখ্যানে?

ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।।

ও বেটার ভাগবতে কোন অধিকার?

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।।

সবে পুরুষার্থ ভক্তি ‘ভাগবতে’ হয়।

‘প্রেমরূপ ভাগবত’ চারি বেদে কয়।।

চারিবেদ—দধি, ভাগবত—‘নবনীত’।

মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।।

মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।

ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত।।

মুণ্ডি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।

যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে।।

—(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১৩, ১৮)

উক্ত ভগবদ্বাক্যে ভাগবত, ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। দেবানন্দের শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা ও প্রকৃত সাধু-সঙ্গ না থাকায় ঐ সকল বিষয় অজ্ঞাতই ছিল। একদিন মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করতে গিয়ে, তাঁর পাঠে আত্মবিনাশকারী চিন্তাশ্রোতের গ্লানি-যুক্ত অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম-জ্ঞানপর ব্যাখ্যা এবং গৰ্ভদোকশায়ী বিষুণের সহিত সংযুক্ত হওয়ার বাসনায় যোগিগণের কৈবল্যলাভের যত্নবিষয়ে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ব্যথিত হন। কিন্তু মহাভাগবত শ্রীবাস ঠাকুরের শুদ্ধ হৃদয়-বৃন্দাবনে সর্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিহার হওয়ায় ভাগবত-বাণী-শ্রবণে সারা অঙ্গে শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়, ইহাতে দেবানন্দের ভক্তিহীন শিষ্য ও শ্রোতৃবৃন্দ বিরক্ত হয়ে শ্রীবাস ঠাকুরকে সে’ স্থান হ’তে টেনে বের করে দেয়। মুমুক্শু দেবানন্দ পণ্ডিতের ভগবৎসেবোন্মুখতা না থাকায় তিনি নিকের্বোধ শিষ্য পড়ুয়াদের এরূপ দুষ্কৰ্ম্ম করতে নিষেধ করেন নি। ইহাতে দেবানন্দ ও তৎশিষ্যগণ মায়াবদ্ধ জীবমাত্রই ছিলেন বুঝা যায়। দেবানন্দ পাণ্ডিত্য-অভিमानে ভাগবত-পাঠক সাজলেও তিনি জগতের উপকারের পরিবর্তে অপকারই করেছিলেন। তাই ‘চৈতন্যভাগবতে’ কথিত হয়—“গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ”। “ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ”। তখন মহাপ্রভু সেই শ্রীবাস-অবমাননকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন,—

“বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।

কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৭২)

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ড লাভে দেবানন্দের সুকৃতির উদয় হ’ল ;—

“চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।

যা’র দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥

চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি’ লয়।

সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগহয় ॥

চৈতন্যের দণ্ডে যা’র চিন্তে নাহি ভয়।

জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড হয় ॥”

—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৭৮-৮০)

দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাসন-দণ্ড শিরে ধারণপূর্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করেন ও শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দকে ক্ষমা করায় তিনি বৈষ্ণব-অপরাধ হতে মুক্ত হয়েছিলেন। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ এবং অনন্য ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা ব্যতীত অন্যকিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। যারা ‘ভাগবতের’ ব্যাখ্যাতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত অন্য কিছু অনুসন্ধান করে, সেই সকল নিতান্ত অর্বাচীন ও পাষণ্ড ব্যক্তিগণ ভাগবতের ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ দেখতে পায়। ভাগবতের অর্থ, গীতার অর্থ, শাস্ত্রের

মর্ম্মার্থ কে বুঝতে পারে? তদন্তরে “শ্রীচৈতন্য ভাগবতে” বলা হয়েছে,—

“ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।

সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি-সার।।—(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।২৫)

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চবিভূত চতুর্বিধ বিগ্রহ—যথা,—

“ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত জনে।

চতুর্থা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।।”—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮১)

অর্চাবিগ্রহ ও উল্লিখিত চতুর্বিধ বিগ্রহের তারতম্য—

“জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।

জন্মমাত্র এ’ চারি ঈশ্বর—বেদে কয়।।”—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮২)

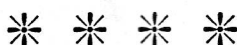
ভগবদ্‌পার্ষদগণের সঙ্গ যাদের হয় নাই, সেই সমস্ত কন্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ যথাক্রমে কন্ম, জ্ঞান ও যোগকেই ‘ভক্তি’ বলে ধারণা করে ও গ্রহ-ভাগবত যে কৃষ্ণের শাস্তিক অবতার এবং ভক্ত-ভাগবত যে কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ—এরূপ ধারণা করতে সমর্থ হয় না। তাই শাস্ত্রের শ্লোকাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভগবচ্চরণে অপরাধ আনয়ন করে ও মনে পাষণ্ডভাবের বৃদ্ধি ঘটায়।

(২) “গীতা-সভা” ও ‘গীতার’ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিয়ে যোগিদের যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখা যায়, সেই ‘গীতা’-শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়,—‘গীতা’ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ যাহা,—গৈ ধাতু ভ্ত স্ত্রীলিঙ্গে আপ দ্বারা গীতা শব্দ নিষ্পন্ন হ’য়েছে। ‘গৈ’ ধাতুর অর্থ গান। ভাব-প্রকাশক শব্দের সুর, তাল, লয়, মান প্রভৃতির ঐক্যতানই ‘গীত’। যে-শব্দের মাধ্যমে হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাব-প্রকাশক শব্দ। এই ভাব-প্রকাশক শব্দ সাধারণতঃ ত্রিবিধ—জড়াশ্রিত, জীবাশ্রিত ও চিদাশ্রিত। চিদাশ্রিত ভাব ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তিবিশয়ক চিদবিজ্ঞান যুক্ত সন্ধিগী-দ্যোতক। তাই ‘গীতা’-শব্দে জড়ীয় ভাব প্রকাশিত হয় না, বরং অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে অপ্রাকৃত ভাব ও চৈতন্য-বাণী প্রকাশে সমর্থ। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা’ বলতে দ্বাপর যুগের শেষে ভক্ত সখা অর্জুনের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গান বা বাণী। উক্ত গীতায় মায়াবাদের কোনও স্থান নাই এবং গীতার কোন শ্লোকের ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র প্রতীয়মান হয় না। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার’ নামে একমাত্র কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে উপনিষদই উদ্দিষ্ট। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে—“ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে”—এইরূপ পুষ্টিপকা পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পার্শ্বদ ভক্ত সখা অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে গীতায় যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন, তাহাই পরমার্থ-পথের বিশেষ সহায়। শ্রুতি যেরূপ অপৌরুষেয়, গীতাও তদ্রূপ ভগবৎ প্রচারিত ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ। এই অপৌরুষেয় গীতার কোন শ্লোকেরই কল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আদৌ সঙ্গত নয় ও নিন্দনীয়। একমাত্র অবরোহ পন্থায় সৎগুরুদেবের

অহৈতুকী কৃপায় গীতার অর্থ চিন্তে প্রকাশিত হয়। বিদেশী মনীষি ভন হামবোল্ট (Von Humboldt) লিখেছেন—“The Gita is the profoundest and loftiest thing the World has ever seen”—অর্থাৎ, গীতা জগতে গভীর জ্ঞানপূর্ণ তথা মহত্তম এবং উচ্চতম মহিমাম্বিত বস্তু।

গীতার প্রতি অধ্যায়ে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়েছে—“শ্রীভগবান্ উবাচ” অর্থাৎ ভগবান্ বললেন। ‘গীতার’ কোথাও যোগিদের আরাধ্য ‘পরমাত্মা উবাচ’—অর্থাৎ পরমাত্মা বললেন—এমন বাক্য কথিত হয় নি। ‘গীতার’ স্থানে স্থানে ভগবান্কে ‘কৃষ্ণ’, ‘যাদব’, ‘কেশব’, ‘গোবিন্দ’ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। ‘অর্জুন’ ভগবান্কে ‘হে সখা’ বলে সম্বোধন করেছেন। শ্রীভগবান্ সখা অর্জুনকে, ‘পার্থ’ (পুথার পুত্র), ‘কৌণ্ডেয়’ (কুন্তী-নন্দন তথা কৃষ্ণের পিসিমার পুত্র), ‘পাণ্ডব’—প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে বলেছেন, সঞ্জয়ের বাক্যে ভগবান্কে ‘গোবিন্দ’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। গীতায় ১।২৯ থেকে অর্জুনের উক্তি পাওয়া যায়—‘হস্ত হ’তে গাণ্ডীব-ধনু স্থলিত হচ্ছে’। গীতাতে ১।৩৪ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন,—“মাতুল বর্গ, শ্বশুর সমূহ, পৌত্র সকল, শ্যালকগণ, সম্বন্ধিবর্গ, সকলেই প্রাণ ও ধনসমূহ পরিত্যাগ করে যুদ্ধস্থলে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছেন। অতএব, হে মধুসূদন! এরা আমাদেরকে বধ করলেও এদেরকে বধ করতে ইচ্ছা করিনা।” কারণ “দৃষ্টেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্”—(গীতা ১।২৮)—যুদ্ধাভিলাষী সমবেত সকলেই আমার আত্মীয়স্বজন। এইভাবে ভগবান্কে সম্বোধনের ভাষা ও ভগবানের নিকট অর্জুনের উক্তির মধ্যে কোন স্থলেই ভগবানের পরিবর্তে পরমাত্মার উল্লেখ নাই। তার গাণ্ডীবধনু-গ্রহণাদি কার্য ও আত্মীয় মাতুলাদির সম্পর্ক ব্যক্তি তথা দেহধারী মানুষ ব্যতীত হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করা যায় না ও তাহা সম্ভব নয় ও অসঙ্গত। এবম্বিধ অবস্থায় গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কাল্পনিক হ’তে বাধ্য ও ভক্তি-বিরুদ্ধমত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ



পাষাণরাজ

সে বহু প্রাচীনকালের কথা। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিব্যরাজ হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটা রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অযথা একটা গাভী ও একটা বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। কম্পিতকলেবর ঐ বৃষটি একপদে দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটি বৎসহারার ন্যায় অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন

করিয়া ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কাব পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “ওরে মূঢ়, অচিরেই তোর দণ্ডবিধান হইবে।” এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

ঐ দুইটী প্রাণী আর কেহ নয়; ধর্ম্মই বৃষের রূপ এবং পৃথিবীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন।

অতঃপর বৃষরূপধারী ধর্ম্ম মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—“হে রাজন! সুখ-দুঃখের কর্ত্তা কে, এ বিষয়ে নানাজনের নানামত, কেহ বলে,—নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, কেহ বলে—গ্রহদেবতারা ই সুখ-দুঃখের বিধাতা, কেহ বলে—যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করে, আবার যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারা বলেন—স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখ-দুঃখের কারণ। আবার কেহ বলে—পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখের বিধানকর্ত্তা। কিন্তু ইহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়। কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি, সুতরাং সাত্বতগণ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।”

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—“হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন—ভগবানের সেবাবিমুখ হইলে ভোগ-বুদ্ধিবশতঃ জীব মনে কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবৎ-আরাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য—এই চারিটী বস্তু থাকাতে তোমার চারিটী পদই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও সৌন্দর্য্যের অভিমানে স্ত্রীলোকে আসক্তি, নেশার বশবর্ত্তিতা—এই তিনটী অধর্ম্ম কার্য্যদ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে। এই কলিতে “সত্য” মাত্র এই একটি পদ ছিল। তাহার উপরে তুমি কোনও রূপে দাঁড়াইয়াছিলে—তাহাও কলি “মিথ্যা” দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালন করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে, বোধ হয় ইহা মনে করিয়া পৃথিবীমাতা কাঁদিতেছেন।”—এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ রাজবেশধারী শূদ্র পাষণ্ড ব্যক্তিকে খজ্ঞাদ্বারা মারিতে উদ্যত হইলেন।

ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিটিই কলি। কলি তখন আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন, কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ গুণসম্পন্ন ভগবদ্ভজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ দুর্লভ। তজ্জন্যই শাস্ত্রে বলেন—

“অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।”

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহাদের অধস্তনসূত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। তাহারা শূদ্রত্বলাভ করিয়া কলিকালে এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা

পদর্শন করিবেন—

“শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।

ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরূহ্যোত্তমাসনম্।।”(ভাঃ ১২।৩।৩৮)

ইহারা কেবল উদর-পোষণের জন্য তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোকদেখান তপস্যার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন উদ্ধরেতা ষড়্বেগ বিজয়ী শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই কলিতে বহিরর্থমানী অদান্তগো অধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম বলিয়া ব্যবসার অবতারণা করিবে। পূর্ব-পূর্বজন্মে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ গুরু-বৈষ্ণবগণের মৎসরতা করিবে। তাহারা জানিবে না যে—

“ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা য়ে ন ভক্তা জনাদর্শনৈঃ।।”

জগতের পরমগুরু সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্তী হইয়া নানা পাষণ্ডমত ও নানা পাষণ্ডপথ কলিতে উদ্ভাবিত হইবে। অপরাধশূন্য হইয়া নিষ্কপটে একবারমাত্রও হরিনাম যে-কোনও অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমাগতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে। এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটি মহৎগুণ আছে—

কলেদৌষনিধে রাজমস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।

একমাত্র মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্তন হয় তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্তনও অপ্রাকৃতবস্তু; সেই অপ্রাকৃতবস্তু “সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ”— শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রভৃতিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। সেই কীর্তনে অন্য অভিলাষ যথা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, নির্ভেদ-ব্রহ্ম-অনুসন্ধানপরজ্ঞান, পাপ-পুণ্যময়-কর্মাদিরূপ মায়িক আবরণ থাকে না, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ববন্ধ-মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্বেই এইসকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত গলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তার-পূর্বক তাহাকে নির্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন,—এটি আর্য্যাবর্ত দেশ। এখানে গৌড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাকে এই চারটি স্থান দিতেছি, তুমি সেইখানেই সর্বদা থাকিবে—(১) দাবা-তাস-পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা, (২) নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস-পাশা খেলাতে মিথ্যাকপটতা প্রভৃতি,

নেশা করাতে তপস্যা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শৌচ নষ্ট, প্রাণী হিংসাতে দয়া নাশ। এই চারটি স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটি স্থান চাহিল যেখানে একই সময়ে এইসমস্ত অধর্মগুলি সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে একতাল সোনা দিয়া বলিলেন, এই স্বর্ণমধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোনাতে জুয়াখেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণীহিংসা সবই আছে। এই সোনা হইতে আবার পাঁচটি বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, (১) মিথ্যা কথা, (২) অহঙ্কার, (৩) কাম, (৪) হিংসা, ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও (১) জুয়া খেলা, (২) মদ, গাজা-তামাক পান, প্রভৃতি নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ (৪) প্রাণীহিংসা অর্থাৎ মৎস্য-মাংস গ্রহণ ও (৫) নিজের ভোগের জন্য কনকাদি গ্রহণ করিবেন না।

অথৈতানি ন সেবেত ভূভুষুঃ পুরুষঃ কচিৎ।

বিশেষতঃ ধর্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।৪১)

যাঁহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্তে তাহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন—

“তোমার কনক, ভোগের জনক,

কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,

তাহার মালিক কেবল যাদব ॥”

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে জানানো যাইতেছে যে, এখনও পর্যন্ত পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা বা আনুকূল্য যাঁহারা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অতিসত্ত্বর দেয় ভিক্ষা প্রদান করিয়া পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

নবদ্বীপ, নদীয়া—৭৪১৩০২

ভ্রমসংশোধন

১। পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা ২৯২ পৃষ্ঠায় সাধুসঙ্গের মহিমা প্রবন্ধটির শেষে লেখকের নাম ভ্রমবশতঃ উল্লিখিত হয় নাই। প্রবন্ধ লেখক — “ভক্তিবাদান্ত পৰ্য্যটক মহারাজ” হইবে।

২। পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা ২৯২ পৃষ্ঠায় ‘সবার নাথ—জগন্নাথ’-এর পরিবর্তে ‘সবার নাথ—শ্রীজগন্নাথ’ হইবে এবং উহার পরবর্ত্তিলাইনে ২৩৪ পৃষ্ঠার স্থলে ২৫১ পৃষ্ঠা হইবে এবং নাটিকাটির শেষে লেখক — “শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ” হইবে।

□ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩০ আশ্বিন, ১৪১১, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥	অন্য ধর্ম সূচুরূপে পালে যেই জন। হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥
--	---

১৯ দামোদর, প্রদ্যুম্ন, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ
৫৬শ বর্ষ } ৩০ কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৪১১, ইং ১৬/১১/২০০৪ { নবম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবাসাস্টকম্

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা।

শুক্লাম্বর-ধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কম্॥ ১॥

শুক্লবস্ত্রধারী, গৌরবর্ণ, গৌরভক্তিপ্রদাতা, পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীবাসপ্রভুকে সানন্দে
আশ্রয় করি॥ ১॥

শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ-লীলা-কীর্তন-সম্পাদি।

যঃ প্রধানতয়া খ্যাতঃ স শ্রীবাসো গতিস্মরম্॥ ২॥

শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপলীলায় সঙ্কীর্তন-সম্পাদে যিনি প্রধানরূপে খ্যাত, সেই
শ্রীবাসপ্রভু আমার গতি॥ ২॥

শ্রীগৌর-কীর্তনানন্দে পুত্রশোকোহপি নাস্পৃশং।

যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃ পুনঃ॥ ৩॥

শ্রীগৌর-কীর্তনানন্দে যাঁহাকে পুত্র-শোকও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই ভক্তরাজ
শ্রীবাসপ্রভুকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৩॥

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪

আদৌ বাসন্ত শ্রীহটে ভাগীরথ্যাস্তটে ততঃ।

কুমারহটে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতিগতিঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমে শ্রীহটে যাঁহার বাস ছিল এবং পশ্চাৎ ভাগীরথীর তীরে কুমারহটে বাস হইয়াছিল, সেই গৌরগতি শ্রীশ্রীবাস প্রভুই আমার গতি ॥ ৪ ॥

শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চৈতী সত্তমাঃ।

শ্রীবাস-ভাতরো জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমি সদ্ধরম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি—এই সত্তমগণ যাঁহার ভাতরূপে পরিচিত, সেই সাধুত্তম শ্রীশ্রীবাস-প্রভুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

পুরা নারদ-রূপেণ হরিনাম-সুধা-ঝরৈঃ।

যো জগৎ প্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোহধুনা গতিঃ ॥ ৬ ॥

পূর্বের যিনি নারদরূপে হরিনাম-সুধা-ধারায় জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, অধুনা সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুই আমার গতি ॥ ৬ ॥

যৎ-পত্নী মালিনীদেবী শ্রীগৌরাস্তমতোষয়ৎ।

স্বহস্ত-পঙ্কৈরন্নাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্মম ॥ ৭ ॥

যাঁহার স্ত্রী মালিনী-দেবী স্বহস্ত-পঙ্ক অন্নাদিদ্বারা শ্রীগৌরাস্তম মহাপ্রভুকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীবাস প্রভুই আমার গতি ॥ ৭ ॥

পতিবদ্ গৌরাস্ত-গতির্মালিনী গৌড়-বিশ্রুতা।

তৎ-পাদপদ্মসবিধে প্রণতির্মে সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥

গৌড়দেশে মালিনী দেবীর গতিরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাস্ত-মহাপ্রভুই যাঁহার পতিতুল্য গতি, সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুর পাদপদ্মে আমার সহস্র প্রণতি ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাস-পণ্ডিতম্।

যৎকারুণ্য-কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাস্তে রতির্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তম শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে বন্দনা করি, যাঁহার করুণা-কটাক্ষে শ্রীগৌরাস্তে রতি হয় ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব করি। কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে,

আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে, ঐ প্রক্রিয়াটি নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতে করিতে সংসার নিব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম-কাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে ; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শাস্তি কোথায়? সূতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয় ; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাত্ত্বিক দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যাদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধ উৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠা-আশা হইতে উদ্ভূত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে! কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশা-শূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,

আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে বাসনা করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদেরকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং

যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ (মনঃশিক্ষা—৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নিল্লজ্জ-চণ্ডালিণী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নিৰ্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিণীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম-বস্তুরূপে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে কেবল গ্রন্থচর্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-তাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম, তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুৎধর্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ের মন্দভাব দূরীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদগুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদগুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্তব্য।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

অর্থ ও অনর্থ

রুচি ও বিশ্বাসভেদে অর্থের তারতম্য

অর্থ ও অনর্থ-নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাসভেদে মিমাত্সা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যাভিলাষীর অর্থ কৰ্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে ; আবার ভগবদ্ভক্ত পূৰ্ব্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

অর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

সাধুগণ বলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কৰ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যুহচতুষ্টয়, কারণদোকশায়ী, গৰ্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্য-কূৰ্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস, সহচর, তদ্রূপ-বৈভব, গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণেন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অনর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেখানে অর্থ বা অর্থাত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয় ; তাহাই জীবের 'বিষয়' বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই ; যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন, তথায় অনর্থ-স্বরূপ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণসংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই, কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অর্থন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থ প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না ; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভলিয়া যান ; তজ্জন্য তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

অনর্থ-মুক্তির উপায়

সংসারদুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফলপ্রয়াস হন না। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পান না। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন, তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই।

অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

একসময় এই জীব সুখাশ্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ক্রটি করেন না (—অন্যাভিলাষ)। কখনও বা

পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমৃতিক সুখাঘেষণে জৈমিনির শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক-চরিত্র উন্নত করিবার বাসনা করেন (—কর্ম)। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণপূর্বক যতিধর্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্বিঘ্নীয়ী জীবন্তু মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন (—জ্ঞান)। এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক মতানুসরণে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যান্ট, সপেনহুয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসকবর্গের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কনফুচি, শাক্যসিংহ, কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানি-মহাত্মাগণের অনর্থসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়।

বিভিন্ন বাদাবলম্বিদিগের কৃষ্ণে প্রবৃত্তি না থাকায়

বিষয়-বাসনা প্রবল

কর্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবল তরঙ্গে দৌল্যমান হইয়া জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিল ভট্ট, উদয়নাচার্য অথবা অহত-সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমনপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ধুর বহন করেন। দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্যাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বা অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বহুীশ্বরবাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্বাকাদির দাস্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্যমতের পোষণ করেন। ইঁহারা যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আমরা এক্রপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাহারও কোন সেবা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দূরে থাক, বিষয়গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্তমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।

গৌর-কীর্তন-রসে মগন না হৈনু॥

শ্রীগৌর-কীর্তনে সর্বার্থ-সিদ্ধি

এক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীগৌরকীর্তনে জীবের সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধু-সঙ্গ পরিবর্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কীর্তনে সমর্থ কে?

যেখানে কপটতা-ধর্মক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিস্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন। তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর-কীর্তন করিতে সমর্থ হন।

অনর্থ-নিবৃত্তির ফল—নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সেবা

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরপদাক্তিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব-পুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমা

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রত্নসমূহ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজা-নদীর সমগ্র জলস্রোত নিগুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মালোকের সমগ্র জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ সুষ্ঠুরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নিব্বিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহ, জন ও তপলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারে প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর-চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না।

শ্রীগৌর-ভক্তের চরণাশ্রয়ে কৈবল্যাদি অনর্থ হইতে মুক্তি

নিক্ষিপ্ত, অনর্থ-নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্বসম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন,—

“কৈবল্যাং নরকায়তে ত্রিংশপূরাকাক্ষ পুষ্পায়তে

দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তৎ গৌরমেব স্তমঃ ॥

(চৈঃ চন্দ্রামৃতম্-১।৫)

[যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিগণসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সায়ুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।]

—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী
 শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রেমধর্ম—প্রাদেশিকতা ও
 ভাষা-সমস্যার উদ্বেগে অবস্থিত এবং
 বিশ্বশান্তি-মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
 তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)
 ইং ৫।৯।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

ভক্তিতে কোন প্রাদেশিকতা নাই। স্বয়ং ভগবান্ দেশ-কালের অতীত বলিয়া দেশ-কালাতীত- চিত্তই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন দেশ-কালের অন্তর্গত নহে। তবে কোন কোন মহাজন বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে কৃপা করিয়া বাংলাভাষায় কিছু গ্রন্থ লিখিলেও তাঁহাদিগকে বাঙালী মনে করা উচিত নহে।

যে-কোন ভাষাতেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রফেসর স্যান্যাল প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন, শ্রীনিমানন্দ প্রভু অসমীয়া ভাষায় ও মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত * দেশে * ভাষায় প্রচার করিতে থাকুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মই সমগ্র বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতি আনয়ন করিবে। কোন দেশই আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক-চিন্তা অত্যন্ত প্রাকৃত ও জড়ীয় ভাবে পুষ্ট, সুতরাং অনিত্য। অনিত্য চিন্তাধারা কখনই মনুষ্যকে নিত্য সুখ-শান্তি দিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম আত্ম-ধর্ম—দেহ মনের উচ্ছ্বাস-পোষক জড়ীয় অনাত্ম-ধর্ম নহে। দেহ ও মন জড় বস্তু ; ইহাতে আবদ্ধ থাকাই বদ্ধতা। আপনি নিষ্ঠাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ; সুতরাং সর্বদাই নিত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। অনাত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার আবশ্যিকতা নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য-৪)

স্বাবর-জঙ্গম যাহা কিছু আছে, গায়ত্রীই সব। গায়ত্রীই বাক্। বাক্ই সব প্রাণী। কেননা, বাণী উচ্চারণ দ্বারা গায়ত্রীর কীর্তন হইলে সমস্ত প্রাণী ভয়াদি হইতে রক্ষিত

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪

হয়। গায়ত্রীই পৃথিবী। তাহাতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থিত। পুরুষের শরীরেই পৃথিবী অবস্থিত। পুরুষের শরীরে যে হৃদয় আছে তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রীই ব্রহ্ম। তাহার ৪টা চরণ। সমস্ত ভূত ইহার একপাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত প্রকাশময় আত্মাতে অবস্থিত। এই পুরুষের ভিতর এবং বাহিরে যে আকাশ দৃষ্ট হয় তাহাও পুরুষের ভিতরে বিরাজিত। এই হৃদয়াকাশ পূর্ণ, অন্যত্র ইহার প্রবৃত্তি নাই। যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনিও পূর্ণ হইতে পারেন, অন্যত্র তাহার প্রবৃত্তি থাকে না।

হৃদয়ে পঞ্চ দেবসুবি (ছিদ্র) আছে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বদিকস্থ সুবিই ‘প্রাণ’। উহাই চক্ষু, আদিত্য, তেজ ও অন্ন। এইরূপে উহার উপাসনা করা কর্তব্য। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন। ইহার দক্ষিণ ছিদ্র ‘ব্যান’। উহাই শ্রোত্র, চন্দ্রমা, যশ ও শ্রী। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন। ইহার পশ্চিম ছিদ্র ‘অপান’। উহাই বাক্, অগ্নি, ব্রহ্মতেজ এবং অন্ন। যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্ম-তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন। ইহার উত্তর ছিদ্র ‘সমান’। উহাই মন, মেধা, কীর্ত্তি ও ব্যুষ্টি (শরীরের লাভণ্য)। ইহা জানিলে কীর্ত্তিমান ও কান্তিমান হইতে পারে। ইহার উর্দ্ধছিদ্র ‘উদান’। উহা বায়ু, আকাশ, ওজঃ এবং তেজ। এই তত্ত্ব জানিলে ওজস্বী ও তেজস্বী হয়। এই পাঁচ ব্রহ্ম-পুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল। এই দ্বারপাল-গণকে জানিতে পারিলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

দ্যুলোকের উপর যে পরমজ্যোতি বিশ্বের উর্দ্ধে প্রকাশমান, উহা ঐ পুরুষের ভিতরেও অবস্থিত। এই পুরুষের দর্শনোপায় এই—মনুষ্য এই শরীরে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উষ্ণতাকে জানিতে পারে। ইহার শ্রবণোপায় এই যে—যখন কণ বন্ধ করিয়া রথের নির্ঘোষ, বৃষের গজ্জন ও জলন্ত অগ্নির শব্দ শ্রবণ করিতে পারে। ঐ জ্যোতি দৃষ্ট ও শ্রুত হয়—এইপ্রকার জানিয়া উহার উপাসনা করিলে দর্শনীয় ও বিখ্যাত হইতে পারা যায়।

এই বিশ্বই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন)। কেননা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মে লীন এবং ব্রহ্মেই চেষ্টাশীল। শাস্ত্রভাবে এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত। ঐ ব্রহ্ম মনোময়, প্রাণময়, প্রকাশ-স্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশ-শরীর, সর্ব-কর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস এই অখিল বিশ্বকে সর্বদিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বাক্রহিত ও সঙ্গমশূন্য। আমাদের হৃদয়-কমলে স্থিত এই আত্মা ধান্য, যব, সরিষা অথবা শ্যামাধান্য হইতেও সূক্ষ্ম; আবার ইনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক অথবা সমস্ত লোক অপেক্ষা বড়। তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস—এ সকলকেই সব দিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, আবার তিনিই আমাদের হৃদয়কমলে অবস্থিত। ইনিই ব্রহ্ম। এই শরীরের মৃত্যু হইলে আমি তাহাকেই প্রাপ্ত হইব। যাহার এবিষয়ে সন্দেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অন্তরীক্ষ যাহার উদর, সেই বিরাট কোশের মূল পৃথিবী। দিক্‌সকল উহার কোণ, আকাশ উপরের ছিদ্র। উহাতেই সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। ঐ কোশের পূর্বদিকের

নাম পুঙ্খ। দক্ষিণদিকের নাম সহমানা, পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী এবং উত্তরদিকের নাম সূভূতা। বায়ু ঐ দিকসকলের বৎস। যিনি ইহা জানেন, তিনি পুত্রের নিমিত্ত রোদন করেন না।

পুরুষই যজ্ঞ (যেহেতু তাঁহা হইতেই যজ্ঞ প্রবর্তিত)। তাঁহার যে ২৪ বর্ষ আয়ু, তাহা প্রাতঃসবন। ২৪ অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীছন্দে ঐ প্রাতঃসবন সংবদ্ধ। বসুগণ ঐ প্রাতঃসবনের অনুগত। প্রাণই বসু। কারণ ইনিই এই সকলকে বসাইয়াছেন। যদি এই প্রাতঃসবনসম্পন্ন আয়ুতে কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে এইপ্রকার বলা উচিত—“হে প্রাণরূপ বসুগণ! আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যদিন সবনে যুক্ত করুন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণরূপ বসুর মধ্যে নষ্ট না হই।” তাহা হইলে কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ হইতে পারিবে।

এই প্রাতঃসবনের পর ৪৪ বর্ষ মাধ্যদিন সবন। ত্রিষ্টুপছন্দ ৪৪ অক্ষরবিশিষ্ট। ঐ সবন ত্রিষ্টুপছন্দে সংবদ্ধ। রুদ্রগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই রুদ্র। কেননা ইনিই সমস্ত প্রাণীকে রোদন করাইয়া থাকেন। রোদন হেতু রুদ্র নাম। যদি এই যজ্ঞকর্তাকে কেহ (রোগাদি) সন্তপ্ত করে তবে তাহার এইপ্রকার প্রার্থনা করা উচিত—“হে প্রাণরূপ রুদ্রগণ! আমার এই মাধ্যহ্নিক সবনকে তৃতীয় সবনের সহিত এক করিয়া দিউন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণরূপ রুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই।” তাহা হইলে ঐ কষ্ট দূর হইয়া নীরোগ হইবে।

এতদ্ব্যতীত বাকী ৪৮ বৎসর তৃতীয় সবন। জগতীছন্দ ৪৮ অক্ষর-বিশিষ্ট। এজন্য জগতীছন্দ তৃতীয় সবনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। আদিত্যগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই আদিত্য। কারণ ইনিই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করেন। ইহার উপাসককে যদি কোন রোগাদি সন্তপ্ত করে, তবে তাহার এইপ্রকার প্রার্থনা করা উচিত—“হে প্রাণরূপ আদিত্যগণ! আমার এই তৃতীয় সবনকে আয়ুর সহিত একীভূত করুন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণরূপ আদিত্য মধ্যে বিনষ্ট না হই।” এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে ঐ কষ্ট হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ঐতরের দাস এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অরে রোগ! তুই কেন আমাকে কষ্ট দিতেছিস্, ইহাতে আমার মৃত্যু হইবে না। তিনি একশত ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সবন-বিদ্যাকে জানিলে এইপ্রকার আয়ুবিশিষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি পান-ভোজনের ইচ্ছা করে, কিন্তু রমমান হয় না, তাহাতে প্রসন্ন বা আসক্ত হয় না—উহাই তাহার দীক্ষা। আর যে পান-ভোজন ও রতি অনুভব করে, সে উপসন্দের সাদৃশ্য লাভ করে। আর যে হাস্য, ভোজন ও মৈথুন করে, যে স্তম্ভশস্ত্রের সমানতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি তপ, দান, আর্জব, অহিংসা ও সত্যবচনযুক্ত ইহা তাহার দক্ষিণা।

ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই যজ্ঞদর্শন শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে অন্যবিষয়ে তৃষ্ণাহীন হওয়া যায়। এই বিদ্যার অন্তকালে তিন মন্ত্র জপ করিতে হয়।

‘তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত ও তুমি অতিসূক্ষ্ম প্রাণ।’ এবিষয়ে দুইটি ঋক্—“আদিৎপ্রত্নস্য রেতসঃ” এবং “উদ্বয়ং তমসাপরি”। প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য এই—পুরাতন প্রকাশ—পরমব্রহ্মে স্থিত দেদীপ্যমান তেজ। অপর মন্ত্রের অর্থ—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে উৎকৃষ্ট জ্যোতিকে দেখিতে পাইলে প্রকাশমান সর্বোত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনই ব্রহ্ম—ইহা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপাসনা এবং আকাশ—ব্রহ্ম, ইহা আধিদৈবত দৃষ্টি। এই মনঃসংজ্ঞক ব্রহ্ম চারিপাদবিশিষ্ট—বাক্, প্রাণ, চক্ষু ও শোত্র। ইহা অধ্যাত্ম। আর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিকসকল এই চতুষ্পদ আধিদৈবত। বাক্ ব্রহ্মের এক চতুর্থপাদ, উহা অগ্নিরূপ জ্যোতিতে দীপ্ত ও তপ্ত হয়। ইহা জানিলে কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ হেতু দেদীপ্যমান হয় ও তাপ প্রদান করিতে পারে। প্রাণ মনোময় ব্রহ্মের অপর চতুর্থপাদ, উহা বায়ুরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় ও তাপ দেয়। ইহা জানিলে কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হয়। চক্ষু মনঃসংজ্ঞক ব্রহ্মের চতুর্থপাদ, তাহা আদিত্যরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়। ইহা জানিলে কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হয়। শোত্র মনঃসংজ্ঞক ব্রহ্মের চতুর্থপাদ। তাহা দিক্‌রূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় ও তাপ দেয়। ইহা জানিলে কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হয়।

আদিত্যই ব্রহ্ম। তাহার ব্যাখ্যা করা হইতেছে—প্রথমে ইহা অসৎ (কারণ) ছিল। পরে সৎ (কার্য্যাভিমুখ) হইল। তাহা অন্ধুরিত হইল। উহা এক অণ্ডে পরিণত হইল। একবৎসর ঐরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহা দ্বিধা ভিন্ন হয়। তন্মধ্যে একটা রজত ও অপরটা সুবর্ণবর্ণ। সুবর্ণময়ই দ্যুলোক। ঐ অণ্ডের জরায়ু (স্থূল গর্ভবেষ্টন) পর্বত, আর উল্ল (সূক্ষ্মগর্ভবেষ্টন) মেঘের সহিত কুয়াশা রূপে পরিণত হইল। ধমনীসকল নদী, বস্তুগত জল সমুদ্র হইল। পুনরায় তাহা হইতে আদিত্য উৎপন্ন হইল। আদিত্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ হইল এবং তাহা হইতে সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত ভোগ উৎপন্ন হইল। এজন্য উহার উদয় ও অস্ত হইলে দীর্ঘশব্দ যুক্ত ঘোষ উৎপন্ন হয় এবং প্রাণীসকল ও ভোগসকলের উৎপত্তি হয়। যিনি ইহা জানিয়া আদিত্যই ব্রহ্ম—এইপ্রকার উপাসনা করেন, তিনি আদিত্যের সামীপ্য লাভ করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমণ্ডিত্ত্বদেব শ্রৌতী মহারাজ

অভাব

পরিদৃশ্যমান জগতে অবিদ্যা-হত জীব-মাত্রেরই ভাবধারা লক্ষ্য করিলে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে সর্বপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও যেন কোন অভাব তাহাদের বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছে। পশু, পক্ষী, কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য-দেবাদি পর্য্যন্ত তাহাদের স্ব-স্ব অভাব সর্বতোভাবে

দূরীকরণের জন্য সর্বক্ষণ তৎপর। কিন্তু কাহার কি প্রকার অভাব তাহা বোঝা কঠিন। মনুষ্যের প্রাণীর অভাব, মনুষ্যের সহিত সর্বাংশে ঐক্য থাকিলেও ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে অভাব নিরাকরণের বা দূরীকরণের জন্য জ্ঞান-প্রাচুর্য্য মনুষ্যেই বর্তমান; কিন্তু ঐ জ্ঞান, যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপে যাহা দেখা যায়, তাহাদ্বারা মনুষ্য-জ্ঞানের গরীমার কিছু আছে বলিয়া ধারণা করা যায় না। অভাবের সত্ত্বা কোথায়?

এমন একটি স্থানে জীব উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে শাস্তির লেশমাত্র নাই। অশান্তির পূতিগন্ধময় আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া চায় কিনা শাস্তি! জৈব-চিহ্নের নিত্যভিলষিত শাস্তির অপ্রাপ্তিহেতু সর্বসময়েই অভাব অনুভব করিয়া থাকে। জীবের তথাকথিত শাস্তির প্রকারভেদ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহা অসংখ্য প্রকার—এমন কি, যাহা জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত গণনা করিয়া উঠা যায় না। বালকের শাস্তি, যুবকের শাস্তি, বৃদ্ধের শাস্তি, পুরুষের শাস্তি, স্ত্রীর শাস্তি—একের সহিত অন্যের পার্থক্য সংরক্ষিত করিয়া চলিতেছে। যে সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া জীব শাস্তির আশা করে, তাহাদের নিকট হইতে নিজ-অভিলষিত অভাব পূরণের জন্য নিজের স্বাধীনতাকেও বলিদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। হতভাগ্য জীব নিয়তই তাহাদেরই নিকট হইতে বঞ্চিত হইলেও তাহাদের কৃপা-কটাক্ষের মধ্যে থাকিবার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু হায়, দুর্ভাগা জীব বোঝে না যে, সে যে-সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা সমস্তই অশান্তিময়। সুতরাং তাহার দ্বারা শাস্তির অভাব মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে তাহার ভাগ্যে প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না।

অভাবের জ্বালায় জীবের চিত্ত সর্বসময়ে জ্বলিতেছে। এই জ্বালা নিব্বাপিত হইবার উপায় একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া দেখা যায় না। গীতাতে বলিয়াছেন—“নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তুত্বনয়োস্তুত্বদর্শিতঃ।।” (গীঃ ২।১৬)। সৎ ও অসৎ-ভেদে বস্তু দুই প্রকার, অসতে অভাব দেখা যায়, সৎ-এ অভাব নাই। যেখানে অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে নাশ সম্ভব। এই কারণে জীব সদ্বস্ত হইয়াও অভাবযুক্ত বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় চিরকালই অভাব অনুভব করিতেছে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপ বিষয় পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্কে সর্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে।

এই ‘বিষয়’ জীবের চরম মৃগ্যস্বরূপ হওয়ায়, বাস্তব শান্তিপদ বিষয় হইতে জীব তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য শাস্তির লেশমাত্র পাইতেছেন না; কেবলই প্রতারণিত হইতেছে। কারণ অসৎ বস্তুর গঠনেই কেবল বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ যে-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত করিয়া তাহা জীবের অভাব মিটাইবার ভরসা প্রদান করিতেছে, পরমুহূর্ত্তে সেই স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া অন্য স্বরূপে জীবের অভাবকে চির-বর্দ্ধিত করিতেছি ও অভাবের আগুন দ্বিগুণ হইতেও বৃহৎগুণে

প্রজ্জ্বলিত করতঃ জীবের চিত্তকে ভস্মাস্ত্রুপে পরিণত করিতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন—
 “কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশান্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
 নোপশাস্তিঃ।।” (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২।৬)। কামাদি ষড়্রিপুর দাসত্বে চিরশাস্তি
 লাভের জন্য জীব সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও শাস্তির নিকট উপস্থিত হইতে পারে
 না, তজ্জন্যই গীতার পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিলে অসৎ বস্তুর চাহিদা পরিপূরণের জন্য
 চেষ্টা না করিয়া সদ্বস্তুর অনুশীলন করিলে বাস্তব অভাব চিরতরে নিবৃত্ত হইবে।
 গীতা বলেন—‘আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।’ (গীঃ ৬।৫)—আত্মাই
 আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যেখানে জীবাত্মা ঈশ-বিমুখতা লাভ করতঃ
 নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য দৈবী-মায়াকে আশ্রয় করে, সেখানে চেতনের সাক্ষাৎ
 ক্রিয়া না থাকিলেও চিদাভাস মনের চেতন্য-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিষয়ের
 সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে ; এই কারণে আত্মার বাস্তব-সত্ত্বার অনুপলব্ধ অবস্থায়
 অপ্রাপ্ত-বল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণের আত্মাভিমানী মনই চির শত্রুর কার্য্য করিয়া
 চির অভাবের পথে টানিয়া আনে।

“সন্ত এবাস্য ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।”—এই উক্তি-অনুসারে সদ্বস্তুর
 অনুশীলনকারী সাধক সাধু-সঙ্গদ্বারা সৎ ও অসতের তত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যা-
 উপহত (অর্থাৎ অবিদ্যা-দ্বারা আক্রান্ত) বিরূপগ্রস্ত জীবস্বরূপে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অনর্থ
 কল্পনা করিত, সেখানে সাধুকুপায় নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মার নিত্য কৃত্য—
 পরমাত্মার সেবা-সন্নিধানে নিজেকে পৌছাইবার জন্য কৃষ্ণ-বিমুখিনী মায়ার সঙ্গ
 সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করে। সেইস্থানে আত্মাই আত্মার
 বন্ধু।

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই জীবের অভাব। এই অভাব জীবকে স্বভাব
 হইতে তফাৎ করিয়াছে। বাস্তব অভাবের অনুভূতি যেখানে, সেখানে জীব স্ব-স্বভাব
 পরিত্যাগ করিতে পারে না। জৈবস্বরূপে বাস্তব অভাব না থাকায় সে সর্ব্বক্ষণ
 অভাব-বিহীন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্য প্রয়াসী ; কিন্তু দুঃখের বিষয় জীব
 এমন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে যে—“পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
 মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।” এইভাব দুরীকরণার্থ এবং বাস্তব স্বভাবের
 জাগরণের জন্য জাগ্রত ব্যক্তির সঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। গীতায় বলিয়াছেন—“যা
 নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্য্যং জাগর্তি সংযমী। যস্য্যং জাগ্রতি ভূতানি সা
 নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।” (গীঃ ২।৬৯)। জীব ভোগপ্রবণতাহেতু ঈশ্বর-আরাধনায়
 নিদ্রিত, আর ভোগেতে জাগ্রত, কিন্তু সংযমী পুরুষ ভোগেতে নিদ্রিত এবং
 ঈশ্বর-আরাধনায় জাগ্রত। এমত জাগ্রত পুরুষের সঙ্গদ্বারা জীবের ভোগের নেশা
 ক্রমশঃ দুরীভূত হইয়া বাস্তব অভাব নিবৃত্তি হইয়া যায়।

যেখানে ভোগ সেখানেই অভাবের সূচনা বা তাড়না। ভগবানের সহিত জীবের
 স্বরূপ অবস্থায় অভাবের সূচনা বা তাড়না কোনটাই লক্ষিত হয় না। অতএব

ভগবানে প্রীতি করাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ; এই স্বধর্ম হইতে চ্যুতিবশতঃ জীবের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা ও যন্ত্রণা। এখন যাহাতে জীবগণ তাহাদের বাস্তব অভাব দূরীকরণার্থ সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য এই অমূল্য জীবন—যাহা মনুষ্যাকারে লাভ হইয়াছে তাহাকে সর্বতোভাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ভগবান্ জীবের, জীব ভগবানের; কিন্তু জীব তাহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যে দুঃখ-কষ্ট অভাব বোধ করিতেছে, তাহা চিরকালের জন্য প্রশমিত হইয়া নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ও সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে, যদি সে তাহার আরাধ্য বস্তুর সন্ধানের জন্য চেষ্টাপর হয়। সেই বস্তুকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায়। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে আর কোনপ্রকার অসুবিধা থাকিতে পারে না। সেই ভক্তি-বৃত্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও তাহাকে প্রকাশ করিতে বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইবে। “শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটি-রুদ্ধঃ”। ভক্তিপথ অনুসন্ধানকারী সাধুজনের আশ্রয়-গ্রহণই জীবের একমাত্র কর্তব্য। তাহা হইলে ক্রম-পর্যায়ে সমূহ বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়া যাইবে ও আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হইবে। তখন আর অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে বহু প্রকারের অভাবের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও বাস্তব অভাব অজ্ঞাত থাকায় অনন্ত জীবন এই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে। ভগবৎ প্রাপ্তিই বর্তমান বদ্ধ জীবের একমাত্র অভাব। এই অভাব মিটিলে সকল অভাবই দূরীভূত হইবে এবং পরাশান্তির অধিকারী হইবে। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য অভাব বাস্তব অভাব নয়। এই সমস্ত প্রাকৃত অভাবই জীবকে অভাব হইতে চ্যুত করিয়াছে। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ অভাব জীবের যাহাতে মিটিয়া যায় তজ্জন্য জীবের ঐকান্তিক সাধনের প্রয়োজন।

—শ্রীভক্তিকুমুদ সন্তগোস্বামী মহারাজ

শিষ্যব্রতের গুরুসেবা ও হরিভজন

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

সদগুরুর লক্ষণ ও পরিচয়

জীবের স্থূলদেহের জন্মদাতা ‘পিতা’ হইতে সূক্ষ্মদেহের জনক সংস্কার-প্রদাতা ‘আচার্য্য’ শ্রেষ্ঠ, এবং আচার্য্য হইতে সন্মুক্তজ্ঞান-প্রদাতা আশ্রয়-বিগ্রহ ‘শ্রীগুরুদেব’ শ্রেষ্ঠ। পিতৃত্বে কর্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড এবং গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। শৌক্য, সাবিত্র্য-জন্মের পর তৃতীয় দৈক্ষ্য-জন্মে তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব সদগুরুর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।

চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪

মুকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যিনি (সম্বন্ধজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানরূপ) জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকাদ্বারা অজ্ঞান-তিমিরাক্ত আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। যাঁহার কৃপায় মুকণ্ড বাচালত্ব লাভ করে এবং পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, সেই দীনতারণ গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি। যিনি শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট পরিপূরণকারী, যাঁহার অপার করুণায় নামশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র, সপার্বদ শচীনন্দন, ধামসহ শ্রীরাধামাধবের সেবা-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই মাধবাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত হইতেছি।

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ব, বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

(ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম)

যাহা প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, অনুমানের দ্বারা যাহা লাভ হয় না, গুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে সেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের সন্ধান দান করেন। তিনি শিষ্যকে নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূলসংসার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করাইয়া বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবজ্ঞান—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

গুরুদেব অনিত্য বস্তু নহেন। তিনি নিত্যসেবা-বিগ্রহ, করুণাময় পতিতপাবন-মূর্তি। গুরুদেব মর্ত্য নহেন, তিনি নিত্যবস্তু। গুরুদেব নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য—“নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, ধর নিতাই চরণ দু'খানি।” তিনি আশ্রিতজন-বৎসল। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবককে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না এবং সর্বর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

গুরুদেব শিষ্যের প্রতি অপার করুণাময়, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ—সর্ব্বমুলাধার ভগবানকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বসদৃশ-বিশিষ্ট, নিখিল জীবের কল্যাণকামী, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, শিষ্যের সকল প্রকার সংশয়ছেদনে সমর্থ এবং সতত ভগবৎসেবানিষ্ঠ ; এইজন্য তিনিই প্রকৃত ‘গুরু’ পদবাচ্য।—

কৃপাসিদ্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।

নিষ্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

সর্ব্বসংশয়-সচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫)

শ্রীগুরু পাঁচ পকার,—বর্ষপ্রদর্শক গুরু, শ্রবণ-গুরু, ভজন-গুরু, শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরু। বর্ষপ্রদর্শক গুরু—যিনি ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে সদৃগুরু-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রবণগুরু অনেকস্থলে ভজন-শিক্ষাগুরুর কার্য্য

করেন। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও আগমশাস্ত্র-কুশল বৈষ্ণব-গুরুই উপযুক্ত মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বিষ্ণু-সেবাসিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা গুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবানুভূতি প্রদান করেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব।

“কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করেন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষা-গুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষা-গুরুর প্রায়ই একত্ব ; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজন-শিক্ষাগুরু দুই প্রকার—মহান্তগুরু ও চৈত্য়গুরু। চৈত্য়গুরু ভজনানুকূল বিবেক প্রদান করেন।”

“সাক্ষাদ্ভরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সত্ত্বিঃ।

কিন্তু প্রভোযঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।”

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব ‘সাক্ষাৎ হরি’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সदा ঐরূপ হইয়াও ভগবানের একান্ত প্রিয় সেবক, সেই শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।১।৪৪)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব না হইলেও তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ। গুরু-নিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও শ্রীচৈতন্যের দাস্যাভিমানী। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্ন্যহাপ্ত ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয় না। গুরুদেব ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ সেবক। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি ভগবান্ হইতেও বড়* বলিয়া পূজ্য।—“মন্তুঃপূজ্যভ্যধিকা।”

কৃষ্ণতত্ত্ববোত্তাই প্রকৃত সদ্গুরু। তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শিষ্যের চরম কল্যাণ বিধান করেন। তাহাতে ভগবদাস্য ব্যতীত অপার প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক ভগবান্। সেব্যের সেবা-প্রকাশই তাঁহার ধর্ম। তাই তিনি ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। ভগবান্ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবান্ বলিতেছেন—আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবে না—করিলে অনাদর করা হইবে। গুরুদেব সর্বদেবময়।—

গুরু—কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।। (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

* গুরুদেব তত্ত্বতঃ ভগবান্ হইতে বড় নহেন, যেহেতু ভগবান্ অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। এস্থলে ‘বড়’ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্কে তিনি ভক্তিদ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহা ভিন্ন ভগবানের অন্য স্বতন্ত্রতা নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এবং তিনিই সেই কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণসেবাকে অন্যের নিকট দিতে পারেন।

আচার্য্য মাং বিজনীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আচার ও প্রচারমুখে বৈষ্ণবচার্য্য জগতে ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁহার আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্যকার্য্য নাই। সেব্য-বস্তুর সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু। অনন্যভক্তিই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। তিনি সেবা ভগবানের অভিনাদ। শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—“হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।”

গুরুদেব শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা জানাইয়া বিষয়ী শিষ্যকে সংসার হইতে উদ্ধার করত শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন—একদেহ, একতনু। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্ বা বিষয়-ভগবান্ এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্। ভগবানের কৃপায় গুরুকে জানা যায়, আবার গুরু-কৃপায় ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। শাস্ত্র বলেন,—যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ। গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুর গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। তাই গুরুদেব ভগবান্ হইয়াও পরমভক্ত—সেবা-বিগ্রহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রেরিত নিজজন। বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা-শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণ যেরূপ আনন্দিত হন, তাঁহার নিজের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কৃষ্ণ তত সন্তুষ্ট হন না। আবার কৃষ্ণ-সেবাদ্বারা গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, নিজসেবায় ততটা হন না। বিশ্বস্তর ভগবান্কে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। তিনি নিরন্তর ভগবৎস্মৃতিতে বিভাবিত। তিনি ভগবান্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-আস্বাদনে সতত লোলুপ।

নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিলেই তিনি স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট স্বীয় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দেন। সেব্যের সেবা-সুখ-দর্শনে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিযুক্ত। তাঁহার স্ব-সুখবাঞ্ছা নাই, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত। তিনি শুদ্ধ ব্রজবাসী, প্রেমময়তনু, সমদর্শী ও অদোষদরশী। সেবামোদে তিনি কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। ভগবান্ও তজ্জন্য গুরুদেবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন—তাঁহার সুখেই ভগবানের সুখ, তাঁহার সেবাতেই ভগবান্ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তাই গুরু-কৃষ্ণ অভেদ-তত্ত্ব। ভগবানের কৃপা না হইলে গুরুপদাশ্রয় সম্ভব হয় না, আবার গুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভও অসম্ভব। এজন্য শরণাগত ভক্ত ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব উভয়েরই নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইতেছেন—

“তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমাকে করুন দয়া।

তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি, পা'ব তব পদছায়া।।”

“কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে।

আমি ত কান্দাল, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি’, ধাই তব পাছে পাছে।।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

যন্নাপ্তং কৰ্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যৎতপোধ্যানযোগৈ-

বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্ব-স্তুতিভিরপি ন যৎ তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।

গোবিন্দপ্রেমভাজমপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তনু-

নান্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥ ৩।।

অর্থ—কৰ্মনিষ্ঠৈঃ (কৰ্মে আসক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা) যৎ ন আপ্তং (যাহা লাভ নয়), তপোধ্যানযোগৈঃ চ (তপস্যা, ধ্যান, যোগের দ্বারাও) যৎ ন সমধিগতং (যাহা জানা যায় না), বৈরাগ্যৈঃ ত্যাগ-তত্ত্ব-স্তুতিভিঃ অপি (বৈরাগ্য, কৰ্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান, স্তবস্তুতির দ্বারাও) কৈশ্চিৎ অপি ন যৎ তর্কিতং চ (কেহ যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না), গোবিন্দপ্রেমভাজং অপি (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভাজন ব্যক্তিগণেরও) ন চ যৎ কলিতং (যাহা মিলিত হয় না), তৎ রহস্যং (সেই গোপনীয় প্রেম), যত্র পরে অবতরতি [সতি] (যে উদার্যশ্রেষ্ঠ পুরুষ অবতীর্ণ হইলে) নান্নৈব (শ্রীনাম-সংকীৰ্তন- দ্বারাই) স্বয়ং প্রাদুরাসীৎ (স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন) তং গৌরং (সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে) নৌমি (আমি প্রণাম করি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারাও যাহা জানা যায় না, বৈরাগ্য, কৰ্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবস্তুতির দ্বারাও কেহ যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের (স্বকীয়) প্রেমসেবারত ভক্তগণের (যেমন, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী ভক্তগণের) নিকটও যাহা অলভ্য, সেই গুঢ়-প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে শ্রীনামসংকীৰ্তন-দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি ॥ ৩ ॥

রহস্য	গভীরতম,	অতিগুহ্য	অনুপম,
কি	প্রেম পরম-ধন	ছিল	ঢাকা এত দিন!
কৰ্মে	কৰ্মপর-জন,	ধ্যানে	যোগে যোগিগণ,
হয়েছে	বিফল-শ্রম	কৃষ্ণ-ব্রতে	তনুক্ষীণ ॥
বৈরাগী	বিষয়-ত্যাগী,	নিষ্কাম	সাধনে ভজি,
পণ্ডিত	বিচারে মজি,	তর্কে	জয় করি দেশ।

পূজা-পাঠে ভক্তিমান,	শ্রীবিগ্রহ-শালগ্রাম,
সেবিয়া অথবা, ঘ্রাণ	পায় নাই তার লেশ।।
অধিক কি, শ্রীগোবিন্দ-	পদযুগ-অরবিন্দ,
ভজিয়া ভকতবৃন্দ,	যে অমিয় অনুত্তম।
পায় নাই কত কাল!	আজি তুমি কে দয়াল
মুক্ত করি মায়াজাল,	দিলে সবে সে-রতন।।
কত যত্নে মিলে নাই,	যাহা কভু কোন ঠাই,
শুধু কৃষ্ণনামে তাই	সম্ভব যে দেখি আজ।
হরি! হরি! হায়-হায়!	তাপদঙ্ক এ-ধরায়
কি সুধার সু-ধারায়	জুড়ালে হে রসরাজ!।
ভূতলে লুটায় পড়ি,	প্রেমদাতা গৌরহরি,
বারবার নতি করি	আমরা তোমার পায়।
তুমি তত্ত্ব-পরাংপর,	পূর্ণ-প্রেম-সুধাকর,
তৃষিতে শীতল কর	চাহে যে বা নাহি চায়!!৩।।

দৃষ্ট স্পৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতো বা

দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।

প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ

শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥ ৪।।

অর্থ—যঃ (যিনি) দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্তিতঃ [সন] (সাক্ষাৎভাবে দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও কীর্তিত হইয়া) দূরস্থৈ অপি বা (অথবা দূরস্থ ব্যক্তিগণের দ্বারাও) সংস্মৃতঃ আনতঃ আদৃতঃ বা (সম্যক স্মৃত, নমস্কৃত কিংবা আদৃত হইয়া) প্রেম্নঃ সারং (প্রেমের সার) দাতুং (প্রদান করিতে) একং ঈশং (একমাত্র সমর্থ), [তং] দয়ালুং দেবং শ্রীচৈতন্যং (সেই দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে) নৌমি (আমি প্রণাম করি)॥৪।।

অনুবাদ—যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্তন অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণেরও স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়া প্রেমসার (বিপ্রলভ-রস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই দয়াল প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ৪।।

কহিব কেমনে অহো,	কত দয়া জীবে তাঁর!
এমন দয়াল প্রভু,	কে আছে রে কোথা আর??
দেখেছে যে একবার,	পেয়েছে পরশ লেশ।
গাহিয়াছে—হা গৌরাজ!	হা গোবিন্দ, গোলকেশ!!
হৃদয়ে অথবা ওরে,	ভাবময় সেইরূপ—
ভাবিয়াছে একবার	অসমোর্দ্ধ অপরূপ।।
থাকিয়াও দূরে কেহ,	শুনি তাঁর যশোনাম।

চরণ-উদ্দেশ্যে সেই করিয়াছে পরণাম ॥
 আদর করিয়া কিস্বা, তাঁহারে, তদীয় জনে।
 দেখায়েছে প্রীতিকণা, কখনো যে কোনক্রমে ॥
 দিয়াছেন প্রেমসার, তাহারে হৃদয় ভরি'।
 দয়াল পরম সেই, আমার শ্রীগৌরহরি ॥
 মরি মরি—এত দয়া অতি ক্ষুদ্র জীবে য়াঁর।
 অনন্ত প্রণতি মম চরণ-কমলে তাঁর ॥ ৪ ॥ (ক্রমশঃ)

* * * *

ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশামৃত

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার সহপাঠিগণকে আরও বলিলেন—এই মনুষ্য-জন্মে মানবের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সেবন করাই একমাত্র কর্তব্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। উত্তমরূপে বিচার করিলে জানা যায়—মাতা-পিতা-পুত্র-পরিজনাদি অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রিয়। কারণ তিনিই সকল দেহের মধ্যে পরমাত্মা-সাক্ষীরূপে এবং তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবাত্তারূপে বিরাজমান। তাঁহারা উভয়ে এই দেহ ত্যাগ করিলে মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বন্ধু কেহই আর প্রিয় থাকে না। তখন মানব তাঁহাদিগকে দেখিলে ভয় পায়, স্পর্শ করিলে স্নান করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্ যতক্ষণ দেহের মধ্যে থাকিবেন ততক্ষণই আত্মীয় পরিজন প্রিয় হইয়া থাকে, তিনি দেহ ত্যাগ করিলে এ জগতের কোন বস্তুই আর প্রিয় থাকে না।

সুতরাং ভগবান্‌ই যে সবচেয়ে প্রিয়, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আত্মা অর্থাৎ সকল দেহের মধ্যে তিনি পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তিনিই জীবের পাপপুণ্যের সাক্ষীরূপ। সেইজন্য অভিন্ন কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—“জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। তাঁহার করুণাতেই আমরা সৃষ্ট ও প্রতিপালিত হইতেছি। আবার সময় আসিলে তিনি ধ্বংসও করিয়া দিবেন। এইজন্য তিনি ঈশ্বর তথা জগৎপিতা। সেই জগৎপিতার আরাধনা জীব মাত্রেরই কর্তব্য।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকের জন্মে জন্মে তাপ ॥

সর্বজগতের পিতা শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার সাধন-ভজন করা আমাদের পরম কর্তব্য। কারণ তিনিই আমাদের পরম সুহৃদ, পরম বন্ধু। পাণ্ডবগণকে দুর্যোধনাদি ভ্রাতা,

বন্ধু, আত্মীয়গণ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রেরণ করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনেও তাহাদের পরম সুহৃদরূপে সর্বক্ষণ সমস্ত বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র সুহৃদ্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন এক প্রাকৃত কবিও লিখিয়াছেন যে—

“সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।

অসময়ে হয় হয় কেহ কারও নয়।।

কেবল ঈশ্বর এক বিশ্বপতি যিনি।

সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি।।”

পরম ভাগবত শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সহপাঠী দৈত্যবালকগণকে নিমিত্ত করিয়া জগদ্বাসিগণকে উপদেশ করিতেছেন যে, দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধজনিত যে সুখ, তাহা পূর্বাদৃষ্ট অনুসারে যত্ন ব্যতীত দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশুসকল লাভ করিয়া থাকে। অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্তব্য নয়। যেহেতু তাদৃশ প্রয়াসদ্বারা কেবল আয়ুক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল ভজনে যে রূপ আত্মস্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হয়, বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত মানবশরীরটি বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতে তাবৎকাল পর্য্যন্ত মঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করিবেন। মনুষ্যের আয়ু শতবর্ষ পর্য্যন্ত। আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুষ্কাল উহার অর্ধেক। কারণ পুরুষ নিদ্রারূপ গাঢ় তমসাজ্জন্ম হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া জীবনের অর্ধেক আয়ু বৃথা ব্যয় করিয়া থাকে। বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, বিদ্যার্জন বিশ বৎসর, এবং ৮০ হইতে ১০০ এই ২০ বৎসর জরাগ্রস্ত অবস্থায় ব্যতীত হয়। অতএব হিসাব করিলে দেখা যাইতেছে যে, নিদ্রায় ৫০ বৎসর এবং অবশিষ্ট ৫০ বৎসর বাল্যকালে খেলাধুলায়, বিদ্যার্জনে, যৌবনকালে কুটুম্বপালনে ও বৃদ্ধকালে জরাগ্রস্ত অবস্থায় ব্যয় হয়। এইভাবে একশত বৎসর আমাদের চলিয়া যায়। ভগবান্ শ্রীহরির ভজন আর করা হয় না।

সেইজন্য ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন যে—“ভগবান্ শ্রীহরির ভজন কৌমার কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সবসময় শোভা পায়।” সে সম্পর্কে মহাভারতেও মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে মহামতি বিদুর বলিতেছেন,—

ন ধর্মকাল পুরুষস্য নিশ্চিত

ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।

সদৈব ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা

যথা নরো মৃত্যুমুখোহপি বর্ততে।।

অর্থাৎ কোন সময় হইতে ধর্মজীবন-যাপন করা হইবে, নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। কারণ মৃত্যু কাহারও সময়-অসময় প্রতীক্ষায় থাকে না। মানব মৃত্যুর মুখগহ্বরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। মৃত্যু যেকোন সময় তাহার মুখটি বন্ধ করিয়া দিতে পারে অর্থাৎ যেকোন সময় আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। সেইহেতু

ধর্মজীবন যাপন করা মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শোভা পাইয়া থাকে। মহাভাগবত শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-রূপ ভজন করিয়াছিলেন। অতএব ভগবান্ শ্রীহরির ভজন জীব মাত্রেরই করা কর্তব্য। যে মুহূর্ত্তে জ্ঞান হইল, সেই সময় থেকেই শ্রীহরির ভজন করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে,—“পঞ্চশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ” অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরে উপনীত হইলে সংসারের দায়ভার পুত্র-হস্তে অর্পণ করিয়া বনে গিয়া হরিভজন করা কর্তব্য। কিন্তু মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াও দুঃখজনক কামে ও পুত্র-কন্যাতির মোহে গৃহাসক্ত হইয়া ভগবদ্ভজন হইতে বিচ্যুত হইতেছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ আরও উপদেশ করিতেছেন যে, চোর রাত্রে জীবন বিপন্ন করিয়া, রাজসৈনিক যুদ্ধবিগ্রহে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, এবং বণিক সমুদ্র আদি দুর্গম পথে ব্যবসা করতঃ অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। এই অর্থ তাহাদের নিকট প্রাণ অপেক্ষায় অতীষ্টতর। এই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? যে ব্যক্তি সুহৃদজনের প্রতি অনুরক্ত, সে কিরূপে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে? স্নেহশীলা প্রিয়ার নিঃসর্জন সঙ্গ স্মরণ করিলে কে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? শিশুগণের মধুরান্ধর যুক্ত মনোহর আলাপ স্মরণ করিলে কে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? আর পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, বৃদ্ধতাপ্রযুক্ত সামর্থ্যরহিত পিতা-মাতা ও অন্যান্য ভোগোপকরণযুক্ত গৃহ-সমূহ এবং কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি, পশু ও ভৃত্যবর্গাদিকে স্মরণ করিয়া কিরূপেই বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কোশকার কীট যেমন নিজ গৃহ নির্মাণ করিতে করিতে নিজের নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না সেইরূপ জীবও কর্ম করিতে করিতে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া শিল্পোদর জনিত সুখকেই অতীষ্ট বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া মোহে অভিভূত হয়। এইপ্রকার জীব কিরূপে সংসার-বিরক্ত হইতে পারে? অতএব উক্ত বিষয়সমূহে আসক্ত হইলে জীব হরিভজন করিতে পারেনা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

* * * *

মঙ্গলময় ভগবান্

ভিনদেশী এক রাজার মন্ত্রী ভগবানে দৃঢ় মতি।
বাহিরে তাহার বিষয়ীর বেশ অন্তরে কৃষ্ণস্বর্ভূতি।।
সদা মুখে তাঁর লাগিয়া থাকিত একটি মাত্র কথা।
‘ভগবান্ হন মঙ্গলময়, নাহি দেন কারেও ব্যথা।।’
একদিন রাজা মন্ত্রীর সাথে শিকারে হইয়া বাহির।
প্রবেশিলেন এক গহন অরণ্যে চিত্ত করিয়া স্থির।।
অস্ত্রের আঘাতে রাজার হস্তের বৃদ্ধাস্পৃষ্ট গেল কাটি’।
বেদনার চিহ্ন রাজার বদনে প্রবল উঠিল ফুটি’।।

রাজারে তথায় মন্ত্রী কহিলেন,—“মঙ্গলময় ভগবান্।
 অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া করিয়াছেন তিনি, তব নিশ্চিত কল্যাণ”॥
 ত্রোধান্বিত হইয়ে রাজা মন্ত্রীরে নিষ্কেপিয়া অন্ধকূপে।
 শিকারের তরে চলিলেন একা ক্ষুভিত গভীর রূপে॥
 হেনকালে পথে বাহির হইল ভীষণ দস্যুর দল।
 নরের শোণিতে রাঙাবে তাহারা মায়ের চরণতল॥
 পথমাঝে যবে রাজারে দেখিল সুন্দর অপূর্ব বশে।
 “ভাল হল এরে বলি দিব সব” বলিয়া বাঁধিল কষে॥
 আশ্রমে যাইয়া দেখিল তাহারা অঙ্গহীন হয় রাজা।
 ‘বিকলাঙ্গে বলি দিলে যে মাকালী মোদের দেবেন সাজা।’
 এত চিন্তি তারা রাজারে ত্যজিল, নাহি দিল বলিদান।
 রাজা ভাবে, ‘মোরে রক্ষিয়াছেন আজ দয়াময় ভগবান্॥
 মন্ত্রীর বচন শুনিয়া তাহারে দিয়াছি কঠোর শাস্তি।
 হইয়াছে পাপ, এখনে কেমন, হইবে সে পাপ মুক্তি?
 কূপ হ’তে রাজা মন্ত্রীরে যতনে উপরে উঠালেন তুলি’।
 চরণে পড়িয়া চাহিলেন ক্ষমা মাথাতে লইয়া ধূলি॥
 মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ! কোন অপরাধ নাহি তব।
 সে অন্ধকূপেতে পতিত হওয়ায় হইয়াছে মম শুভ॥
 দস্যুর দল ধরে ল’য়ে যেত দোঁহারে বলির তরে।
 নিঁখুত অঙ্গ দেখিয়া আমায় পাঠাত যমের ঘরে॥
 দয়াময় হরি, করুণায় তাঁর রক্ষা পেয়েছি মোরা।
 সকল জীবের অশুভ সব চুরি করে সেই চোরা॥
 আসুন মোরা দুঁহে মিলে গাহি দয়াল হরির নাম।
 অমঙ্গল নাশ হবে যে দোঁহার পাইব পরমধাম॥

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন



জীবই ঈশ্বর, এটি কল্পনা না শাস্ত্রবাক্য ?

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রম-সংশোধন

[গত ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত “জীবই ঈশ্বর—এটি কল্পনা না শাস্ত্রবাক্য”—
 প্রবন্ধে ৩৩৫ পৃষ্ঠার ২৯ পংক্তিতে “এসব কথাগুলো গীতা-ভাগবত পড়ে তা’
 বুঝার কষ্ট করো”—স্থলে “এসব কথাগুলো গীতা ভাগবত পড়ে তা’ বুঝার
 কষ্ট করো না” হবে।]

আবার অনেককে বলতে শুনা যায়,—“ঈশ্বর সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনিই জীবগণকে সমস্ত কিছু করান, জীবের নিজের কিছু করার নেই। কিছু গানেও তো আছে যে, “চোরকে বল ‘চুরি কর’, গৃহস্থকে বল ‘ধর ধর’।” সুতরাং জীব যা করছে, তা ঈশ্বরই করছে। অতএব জীবই যে ঈশ্বর, এতে আর আশ্চর্য্য কি?” সত্যিই এতে আশ্চর্য্য কিছু নাই, কারণ ভগবান্ তো নিজেই ঘোষণা করছেন—
 “আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবৎ চৈনমন্যঃ
 শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।” (গীঃ ১।২৯)—‘দেখ, এই আত্মতত্ত্বের কথা কেউ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করে, কেউ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করে, কেউ বা আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করে, সুতরাং শুনেও অনেকে এই সব কথা বুঝতে পারে না।’ আর এইজন্যই দেখা যায়—শাস্ত্র পড়ে কেউ তরে, আর কেউ মরে। ‘উল্টো বুঝলি রামের দল যেখানে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাটা, সেখানে অধর্ম্মের স্থান করে নিতে কতক্ষণ?

“চোরকে বল ‘চুরি কর’ গৃহস্থকে বল ‘ধর ধর’”—বলুন তো, এইপ্রকার কাজ যদি সমাজে কোন মানুষকে করতে দেখা যায়, তবে সে-সমাজে তার সম্মান কি প্রকারে থাকে? বরং এইপ্রকার দ্বিচারিতা ধরা পড়লে জনগণের কাছে ‘গণপিটুণী’-লাভ ছাড়া তার আর কি প্রাপ্তি থাকতে পারে? ঈশ্বরের মধ্যে যারা এইপ্রকার দ্বিচারিতা কল্পনা করে, তারা সমাজের জঘন্যতম কীট ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বরই যদি জীবগণকে সমস্ত কিছু করান এবং জীবের নিজের কিছু করার ক্ষমতা নাই থাকে, তবে সেই ঈশ্বর গীতায় অর্জ্জুনকে কেন উপদেশ করছেন, কেন আত্মতত্ত্বের কথা বোঝাচ্ছেন? আর, কেনই বা তিনি সাধুগণকে পরিব্রাজন করতে এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ করতে অবতীর্ণ হন? তা’হলে এগুলি কি প্রহসন বুঝতে হবে? চোরকে যদি ঈশ্বরই চুরি করান এবং সেইজন্য যদি সে ‘চোর-নারায়ণ’ বলে অভিহিত হয়, তাহলে যম-মহারাজ বা আদালতের বিচারক তাকে চুরির জন্য শাস্তিপ্রদান না করে কি পূজা করবেন? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলছেন,—“ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে।।” (গীঃ ৫।১৪)—ঈশ্বর বলপূর্ব্বক জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফলে সংযোগ কিছুই করেন না, জীবের অবিদ্যা-রূপ স্বভাব হতেই ঐসকল হয়ে থাকে। নতুবা ঈশ্বরে বৈষম্য বা নির্দয়তা স্বীকার করতে হয়।

উপনিষদ্ বলেন,—একই বৃক্ষরূপ দেহে ‘জীবাত্মা’ ও ‘পরমাত্মা’-রূপ দুইটা পাখী অবস্থান করেন। এই দুইয়ের মধ্যে জীবাত্মা—মায়াধীন এবং সেই মায়ার বশে সে নিজের বিভিন্ন কর্ম্ম-অনুসারে সুখ-দুঃখরূপ নানা কর্ম্মফল ভোগ করে থাকে। আর, অন্য যে পরমাত্মা, তিনি মায়ার অধীশ্বর, তিনি প্রতি জীবের হৃদদেশে বাস করে জীবের সমস্ত কর্ম্মের স্বাক্ষী হন এবং জীবের সেই সেই কর্ম্ম-অনুসারে তিনি তা’কে বিভিন্ন কর্ম্মফল প্রদান করেন ও মায়ার দ্বারা তা’কে সেই সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করান। সুতরাং কর্ম্মফল-বশে জীবাত্মার যে দারিদ্র্য-লাভ বা স্বভাব-দোষে তার যে

চুরি-প্রবৃত্তি, সেগুলিকে কখনই পরমাত্মা-রূপী ঈশ্বরের উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, সেই জীবাত্মাকে কখনও ‘দরিদ্র-নারায়ণ’ বা ‘চোর-নারায়ণ’ ইত্যাদি কিছুই বলা যেতে পারে না। সে-কাজ ভীষণ অন্যায় ও অপরাধজনক। তাহলে বুঝুন—মায়াবশ এবং কর্মফল-বাহ্য জীবকে কিভাবে মায়াদীশ ও কর্মফল-প্রদাতা ‘ঈশ্বর’ বলে ভাবা যেতে পারে? আর সেই প্রকার ভেবে ‘জীবের প্রেম’ কি অত্যন্ত অন্যায় নয়?

উপনিষদে স্পষ্টরূপে সেই বৃক্ষরূপ দেহে অবস্থানকারী সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা আছে—“জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ” (শ্বেতঃ উপঃ ১।৯)—অর্থাৎ ‘জ্ঞ-অজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশনীশৌ’—সেই জন্মরহিত পরমাত্মা ও জীবাত্মার একজন ‘জ্ঞ’ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, এবং অপরজন ‘অজ্ঞ’ অর্থাৎ অল্পজ্ঞ, একজন ‘ঈশ’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’, অন্যজন ‘অনীশ’ (ন+ঈশ)—অর্থাৎ ঈশ্বর নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলেছেন,—“বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন।” (গীঃ ৭।২৬) ‘হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।’ আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন,—“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ।” (গীঃ ৪।৫) ‘হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার অনেক জন্ম বিগত হয়েছে। আমি সে-সমস্তই জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।’ সুতরাং এতেই সেই উপনিষদ-বাক্য প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর—সর্বজ্ঞ এবং জীব—অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ। সুতরাং সেই ‘অজ্ঞ’ বা অল্পজ্ঞ জীবকে এবং ‘অনীশ’ জীবকে কিভাবে সর্বজ্ঞ ‘ঈশ্বর’-রূপে কোন্ বিবেকবান্ ব্যক্তি ভেবে নিতে পারে, বুঝা যায় না। এবং সেইপ্রকার বিবেকজাত আনন্দ নিশ্চয়ই কোন সুস্থ-মস্তিষ্কের ব্যক্তি কামনা করে না।

ঈশ্বরকে খুঁজা কিছু অবিবেকীর কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও বেদান্তসূত্রে সর্বপ্রথমেই “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”-র দ্বারা সেই ঈশ্বরকে খুঁজার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কেন সে প্রবৃত্তি? কারণ, তাঁকে না জানলে নিত্য শান্তি লাভ করা যায় না, মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না ইত্যাদি। আপাততঃ ঈশ্বরের সন্ধান এই দুই কারণেই হয়ে থাকে। উপনিষদে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝানো হয়েছে—“তমাস্বস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্।” “তমেব বিদিত্বাহতি-মৃত্যুমেতি নানং পস্থা বিদ্যতেহয়নায়।” (শ্বেতঃ উপঃ)—অর্থাৎ সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে যে ধীর ব্যক্তিগণ দর্শন করেন, তাঁরাই শান্তি লাভ করেন, অপরে নয়; তাঁকেই জেনে একমাত্র মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অন্য আর কোন উপায় নেই। এইজন্যই সেই ঈশ্বরকে খুঁজার প্রবৃত্তি। কিন্তু কে সেই ঈশ্বর? তাঁর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে পরবর্তী বেদান্তসূত্রে বলা হ’ল—“জন্মাদ্যস্য যতঃ”। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁর দ্বারা হয়ে থাকে—তিনিই সেই ঈশ্বর।

উপনিষদে এই কথাটাই বিস্তৃতরূপে বলা হয়েছে—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজ্ঞাস্ব তদ্রক্ষ”।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪

(তৈঃ উপঃ)—অর্থাৎ ‘যাঁহা হতে এই সমস্ত চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর দ্বারা পালিত হয়ে তাঁরা জীবিত আছে এবং প্রলয়কালে আবার এই সমস্তই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে,—এই বিশেষ তিন লক্ষণ একত্রে যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই সেই ঈশ্বর (ব্রহ্ম), তাঁর আরাধনা কর।’ এই তিন লক্ষণ একই সাথে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কোন দেবতাগণের মধ্যেও নাই বলে তাঁরাও জীবের আরাধ্য নন। পরন্তু সেই ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণ এই তিন লক্ষণ যাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেই শ্রীবিষ্ণুকেই প্রতিনিয়ত দিব্যস্তুবের দ্বারা আরাধনা করেন—“যং ব্রহ্মা বরুনেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুষন্তি দিব্যস্তুবৈঃ”(ভাঃ ১২।১৩।১)। আসুন, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতির মুখেই শুনা যাক—কে প্রকৃত মালিক এবং আরাধ্য?

শ্রীব্রহ্মা বলছেন—“সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।”(ভাঃ ২।৬।৩২)

অর্থাৎ, আমি শ্রীহরির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সৃষ্টি-কার্য্য করে থাকি, আর শ্রীহরিরই বশীভূত শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীহরি সৃজন, পালন ও সংহার এই তিন শক্তিরই অধিকারী—‘ত্রিশক্তিধৃক্’। তিনি পরমাত্মা-রূপে বিশ্বকে পালন করেন।

শ্রীশিব বলছেন—“তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।।”(স্কন্দ পুঃ)

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিশেষারাদনং পরম্।।”(পদ্ম পুঃ)

অর্থাৎ, হে মহেশ্বরী, আমরা সকলে সেই মূলপুরুষ হতেই জাত হয়েছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্বভূতের কারণ। সুতরাং সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমম্বিতাঃ।।”(গীঃ ১০।৮)

অর্থাৎ, ‘আমি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সমস্ত কিছুর উৎপত্তির কারণ, আমি হতে সকল প্রবর্তিত হয়। যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা এটা জেনে ভাব-সমম্বিত হয়ে অর্থাৎ প্রেমের সাথে আমাকেই ভজনা করে। ভগবানের এই কথাতে একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে—যাহার ‘বুধাঃ’ অর্থাৎ বুদ্ধিমান, তারা আমি হতেই সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে জেনে প্রেমের সাথে আমাকেই ভজনা করে—তাঁরা “বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর” এই হৃজুগে পড়ে আমার ভজনা ছেড়ে দিয়ে আমি হতে সৃষ্ট অন্য সব জীবের বা জগতের ভজনা (তথা প্রেম) করতে যায় না। আর যাঁরা তা করে, তাঁরা ‘বুধাঃ’ নাকি অন্য কিছু, পাঠকগণ আপনারাই তা বিচার করুন।

সুতরাং ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ প্রতিনিয়ত যাঁর আরাধনা করেন, যাঁর আদি-অন্ত সেই দেবতাগণ পর্য্যন্ত নির্ণয় করে উঠতে পারেন না, তাঁরাও পর্য্যন্ত মোহিত হয়ে

পড়েন—সেই শ্রীভগবানের আরাধনার বিকল্প অন্যান্য দেব-দেবীপূজাই যেখানে হতে পারে না, সেখানে বলুন তো ‘জীবে প্রেম’-রূপ অদ্ভুত ঈশ্বর-সাধনার কথা কি হাস্যকর নয়? শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা আছে—“যন্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষ্যতঃ সাং পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্॥” শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণের সাথে যে সমানভাবে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। সেস্থলে শ্রীনারায়ণকে জীবের সাথে সমান করে দিয়ে ‘দরিদ্র-নারায়ণ’, ‘চোর-নারায়ণ’, ‘মেথর-নারায়ণ’ প্রভৃতি বলা কত বড় পাষণ্ডতা!

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—‘যা’রা, আমাতে মনকে নিবিষ্ট করে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আমার নিত্য শ্যামসুন্দর-রূপের উপাসনা করে, তা’রাই আমার সাথে ‘যুক্ততম’ অর্থাৎ নিকটতম’—(গীঃ ১২।২)। জ্ঞানযোগে ভগবানের অব্যক্ত-অক্ষররূপের উপাসনার যে পদ্ধতি, তার দ্বারা ভগবানের সাথে ‘যুক্ত’ হতে পারা গেলেও ‘যুক্ততম’ হওয়া যায় না। সুতরাং সমস্ত প্রকার যোগিগণের মধ্যে ঐকান্তিক ভক্তযোগীই শ্রেষ্ঠ—এটি তো স্বয়ং ভগবানই ঘোষণা করেছেন—“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স ম যুক্ততোম মতঃ॥” (গীঃ ৬।৪৭)। সেই ভক্তযোগে ভক্তগণ কেবল শ্রীভগবানেরই ভজনা করেন—অন্য কিছুই নয়। তদ্বারা তাঁরা যতই ভগবানের নৈকট্য লাভ করেন, ততই তাঁদের চিত্তে নির্মলতা ও প্রশান্তি লাভ হতে থাকে। তখন সর্বভূতের হৃদয়ে যে-ঈশ্বর অবস্থান করেন, সেই শ্রীবাসুদেব তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে দর্শন দান করেন এবং তখনই সেই ভক্ত “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” সর্বভূতে বাসুদেব দর্শন করে কৃতকৃতার্থ হন। এটি নয় যে, ভক্তগণ তাঁদের নিজ নিজ সন্ধান-চেষ্টার দ্বারাই ভগবানকে দর্শন করে নিতে পারেন—কারণ, ভগবান বলছেন, ‘আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, আমি নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত রাখি’ (গীঃ ৭।২৫)। সুতরাং ভগবান যখন তাঁর ভক্তের চোখের সামনে হ’তে মায়ার আবরণ দূর করে দেন, কেবল তখনই সেই ভক্ত অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বাসুদেব-দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

অনেকেই এই ব্যাপারটা ভুল বুঝে থাকেন। ঐকান্তিক ভক্তের যে সর্বত্র বাসুদেব-দর্শন, তাঁর অর্থ এই নয় যে, তিনি সমস্ত জীবকে বাসুদেব-রূপে দর্শন করেন। জীব তো ঈশ্বরই নয়—সুতরাং তাঁকে ঈশ্বররূপে দর্শনের কোন প্রশ্নই আসে না। সমস্ত চেতন-অচেতন বস্তুর মধ্যে নির্লিপ্তভাবে যে-পরমাত্মা অবস্থান করেন, সেই পরমাত্মাই ঐকান্তিক ভক্তের কাছে দর্শন-দান করেন। তখনই মাত্র ভক্তের সর্বত্র ভগবদর্শন হয়ে থাকে। এইজন্য বলা হয়েছে “বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ” (গীঃ ৭।১৯)। ঐ প্রকার দর্শনকারী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। সমস্ত বস্তুমধ্যে নির্লিপ্তভাবে যে-পরমাত্মা অবস্থিত থাকেন, তাঁর দর্শন বা অনুভব কিছুমাত্র কাল্পনিক নয়, বা কৃত্রিমভাবে তাঁর অনুভবও সম্ভব নয়। সেটি একমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপাসাপেক্ষ

ব্যাপার। সকলের পক্ষেই তা লভ্য নয়—কেবলমাত্র অধিকারী ব্যক্তিগণের জন্যই তা সংরক্ষিত।

সুতরাং ভগবদর্শনের এবং ভগবৎপ্রেমের এমন একটি গভীর বিষয়কে “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” বলে এইপ্রকার হাঙ্কা এবং গুরুত্বহীন করে দেবার যে প্রয়াস, তাকে কখনই প্রশংসা করা যায় না। আমরা বলি—এপ্রকার অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় একটা কথার প্রচার না করে তিনি নিজেই বরং যদি আক্ষরিক ভাবেই ফুটবল খেলে বা বেগুনগাছে জল দিয়ে দিন কাটাতেন, তাতে বরং জগদ্বাসীর অনেক উপকার হত।

—শ্রীভক্তিবেন্দান্ত তপস্বী

* * * *

যোগীদের পাঠ্য “গীতার” আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভক্তি-বিরোধী

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

(৩) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে কথিত হয়,—“পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি।” এই একপাদ বিভূতিকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের ‘একাংশ’ অবস্থিত। উক্ত একাংশই ‘পরমাত্মা’। এমতাবস্থায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী ‘পরমাত্মা’ ও জীব হৃদয়ে অবস্থিত ‘পরমাত্মা’ শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ,—পরন্তু পূর্ণ অভিভ্যক্তি নয় ও হতে পারে না। গীতায় ১০।৪২ শ্লোকে “বিস্তভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ”—এই উক্তিভে ভগবান্ জানাচ্ছেন,—‘আমি একাংশ-দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে রয়েছি।’ গীতার ১১।৭ শ্লোকেও ভগবান্ বলেছেন,—‘হে গুড়াকেশ (জিতেন্দ্র) ! আমার এই দেহে একদেশে অবস্থিত চরাচর সমগ্র বিশ্বকে দর্শন কর এবং অন্য যে কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা’ও দর্শন কর।’ গীতায় ৭।৭ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন,—‘আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই ; একটি মণিমালাতে যেরূপ মণিগণ সুতায় গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই তথা আমার আশ্রয়েই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে সংলগ্ন রয়েছে।’ এস্থলে মন্তঃ (আমা হ’তে) পরতরঃ (শ্রেষ্ঠতর) ন অস্তি অন্যৎ কিঞ্চিৎ (অন্য আর কিছুই নাই), ময়ি সর্বমিদং প্রোতং (আমাতে এইসকল গ্রথিত)—এই শব্দ সমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব ভগবান্ কৃষ্ণই সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তি সম্ভব। নাভির যজ্ঞে ভগবান্ আবির্ভূত হয়ে নিজেরই অদ্বিতীয়ত্ব বর্ণনা করেছেন—“মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ” (ভাঃ ৫।৩।১৬)। শ্রীধর স্বামিপাদ জানিয়েছেন,—“আমার তুলনা আমিই, কারণ আমি অদ্বিতীয়।” ভাঃ ১।২।১১ শ্লোকে তত্ত্ব নির্ধারণ করে কথিত হয়,—“বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।”—“যাহা অদ্বয়জ্ঞান এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্ববিদগণ তা’কেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি ‘ব্রহ্ম’, দ্বিতীয়

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪

প্রতীতি ‘পরমাত্মা’ এবং তৃতীয় প্রতীতি ‘ভগবান্’।” জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা’ গ্রন্থে লিখেছেন,—“ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং মায়িক উপাধির অম্বয়ভাবে পরমাত্মদর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিদৃচক্ষু-দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎ-স্বরূপ মাত্র লক্ষিত হয়।” শ্রীগোপালোপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,—

“কৃষ্ণগংগঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরৈব চ।

পরব্যোমাদ্বিপত্তস্যৈশ্বর্য্য মূর্তিন্ সংশয়ঃ।।”

‘শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বৈশ্বর্য্য। পরমাত্মা তাঁর অংশ। ব্রহ্ম তাঁর জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁর ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নেই।’

‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলা হয়েছে,—

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ।।

বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।

পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম।।

ভক্তিয়োগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।

সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।।

জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।

ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব।।

(চৈঃ চঃ আদিঃ ২।১০৬, ৬৫, ২৪-২৬)

‘তত্ত্ব’ অর্থে তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ—(চৈঃ চঃ আ ১।৯৬)। সুররাং ‘তত্ত্বদর্শী’ বলতে যিনি কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন—এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হয়। গীতায় ৪।৩৪ শ্লোকে ভগবানের, উক্তি—“উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ”—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করবেন। শ্রীধরস্বামীপাদ ব্যাখ্যা করেছেন,—তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ অপরোক্ষানুভব-সম্পন্ন। কিন্তু পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ কেন? তাঁকে এক বললেই তো হ’ত? না, কারণ তিনি তিন ভাবে—প্রকটিত; ব্রহ্ম—ভগবানের নির্বিশেষ স্বরূপ, তিনি নিরাকার, নির্লীল, নিঃশক্তিক,—এস্থানে কেবল জ্ঞানের প্রকাশ। পরমাত্মা—ভগবানের আংশিক বিশেষ প্রকাশ—তাঁতে লীলা, গুণ, শক্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র। পরমাত্মা যিনি, তিনি তো জীবশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা বিলসিত। নিরাকার-স্বরূপ ব্রহ্ম ও আংশিক প্রকাশ পরমাত্মায় ভক্তি বা প্রীতি প্রযোজ্য হয় না ও হতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গুণ ও শক্তির অনুভব যখন হৃদয়ে অনুভূত হয় না, তখনই ‘ব্রহ্মের’ ধারণা, যাঁকে মায়াবাদী সম্প্রদায় ক্লীব-ব্রহ্ম বলেন। সেই একই ভগবান যখন সর্বশক্তিমত্তা ও পরমানন্দ ব্যতীত কেবলমাত্র সৎ ও চিদবৃত্তিতে অবস্থান করেন এবং সর্বব্যাপক, সর্বপালকরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে বিরাজিত থাকেন ও প্রতিভাত হন, তখনই যোগিগণের পরমাত্মার ধারণা তথা সমষ্টি আত্মার ধারণা হয়। আর ভগবান বলব কাকে? এককথায় সর্বশক্তিমান্ তত্ত্বই ভগবান্। তিনি অনন্ত গুণাধার। তাঁর অনন্ত লীলা এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান্। তাঁর সমগ্র বীৰ্য্য, যশ, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই ছয় লক্ষণযুক্ত সর্বোত্তম গুণাবলী তাঁতে সম্মিষ্ট। ব্রহ্ম—সর্বগুণশূন্য, সর্বশক্তি-বর্জিত, সর্ব-বিশেষ বা আকার শূন্য, আর পরমাত্মা—ভগবানেরই অংশ-বিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিরাট অন্তর্যামী-স্বরূপে ও জীবের হৃদয়-অভ্যন্তরে ক্ষিরোদকশায়ী বা কোথাও গর্ভোদকশায়ীরূপে বিরাজিত। উক্ত পরমাত্মা-দর্শনের সাধন পদ্ধতি আদৌ ‘ভক্তি’ পদবাচ্য নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হটযোগ প্রভৃতি যোগমার্গই ঐ পরমাত্মা-তত্ত্বের আশ্রয়ে প্রবেশের চেষ্টা মাত্র। “ভক্তিসন্দর্ভে” কথিত হয়,—“অন্তর্যামিত্বময়-মায়াক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্ত্যাংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি”—“অন্তর্যামিত্বময়, মায়াক্তি-প্রচুর ও চিচ্ছক্তির অংশ-বিশিষ্ট তত্ত্বের নাম—পরমাত্মা। ভগবৎতত্ত্ব হ’তে পরমাত্মা-তত্ত্ব কিন্তু ন্যূন ; কারণ, তাহা পূর্ণ ভগবৎতত্ত্বের আংশিক প্রকাশ মাত্র। জ্যামিতির বিচারে বলা হয়—A part can not be equal to the whole—অংশ কখনও পূর্ণের সহিত সমান হতে পারে না। “ভক্তিসন্দর্ভে” ভগবৎতত্ত্বের লক্ষণ—যথা, “পরিপূর্ণ-সর্বশক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি”—“ভগবান্ সম্পূর্ণচিন্ময় ও সর্বশক্তি-বিশিষ্ট।” অপরোক্ষ-জ্ঞানে চেতনের বিলাস না থাকায় তাহা ‘চিন্মাত্রবাদ’। ইহাতে উপাস্যদেবতা, উপাসনাকারী, ও উপাসনার নিত্য অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানী ও যোগিগণ—উভয়েই চিন্মাত্রবাদী। জ্ঞানিদের বিচারে ব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ ; আর যোগিদের উপাস্য পরমাত্মা—পূর্ণভগবানের আংশিক সবিশেষ অনুপ্রকাশ মাত্র, তাহা জড়ের অতীত হলেও এ জগতের অভিজ্ঞতা হ’তে সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে তাহা বিচার করতে গিয়ে আধ্যক্ষিকতার ফাঁদে পড়ে বস্তুর নির্বিশেষ-স্বরূপ মাত্র দর্শনাভিনয় হয়ে থাকে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন তত্ত্বের মধ্যে পূর্ণ তত্ত্ব কে? তদবিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উল্লেখ করছি,—সমুদ্রে জাহাজ দেখতে তিন বন্ধু একত্রে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে দেখে যে, বহুদূরে একটা জাহাজ আসছে। জাহাজটির সম্মুখে একটা বৃহৎ আলো জ্বল্ জ্বল করছে, তাহা এত স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময় যে সেদিকে তাকানো যায় না। তিন বন্ধুর মধ্যে একজন ঐ আলোক দেখেই ধারণা করলেন যে, জাহাজটি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তাই ভেবে তিনি জাহাজ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করেই সে স্থান হ’তে প্রস্থান করলেন। অপর দুইজন সেইস্থানে জাহাজের আসার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রইলেন। জাহাজটি যতই নিকটস্থ হ’তে লাগল, ততই জাহাজের

অবশিষ্ট অংশ সামান্যই দৃষ্টিগোচর হ’তে লাগল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বন্ধু জাহাজটির অন্য সামান্যতম অংশ দেখে ধারণা করল যে, উক্ত আলোকের পর অবশিষ্ট অস্পষ্টঅংশ কালো রঙ তথা একটা কালো রেখাকৃতি কিছু বস্তু হবে—তাহাই জাহাজের গঠন। দ্বিতীয় বন্ধুটি জাহাজটির আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অর্থাৎ জাহাজটিকে সম্পূর্ণরূপে না দেখে অধৈর্য্য হয়ে সেস্থান ত্যাগ করে নিজস্থানে ফিরে গেল। কিন্তু তৃতীয় বন্ধু বিশেষভাবে ধৈর্য্য ধারণ করে জাহাজটির আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে সর্বশেষ জাহাজের যাবতীয় প্রকোষ্ঠ ও সবকিছু দেখে বুঝল যে, তার পূর্ববর্তী বন্ধুদ্বয় জাহাজটির সম্বন্ধে যা’ যা’ জ্ঞান নিয়ে ফিরে গেছে, তাহা ভ্রাম্যক, অসম্পূর্ণ এবং জাহাজের প্রকৃত গঠন সম্বন্ধে তারা কিছুই বোধগম্য করে নি ও জানে না। উক্ত উদাহরণটিতে প্রমাণিত হয় যে, ১ম বন্ধু জাহাজটিকে জ্যোতিপুঞ্জ-স্বরূপ মনে করল—যাহা ব্রহ্মের উপমা স্বরূপ। ২য় বন্ধু জাহাজটির যে আংশিক-বিশেষ দেখল, তাহাও যথার্থ দর্শন হয়নি—ইহাতে পরমাত্মার উপমা প্রযোজ্য। আর ৩য় বন্ধু জাহাজের সর্বশেষ অবয়ব যাহা পর্য্যবেক্ষণ করল, তাহাই জাহাজের পূর্ণপ্রকাশ—ইহাতে ভগবান-শব্দের উপমা যথায়থ প্রযোজ্য।

তাই জ্ঞেয় পদার্থ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের মধ্যে থাকলে মানুষের বুদ্ধিতে ধরা যায়। ভগবদ্বিমুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়—প্রত্যক্ষ ; অন্যের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করে যাহা জানা যায়,—তাহাই পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ নয়, তারও উদ্ভেদে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাভীত যে বস্তু এ জগতের সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে অনুভব হয়, তাহাকে অপরোক্ষ বলা যায়। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানিয়েছেন,—“প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্য অবস্থিত ; আর অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত হইতে আত্মধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ সিদ্ধান্তে ইতর-ব্যোমের অবকাশ ও নির্বিশেষভাব নিরস্ত হইয়া পরব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রে প্রচুর গবেষণামূলক বহু তথ্যের আবিষ্কার থাকিলেও সে সমস্তই জড় প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ অনুভূতিরই দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন মাত্র। সেই জ্ঞান-ভূমিকা চতুর্দশ ভুবনেরই অন্তর্গত।

“প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্য্য ও মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের লেখনী—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতিরিক্ত হইলেও অপরোক্ষানুভূতি মাত্র। এই অপরোক্ষ-অনুভূতির গতি নির্গুণ বিরজা অথবা নির্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। এবম্প্রকার দান শ্রীত দান নয়, তাহা শ্রীতব্রব অশ্রীতদান। * * প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধবিহীন মনোধর্ম্ম বিষয়কমাত্র।”

উক্ত বিষয়ে একটা সারণী (Table) এইরূপ ;—

[পরের পৃষ্ঠায় সারণী (Table)]

(সর্বোচ্চ জ্ঞান) অধোক্ষজ হ'তে অধিকতর
চমৎকারিতাময় চিদ্বিলাস—অপ্রাকৃত



অপরোক্ষের অতীত চিদ্বিলাসময়—অধোক্ষজ



পরোক্ষের অতীত জড়ভোগাতীত
নির্বিশেষ বা পরমাত্মা—অপরোক্ষ



(তদপেক্ষা ন্যূন)-জড় প্রত্যক্ষের
অতীত ভোগ্যজড়ময়—পরোক্ষ



(সর্বনিম্ন)—জড় প্রত্যক্ষ

পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভাষায় উদ্ধৃত করছি—
“অধোক্ষজ বিচারে প্রবিশ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-বিচার সম্পূর্ণ আন্তিময় থাকিবে।” এমতাবস্থায় যোগিগণের তত্ত্বদর্শন অর্থে যে অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন বিচার, তা' সম্পূর্ণ আন্তিময়—ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য—“অপরোক্ষ, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ এই জগতের ভূমিকা হইতে উথিত বিচার, অধোক্ষজের ভূমিকা অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ, তিনি যখন কৃপা করিয়া অবতরণ করেন, দেখা দেন, তখন তাঁহাকে দেখা যায়। উপনিষদ্ যেমন “নেদম্ যদিদমুপাসতে” বলিয়াছেন, সেরূপ বিচারাবলম্বনে আরোহ-পন্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস করিব না, তাঁহার কৃপাপেক্ষায় তাঁহাকে approach করিবার চেষ্টা করিব। অপরোক্ষ-বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—ত্রিপুটির বৈশিষ্ট্য অস্বীকৃত হইয়েছে। সুতরাং সেখানে সেবা বলিয়া কোন কথা নাই।”

গীতায় শ্রীভগবান্ স্থানে স্থানে নিজমুখে, ‘অহম্’, ‘মম’, ‘ময়ি’, ‘মাম্’—প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে যাহা বলেছেন, তা'তে তিনি স্বয়ং ভগবান্ তাহা প্রতিপন্ন হয়েছে। গীতার ১৩।১৮ শ্লোকে আমিই পরমাত্মা—“হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্”—সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখেছেন,—“সকলের হৃদয়ে স্থিরভাবে অবস্থিত”। “উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।—(গীঃ ১৩।২৩) “এই দেহে জীব ভিন্ন যে অন্য পুরুষ, তিনি নিকটস্থ দ্রষ্টা, অনুমোদনকারী, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলেও কথিত হন।” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকায় জানা যায়—“এস্থলে ‘পরম’ শব্দ একাত্মবাদ পক্ষে স্বাংশ, ইহা প্রকাশ করবার জন্য, জীবের ‘উপ’ অর্থাৎ সমীপে পৃথক্ অবস্থিত হ'য়েই ‘দ্রষ্টা’ অর্থাৎ সাক্ষী।” উক্ত শ্লোকে ভগবান্ দেহী জীবের সহিত দেহ-মধ্যে অবস্থিত যে অন্তর্যামী পরমাত্মা, তাঁর বিচার বর্ণনা করেছেন।

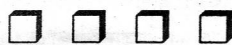
“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ”(গীঃ ১৫।১৫) “আমি সকল প্রাণীরই হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট আছি।” গীতার ১৫।১৬ শ্লোক আলোচনা করলে জানা যায়, তটস্থ স্বভাব বশতঃ বিভিন্নাংশ গত জীব স্বরূপ-বিচ্যুত হওয়ায় সে ‘ক্ষর পুরুষ’ ; স্ব-স্বরূপ হ’তে বিচ্যুত হন না বলে ‘অক্ষর’—ব্রহ্ম। তৎপরে যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা ভগবান বলেছেন,—

“উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মোত্তাদাহতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥ (গীঃ ১৫।১৭)

অর্থাৎ—“পূর্বোক্তে ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব হ’তেও বিলক্ষণ এক উত্তমপুরুষ ‘পরমাত্মা’ বলে কথিত হ’ন, যিনি ঈশ্বর ও নির্বিকার, ত্রিলোক-মধ্যে প্রবিষ্ট হ’য়ে তিনি পালন করে থাকেন।” উক্ত ক্ষেত্রে জীব ও পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন,—ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আবার জীব মুক্ত হ’লেও পরমাত্মা হ’তে পৃথক থাকেন, তাহা জানাবার জন্য পরমাত্মার ঈশিতা ও জগৎপালনাদি কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে। তৎ পরবর্তী শ্লোকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—কারণ, উক্ত শ্লোকে (গীঃ ১৫।১৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্ব-স্বরূপেরই উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে নিজে যে ‘পুরুষোত্তম’, তাহা নিজমুখেই ব্যক্ত করেছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ



সময় নাই

আমার সকল কাজের সময় আছে, কিন্তু হরিভজনের সময় নাই। আহার, নিদ্রা কুটুম্ব-ভরণ, ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি সমস্ত কার্যেই আমি সময় পাই কিন্তু হরিভজনের সময় পাই না। ছোটবেলায় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা আর খেলাধূলাতেই সব-সময় গেল—হরিভজনের তখন ফুরসৎ কই? তারপর যৌবন লাভ করলাম—বাবা-মার শুভেচ্ছায় (আর নিজেরও---থাক) মনোহারিণী বামা আমার বাম-দেশ অধিকার করলে। তার সঙ্গে বিলাসে আর তার প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাতেই আমার অধিকাংশ সময় চলে যায়। বাকী সময়টুকু এত পরিশ্রান্ত থাকি যে, তখন বিশ্রাম ও স্ত্রী-চিন্তা ছাড়া আর কোন বিষয়েই উৎসাহ হয় না। সুতরাং আমার হরিভজনের সময় হয়েই উঠে না।

একবার এক সাধু অবশ্য আমাকে খুব বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, ভগবানই নাকি সমস্ত প্রাণীর সবচেয়ে নিকটতম জন। কিন্তু আমার বিচারে আমার স্ত্রী তাঁর থেকেও আরও নিকট। তিনি বললেন,—“একদম না। দেখুন, ভগবান জীবের

হৃদয়-মধ্যে বাস করেন—একেবারে অন্তরের অন্তস্থলে। কিন্তু আপনি স্ত্রীকে যতই আলিঙ্গনে আবদ্ধ করুন না কেন, আপনার বুকের পাঁজরা সে ভেদ করতে পারবে না। আর, ভগবান্ আমাদের প্রতিক্ষণের এমনকি জন্মে জন্মের সঙ্গী—সেখানে আপনার স্ত্রী আপনার কর্মস্থলেই সঙ্গিনী হতে পারে না, তো জন্মে জন্মের কথা বহুদূরে। এমন নিকটতম যে ভগবান্, তাকে ভুলে স্ত্রী-ভজন করা সত্যিই ভীষণ এক দুর্ভাগ্যের পরিচয়।”

সাধুর কথায় যুক্তি আছে, তেজও আছে—কিন্তু আমার পাষণ-হৃদয়ে তা প্রবেশ করে না, প্রতিফলিত রশ্মির মত তা দূরে কোথায় হারিয়ে যায়। বরং হরিভজনের অবসর যাতে উপস্থিত না হয়, সেইজন্য আমার ইন্দ্রিয়তর্পণরত মন কত না যুক্তি ফেঁদে বসে—ভগবান্ আমাদেরকে জগতে পাঠিয়েছেন, নানা সব কর্তব্যের মধ্যে ফেলেছেন, সুতরাং, স্ত্রীচিন্তা, পুত্রচিন্তা, পিতামাতার যত্ন করা এবং তারপর ধরুন, আমার ঐ সমস্ত ভোগের উপকরণ যাঁতে জগতে আরও সমৃদ্ধি লাভ কোরে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায় হতে পারে, সেইজন্য বহিঃস্থ দেশ ও সমাজের রক্ষা করা বা তাঁদের বহিঃস্থখতার প্রশ্রয় দেওয়া—এগুলিই হচ্ছে ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য। তাছাড়া ‘সংসার ধর্ম্মই বড় ধর্ম্ম’—হরিই তো পাঠিয়েছেন এই ‘বড় ধর্ম্ম’ পালন করতে। সাধুরা অবশ্য ‘কৃষ্ণের সংসার’ করার কথা বলেন—আর আমাদের নাকি করতে। সাধুরা অবশ্য ‘পাপের-সংসার’—সেইজন্যই এই সংসারে যত দুঃখ। তা হলোই বা, ঘরেই তো আমার দু’দুটা বালগোপাল নেচে-কুঁদে বেড়ায়—এটাই তো সেই ‘কৃষ্ণের সংসার’। সুতরাং ছেলের মা আর দুই ছেলে (থুরি বালগোপাল)—তাদের প্রতিপালনই তো আমার কর্তব্য, আমার ভজন। আর এতে আমার হরিবিমুখ মনও বেশ নেচে উঠে।

তাই বলছিলাম, আমার সকল কাজের সময় হয়, হরিভজনের সময় হয় না। শুনেছি শাস্ত্রেও নাকি আমার এই ব্যাপারটা খোলসা করে বলে দেওয়া আছে—**“নিদ্রয়া হ্রিয়তে নন্তং ব্যাব্যেন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্ধে হয়্য রাজন্ কুটুম্ব-ভরণেন বা।।”** অর্থাৎ রাত্রিটা কাটে নিদ্রায় আর স্ত্রীসঙ্গে এবং দিনে ব্যস্ত থাকি কুটুম্বপালনের ব্যবস্থা করতে। সুতরাং দেখুন, শাস্ত্রেই তো আমার কাজের সব অংক কষে দেওয়া আছে। আমার ঠিক এমনই ভীষণ ব্যস্ততা দেখে, আর হরিভজন না করবার মোক্ষম্ সব অজুহাতগুলি শুনে একদিন এক সাধু বললেন (মনে হয় পূর্ববঙ্গের হবেন)—**“মশাই, কারে ফাঁকি দ্যান? শ্যামে নিজেই ফাঁকে পৈড়া যাইবেন, তখন বুঝবেন ঠেলাডা। হাগ্‌বার-মুৎ‌বার সময় পর্য্যন্ত কৈরা লৈতে পারেন, আর ভগবানের নাম করবার সময় কর্তে পারেন না? ইডা একটা কতা হৈলো?”**

দেখলাম, কথাটা ভীষণ সত্য। সাথে সাথে আমার ভোগোন্মুখ চিন্তে যেন আর এক ফাঁকির রাস্তা আবিস্কৃত হ’ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এই বহু কাজের ভিড়ে হরিভজনের নামে একটু অবসর, মানে আর কি, পরিশ্রম-লাঘবের একটু সময় নিশ্চয়ই করা

যেতে পারে। তখন সেই উদ্দেশ্যে একটা ছোট কুঠরী প্রস্তুত করি—তাতে বাজার হতে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল অর্থাৎ আমার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করে দিতে সমর্থ হবে, এমন কোন একটা বা বহু দেবদেবীর ছবি কিনে আনি, তারপর ধূপ, ধুনা, কুশাসন বা কম্বলাসন যোগাড় করে থাকি। কিন্তু ঐ কুঠরীতে গিয়েও আমার হরিভজনের সময় হয় না। দুষ্ট মন চায় সবসময় ইন্দ্রিয়তর্পণ—তার হরিভজন করবার সময় আর হয় না, তার কাজই বাহ্য জগতের পিছনে ধাবিত হওয়া। তাই সেখানে চুপ করে বসে—কোথায় কি কাজ আছে, কোথায় গেলে সুবিধা হবে, কে আমার কেমন অনিষ্ট করছে, কাকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়—ইত্যাদি সহস্র পরিকল্পনা তখন করে থাকি, যেন ঐটাই আমার সমস্ত কল্পনা-পরিকল্পনার সুযোগ্য সময়। অর্থাৎ এক কথায়—হরিভজনের সময় আমার একেবারে নেই-ই।

আবার, মনের ভীষণ অশান্ত্যাব থেকে রেহাই পেতে কারও পরামর্শে আমাব সেই সাধের কুঠরীতে বসে ধ্যান করি—রেচক, পূরক, কুস্তক করে অজপা মন্ত্র জপ করি—ভাবি, তাতে আমার মনের শান্তি বিধান হবে। ঐভাবে মনকে প্রশান্ত করবার চেষ্টায় নিজের চিন্ততোষণ হয় মাত্র—হরিতোষণ হয় না। আর হরিতোষণই তো হরিভজন—সেটা আর হয় কই? আমি তো আছি আমার নিজেকে নিয়ে—হরির জন্য একটা ক্ষণও আমার ভাঙারে নেই। তাই বলছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নেই।

প্রৌঢ়কালে মনে করেছিলাম, পুত্র সাবালক হলে তার হাতে বিষয়সম্পত্তি সমর্পণ করে দিয়ে সারা জীবনের ক্রেশ ও জ্বালা জুড়াবার অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়তোষণের একটা উপায় খুঁজে নিব। কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ইত্যাদি নানা তীর্থস্থানে গমন করব—এতে লোকের কাছে ‘ভক্ত’ বলে প্রতিষ্ঠাও হবে, আবার নানা দেশভ্রমণের দ্বারা চিন্তের সুপ্রসন্নতা (মানে আমার ইন্দ্রিয়তোষণ) লাভও হবে। বৃদ্ধকাল উপস্থিত হয়েছে, এখন আর স্ত্রীপুত্রেরা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন বিশেষ যোগাতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি আর আগের মত নাই, শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখছি, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ার অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন এখন জিহ্বায় এসে একত্র হয়েছে। তাই প্রসাদ-সেবার ছলে বিতাড়িত বৃদ্ধ অকর্মণ্য জরদাবের মত আমি তীর্থে গিয়ে বৈষ্ণবদের মঠে-মন্দিরে ভ্রমণ করে জিহ্বা-লালসা পূরণে উদগ্রীব হয়ে উঠি। স্ত্রী-পুত্রেরাও আজকাল আমাকে সংসারের একটা বৃথা বোঝা বলে মনে করে, আর সেই বোঝার ভার এড়াবার জন্য আমাকে সাধুদের মঠে যাবার রেলখরচ দিয়ে নিষ্কৃতিলাভ করে—ঘরে ফিরে আসবার খরচাটা আর দেয় না। অথচ পূর্বের তাদের কাছ হতে এমন সাহায্য পাইনি। বরং আমি পাছে ভুল করেও হরিভজন করে বসি বা কোন শুদ্ধবৈষ্ণব অর্থাৎ প্রকৃত সাধুগুরুর সঙ্গলাভ করে ফেলি, সেজন্য তা’রা এতদিন সকলে মিলে পাহারা দিয়েছে। নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করলে পাছে তাদের ইন্দ্রিয়তোষণের ব্যাঘাত উৎপাদন হয়, এই আশঙ্কায়

তা'রা আমাকে হাতের জল শুদ্ধ করবার নামে গৃহব্রত-গুরুর কাছ থেকেই মন্ত্র নেওয়া করিয়েছে। যাতে আমি হরিভজনের সময় না পাই, সেজন্য আমাকে সমাজনীতি, দেশনীতি, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি কত কিছু আলোচনা করবার পরামর্শ দিয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, দোষ তো আমারই, আর কারও নয়। আমিই আসলে হরিভজন করতে চাই না, তাই সময়ও পাইনা। আমি যদি প্রহ্লাদের আদর্শ নিতে পারতাম, তাহলে ঐপ্রকার যণ্ড-অমর্কের মত গৃহব্রত-গুরুর দুঃসঙ্গ বা হিরণ্যকশিপু তুল্য 'আত্মীয়' নামধারী পরমশত্রুর কুসঙ্গ উৎপাটন করে শ্রীনারদ-গোস্বামীর মত নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করতাম।

আমার এই আমিত্ব আবার নানাপ্রকার। হরিভজন-বিমুখতাও নানারকমের। আরেক প্রকার 'আমি' আছি, যে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধবৈষ্ণবের কাছে গমন করে, কিন্তু 'অভিগমন' করে না—শাস্ত্রে যে আছে "তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", সেহ অভিগমন করে না, তাঁর শ্রীপাদ-পদে একান্তভাবে শরণাগত হয় না। সেই 'আমি' 'হরিভজন করব' বলি, আবার দার-পরিগ্রহও করি না। তাতে লোকে আমাকে 'ব্রহ্মচারী' বলে এবং নিজেও তা বলে বেড়াই। কিন্তু ব্রহ্মচারী সেজেও আমার হরিভজনের সময় নাই। স্ত্রী, পুত্র না থাকলেও আমার যে 'ষড়রিপু'-রূপী ছয় স্ত্রী আছে, তাদের পালন-পোষণ বা নিগ্রহ করতেই সময় চলে যায়। বা কখনও দুঃখিনী মাতা, বৃদ্ধ পিতার সেবার ছল করে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ করি—হরিসেবা ছেড়ে মায়ার সেবা করতে ধাবিত হই।

আবার কখনও আরেক 'আমি' কৃষ্ণের সংসার পেতে সন্তীক হরিভজন করব, স্ত্রীকে সহধর্মিণী করে নিব,—এইপ্রকার মনোরূপী গুরুর পরামর্শ নিয়ে কার্য্যতঃ নিজের ইন্দ্রিয়তোষণেই নিযুক্ত হই; শ্রীহরির তোষণের সময় করে উঠতে পারি না।

কখনও বা অন্য পরিচয়ের অপর এক 'আমি' মঠ-মন্দির বা 'ঠাকুর-বাড়ী' নির্মাণ করে ভগবানের শ্রীমূর্তি, গুরুদেবের চিত্রপট সামনে খাড়া করি এবং শ্রদ্ধালু, ধর্ম্মভীরু জীবদের কাছ থেকে ভগবৎসেবার নামে আনুকূল্য সংগ্রহ করে বস্ত্রতঃ নিজের ভরণ-পোষণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ প্রভৃতি হরিবিমুখ-কার্য্যেই মত্ত থাকি। বাইরের লোক আমার সে হরিবিমুখতা বুঝতে পারে না—এমনকি আমিও 'বিপ্রলিপ্সা'-দোষের বশবর্ত্তী হয়ে নিজেকে নিজের হরিবিমুখতা বুঝতে দিই না। কিন্তু বিচার করলে দেখি, প্রকৃতপক্ষে সেই আমারও হরিভজনের সময় নাই।

সত্যিই কি আশ্চর্য্য! শ্রীহরি 'কাল' সৃষ্টি করেছেন—তিনি কালাধিপতি, সর্ব্ব কালেই তিনিই একমাত্র সেব্য। অথচ আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী—সকলেই নিজেরাই কালাধিপতি সেজে 'কাল'কে নিজের সেবায় নিযুক্ত করছি! যিনি যে-বর্ণে আছেন, যে-আশ্রমে আছেন, সেই

বর্ণের ও সেই আশ্রমের 'আমি' সর্বকালেই কেবল নিজের তোষণেই ব্যস্ত হয়ে আছি—শ্রীহরির 'কাল'কে হরির তোষণে নিযুক্ত করবার আমার সময় নাই। তাই বলছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নাই।

—বিরূপগ্রস্ত কার্য



বিজয়ার সম্ভাষণ

শারদীয় পূজা আসিল, চলিয়া গেল। প্রতিমা গড়া হইল, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, তাহার পূজা হইল এবং পূজা শেষে তাহার বিসর্জনও শেষ হইল। অনাদিকাল হইতে এইরূপ কার্য চলিয়া আসিতেছে। যতদিন মন নিজের ইন্দ্রিয় ও মনের বিভিন্ন কামনা-তৃপ্তির জন্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া মনের ছাঁচে আরাধ্যবস্তুকে ঢালিতে যাইবে, ততদিনই সে এইভাবে প্রথমে এইরূপ মহামায়াকে গড়িয়া তাহার উপাসনা করিবে, পরে যখন মনে হইবে, পূজা শেষ হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিসর্জন দিবে, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকিবে,—“ওগো, সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়িনি মা, বৎসর বৎসর যেন এমনইভাবে তুমি আমাদের ঘরে আসিও, আর আমরাও আমাদের যত অভাব, অভিযোগ, কামনা, তোমাকেই জানাইব। মাগো! তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেই বা জানাইব—মা ছাড়া সন্তান আর কাহাকেই বা নিজ সুখবিধানের আব্দার করিতে পারে? আর মা, তুমি ছাড়া এমনভাবে আর কেই বা সন্তানের সকল কামনার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারে? তুমি তাহা পার বলিয়াই ত' তোমাকে মধুর 'মা'-নামে ডাকি! তোমাকে মা, বিসর্জন দিতে প্রাণ চায় না, তবুও তাহা গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত করিতে হইতেছে—কি করিব, উপায় যে নাই, মা!

চৈতন্য-বস্তু বা চৈতন্য-বস্তুর যিনি সর্বময় কর্তা, সেই শ্রীবিষ্ণুর কিন্তু বিসর্জন নাই। জগতের ইতিহাসে, জগৎসৃষ্টির পূর্বে বা জগৎধ্বংসের পরেও শ্রীবিষ্ণুর কোন মূর্তিরই—শ্রীশালগ্রামই বল, আর চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজই বল—বিসর্জন হয় নাই, হইতে পারে না। যাহার বিসর্জন আছে, যাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহার জন্ম বা উদ্ভবও আছে—ইহাই নিয়ম। তাহা—অচৈতন্য, জড়। কিন্তু চৈতন্য-বস্তু ও তাহার ধর্ম—নিত্য, তাঁহাকে কেহ কোনদিন গড়ে নাই, গড়িতে পারেও না। কেননা, গড়িতে গেলেই কোন না কোন সময়ের মধ্যে কোন যন্ত্রদ্বারা কোন কর্তারই তাহা সম্পাদন করিতে হয়। আবার, তাহা নির্দিষ্ট সময়ে বিনষ্টও হইয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যের ধ্বংস নাই।

দুইটা চৈতন্য নিত্যকাল ছিল, আছে ও থাকিবে—একটির নাম 'জীব', আর অপরটির নাম 'বিষ্ণু'। একটি পরমাণু অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অপরটি 'বিভু' অর্থাৎ

বৃহৎ। ছোটটি অল্পস্থান, আর বড়টি সমস্ত স্থান জুড়িয়া আছে। ছোট চৈতন্য সংখ্যায় অনেক, কিন্তু বড়টি এক—দুই বা বহু নহে। ছোটটি—ভৃত্য, বড়টি—প্রভু। বড়টি সর্বদাই ছোট চৈতন্যের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহার সেবা গ্রহণ করে, তাহার সহিত খেলা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। ছোটটির তাহাতেই কেবল আনন্দ। এমনটি যদি সমস্ত ছোট চৈতন্যের ক্ষেত্রেই হইত তাহা হইলে ত' কোন চিন্তার কারণ ছিল না—কোন নিরানন্দই থাকিত না। কিন্তু তাহা ত' হইল না! কেন, জান?

ছোটটির চৈতন্যের ধর্মে স্বতন্ত্রতার একটি অধিকার নিহিত আছে। তাহাতে সে যেমন ভালছেলেটির মত প্রভুর অনুগমন করিতে পারে, আবার তেমনই 'দুষ্ট ছেলের' মত প্রভুর সেবা ছাড়িয়া দিয়া নিজের খেয়ালমত মিথ্যা স্বার্থসিদ্ধির জন্যও মনোযোগী হইতে পারে। আর এইপ্রকার বেইমান ছোটগুলির দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ। তাহারা বড়টির প্রীতির আকর্ষণ না বুঝিয়া, তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র গতি না জানিয়া, তাঁহার সুখেই যে নিজের অন্তহীন সুখ এবং সে যে তাঁহার নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া সে দৌড়াইল স্বাধীন হইয়া নিজের সুখের জন্য। সে তখন নিজেকে আর বড়চৈতন্যের অধীন বলিয়া ভাবে না। নিজেকে স্বাধীন ভাবিয়া নিজের তোষণকেই খুব বড় বলিয়া মনে করে।

কিন্তু সেই 'বিভু' চৈতন্য যে তাহাকে অত ডাকিতেছে, সেই ছোট চৈতন্য তাহাতে জ্ঞান্বেষণ করিতেছে না। উপস্থিত যৎসামান্য একটু মজা পাইলেই হইল, অমনি সে দু'হাতে লুটিবার জন্য ছুটিল। সে এমনই আচ্ছন্ন যে, একবার ভ্রমেও ভাবে না, যাহাকে ভোগ করিবার জন্য বা যাহার দ্বারা নিজের সুখ পাইবার জন্য ছুটিতেছি, অত পরিশ্রম করিতেছ, সেই বস্তুটাই তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। যাহাকে পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়া লুটিয়া নিজের তৃপ্তি সাধন করিবে ভাবিয়াছিল, তাহারই সে হইয়া পড়িল, একেবারে 'গোলাম'। অথচ একবারও সে তাহার পুরাতন বান্ধব বড়টির অর্থাৎ 'চৈতন্য-বিষ্ণুর' কোন সংবাদ পর্যন্ত রাখিল না, অথবা এক মুহূর্তের জন্য মনে করিল না যে,—সে নিজে কোন্ বস্তু, কে তাহার প্রভু ও নিজজন; এবারও ভাবিল না যে,—সেই বড়-চৈতন্য তাহাকে কত কৃপা করিতে প্রস্তুত, আর সে কত বড় বে-ইমান, কত বড় কৃতঘ্নতা করিয়া একেবারে তাহার আসল নিত্যকালের বসত-বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া একেবারে জাহান্নামে গিয়া পড়িল। এমন ধারা বোকামী কেউ করে গা! যার মাথায় একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, সে ত' কই, এমন বোকামি কখনও করে না, করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হয়, বোকামি সে ত' করিয়াছেই। এখন তাহার ফল কি হইল, তাহাও একটু শুন।

পূর্বেই বলিয়াছি ছোটের সংখ্যা অনেক। ঐ ত' তুচ্ছ ক্ষণিক মজা, কিন্তু ঐ মজাটুকুর লোটালুটিতে অনেকগুলি ছোট তাহাতে যোগদান করিল। এক-একজন একাই সবটা লুটিতে চায়, কাজেই পরস্পর ঝগড়া বাধিয়া যায়। প্রত্যেকের মনে

আশঙ্কা—আমার এই সাধের জিনিষটা, বুঝি, ঐ অপর একটা ছোট আক্রমণ করিয়া আমার গ্রাসটা কাড়িয়া লইতে আসিতেছে ! আবার সাধের জিনিষটা যখন অন্য জোর করিয়া, হিংসা করিয়া লইয়া গেল, যখন তাহাকে আর তৃষ্ণা মিটাইয়া ভোগ করা গেল না, বা ভোগ করিতে করিতে অতৃপ্ত অবস্থায় উহা মাঝখান হইতেই নষ্ট হইল, তখন তাহার বিষম শোক—সে কি ভীষণ বুকফাটা কান্না ! কিন্তু মজার কথা এই যে, সেই কান্না আবার যখনই থামে, আবার তখনই সে ঐরূপ মজা লুটিতে ছুটে—আবার শুরু হয় সেই অন্য ছোটগুলির সাথে হিংসা, আর বিবাদ, আবার সেই শোক, আবার সেই ক্রন্দন।

এমনটী কিন্তু তাহার স্বভাবে নাই, বা এমনটী যে চিরকালই থাকিবে, তাহাও নয়। কেননা, তাহা হইলে সে আবার ভুল শোধরাইয়া তাহার নিত্যপ্রভু সেই বড়-চৈতন্যের বাড়ী, যাহা তাহারই প্রকৃত নিজ দেশ, সেখানে গিয়া সেই প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ পায় কেন ? আসল কথা এই যে, ঐ গোড়ার ভুলটাই বড় ভয়ানক হইয়াছিল। ওটা শুধরালেই, বুদ্ধিটা তাহার একটু ভাল হইলেই সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, সে কোন্ জিনিষ, আর ঐ বড় চৈতন্য বিস্ময় বা তাঁহার কে হয়েন ? সে তখন ভাবে, ‘অত বড় চৈতন্য বস্তু, যিনি আমার নিত্যকালের প্রভু ও আমি তাঁহারই জন—আর সেই সম্বন্ধে তাঁহার অসংখ্য অমূল্য জিনিষের মালিকও আমি, অথচ আমি অমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রভুর সেবা ছাড়িয়া একটা কুৎসিৎ মোহিনীর ছলনার মোহে ভুলিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছি—কত বড় নিমক্-হারামির কাজই না করিয়াছি ! কি সর্বনাশ, ঐ ত’ একটু অন্যমনস্কতা—প্রভুর সুখ ছাড়িয়া একটু নিজের সুখের পানে দৃষ্টি ! আর তার ফলে কতটা ভোগান্তি, কতটা বিরাট কৰ্ম্মকাণ্ড—কত হাঙ্গামা-ফেসাদ।

এই ছোট-চৈতন্যগুলির বোকামি দেখিয়া তাহাদিগকে শোধরাইয়া ঘরে আনিবার চিন্তা করেন ঐ বড়-চৈতন্যই। তাঁহার আর এক নাম ‘সনাতন’। আবার, তাঁহার যে-সকল নিত্যসেবকগণ আছেন, তাঁহাও ‘সনাতন’। তিনি কখনও কখনও তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া ছোট চৈতন্যগুলির কানে কানে, কখনও হাত বুলাইয়া, কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, কখনও কোমল-স্বরে, কখনও কঠোর-বাক্যে, তাহাদের নিজেদের প্রকৃত পরিচয়, নিজ-দেশের কথা, নিজ প্রভুর কথা, সেই প্রভুর সাথে তাহাদের নিত্য-সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি নিত্য সেবাসম্বন্ধের কথা প্রভৃতি বলিয়া বলিয়া সমস্ত কিছু স্মরণ করাইয়া দেন। তাহাতে কোন কোন ছোট চৈতন্য সেই ডাকে সাড়া দিয়া উঠে, আর তাঁহার কথামত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে, আর সেই নিত্যপ্রভুর সেবাকর্য্যে মগ্ন হইয়া নিত্য আনন্দে নিজে ডুবিয়া যায়। আর যাহারা সেই কথায় সাড়া দেয় না, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয় না, তাহারা ঐ পরদেশকেই নিজদেশ ভাবিয়া বেঘোরে পড়িয়া ক্ষণিক মজার জন্য মারামারি করিয়া মরে।

এই যে ছোট-চৈতন্যের কানে নিত্য প্রভুর কথা শুনানো, উহারই নাম—‘শ্রুতি’ বা ‘বেদ’। ‘সনাতনের’ মুখ হইতে এই বাণী কর্ণগোচর হইলে, আবার কোন কোন ভাগ্যবান সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকে সেই নিত্যপ্রভুর কথা, নিজ নিত্য দেশের কথা শুনাইয়া নিত্য আনন্দের সংবাদ জানায়। আবার সেও অপরকে এই আনন্দবার্তা জানাইয়া ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের যাত্রীর গোত্র বৃদ্ধি করে। এইভাবে শ্রুতিপথে অর্থাৎ কর্ণপথে কীর্তন-দ্বারা বেদকে অবতারণা করায়। এই শ্রবণ-কীর্তনই সমস্ত ছোট-চৈতন্যের নিত্য-ধর্ম। ইহাই বেদ—ইহাই পুরাণ—ইহাই ভাগবত—ইহাতেই ধর্ম অধিষ্ঠিত। ইহা না থাকিলে জগৎ হইতে বেদ ও বৈদিকধর্ম লুপ্ত হইয়া জগৎধ্বংস হইয়া যাইত।

ইনি সর্বদা বর্তমান থাকেন, এইজন্য ইহার নাম ‘সনাতন’—(সদা+তন)। এই সনাতনের কোন ভাঙ্গাগড়া নাই, কোন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই—ইহার পূজায় কোন বিসর্জনের বাজনা নাই, আছে কেবল সেবকের নিত্য আরাট্রিক-সেবার বাজনা, যে-বাজনায় ঐ ছোট-চৈতন্যকে বড়-চৈতন্যের নিত্য সেবানন্দ-রসে ডুবাইয়া নিত্য নবনব সেবানন্দ-স্রোতে ভাসায়।

বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী পাঠক-পাঠিকাগণ, এই সনাতনই দিব্যজ্ঞান প্রদাতা বৈকুণ্ঠ-সন্দেশদাতা সদগুরু। তিনি নিত্যকালই ছোট-চৈতন্য আমরা যাহারা নিত্য চৈতন্যবিমুখ, সেই আমাদেরকে আমাদের নিত্যপ্রভু সেই বড়-চৈতন্য শ্রীবিষ্ণুর ধামে গিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ডাকিতেছেন। চলুন, আর একটুকুও সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার মধুর-স্বরে গীত সেই গানটা গাই—

“ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম রে।

যে জন চৈতন্য ভজে, সেই আমার প্রাণ রে।।”

এই গানই একদিন সদগুরু নিত্যানন্দ স্বয়ং গাহিয়া গৌড়দেশ-বাসিগণকে গাওয়াইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার উন্মুখ করিয়াছিলেন। কৃপাময় পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি ইহাই আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ।



বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

এক বৈশিষ্টপূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে।

ভক্তগণ সত্বর সংগ্রহ করুন।

এতদ্বারা শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য হইতেছে যে, এখনও পর্যন্ত পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা বা আত্মকূল্য যাঁহারা প্রদান করেন তাহী, তাঁহারা অতিসত্ত্বর দেয় ভিক্ষা প্রদান করিয়া পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ কার্তিক, ১৪১১, ১৬ নভেম্বর, ২০০৪



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিদ্যশূন্য।	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরিকথায় রতি নৈলে পুণ্ড সেই শ্রম।
--	--

২০ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ
৫৬শ বর্ষ } ৩০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৪১১, ১৬/১২/২০০৮ { দশম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকম্

[শ্রীল-স্বরূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

স্বভক্তিযোগ-লাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণং

হরি-প্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসূত-প্রিয়েশ্বরম্।

সরাধা-কৃষ্ণসেবন-প্রকাশকং মহাশয়ং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ১ ॥

যিনি নিজ-ভক্তিযোগে বিলাস করত সর্বদা ব্রজে বিহার করেন, যিনি হরিপ্রিয়া-গণের মধ্যে অগ্রগণ্য, শ্রীশচীসূত-প্রিয়গণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রকাশক, সেই মহাত্মা, সুপণ্ডিত, গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

নবোজ্জ্বলাদি-ভাবনা-বিধান-কর্মপারগং

বিচিত্র-গৌর-ভক্তি-সিদ্ধ-রসভঙ্গ-লাসিনম্।

সুরাগ-মার্গ-দর্শকং ব্রজাদি-বাস-দায়কং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ২ ॥

নিত্যনব-উজ্জ্বল ও আকর-রস অর্থাৎ মধুর-রসময়ী ভাবনার বিধান-ক্রিয়ায় যিনি পারঙ্গত, বিচিত্র গৌরভক্তি-সিদ্ধুর রসতরঙ্গে যিনি বিলাসরত, সর্বোত্তম রাগমার্গের প্রদর্শক ও ব্রজাদি ধাম-বাসে অধিকার প্রদানকারী, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

শচীসুতাজিসার-ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-গৌরবং

গৌরভাব-চিত্তপদ্ম-মধ্য-কৃষ্ণ-সুবল্লভম্।

মুকুন্দ-গৌররূপিণং স্ব-ভাব-ধর্ম-দায়কং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশচীসুত-পাদপদ্মে ঐকান্তিক আশ্রিত ভক্তবৃন্দের যিনি বন্দনীয় এবং গৌরবের বস্তু, শ্রীগৌরহরির ভাবরূপ-চিত্তপদ্ম মধ্যে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার প্রাণবল্লভ, শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণকে যিনি নিজের হৃদয়ের ভাবরূপ ধর্ম অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাব প্রদানকারী, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

নিকুঞ্জ-সেবনাদিক-প্রকাশনৈক-কারণং

সদা সখীরতি-প্রদং মহারসস্বরূপকম্।

সদাশ্রিতাজি-পুণ্ডরীক-প্রদং সদগুরুং বরং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৪ ॥

যিনি নিকুঞ্জ-প্রেমসেবাদি প্রকাশের একমাত্র কারণ, সর্বদা সখীরতি (গোপীভাব)-প্রদাতা এবং মহারসস্বরূপ, সর্বদা আশ্রিতগণকে যিনি স্থায়ী চরণপদ্ম প্রদানকারী সদগুরুবর্ষ্য, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভোর্মহারস-প্রকাশনাকুরং প্রিয়ং

সদা মহারসাকুর-প্রকাশনাদি-বাসনম্।

মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনা-ভাব-মোদ-কারকং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহারস-প্রকাশের যিনি প্রিয় অকুর-স্বরূপ, মহারসাকুর-প্রকাশে সর্বদা বাসনায়ুক্ত এবং মহাপ্রভুর ব্রজাঙ্গনা-ভাবাস্বাদনে অনুমোদনকারী, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তি-বর্দ্ধকং

নিজেষু রাধিকাত্মতা-বপুঃ প্রকাশনাগ্রহম্।

অশেষ-ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃত-প্রদং

ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিজেন্দ্রবৃন্দের নিত্য বন্দনীয় শ্রীহরির চরণযুগলে ভক্তিবর্দ্ধনে যিনি সমর্থ, নিজগণে স্থায়ী রাধিকাত্মক বিগ্রহ-প্রকাশে আগ্রহবান, অশেষ ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষায় উজ্জ্বলরসামৃত প্রদানকারী, এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

মুদা নিজ-প্রিয়াদিক-স্বপাদপদ্ম-সীধুভি-
 মহারসার্গবামৃত-প্রদেষ্ট-গৌরভক্তিদম্।
 সদাস্ত-সাত্ত্বিকাস্থিতং নিজেষ্ট-ভক্তি-দায়কং
 ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥ ৭॥

সানন্দে নিজ-প্রিয়বর্গকে যিনি স্বীয় পাদপদ্ম-মকরন্দসহ মহারসসিদ্ধি-রূপ-অমৃতপ্রদ
 স্বাভীষ্ট গৌরভক্তি প্রদান করেন, যিনি সর্বদা অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবাধিত এবং নিজ
 ইষ্ট-ভক্তিদাতা—এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যদীয়-রীতিরাগ-রঙ্গভঙ্গ-দিগ্ধ-মানসো
 নরোহপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাব-ভাজনম্।
 তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তমেতু চিত্ত-মত্ত-ষট্পদো-
 ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্॥ ৮॥

যাঁহার রীতিরাগ-রঙ্গ-তরঙ্গে প্রাবিতমনা ব্যক্তি শীঘ্রই নারী অর্থাৎ ব্রজবধূ-ভাবভাজন
 হন, ও তাঁহার চিত্তরূপ মত্ত-ভ্রমর সেই উজ্জ্বল-রসাত্মক চিত্ত প্রাপ্ত হয়, আমি এরূপ
 সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

মহারসামৃতপ্রদং সদা গদাধরাষ্টকং
 পঠেত্ত্ব যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনা-গণোৎসবম্।
 শচীতনূজ-পাদপদ্ম-ভক্তিরত্ন-যোগ্যতাং
 লভেতরাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রি-পদ্ম-সেবয়া॥ ৯॥

ব্রজাঙ্গনাগণের উৎসবরূপ মহারসামৃত-প্রদ এই গদাধরাষ্টক যিনি অত্যন্ত
 ভক্তিসহকারে সর্বদা পাঠ করেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকাজিহ্ন শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম-
 সেবাদ্বারা শ্রীশচীনন্দন-পাদপদ্মে ভক্তিরত্ন লাভের যোগ্যতাজর্জন করেন ॥ ৯ ॥

ধর্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড় সম্বন্ধ অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী প্রতিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—বর্তমান
 বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্মভাবের সামঞ্জস্য যে প্রকার উচ্চ জীবনপ্রার্থী-
 দিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদস্য
 নিক্কারিণী বুদ্ধি কিপ্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে
 পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত-জীবন জড়বিজ্ঞান-নির্দ্বারিত
 মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ স্বীকৃত হইতে পারে—এই দুইটী
 প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমার্থিক বুদ্ধি
 এবং জড়বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি এতদুভয়ের মধ্যে একটী বিবদমান ভাব আছে, ইহাতে

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়স্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্তমান, (যেমন) প্রেমচেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব-সাধক ভাবের সদসৎ বিচার এবং ধর্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে-কোন প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বকালে এবং সর্বদেশে একাল পর্য্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে সে সমুদয়ই একটি বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটি বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটি জড়যন্ত্রের ন্যায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে! এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম ও সৎকারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি, অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদসৎ চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা যাহা সম্প্রতি আমাদের সত্যায় গভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে, সে সমস্ত এককালে খপুষ্পের ন্যায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সৎলোক ও অসৎলোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্বভাবের জড়সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার মাধ্যাকর্ষণ-বল-নিষ্কিপ্ত পর্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর-ফলকের ন্যায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বेष কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিণ্ডল, হাক্সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাপ্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এস্থলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্বে লুএলিন ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। এখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদীগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে বিজ্ঞান-বৈশারদী-বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক উর্দ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপার সকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং উর্দ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপার-সকলের অনুসন্ধান-পূর্বক দেখিয়া থাকেন যে, বস্তুসকলের কিরূপে ক্রমবিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃতপান করতঃ কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়। যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাব ও ধর্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি? তাহাদের আসল

কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদদাতার কার্য্য-সম্বন্ধের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণ কর্ত্তমাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্য্যের গৌণ নিয়ন্তা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



অভক্তি-মার্গ

অভক্তির পরিচয়

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই অভক্তিমার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কৰ্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি-মার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হটকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্য্যয় ঘটয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ-গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

সচেতা সামাজিকগণ! আপনাদিগকে ভক্ত-অভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন-শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অনু শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীল্ ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্তাত্মক কায়মনোবাক্য-সম্বন্ধীয় তৎতৎচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন-সম্বন্ধীয় তত্তত্তাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন দ্বয়।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম ও জীবতত্ত্ব

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ

করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয়-তত্ত্ববস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতারসমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্থায়ী অনুশীলন করাইয়া বিষু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন, উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব 'ভক্ত' সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত, ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন।

অভক্তি-বৃত্তির লক্ষ্য

ভক্তের ভক্তি-বৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন ; সুতরাং যোগিগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ-প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণের চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফল-দাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন। আবার কোন সময় স্থায়ী বিভূত্বে ও প্রভূত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেষ্টাচার ভোগপর জীবনই হরিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই, জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র, বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেইসকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

অনুকূল-প্রতিকূল ভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণানুশীলন

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দম্ভবক্র, শিশুপা, পুতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য়্যায় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচনামা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান-রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ



শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী
 অনুক্ষণ শ্রীভগবদ্ভ্যাম শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণদ্বারা
 যাবতীয় বিপদাপদের শান্তি ও
 অনিত্য জীবনের সার্থকতা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
 তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, (নদীয়া)

ইং ১৩।৮।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

* * তোমাকে ১।৮।৬০ ও ৮।৮।৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য ১৩।৮।৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে * এর সম্বন্ধে একটি বিভীষিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য মন খুব উদ্ভিন্ন। এরূপ সঙ্কট সময়ে ধীর-স্থির হইয়া যে-কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা কারা আবশ্যক। সর্বদাই ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।

“যায় সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই।” —সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ণনই আমাদিগকে নিশ্চিত্ত করিবে। শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য। * * *

আর একটি পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যানে একটি পয়ার লিখিত আছে—“স্নেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা” (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২)—এই নীতি অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিম্নে চরিতামৃতে আর একটি লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি—

“শ্রীগোপাল-নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।

বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহা অধিকারী ॥ ৪১ ॥

শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।

স্নেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেলা পালাঞা ॥ ৪২ ॥

সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।

ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে” ॥ ৪৩ ॥

এত বলি’ সেই বালক অন্তর্দ্বান হইল।

জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪)

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে * ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে * এবং * কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্য পাঠাইতে পারা যায়। * প্রভুকে ডাকিয়া এসব বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সব রকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া

কার্য্য করিবে। মঠের অন্যান্য সেবকগণকে নিরাপদে রাখিতে চেষ্টা করিবে। * *
* তবে একথা খুবই সত্য—মানুষের জীবন অনিত্য। যে-কোন মুহূর্ত্তেই জীবন বহির্গত
হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মফল অনুযায়ী মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তথাপি ভগবৎসেবাদ্বারা
সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিষ্ণুশর্ম্মার ‘মিত্রলাভ’ গ্রন্থে
একটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

ধনানি জীবিতশ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।।

অর্থাৎ ধন এবং জীবন—ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনাশশীল
হইলেও সংকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য।

* এর অন্যত্র যে রূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, * জেলায় বিশেষতঃ
তোমাদের ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ধীর-
স্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে * ও * কে
পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন * এর সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া
তাহাদিগকে আনাইতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব
না।

এখানে মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। * প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। * এখানকার
অন্যান্য সংবাদ ভাল। * র সহিত আবশ্যিকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্য
বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। * * সহিত পরামর্শ করিতে পার।
ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য-৫)

জনশ্রুত রাজার প্রপৌত্র বড় দাতা ছিলেন, তাঁহার নাম জানশ্রুতি। তিনি এইপ্রকার
অভিলাষবিশিষ্ট ছিলেন যে, ‘সর্ব্বত্র সমস্ত লোক আমারই অন্ন ভোজন করিবে এবং
আমার গৃহে বাস করিবে’—এই বিচারে তিনি অন্নছত্র ও পাশুশালা নির্মাণ
করাইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকালে একদিন রাত্রি কতিপয় হংস উড়িয়া যাইতেছিল।
তন্মধ্যে এক হংস অপর একটা হংসকে বলিল—অরে ভল্লাক্ষ! দেখ জানশ্রুতি
পৌত্রায়ণের তেজ্যুলোকের সমান প্রকাশমান। তুমি উহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেলে
ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন ভল্লাক্ষ উত্তরে বলিল—অরে, তুই এই রাজার কোন মহত্ব
দেখিয়া ইহাকে এতটা সম্মান প্রদান করিতেছিস? এ কি শকটবান রৈক্কের সমান?
অপর হংস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—রৈক্কে কি প্রকার? তদুত্তরে অন্য হংস কহিল—

যেরূপ পাশা খেলায় বিজেতা ব্যক্তির অধীন সমস্ত পাশাই হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রজাগণ যাহা কিছু সংকল্প করে, সে সবই রৈক প্রাপ্ত হন। যে রৈককে জানে, সে আমাকে তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে।

জানশ্রুতি ঐ পক্ষীদের কথা শুনিয়া প্রাতঃকালে সেবকগণকে রৈকের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। বহু অনুসন্ধানের পর সেবকগণ রৈককে এক শকটের নীচে শরীর চুলকাইতে চুলকাইতে যাইতে দেখে। তাহারা আসিয়া রাজার নিকট সংবাদ দিলে, রাজা এক হাজার গাভী, হার, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি লইয়া রৈকের নিকট গিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন। রৈক প্রথমে রাজাকে ‘শূদ্র’ বলিয়া সম্বোধন করেন অর্থাৎ রৈকের প্রশংসায় রাজার মনে দুঃখ হইয়াছিল বলিয়া শূদ্র সম্বোধন করেন। পরে রাজাকে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন। উপদেশ-সার এই—বায়ুই সংসর্গ। যখন অগ্নি নিব্বাপিত হয় ও সূর্য্য-চন্দ্র অস্ত হয়, তখন বায়ুতে লীন হয়। জল শুকাইলে বায়ুতেই লয় প্রাপ্ত হয়। বায়ু সমস্ত জলকে নিজ মধ্যে লীন করে—ইহা অধিদেবত দৃষ্টি।

এখানে অধ্যাত্মদর্শন বলা যাইতেছে—প্রাণই সংবর্গ। যখন পুরুষ শয়ন করে, বাগিদ্রিয় প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, শ্রোত্র ও মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। প্রাণ সকলকে নিজ মধ্যে লীন করিয়া লয়। এই দুইটিই সংবর্গ বায়ু ও প্রাণ।

কপিগোত্রজ শৌনক এবং কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতীরা ভোজনরত থাকিলে জনৈক ব্রহ্মচারী উহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভিক্ষা দেন নাই। তখন ব্রহ্মচারী বলেন—ভুবন-রক্ষক দেব প্রজাপতি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন। নানাভাবে নিবাসকারী মনুষ্যগণ সেই দেবতাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং যাহার জন্য অন্ন, তাহাকেই অন্ন দেয় না। শৌনক ঐ বাক্য মনন করিয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন—যিনি দেবগণের আত্মা, প্রজাসকলের উৎপত্তি-কর্তা, হিরণ্যদেব, ভক্ষণশীল ও মেধাবী, যাঁহার মহিমা প্রভূতভাবে ঘোষিত, অন্যে যাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না, আমি তাঁহারই উপাসনা করি—এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন।

উপরিউক্ত ঐ অগ্নি প্রভৃতি এবং বায়ু পঞ্চবস্তু এবং প্রাণাদি পঞ্চবস্তু—এই দশই কৃত (কৃত-নামক পাশা ক্রীড়ায় উপলব্ধিত হয়)। সকলদিকের অন্নই ঐ দশ কৃত। এবং বিরাটই অন্নাদ (অন্নভক্ষক)। তদ্বারাই সমস্ত দৃষ্ট হয়।

জবালা-পুত্র সত্যকাম নিজ মাতাকে বলিয়াছিলেন—“মাতঃ, আমি ব্রহ্মচার্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুকূলে নিবাস করিতে ইচ্ছা করি ; অতএব আমার গোত্র কি তাহা বলুন।” মাতা তদুত্তরে বলেন—“আমি তাহা জানি না। আমি জবালা, আর তুমি সত্যকাম। সুতরাং তুমি সত্যকাম-জাবাল নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিবে।”

সত্যকাম হারিক্রমত গৌতমের নিকট গিয়া কহিল,—“আমি পূজ্যপাদ আপনার নিকট ব্রহ্মচার্য্য পালনপূর্ব্বক বাস করিতে ইচ্ছা করি।” তদুত্তরে গৌতম উহার গোত্র

জিজ্ঞাসা করিলে সত্যকাম বলিল—“আমার জননী এই বলিয়াছেন—আমি যৌবনকালে বহু পরিচারিণী অবস্থায় তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তোমার গোত্র কি, তাহা জানি না। আমার নাম জবালা ও তুমি সত্যকাম নামধারী ; অতএব তোমার পরিচয়—সত্যকাম-জাবাল।” তখন গৌতম বলিলেন—“এইরূপ সত্য-ভাষণ ব্রাহ্মণেতর কেহ বলিতে পারে না। অতএব তুমি সমিধ লইয়া আইস, তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব। তাহাকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিয়া চারিশত কৃশ গাভী উহাকে দিয়া বলিলেন—“তুমি এই গাভীসকলের পশ্চাতে গমন কর।” যাইবার সময় সত্যকাম বলিয়া গেল, “এই গাভীসকল একসহস্র সংখ্যক না হইলে আমি ফিরিব না।” গো-সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইলে, এক যাঁড় সত্যকামকে বলিল—“সত্যকাম! আমরা সহস্র সংখ্যক হইয়াছি, এক্ষণে আচার্য্যের নিকট আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দাও। তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিতেছি।” সত্যকাম শুনিতে অভিলাষী হইলে, যণ্ড বলিল—পূর্বদিক ‘কলা’, পশ্চিমদিক ‘কলা’, উত্তরদিক ও দক্ষিণদিক ‘কলা’—এই চারি ‘কলা’ ব্রহ্মের প্রকাশবান নামক চারিপাদ। যে ইহা জানিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে ব্যক্তি প্রকাশবান হয় এবং প্রকাশবান লোককে জয় করা যায়। অতঃপর অগ্নি তোমাকে দ্বিতীয় উপদেশ করিবে—বলিয়া বুধ মৌন হইল।

গুরুকুলে প্রত্যাবর্তনভিমুখে সায়ংকালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে আখতি প্রদানার্থ অগ্নির পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে বসিলে অগ্নি তাহাকে অপর পাদ উপদেশ করেন—পৃথিবী ‘কলা’, অন্তরীক্ষ ‘কলা’, দ্যুলোক ‘কলা’ ও সমুদ্র ‘কলা’। এই চারি ‘কলা’ ব্রহ্মের অনন্তবান নামক চতুস্পাদ। ইহাকে এইরূপ জানিলে অনন্তবান হইয়া অনন্তবান লোকে জয় করিতে পারে। হংস তোমাকে তৃতীয় পাদ উপদেশ করিবে। এই বলিয়া অগ্নি নীরব হইলেন।

পরদিন সায়ংকালে গাভীসকল কোনস্থানে একত্রিত হইলে সত্যকাম অগ্নির পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে বসিবার পর এক হংস তাহার সমীপে গিয়া তাহাকে বলিল,—“সত্যকাম! আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ উপদেশ করিব।” সত্যকাম স্বীকৃত হইলে হংস কহিল—অগ্নি কলা, সূর্য্য কলা, চন্দ্র কলা, ও বিদ্যুৎ কলা। এই চতুষ্কলা ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান নামক চতুস্পাদ। এইপাদের উপাসনা করিলে জ্যোতিষ্মান হইয়া জ্যোতিষ্মান লোককে জয় করিতে পারে। মদগু তোমাকে চতুর্থপাদ বলিবে—বলিয়া হংস নীরব হইল।

পরদিন গুরুকুলাভিমুখে গমনকালে সন্ধ্যার সময় কোনস্থানে একত্রিত হইয়া অগ্নিতে সমিধাধানপূর্বক অগ্নির পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে বসিলে মদগু তাহার নিকট অবতরণ করিয়া বলিল—সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ উপদেশ করিতেছি—প্রাণ কলা, চক্ষু কলা, শ্রোত্র কলা ও মন কলা। ইহা ব্রহ্মের আয়তন-বান নামক চতুষ্কলা। ইহাকে জানিলে আয়তনবান হইয়া আয়তনবান লোককে জয় করিতে পারে।

অতঃপর সত্যকাম আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হয়। তাহাকে দেখিয়া আচার্য্য বলিলেন,

—“সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মবেত্তা বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে কি কেহ উপদেশ দিয়াছে?” সত্যকাম বলিল—“আমাকে মনুষ্যেতর প্রাণী উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার নিকট উপদেশ প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। কারণ আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাই অতিশয় সাধুতা প্রাপ্ত করায়।।” তখন আচার্য্য তাহাকে ঐ বিদ্যাই উপদেশ করেন।

উপকোশল নামক ব্রহ্মচারী সত্যকামের নিকট উপসন্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর নিবাস করেন। সত্যকাম অন্য ব্রহ্মচারীর সমবর্তন সংস্কার করিলেও তাহার কিছুই করেন নাই। তখন আচার্য্যপত্নী আচার্য্যকে কহিলেন, এই ব্রহ্মচারী খুব তপস্যা এবং উত্তমরূপে অগ্নির সেবা করিয়াছে; এখন ইহাকে বিদ্যা উপদেশ করা কর্তব্য। কিন্তু আচার্য্য তাহা শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। উপকোশল মনের খেদে অনশন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে আচার্য্যপত্নী কহিলেন, ব্রহ্মচারিন্! তুমি ভোজন কর। ব্রহ্মচারী বলিল—মাতঃ! মানুষের মধ্যে বহুদিক্‌গামী অনেক প্রকার কামনা থাকে। আমি ব্যাধিতে পূর্ণ, এজন্য ভোজন করিব না।

পুনরায় অগ্নিসকল একত্রিত হইয়া কহিল,—এই ব্রহ্মচারী আমাদের উত্তম সেবা করিয়াছে। আচ্ছা, আমরাই ইহাকে উপদেশ করিব। এই বলিয়া অগ্নি বলিল—প্রাণ ব্রহ্ম, ‘ক’ ব্রহ্ম, আর ‘খ’ ব্রহ্ম,। ব্রহ্মচারী বলিল,—প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা জানি; কিন্তু ‘ক’ ও ‘খ’ কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা জানি না। উত্তর—‘ক’ই ‘খ’ এবং ‘খ’ই ‘ক’। ‘খ’=আকাশ অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্ম। এইরূপে প্রাণ ও তাহার আশ্রয়ভূত আকাশের উপদেশ প্রাপ্ত হইল।

পুনরায় তাহাকে গার্হপত্য্যগ্নি বলিল—পৃথ্বী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য এই চারিটি আমার শরীর। আদিত্যের অন্তর্গত যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তাহাই আমি। এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিলে পাপসমূহের নাশ হয়। অগ্নিলোকবান হয়, পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়, উজ্জ্বল জীবন অতিবাহিত করে ও কদাপি ক্ষীণ হয় ন। তাহাকে ইহলোক ও পরলোকে পালন করে।

অতঃপর অম্বাহার্য্য পবন অগ্নি তাহাকে শিক্ষা দেয়—জল, দিক্, নক্ষত্র ও চন্দ্র—আমার চারিটি শরীর। চন্দ্রে স্থিত পুরুষই আমি। এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিলে উপরিউক্ত ফল সকল লাভ হয়।

তৎপরে অহবনীয় অগ্নি উপদেশ করে—প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ আমার চারিটি শরীর। এই বিদ্যুতের অন্তর্গত পুরুষই আমি। ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে উপরিউক্ত ফল লাভ হয়।

তদনন্তর আচার্য্য উপকোশলকে উপদেশ করেন—নেত্রে দৃষ্ট পুরুষই আত্মা, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম। উহাতে ঘৃত বা জল পড়িলে তাহা পলকে অদৃশ্য হয়। ইহাকে সংযদ্বাম’ বলে। সমস্ত সেবনীয় বস্তু সর্বদিক হইতে ইহাকেই প্রাপ্ত হয়। ইহা বামনী, কারণ সম্পূর্ণ বামনের বহন করে। ইহা ভামনী, কারণ সমস্ত লোকে ভাসমান। এজন্য শবকর্ম (দাহনাদি) করুক অথবা না করুক, এই ব্রহ্মবেত্তা অর্চি অভিমানী দেবতাকে

প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে দিবসাত্তিমানী দেবতা, তথা হইতে গুরুপক্ষাভিমানী দেবতা, উত্তরায়ণের ছয় মাস, তৎপরে সংবৎসর, তাহা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ-লোক প্রাপ্ত হয়। সেখান হইতে এক অমানব পুরুষ উহাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যায়। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ। ইহাকে জানিলে আর পুনরাবর্তন হয় না।

এই বিচরণকারী পরমই যজ্ঞ। ইহা সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে। মন ও বাক্—এই দুইটী ইহার মার্গ। তন্মধ্যে এক মার্গকে ব্রহ্মা মনদ্বারা সংস্কার করেন। হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্ধাতা বাণীদ্বারা অন্য মার্গকে সংস্কার করেন। যদি প্রাতরনুবাক আরম্ভ হইলে পরিধানীয় ঋকের উচ্চারণের পূর্বে ব্রহ্মা বলিয়া উঠেন, তবে এক মার্গেরই সংস্কার হয়—অন্য মার্গ নষ্ট হয়। একপদে বিচরণকারী ব্যক্তির ন্যায় যজ্ঞ নাশ হইয়া যায়। তৎপশ্চাৎ যজমানের নাশ হয়, সুতরাং যজমান অধিক পাপী হয়। যদি উক্ত সময়ে ব্রহ্মা কিছু না বলেন তাহা হইলে সমস্ত ঋত্বিক্ মিলিয়া উভয় মার্গেরই সংস্কার করেন। যজমানও যজ্ঞে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, যজ্ঞও শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

প্রজাপতি লোকসকলকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যানরূপ তপ করেন। তপঃপ্রভাবে পৃথ্বী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, আর দ্যুলোক হইতে আদিত্য উৎপন্ন হয়। পুনঃ তপঃপ্রভাবে অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ ও আদিত্য হইতে সাম উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার ত্রয়ী বিদ্যাকে লইয়া তপ করিলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রকাশ হয়। যজ্ঞে ঋক্-শ্রুতির ক্ষতি হইলে ভূঃ স্বাহা বলিয়া গার্হপত্যাগ্নিতে হোম করিতে হয়। যজুঃ-শ্রুতির ক্ষতি হইলে ভুবঃ স্বাহা বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে এবং সাম-শ্রুতির ক্ষতি হইলে স্বঃ স্বাহা বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিতে হয়। এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মাই সমস্ত কর্ম্মের অপূর্ণাঙ্গ পূর্ণ করিতে সমর্থ। সেজন্য যজ্ঞে উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্রহ্মা নিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

৩৫

শিষ্যব্রতের গুরুসেবা ও হরিভজন

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রদ্ধার সহিত সদগুরুর পদাশ্রয়ে ভগবৎ-অর্চন ও ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করত শিষ্য গুরুপায় ভগবৎসাক্ষাৎকার—ভগবৎপ্রেম লাভের অধিকারী হন। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, ভগবৎ-প্রেমপ্রদাতা সদগুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও যদি শিষ্যের ভজন-বিষয়ে ক্রমোন্নতি ও অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দান্তিকতা ও অহঙ্কারই উহার প্রধান কারণ। এই অবস্থায় শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে। সাধু-গুরু-উপদিষ্ট মত ও শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত হরিভক্তির নূতন পন্থা আবিষ্কার করে!

গুরু-উপদিষ্ট শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া বিধিমাগ পরিচ্যাগ করতঃ অন্যায়ভাবে সিদ্ধ ও মুক্তাভিমাণে রাগমার্গে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং অনর্থগ্রস্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধীর সঙ্গে দ্বারা সে অর্চন-বিষয়ে সেবাপরোধ, ভজন-বিষয়ে নামাপরোধ, ধামাপরোধ, বৈষ্ণবাপরোধের আবাহন করে। নামাপরোধফলে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রেমভক্তিদ শ্রীনাম-গ্রহণে তাহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ কমিয়া যায় এবং নামের আনুষঙ্গিক ফললাভেও বঞ্চিত হয়।

‘এক’ কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।

এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন॥

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার॥

তবে জানি “অপরোধ” তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।২৬, ২৮-৩০)

শিষ্যব্রতের লক্ষণ :—অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুন্ড, পরছিদ্রাশ্রয়ী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রক্ষাক, অন্যায়রূপে ধন-উপার্জক, পরদার-রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ-সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ত্রুরকর্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তি শিষ্যপদ হইতে ভ্রষ্ট।

সাক্ষাৎগুরুসেবা সম্বন্ধে অসংশিষ্যের ব্যবহার :—গুরুসমীপে পদ-প্রসারণ, গুরুর অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, আশ্ফালন, গুরুর সম্মুখে উচ্চবাক্য প্রয়োগ, যেখানে-সেখানে গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন-বচন-ক্রিয়ার অনুকরণ, গুরুর বাক্য-আসন-যান-পাদুকা-বস্ত্র-ছায়া লঙ্ঘন, গুরু-সমীপে পৃথক পূজা, ‘আমি যাহা, গুরুও তাহা’—এরূপ অহংভাব, গুরুদেবকে আদেশকরণ, তাঁহার আদেশলঙ্ঘন, গুরুকে নিবেদন না করিয়া বস্তু গ্রহণ, গুরুদেবের দ্রব্য ভোজন, গুরুদেবের আগমানে অভ্যর্থনা না করা ও গমনে তদনুগমন না করা, গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, তাঁহার শয্যায় উপবেশন, গুরুর তাড়না ও ভৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলা, গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ, গুরুনিন্দুকের সহিত বাক্যলাপ ও সঙ্গই গুরু-চরণে অপরাধী-শিষ্যের কৃত্য হইয়া পড়ে।

(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে বিষ্ণু হইতে পৃথক জ্ঞান এবং শিবাদি অন্য দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর এরূপ

জ্ঞান, (৩) শ্রীনামদাতা গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাসূচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) শ্রীনামের মহিমা 'কেবল স্তবমাত্র' এরূপ চিন্তা, (৬) শ্রীনামকে কল্পিত জ্ঞান, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীনামকে জড়-পুণ্য ও শুভকর্মের সহিত সমান জ্ঞান, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানে শ্রীনাম-অনুশীলন—পতিত সেবক এই দশবিধ নামাপরাধেব আবাহন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা-বঞ্চিত হয়।

(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও দর্শনার্থীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) ধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ-উপার্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্যতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাসের ছলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান, (৯) ধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা, এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—অসংশয় এই দশবিধ ধামাপরাধ সঞ্চয় করিয়া ধামবাসের অযোগ্য হয়।

(১) যান—শিবিকাদিযোগে এবং পাদুকা পরিধান করিয়া ভগবদগৃহে গমন, (২) ভগবৎ-প্ৰীত্যর্থ শ্রীভগবানের জন্ম-যাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, (৬) পাদ প্রসারণ, (৭) পর্য্যঙ্ক-বন্ধনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চভাষণ, (১২) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যব্যবহার, (১৮) পরনিন্দা, (১৯) পরস্তুতি, (২০) অশ্লীল বাক্যব্যবহার, (২১) অপান-বায়ু পরিত্যাগ, (২২) অন্যকে অভিবাদন, (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৪) তাম্বুল-চর্বণ, (২৫) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, (২৬) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি, (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে ও অল্পব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি, (২৮) অনিবেদিত বস্তুগ্রহণ, (২৯) কালোচিত ফল-শস্যাদি দ্রব্য ভগবান্কে অপ্রদান, (৩০) দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট ভগবান্কে প্রদান, (৩১) দেবতা-নিন্দা, (৩২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ, (৩৩) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, (৩৪) বিধি উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, (৩৫) কুকুরদ্রষ্ট দ্রব্য ভগবান্কে নিবেদন, (৩৬) পূজাকালে অসদালাপ, (৩৭) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৩৮) অযোগ্য-পুষ্পে পূজা, (৩৯) স্ত্রী-সন্তোগান্তে পূজা, (৪০) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪১) শবস্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪২) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা, (৪৩) মৃত দর্শনাস্তে পূজা, (৪৪) ক্রোধ-শোকাভিভূত হইয়া শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শ, সেবা ও পূজা, (৪৫) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা, (৪৬) গাত্রে

তৈল মর্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, (৪৭) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৪৮) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্বক পূজা, (৪৯) বাসী বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৫০) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, (৫১) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, (৫২) ত্রিযাক্ পুণ্ড্র ধারণ, (৫৩) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৪) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্তি-স্পর্শ, (৫৫) অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ন শ্রীভগবান্কে নিবেদন, (৫৬) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৭) ঘস্মাক্ত দেহে পূজা, (৫৮) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৫৯) নিৰ্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন, (৬০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬১) ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্বক রাজসিক-তামসিক অসংশাস্ত্রে সমাদর, (৬২) মৃত্তিকাহীন শৌচ, (৬৩) দাঁড়াইয়া আচমন, (৬৪) সমর্থপক্ষে স্নানবর্জন, (৬৫) দেবার্চনে শৈথিল্য, (৬৬) দেবতার অনভ্যর্থন, (৬৭) বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন, (৬৮) মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন, (৬৯) ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা, (৭০) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন, (৭১) দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, (৭২) চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি, (৭৩) আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার, (৭৪) অসংস্কৃতদ্রব্য দ্বারা পূজা, (৭৫) চঞ্চল চিত্তে অর্চন, (৭৬) একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, (৭৭) পর্যুষিত অন্য নিবেদন, (৭৮) পূজায় মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার, (৭৯) অসময়ে শ্রীমূর্তি দর্শন, (৮০) অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ প্রভৃতি সেবাপরোধ এবং

(১) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন, (২) শোকাভিভূত হওয়া, (৩) তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি, (৪) মদ্যপান ও মৎস্য-মাংস-ভোজন, (৫) মাদক ঔষধ সেবন, (৬) মসুরীসহ অন্নগ্রহণ, (৭) পেঁয়াজ, রসুন, গাঁজর ভোজন, (৮) সর্বসমক্ষে মন্ত্রার্থ-প্রকাশ, (৯) অবৈষ্ণব-মন্ত্রগ্রহণ, (১০) অবৈষ্ণব-ব্রতানুষ্ঠান, (১১) দশমীবিক্রা একাদশী ব্রতগ্রহণ, (১২) গুরু-কৃষ্ণ-একাদশীতে ভেদবুদ্ধি, (১৩) একাদশীতে নিদ্রা, (১৪) মর্থপক্ষে অনুকল্প স্বীকার, (১৫) একাদশীতে শ্রাদ্ধ, (১৬) দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, (১৭) বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্ত্তদ্বারা শ্রাদ্ধ, (১৮) বুদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী, (১৯) অবৈষ্ণব ও রাক্ষস শ্রাদ্ধ, (২০) মন্ত্ৰের অসংখ্য জপ—ইত্যাদি নিষিদ্ধাচারেব অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়া দান্তিক, দেহারামী, কুকৰ্ম্মী, অশান্ত, পরনিন্দক, পতিত শিষ্যব্রত হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও ভগবদ্ভক্তি লাভে অসমর্থ হয়।

অসংশিষ্য সততই অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ও সংশয়াত্মা ; শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতাবিষয়ে, তাঁহার পতিত ও পাতকীতারণের ক্ষমতা-সম্বন্ধে এবং ভগবৎপ্রাপ্তি করাইবার সামর্থ্য বিষয়ে সর্বদাই তাহার সন্দেহ। তাই সে শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের ভাণ করে মাত্র। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুরুকে চিনিয়া লইতে পারিবে—মনে করে এবং অন্যাত্মিলাষের সহিত গুরুসেবার ছলনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহে। গুরুদেবের সম্মুখে সে নিজেই নিজের প্রশংসা কীৰ্ত্তন করে। গুরুদেবের মঙ্গলময়ী বাণীর প্রতিবাদ ও আদেশের অবমাননা করিয়া নরকগতি লাভ করে। ‘আমি অধিক বুঝি, গুরুদেব

আমায় আর অধিক কি উপদেশ দিবেন?’—এইরূপ অহঙ্কার ও অপরাধবশতঃ সে অধঃপতিত হয়।

শিষ্যক্রম গুরুদেবকে তাহার ন্যায় কর্মফলাধীন মর্ত্য-জীববিশেষ ও শোক-মোহাদির বশীভূত মনে করিয়া তাহার নিজের অকল্যাণ বরণ করে এবং সেই শিষ্যক্রমের শ্রীনামকীর্তন, ভূয়সী সেবাচেষ্টা, ভগবন্ত্বাদি-জপ, হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সকলই বিফল হয়। গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধীজনের সঙ্গই তাহার রুচিকর হয় এবং সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও নিন্দায় সে পঞ্চমুখ হয়। গুরুদেব একগুয়ে, অদূরদর্শী, অবুধা, ‘একচোখা’ ও অবিচারক—তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব আছে বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করে। বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষা-ব্যাপারে তাঁহার অন্তর্নিহিত সদুদ্দেশ্যে বুঝিতে না পারিয়া কটাক্ষ করে, গুরুদেবের গতি, স্বর, চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ চাল-চলনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

তথাকথিত শিষ্যাভিমাত্রী গুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কারে স্ফীত হয়। গুরুদাসকে গুরু হইতে পৃথক্ ভাবিয়া বা সেবকের দোষ গুরুতে আরোপ করিয়া প্রকৃত গুরুদাসগণের নিন্দা করত গুরুনিন্দায় পতিত হয় এবং ক্রমশঃ ভজন-ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন হইয়া সে গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিহীন এবং ক্রমশঃ ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়ে। সে নিজে অন্যায় করিয়া বিচারপ্রার্থী হয় এবং আপন সহস্র দোষ ঢাকিবার জন্য পরছিদ্রাঘেষণে প্রবৃত্তি লাভ করে। “যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়।।” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)—ইহা জানিয়াও সে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ একান্ত সেবকের মধ্যে “এক মানি’ আরে না মানি”—“একে নিন্দি, আরে বন্দি” এইরূপ ‘অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়’ বা ‘অর্দ্ধকুক্কটীয় ন্যায়’ অবলম্বন করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়।

গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত নিজচেষ্টায় বহুগ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা সকলতত্ত্ব বুঝিয়া লইবে মনে করে। বৈষ্ণবাভিমাত্রী হইয়া সে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি বিধানের পরিবর্তে উহা নিজেই আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পায়। তৌর্য্যত্রিকের আশ্রয় লইয়া সে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির আড়ম্বরে উন্মত্ত হয়, দান্তিকতা আশ্রয় করিয়া গুরুবৈষ্ণব-আদিষ্ট না হইয়া স্বেচ্ছায় শাস্ত্র-ব্যাক্য্যার অজুহাতে বৈষ্ণবগণের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করে, বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া সে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন, গ্রন্থাদি-আলোচনা ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য জাহির করে। ‘অন্তরনিষ্ঠা কর’ বাক্যের সুযোগ লইয়া সুবিধাবাদী শিষ্য বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে পরাধুখ হইয়া উত্তমাদিকারীর আসন গ্রহণে ব্যস্ত হয়। দান্তিক শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবের সম্মুখে মিথ্যাভাষণ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, সতীর্থগণের সহিত কলহ, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। দেহরামী শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যোগ্য নিজ প্রিয়বস্তু তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে। সে শাস্ত্রীয় বিধি ও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবিগ্রহার্চন ও হরিসেবার বাহাদুরী দেখায়

এবং নিজে বড় অর্চ্চক ও সেবক-অভিमानে প্রমত্ত হয়। শিষ্যব্রত দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরু-বৈষ্ণবের নিকপট সেবা-প্রবৃত্তি লাভ না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে এবং বৈষ্ণবের দোষানুসন্ধানে রত হইয়া ‘মক্ষিকার ব্রণানুসন্ধানের’ স্বভাববশতঃ অবশেষে গুরু-পাদপদ্মশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়।

সুবিধাবাদী শিষ্যব্রত ‘আমি গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হইব, মঠের পয়সায় প্রাকৃত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিব, আমার কোনপ্রকার অভাব থাকিবে না, সুখে শান্তিতে আমার দিন কাটিবে’—প্রভৃতি অবাস্তর ফল কামনা করিয়া গুরু-ভগবানের সেবা-সুখ-তাৎপর্যরূপ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা না দেখিয়া সে অন্যের নিকট ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করে এবং স্বশ্রী-কাতর হইয়া শ্রীগুরুদেবের বৈভব—সতীর্থ-মঠ-মন্দির ধর্মপ্রচারাদির সমালোচনাপূর্বক বহিস্মুখ সঙ্ঘ-মিশনের শতমুখী প্রশংসা করে। সে কর্মীর কাণাকড়ি আশ্রয়পূর্বক কর্মজড় হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কর্মের বহু-আড়ম্বর না দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নিকট নিজের কর্মের বাহাদুরী খ্যাপন করে ও তাঁহাদিগের প্রতি তাত্খিল্য- ভাব প্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠাকামী অসৎশিষ্য গুরুদেবের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠাপর তোষামোদী মনযোগান কথার পরিবর্তে পারমার্থিক কল্যাণকর কঠোর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করত গুরুনিন্দায় অগ্রসর হয় এবং হরিভজন হইতে ছুটি লইয়া মায়ার সংসারে প্রবেশের যত্ন করে। তখন তাহার এইরূপ বুদ্ধি হয়—মঠ-মন্দিরাদি-গুরুগৃহে থাকিয়া যদি কেবল অপরাধেরই সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে অপরাধের আর ভয় থাকিবে না! অনর্থগ্রস্ত বিষয়াসক্তচিত্ত শিষ্যব্রত বলিয়া থাকে—জগতে কি আর সদগুরু আছেন! সদগুরু এখন আর পাওয়া যায় না! দেখনা, গুরুর অযোগ্যতার দরুণ (?) আমার এতকাল ধরিয়াও হরিভজন (?) হইল না! কতকাল মঠে বাস করিলাম, কত হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, ভগবান্-প্রাপ্তি ও সংসারক্ষয় ত দূরের কথা! সেই একই কথার চর্কিত চর্কণ! —“দেহ কিছু নয়—মন কিছু নয়—আত্মাই সব! কর্ম-জ্ঞান-যোগ কিছু নয়—ভক্তিই সব!” এইরূপ অবৈধ গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক বিচারে কি কখনও ভগবান্কে লাভ করা যায়? “ফোটা-দীক্ষা-মালা ধরি’, ধূর্ত করে সুচাতুরী, তাই এবে আমার বিরাগ!” হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্যভিমानी এইরূপে দণ্ডাহঙ্কারবশে হরিভজন হইতে বিরত হইয়া তাহার সর্বনিকৃষ্টতম অধোগতি—নরকের দ্বারস্বরূপ সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া চরম-দুর্দশা বরণ করে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবোদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর)

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকশ-পুষ্পায়তে

দুর্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্প-পটলী প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে।

বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যৎ কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ।। ৫।।

অন্বয়—যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং (যাঁহার কৃপাকটাক্ষ-রূপ-সম্পদে সম্পৎশালী ব্যক্তিগণের নিকট) কৈবল্যং (সায়ুজ্য-মুক্তি) নরকায়তে (নরকের তুল্য হইয়া থাকে), ত্রিদশপুং (ত্রি-অধিক-ত্রিরাবৃত্ত দশ পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা যেমন দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রধান বলিয়া তাঁহারা ‘ত্রিদশ’, তাঁহাদের পুর অর্থাৎ স্বর্গ) আকাশ-পুষ্পায়তে (আকাশ-কুসুম সদৃশ হইয়া থাকে), দুর্দান্ত-ইন্দ্রিয়-কালসর্প-পটলী (ভীষণ কালসর্পরূপ ইন্দ্রিয়সকল) প্রোৎখাত-দংষ্ট্রায়তে (উৎপাতিত-বিষদন্তবৎ হইয়া যায়), বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে (জগৎ পরিপূর্ণ সুখময় অর্থাৎ ভগবদ্ভাবময় হইয়া উঠে), বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ (ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি-দেবতাগণও) কীটায়তে (কীট-তুল্য বোধ হয়), তং গৌরং এব (সেই শ্রীগৌরসুন্দরকেই) [বয়ং] স্তমঃ (আমরা স্তব করি)।। ৫।।

অনুবাদ—যাঁহার কৃপাকটাক্ষ-রূপ বৈভব-লব্ধ মহাভাগবতগণের নিকট সায়ুজ্য (ব্রহ্ম-সায়ুজ্য ও ঈশ্বর-সায়ুজ্য) মুক্তি—নরকতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, আমরা পুরী—আকাশকুসুমের গায় বোধ হয়, কালসর্প-স্বরূপ দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল—উৎপাতিত-বিষদন্তের গায় বিষহীন হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্ব—পূর্ণানন্দময় অর্থাৎ ভগবদ্ভাবময় হইয়া উঠে এবং ব্রহ্মাধিপত্য, ইন্দ্রাধিপত্য প্রভৃতি পদবী—কীটের ন্যায় তুচ্ছরূপে জ্ঞান হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকেই আমরা স্তব করি।। ৫।।

কারুণ্য-কটাক্ষে যাঁর, কি বৈভব ভবসার!

চরণ-শরণে যাঁর ভবে।

যোগি-ঋষি-অকিঞ্চন, মোক্ষও নরক-সম

জানি’ হয়, ত্যাগ করে সবে।।

দেখিয়া অনিত্য শোভা, স্বর্গসুখ মনোলোভ,

লভ্য বলি’ কভু নাহি গণে।

মোহন মন্দার-বন, সুর-নারী, সিংহাসন,

‘খ-পুষ্প’ সে দেখে সর্বক্ষণে।।

কৃপা বলে সেই যাঁর, জীব-দেহে দুর্নিবার—

কালসর্প ইন্দ্রিয়-পটল।

হয় বিষদন্ত-হীন, হরিদাম্বে আজ্ঞাধীন,

মদ্রমুগ্ধ যথা অহিদল।।

বিন্দু-কৃপা-কণে যাঁর, করে চিত্ত নির্বিকার,
 পূর্ণ সুখ সর্বত্র প্রকটে।
 প্রপঞ্চ-প্রচ্ছদে ঢাকা, মুরলী-বদন বাঁকা,
 দরশন হয় প্রতি ঘটে।।
 তৃণ-কীট হয়ে পর, ব্রহ্মা আদি মহেশ্বর,
 একে সাম্য সবার পরম।
 প্রত্যক্ষ কৃপায় যাঁর, সেই সর্ব মূল্যধার,
 বন্দি সেই শ্রীগৌরচরণ।। ৫।।

মাগ্নন্তঃ পরিণীয় যস্য চরণান্তোজ-স্ববৎ-প্রোজ্জ্বল-
 প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুত-রসান্ সর্বৈ সুপর্বেড়িতাঃ।
 ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহু-মগ্নন্তে মহাবৈষ্ণবান্
 ধিক্কুর্বন্তি চ ব্রহ্মযোগ-বিদুষন্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ।। ৬।।

অর্থ—সুপর্বেড়িতা (দেবতাগণেরও পূজ্য) সর্বৈ (সকল গৌরভক্তগণ) যস্য
 (যাঁহার) চরণান্তোজ-স্ববৎ-প্রোজ্জ্বল-প্রেমানন্দময়-অমৃত-অদ্ভুতরসান্ (চরণকমল
 হইতে নিঃসৃত উন্নত-উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় চমৎকার অমৃতরস) পরিণীয় (পূর্ণরূপে
 পান করিয়া) মাগ্নন্তঃ [সন্তঃ] (মত্ত হইয়া) ব্রহ্মাদীন (ব্রহ্মাদিকে) হসন্তি (উপহাস
 করেন), মহাবৈষ্ণবান্ চ (ঐশ্বর্য্যপরি বিষ্ণুভক্ত মহাভাগবতগণকেও) ন অতিবহু মগ্নন্তে
 (বহুমানন করেন না), ব্রহ্মযোগ-বিদুষঃ (ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগীগণকে) ধিক্কুর্বন্তি
 (ধিক্কার করিয়া থাকেন) তং গৌরচন্দ্রং (সেই গৌরচন্দ্রকে) [বয়ং] নুমঃ (আমরা স্তব
 করি)।। ৬।।

অনুবাদ—সমস্ত দেব-বন্দ্য গৌরভক্তগণ যাঁহার পদকমল হইতে নিঃসৃত
 উন্নত-উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অতিচমৎকার অমৃত-রস আকর্ষণ পান করিয়া বিভোর
 হইয়া ব্রহ্মাদিকেও (গৌর-প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত দেখিয়া) হাস্য করেন, গৌরভক্তি-শূন্য
 মহাবৈষ্ণব-দিগকেও বহুমানন করেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগীগণকেও ধিক্কার
 প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।। ৬।।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ—ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
 সেব্য সদা মানবের কন্মজড় মতি।।
 ব্রহ্মযোগবিৎ কিস্মা, নির্বিশেষ-জ্ঞানে।
 কৃষ্ণ-অঙ্গকান্তি শুধু দেখে যাঁরা ধ্যানে।।
 বিজ্ঞানে অথবা মূল পাইয়া সন্ধান।
 করে কৃষ্ণসেবা যাঁরা বৈষ্ণব মহান।।
 নাহি জ্ঞান কিন্তু, হায়, গৌরগুণমণি।
 রাখা-ভাব-দ্রুতি-চোরা গোবিন্দ আপনি।।

কি পদ সম্পদ অহো, তাঁদের জগতে?
 বঞ্চিত সকলে পূর্ণ-প্রেমরস হ'তে!
 গুরুকৃপা-বলে, কিন্তু অহো ভাগ্যবান।
 দেখ রে, দেখ রে, ওই গৌর-গত-প্রাণ॥
 মহা সত্ত্ব মহীয়ান্ ভাগবত গণ।
 মজি' গৌরপাদপদ্ম-প্রেমে অনুপম॥
 কি উজ্জ্বল কি অদ্ভুত আনন্দ-আসব!
 পান করি' প্রাণ ভরি' তুচ্ছ করে সব!!
 হাসিয়া, ধিক্কার দিয়া সকলে সমান।
 দুর্লভ সবার সার-সুধা করে পান॥
 প্রেমসুধাসব হেন পাদপদ্মে যাঁর।
 সর্বদাঙ্গে গৌরাজে সেই প্রণতি আমার ॥ ৬ ॥

* * * *

ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশামৃত

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ-অনুসরণে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅবধূত
 ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে,

লক্ষা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবাস্তে
 মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
 তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
 নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ বহু জন্ম জন্মান্তর যাবৎ সংসারে ভ্রমণ করতঃ ভাগ্যক্রমে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির
 পক্ষে উপযুক্ত সুদুর্লভ এই অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত বিবেকি পুরুষ
 সত্ত্বর নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বস্তু নাই সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম
 লাভের জগ্ন নিরন্তর যত্নশীল হইবেন। বিষয়ভোগ অগ্নাঙ্গ নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরেও
 সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ অগ্গদেহে সম্ভবপর নয়। সেইজগ্ন অতিশীঘ্র এই
 মনুষ্যদেহে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শ্রীভগবান্ হরিভজনের জগ্নই এই
 সুন্দর মনুষ্যদেহ—সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কৰ্ণধারম্।*

ময়ানুকূলে ন ভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিৎ ন তরেৎ স আত্মহা ॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

যে দেহ সর্বফল লাভের উপযোগী, সুদুর্লভ ও পটুতর নৌকাস্বরূপ এবং গুরুরূপ
 কৰ্ণধার তথা সাধুসঙ্গরূপ অনুকূল বায়ু ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও যিনি সংসার-

সাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা না করেন তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী। এ সম্পর্কে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ত্বদীয় 'বিবৃতি'তে জানাইতেছেন যে,—

মানব-শরীরই মানবগণের নিজ মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। বহু জন্মের পর ইহার লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলন-নিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এই ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি স্থায়ী নরদেহকে নৌকা-স্বরূপে জানিতে পারেন না, গুরুদেবকে স্থায়ী কর্ণধার বলিয়া বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎকৃপাতেই অনুকূল বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন-সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিত্যমঙ্গল বিনাশপূর্ব্বক আত্মঘাতী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের গ্রায় সকল জ্ঞানী গুণিজনই জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কৃষ্ণভজনের উপদেশ করিতেছেন। কৃষ্ণভজন না করিলে জীব নিজ নিজ কামনা-বাসনা অনুযায়ী পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম-মৃত্যুকেই বরণ করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ-ছলে জগৎবাসীকে বলিতেছেন যে, কোন দেশে বা কোন কালে জ্ঞানহীন শ্রীভগবৎবিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিলাসের জন্য স্ত্রীগণের ক্রীড়া-মৃগ তুল্য হইয়া পড়ে এবং পুত্র-পৌত্রাদিহি তাঁহার বন্ধন শৃঙ্খল হয়। অতএব তোমরা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও—তিনি আসক্তি-রহিত ভগবৎভক্তগণের অভীষ্ট স্বরূপ। শ্রী-শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ আরও বলিতেছেন যে, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মা, তাঁহার আরাধনায় বাল্য ও বার্ষ্যকাদির কিছুই অপেক্ষা নাই। তিনি এ সংসারে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ। কুটুম্ব-পালনে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিতে অত কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। মানস-উপাচারের দ্বারাও ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। এমন কি যিনি তাঁহার কোন সেবার সংকল্পও করেন, তাহাতেও তিনি পরম সন্তুষ্ট হন। তৎসম্বন্ধীয় কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিয়াজনের দ্বারাই জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সুতরাং হে দৈত্যবালকগণ, তোমরা দ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বজীবের মধ্যে মৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিরাজমান, ইহা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া ও মৈত্রী বিধান কর। তদ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি বিশেষ পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে? অর্থাৎ ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে জীবের চরম-প্রাপ্য—তদীয় ধাম, তৎশ্রীচরণকমল-সেবা প্রভৃতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবদতিরিক্ত কামনা-রহিত এবং ভগবৎপদারবিন্দরজে আপ্লুত হয়, সেই সকল দেহিগণের নিঃশলজ্ঞান উদিত হয়। কেবলমাত্র শুধু যে, উত্তমব্যক্তিগণেরই হইবে এরূপ নিয়ম নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমঙক্তিবৈদান্ত পর্যাটক মহারাজ

নিত্যনূতন

এই মায়িক ভুবনে নূতনের জয়গানে মুখরিত হওয়া জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পুরাতনকে প্রায় সকলেই ভুলিয়া যায়। ধ্বংসশীল মায়িক বস্তুগুলিকে নিত্যনূতন বোধে জীব ভোগের জন্য ধাবিত হইতেছে। কোন প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন, “নূতন কিছু কর, একটা নূতন কিছু কর।” ইহজগতে নিত্যনূতন বলিয়া কোন বস্তুই নাই, কালক্রমে নূতনই পুরাতন হইয়া যায়। নূতন-পুরাতনের চক্রমালায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে কেহই নিত্যনূতনের সন্ধান পাইতে পারে না। যাহা অপরিবর্তনশীল, তাহা নিত্য। জড়-জগতের বস্তুমাট্রেই পরিবর্তনশীল, তাহাকে কিরূপে ‘নিত্যনূতন’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে? যাহারা নিত্য পরিবর্তনশীলতার স্রোতে ভাসমান, তাহারা নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য।

যিনি আজ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইদিন পরে তিনিই আবার প্রাক্তন হইয়া প্রধানমন্ত্রীর কোন কিছুই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না। ট্রেনে বা বাসে নিজের সংরক্ষিত আসন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবামাত্রই নূতন যাত্রীর জন্য তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহা গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যালয়গুলিতে নূতন ছাত্রদের বরণ করিয়া নেওয়া হয় এবং কয়েক বৎসর পরে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তে তাহাদিগকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হইলে অন্য ছাত্রেরা আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করে এবং তাহারাও যথাসময়ে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। বিদায় ও বরণকে সাথী করিয়া, শুধুমাত্র বিদ্যালয় কেন, সরকারী ও বেসরকারী সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠানই কালস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে। একবর্ষ অতীত হইলে নূতন বর্ষকে বরণ করিবার প্রথা—তাহা কাহারও অজানা থাকিবার কথা নহে।

জাগতিক সুখের সৃষ্টি কেবলমাত্র দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই। সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়া পৃথিবীর কোন বস্তুতেই কেহ নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে না। আজ যে মৃন্ময় পুত্তলিকাকে শিশু নানাসাজে সজ্জিত করিয়া অঙ্কে রাখিয়া সোহাগভরে আদর যত্ন করিতেছে, কিছুদিন পরে হয়ত দেখা যাইবে, তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় আবর্জনার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। বালক-বালিকা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যে রূপকথা শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে, কাল তাহা তাহাদের চিন্তা বিনোদন করিতে অপারগ হইবে। যে দৃশ্য আজ সকলের মন-প্রাণ হরণ করিল, কাল তাহার প্রতি কেহই ফিরিয়া তাকাইবে না। মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় মনুষ্যের মন অনবরত এক নূতন বিষয় হইতে অন্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নূতনের জন্য কিরূপ লালায়িত—নূতনের প্রতি তাহার কি প্রগাঢ় আসক্তি—তাহার লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দিলেও শেষ হইবে না। ‘নিত্যনূতন’ বস্তুর সন্ধান না করিয়া মনুষ্য যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্তন ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে ‘নূতন’ ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়া প্রকৃত সুখলাভে বঞ্চিত হইতেছে।

জীবগণকে মোহিত করিবার জন্য প্রকৃতিদেবী নিজ কৰ্মশালায় যে কত রকমারি নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাহা ধ্বংসও করিতেছেন, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। দিগন্তব্যাপী শ্যামলক্ষেত্র যাহা আজ তরঙ্গবৎ ক্রীড়া করিতেছে, পরে তাহাই আবার জীর্ণ-শীর্ণ শুষ্ক হইয়া অগ্নির দ্বারা দক্ষ হইয়া ভস্মীভূত হইবে। যে ক্ষীণকায়া তটিনীর উপর দিয়া আজ মনুষ্য ও জীবসকল অতিসহজেই পার হইয়া যাইতেছে, পরে তাহারই উত্তলতরঙ্গ স্ফীতবক্ষে বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া সবকিছুই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। যে বিটপী আজ ভিখারিণীর ন্যায় বিগতশ্রী হইয়া কাতরপানে তাকাইতেছে, পরে উহাই আবার বসন্ত সমাগমে হরিদবসনাঞ্চল উড়াইয়া শর শর রবে তাহার নবসম্পদের বার্তা ঘোষণা করিবে। প্রকৃতির এই নূতনের দেশে পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রভু সকলেই পুরাতন হইয়া যায়, সকলেই একসময় আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়। নিত্যনূতনের সহিত প্রপঞ্চের পরিবর্তনশীল নূতন বস্তুর কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না।

যেখানে কাল ও মায়া কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারেনা, যেথায় প্রাকৃত চন্দ্র, সূর্য্য, তারকার আলোকের প্রবেশের কোন অধিকার নাই, সেই নিত্য উজ্জ্বল, নিত্য আনন্দময়, নিত্য-নূতন গোলোকধামেরই জীবমাত্র নিত্য-অধিবাসী। সেই নিত্যনূতন রাজ্যে পরিবর্তনশীলতার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। জড়বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও বিরাগের বিচিত্রতা আদৌ সে নিত্যনূতন রাজ্যে পরিলক্ষিত হয় না, যেহেতু ভোগময় দৃষ্টির সেখানে কোন স্থান নাই। সেই নিত্যনূতন ধামে সকল সম্বন্ধের একচ্ছত্র সম্রাট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, সখা, পুত্র, কান্তরূপে, নিত্য-নব-নবায়মানরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই নিত্যনূতনের দেশে নিত্যনূতন ভোক্তারূপে সকলকে ভোগ করিতেছেন। সেথায় নিত্যনূতনের সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া সকলে জড়জগতের নূতনের খেলা অর্থাৎ গ্রহণ ও বিদায়ের অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদায় সকলকে সর্বদাই ব্যথিত করে। যে বস্তু সনাতন এবং যাহার ক্রম বা সমাপ্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার আবার বিদায় কোথায়? নিরন্তরকুহক সর্বিশেষ পরমসত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানই নিত্যানন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

নিত্যনূতন ভগবানের নিত্যদাস জীবও নিত্যনূতন অর্থাৎ সনাতন, তাহার গঠনে কোন মায়িক উপাদান নাই, জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না। শাস্ত্রে ষড়বিধ বিকারের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এইগুলি লৌকিক বস্তুর বিকার। ছয়প্রকার বিকারশূন্যতা হেতু জীব (আত্মা) নিত্য অর্থাৎ সকলকালেই বর্তমান। প্রাক্তন কৰ্ম্মবশে জীব যে প্রপঞ্চভূত নিশ্চিত নূতন দেহ ধারণ করিতেছেন, কালক্রমে তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইলে সে মায়ানিশ্চিত নূতন একটা দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। মহাভ্রমে পতিত হওয়ার ফলে নিত্য, শাস্ত্রত, স্থানু, অচল জীব প্রকৃতির নূতন নূতন দেহের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। এই জড়শরীর যেহেতু একভাবে থাকে না, তখন জীব বাহ্য বিষয়ে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারে?

নিত্যনূতনের কথা অর্থাৎ হরিকথা—ঠাকুরমার উপকথা নহে—নূতনের কুহকে ভ্রান্ত বহু চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক, পরোপকারী মানবের বহুবিধ ভ্রমাত্মক কথাও নহে। নিত্যনূতনের কথা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই কালত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাই তাহা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, ইন্দ্রিয়বর্গের সেবোন্মুখ-অবস্থাতেই তৎ-তৎইন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণনামাদির শ্রবণাদি সৌভাগ্য লাভ হয়। অপ্রাকৃত জগতের কথা শ্রবণ করিতে হইলে অগ্রে কর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কালক্ষোভ্য নশ্বর জগতের কথায় আমাদের কর্ণরন্ধ্র এতই পরিপূর্ণ হইয়া আছে যে, সেখানে অপ্রাকৃত জগতের নিত্যনূতন কথা প্রবেশ করিবার পথ পাইতেছে না।

স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের আর কোন অভাব থাকিতে পারে না। কৃষ্ণসেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণই জগতের পিতা—সেই পিতার সেবা না করিলে পিতৃদ্রোহী হইতে হইবে—জন্মে জন্মে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হইবে—এই সনাতন শাস্ত্রের কথা ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই আমাদের যত অমঙ্গল। গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপালাভ হইলেই আমরা নিত্যনূতন দেশের অধিবাসী হইয়া নিত্যনূতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জয়গানে নিত্য মুখরিত থাকিব।

—শ্রীভক্তিবৈদ্য বোধায়ন মহারাজ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ জগদগুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈদ্য বামন গোস্বামী মহারাজের

শ্রীসমাধি-মন্দির



পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ

অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ও আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তাঁহার ভৃত্যগণ এই আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া গত ২৮শে কার্তিক ১৪১১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, রাত্রি ১২-৩৭মিনিটে (ইং ১৫।১১।০৪) শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে ও অমৃতযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীর নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তগণ যাঁহারা দেশের বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নিগ্ধ-সান্নিধ্যে শ্রীরাধাদামোদর-ব্রত পালন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে একযোগে অত্যন্ত বিরহ-বিহ্বল হইয়া পড়েন। উক্ত দিবস সকালে তাঁহার কিছু শারীরিক অসুস্থতা লক্ষিত হওয়ায় স্থানীয় চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হয়। তাঁহারা সেই অসুস্থতা দেখিয়া কলিকাতায় স্থানান্তরকে অধিক অসুবিধাজনক মনে করায় নবদ্বীপে শ্রীমঠেই যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। উহাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে পর কলিকাতায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এহেন অবস্থা দর্শনে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে হারাইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, তাঁহাদের সেই আশঙ্কা ততই ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া উঠিল। নিকটস্থ সেবকগণ তখন শ্রীল গুরুমহারাজের দিব্য ললাটে যেইমাত্র তিলক অঙ্কন করিয়া দিলেন অমনি তিনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ মঠবাসী ও গৃহস্থ সকল ভক্তবৃন্দ বুকফাটা কান্নায় ভাসিয়া পড়িলেন। সকলেই নিজেকে অনাথ অনুভব করিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িলেন।



চতুর্দিকে টেলিফোন-যোগে সেই বিরহ-সংবাদ প্রেরিত হইল। দেশের বিভিন্ন স্থানের মঠবাসীগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া গেলেন।

এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সেই সেই স্থান হইতে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথেই তাঁহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন সময়ে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্ৰাকৃত নিব্বাৰক কলেবর দর্শন করিয়া যার পর নাই গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

২৯শে কার্তিক, সোমবার (ইং ১৫।১১।০৪) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য শ্রীশ্রীল পরমগুরুপাদপদ্ম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধিমন্দিরের দক্ষিণদিকে তাঁহার প্রিয়তম সেবককে সমাধিস্থ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমস্ত দিবস ধরিয়া চতুর্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার শ্রীচরণ সাক্ষাৎভাবে শেষদর্শনের লালসায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইতে থাকেন। শ্রীমঠের প্রাঙ্গন, আকাশ-বাতাস সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের বিলাপ, রোদন, হা-ছতাশ-শব্দে ভারী হইয়া উঠে। ভাষাদ্বারা সেই বিরহ-বেদনার এক-সহস্রাংশও প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

অবশেষে রাত্রে শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর ভোগরাগের পর রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় শ্রীল গুরুমহারাজের অপ্ৰাকৃত কলেবর সুসজ্জিত পালঙ্কে করিয়া তাঁহার ভজন কুটীর হইতে আনয়ন করা হয়। কীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহার শ্রীকলেবরকে লইয়া হরিকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাদ্যে ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পরিক্রমার পর সেই দিব্য কলেবর শ্রীনাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া বিপ্রলভাত্মক হৃদয়বিদারক করুণ সঙ্কীৰ্ত্তনের মধ্যে তাঁহাকে অর্চন, আরতি, স্নান, বসন-পরিধান, তিলক প্রভৃতি কৃত্য সমাপন করা হয়। পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ তাঁহার শ্রীবক্ষে শ্রীচন্দনদ্বারা সমাধি-মন্ত্র লিখিয়া দেন। মঠে উপস্থিত সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ, নবদ্বীপবাসিগণ এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ সকলে সজলনেত্রে তাহা দর্শন করেন। শ্রীনাট্যমন্দিরে ও চতুষ্পার্শ্বে তখন তিলধারণের জায়গা ছিল না।

তাহার পর আমাদের পরমারাধ্য পরমগুরুপাদপদ্মের শ্রীসমাধি-মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে যেখানে পূর্ব্ব হইতেই সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করা ছিল, সেইস্থানে শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীকলেবর লইয়া যাওয়া হয়। প্রবল ক্রন্দনধ্বনির রোল এবং সঙ্কীৰ্ত্তন মুখরিত বিপ্রলভঘন পরিবেশে ভূগর্ভ-মধ্যে সুন্দর আসনোপরি পদ্মাসনে ধ্যানমুদ্রায় স্থাপিত তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির অর্চন ও ভোগারতি সম্পন্ন হয়। তাহার পর লবণ ও মৃত্তিকার আবরণে সেই অপ্ৰাকৃত শ্রীবিগ্রহ ক্রমশঃ সকলের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সকল ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শ্রীসমাধিতে মৃত্তিকা প্রদান করেন। শেষে পত্রপুষ্পে তাহা সুসজ্জিত করিয়া, ধূপ-দীপে আরতি করিয়া ভক্তগণ শ্রীমন্দির, শ্রীসমাধি-মন্দির সহ শ্রীসমাধিপীঠ পরিক্রমা করেন। তখন রাত্রি প্রায় ২টা।

৩০শে কার্তিক, মঙ্গলবার (ইং ১৬।১১।০৪) সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রত্যুষে এবং সমস্ত দিবস ধরিয়া বহু দূরদূরান্তর হইতে বহু বহু ভক্তগণ দলে দলে উপস্থিত হন। তাঁহারা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমূর্তি দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাওয়ায় ও তাঁহার শ্রীসমাধিপীঠ দর্শন করিয়া বহুপ্রকার অন্তর্ভেদী বিলাপ প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্থান কিছু প্রতিকূলতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শ্রীমঠে এবং পরমগুরুপাদপদ্মের সন্নিকটে হইতে পারিয়াছে দেখিয়া বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করেন। যুগপ্রভাবে সৃষ্ট শ্রীসমিতির অনিষ্টকারী দলের দুষ্টচিত্তা শ্রীশ্রীগুরুগৌরঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-লক্ষ্মীবরাহদেবের অশেষ কৃপায় কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

পরদিবস ১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ১৭।১১।০৪) অত্যন্ত সাড়ম্বরে 'শ্রীবিরহ-মহোৎসব' পালিত হয়। শ্রীসমাধিপীঠে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির-দ্বারা পূর্বদিবসই সুন্দর একটি শ্রীমন্দির স্থাপন করা হয়। তাহাতে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মঙ্গলারতি, নিত্য ভোগরাগ ও ভোগারতি প্রভৃতি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। প্রত্যুষেই দামোদর-ব্রত উপলক্ষে নিত্য অনুষ্ঠিত নগর-সঙ্কীর্তন ও প্রাতঃকালীন কীর্তন ও পাঠের পর শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীসমাধি-মন্দিরে তাঁহার অর্চন, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি আরম্ভ হয়। মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ, স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলে এক এক করিয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীসমাধি-পীঠে প্রাণের উপটোকন সহিত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণও তাহাতে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ সন্ন্যাসি-শিষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্বত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী ত্রিদিগুস্বামী শ্রীশ্রীমদ্- ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজকে সভাপতি-পদে বরণ করিয়া ধর্মসভা আরম্ভ হয়। ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম বিষ্ণুমহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর ও স্বরূপহঞ্জ হইতে আগত ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিধর গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম গোবিন্দ মহারাজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে শ্রীশ্যামদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী, বৃন্দাবন হইতে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ব্রহ্মচারী, মেঘালয় তুরা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম বোধায়ন মহারাজ, কুচবিহার হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম হাষিকেশ মহারাজ, শিলিগুড়ি হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম গোবিন্দ মহারাজ, হরিদ্বার হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম সাগর মহারাজ, আসামের শিলচর হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম যাচক মহারাজ, নবদ্বীপস্থ কোলেরডাঙ্গা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম গিরি মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠস্থ শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিব্যোম গোস্বামী মহারাজ, অকিঞ্চন মহারাজ, ন্যাসী মহারাজ, ত্যাগী মহারাজ, নিরীহ মহারাজ, নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ অনুভূতির সহিত শ্রীল গুরুপাদপদ্মের পরমপাবন জীবনী ও বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২১ খ্রীঃ) পৌষী কৃষ্ণ নবমী তিথিতে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার সুন্দরবনস্থ পিলজং গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা—শ্রীসর্বেশ্বর দাসাধিকারী ও মাতা—ভগবতী দেবী। তাঁহার শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য ও সকল আচরণ সর্বদা সকলের সন্তোষ উৎপাদন করিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে ‘সন্তোষ’-নামে ডাকিতেন। মাতা শ্রীভগবতী দেবী, পিসীমা শ্রীমতী নির্মালা বোস, এবং পিতৃব্য শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী সকলে জগদগুরু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের চরণাশ্রিত ছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী পরবর্ত্তিকালে ‘ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ’ নামে পরিচিত হন। পিতা সর্বেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয় জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রীঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে আট বৎসর বয়সে বালক সন্তোষ মাতা ও পিসীমার সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে আসেন। শ্রীমন্নাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে পর বালক সন্তোষ মাতা ও পিসীমার পুনঃ পুনঃ উপদেশ ও অনুরোধ সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীধাম মায়াপুরে “শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট” আরম্ভ হইলে শ্রীসন্তোষ সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। তাঁহার অসাধারণ শ্রুতিধারণ ক্ষমতা থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় পাঠ্যপুস্তক হইতে যাহা আলোচনা করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়-মধ্যে গ্রথিত হইয়া থাকিত। তজ্জন্য তিনি অবশিষ্ট সময় শ্রীচৈতন্য মঠের রক্ষক শ্রীনরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীমায়াপুর এস্টেট ম্যানেজার শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ‘কৃতিরত্ন’ প্রভুর আনুগত্যে সর্বক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য মঠে তৎকালে এমন কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী ছিলেন না, যিনি তাঁহার নিকট হইতে সেবা লাভ করেন নাই। ১৯৩৬ সালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম প্রাপ্ত হন। ১৯৩৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রভুপাদের বিচারধারা-লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করিয়া বিশৃঙ্খলা উদয় হইলে ১৯৩৯ সালে কোন একটা মিথ্যা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ‘কৃতিরত্ন’ প্রভু ও প্রভুপাদের অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ জেল-হাজতে প্রেরিত হন। সেইকালে কিশোর সন্তোষ তাঁহাদের জন্য রক্ষন-সেবায় নিযুক্ত হইতে ‘কৃতিরত্ন’ প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন এবং ‘শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী’ নামে পরিচিত হন। পশ্চাৎ আদালতের বিচারে ‘কৃতিরত্ন’ প্রভু সগোষ্ঠী নির্দোষ প্রমাণিত হইলে জেল-হাজত হইতে মুক্ত হন। তাহার পর মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদের শেষ সন্ন্যাসি-শিষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাবাবর গোস্বামী মহারাজের আচার্য্যত্বে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারির উপনয়ন সংস্কার হয়।

১৯৪০ সালে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুপাদের বিচারধারা যথাযথ সংরক্ষণের জন্য কলিকাতায় বোসপাড়া লেনে ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি কাটোয়ায় জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী

মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের বিচার ধারা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ‘শ্রীগৌরাদ্ধ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্’ নামে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সেই সকল গ্রন্থ-প্রকাশের ও মাসিক ‘শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা’র সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া লন। শ্রীরামচন্দ্রের সেবক যেমন ‘হনুমান’, শ্রীনারায়ণের যেমন ‘গরুড়’, শ্রীরামানুজাচার্য্যের যেমন ‘কুবের’, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যেমন ‘স্বরূপ-দামোদর’, সেইপ্রকার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর ছিলেন শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী। শ্রীকেশব গোস্বামীর ভাষায় তিনি ছিলেন সকল গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের ‘অভিধান’ (Dictionary)। ১৯৫২ সালে শ্রীকেশব তাঁহার হৃদয়ধন সজ্জনকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক ‘শ্রীমদ্ভক্তিব্যবাস্তব বামন’ নামে ভূষিত করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে তাঁহাকে ‘বৃহৎ-মুদঙ্গ’ স্বরূপ প্রেসের দায়িত্ব হইতে ‘জীবন্ত-মুদঙ্গ’-রূপে তাঁহার অপর এক পরিচয় প্রকাশ করিতে তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তদবধি বৎসরের ১২ মাসই এই প্রচারকবর অক্লান্তভাবে বাংলা, আসাম, বিহার প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার সেই প্রচার-কার্য্যের সঙ্গী ও সাক্ষীস্বরূপ পূজনীয় শ্রীমুরলী প্রভু (স্বধাম গত), শ্রীচিন্ময় ব্রহ্মচারী (বর্তমানে ভক্তিব্যবাস্তব ভাগবত মহারাজ), শ্রীশ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী (বর্তমানে ভক্তিব্যবাস্তব শিখি মহারাজ), শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী (বর্তমানে ভক্তিব্যবাস্তব গিরি মহারাজ), শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী (পরবর্তিকালে ভক্তিব্যবাস্তব যতি মহারাজ, বর্তমানে স্বধামগত) প্রভৃতির নিকট হইতে আজও তাঁহার সেই প্রচার-কার্য্যের মহিমা শ্রবণ করা যায়।

শ্রীকেশব গোস্বামীকে তাঁহার আশ্রিতগণের কেহ কেহ ভুল বুঝিয়া বা অভিমান-বশে তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-ভজনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের শ্রীমদ্ভক্তিব্যবাস্তব বামন গোস্বামী কদাপি তাঁহার আরাধ্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করেন নাই বরং ঐপ্রকার পরিত্যাগকারীকে তিনি পুনরায় শ্রীকেশব-চরণে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৯৬৮ সালে দামোদর-ব্রত আরম্ভের প্রাক্কালেই জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী শারদ-পূর্ণিমায় শ্রীরাধা বিনোদবিহারীর নিত্য রাসলীলায় প্রবেশ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি তাঁহার ‘ইচ্ছাপত্রে’ শিশুকাল হইতেই যিনি ছায়ার মত তাঁহাকে অনুক্ষণ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিব্যবাস্তব বামন গোস্বামী দেবকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট ও আচার্য্যরূপে স্থাপনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তদনুযায়ী তৎকালে ভূমণ্ডলে বর্তমান প্রভুপাদের শিষ্যগণ জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি কর্তৃক শ্রীসমিতির সভাপতি ও আচার্য্যরূপে আমাদের আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিব্যবাস্তব বামন গোস্বামী দেব অভিষিক্ত হন।

তাঁহার প্রচার-কার্যে, তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে, তাঁহার গুরু-গাভীর্যে, তাঁহার অভূতপূর্ব শাস্ত্র-প্রজ্ঞায়, তাঁহার অতুলনীয় বিচক্ষণতা, উদারতা ও বাৎসল্যে কত সহস্র ব্যক্তি যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত শত ব্যক্তি কেবল তাঁহার আলেখ্যে মাত্র দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিত্যকালের প্রভুরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীপ্রভুপাদ ও আচার্য্যসিংহ শ্রীল কেশব গোস্বামী যে-আদর্শ, যে-বিচারধারা প্রচার করিয়াছেন, আমাদের আরাধ্যদেব সেই আদর্শে ও সেই বিচারধারা হইতে এক চুলও বিচ্যুত না হইয়া তাহা যথাযথ সংরক্ষণ করিয়াছেন—ইহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। পরবর্ত্তী কর্ণধার সেইপ্রকার আদর্শ ও বিচারধারা সংরক্ষণ করিবেন, ইহাই কামনা।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে আচার্য্যসিংহ শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী গুরুত্বে, আচার্য্যত্বে স্থাপন করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধগণের হৃদয়স্থ ‘কৃষ্ণপ্রেমাগ্নি’র স্ফুলিঙ্গ স্নিগ্ধ শিষ্যের চেতনে যে-প্রকার অপর এক মহাগ্নির সূচনা করে, সেইপ্রকারই সিদ্ধপুরুষেরও আচার্য্যত্ব, গুরুত্ব স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট অর্পিত হয়—ইহা নিজে নিজে ফুটিয়া উঠে না। ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়া উঠা যে আচার্য্যত্ব বা গুরুত্ব, তাহা “গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ” এই আগম-বাক্যের সত্যতাই মাত্র প্রমাণ করে।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিলে শিষ্যগণকে অনাথ, আশ্রয়হীন ভাবিতে হইবে না। তিনি ও তাঁহার উপদেশাবলী অভিন্ন। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী কখনও অপ্রকট হয় না। যিনি সেই উপদেশাবলীকে তাঁহার একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ বলিয়া বরণ করিতে পারেন, শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার কাছে সর্বদা প্রকটিতই থাকেন, আলোর মহিমা অন্ধকার আসিলেই উপলব্ধি হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ উপস্থিতির মহিমা বদ্ধজীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না। তজ্জন্য নিজেকে তিনি সংগোপন করিয়া আমাদের মধ্যে তাঁহার জন্য বিরহ উৎপাদন করাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতির মহিমা উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহার এক বিশেষ করুণাই বলিতে হইবে। আমরা পূর্বে তাঁহাকে চোখের দেখা দেখিয়াই মাত্র সন্তুষ্ট থাকিতাম, অন্তর্রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতাম না। এখন তাঁহার সামিধ্য লাভ করিতে হইলে অন্তর্রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। শিষ্যের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা গুরুপাদপদ্ম মৌনাবলম্বন করিলে বা অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেই প্রকাশিত হয়।

এইরূপে বিভিন্ন বক্তাগণ তাঁহাদের বক্তব্য স্থাপন করিলে পর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল পরমগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীর ভোগারতি সম্পন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ প্রায় তিন সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। সন্ধ্যারতির পর পুনরায় এক বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমিতির সমস্ত সন্ম্যাসীবৃন্দ ও ব্রহ্মচারীগণ শ্রীল গুরুমহারাজের সম্বন্ধে বিভিন্ন অমূল্যশিক্ষা সম্বলিত স্মৃতিসমূহ রোমন্থন করেন। তন্মধ্যে একসময় হঠাৎ নিকটস্থ ক্লাবঘর হইতে কিছু

দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মঠের বিরুদ্ধাচরণ করিতে জোরে জোরে মাইক বাজাইতে থাকে। তখন বিরহসভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাহাদিগকে শাস্ত হইতে অনুরোধ করিলে তাহারা তথায় উপস্থিত মঠের সেই যাত্রীগণের উপর আক্রমণ করে। থানা হইতে পুলিশ আসিয়া তাহাদের কুখ্যাত নেতাকে ধরিয়া লইয়া যায়। কলির সৃষ্ট এই উৎপাত সকল অনর্থকর দেশী-বিদেশী-অর্থপ্রভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজের বিরোধিতাকেই সারাৎসার জ্ঞান করিয়াছে। তাহাদের সুবুদ্ধি-লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা না গেলেও তথাপি ভক্তগণ ধৈর্য্যধারণ পূর্বক তাহাদের দুর্বুদ্ধি দূর হউক, এইমাত্র প্রার্থনা করেন।

গুরুপ্রেষ্ঠের মহাপ্রয়াণ

গুরুপাদপদ্মের বিরহবেদনায় যখন সকলেই মুহুমান, তখন দিবস দুই মধ্যেই পুনরায় গুরুভ্রাতার বিচ্ছেদ-সংবাদে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখামঠ শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ গত ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার (ইং ১৮।১১।০৪), দুপুর ১২-৪০ মিনিটে গুরুর সপ্তমী তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে অপ্রকট করেন। ‘কেবল পূর্বদিবসেই মাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যলীলায় প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীবিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল, আজ আবার এ কি দুঃসংবাদ!’—মঠে উপস্থিত সমস্ত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীগণ ও ভক্তবৃন্দ, সকলে মুহূর্তকাল যাবৎ স্তম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনিতে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাহার এই নিদারুণ-সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইলে তাহা সকলের নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় দুর্বিষহ হইয়া উঠিল।

ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে অপ্রকট করেন। তজ্জন্য তাহার এই বিয়োগ আমাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হইতেছে। গত ১৯৯২ সালে তিনি আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাহার নাম ছিল শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী। বলাবাহুল্য, আমাদের গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্ন্যাসী। প্রথম সন্ন্যাসী—পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ। হায়, উভয়ের কেহই আজ আমাদের মধ্যে নাই! শ্রীরামগোবিন্দ প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গোরানগর ঘোলাপাড়ায় আবির্ভূত হন। তিনি পিতা শ্রীদেবেন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও মাতা পুষ্পদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। ২০ বৎসর বয়সে তিনি মঠে যোগদান করেন। তদবধি তিনি আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে তাহার হৃদয়-সিংহাসনে এরূপভাবে স্থান প্রদান করিয়াছেন যে, কেহ যদি কোনপ্রকারে গুরুপাদপদ্মকে লঙ্ঘন করিতে চাহিত, তবে

তাহার নিকট তিনি ‘যম’-স্বরূপ ধারণ করিতেন। প্রত্যেক কুলেই কিছু কুলাঙ্গার জন্মিয়া থাকে। আমাদের গুরুপাদপদ্মের আশ্রিতগণের মধ্যেও ঐ প্রকার কিছু ব্যক্তি আছে— তাহাদের দেখিলেই তিনি ‘কৃতান্ত’-মূর্তি ধারণ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে বাহ্যিকভাবে মাথা খারাপের মতো বলিয়া মনে হইত। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কোনপ্রকার অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিলে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া যাইতেন—তাঁহার এইপ্রকার গুরুনিষ্ঠা আমাদের স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ইহাতে কাহাকেও কাহাকেও (উক্ত কুলাঙ্গার-গোষ্ঠীর) গোপনে তাঁহাকে ‘গুরুপ্রেষ্ঠ’ বলিয়া উপহাস করিতে দেখা যাইত। কিন্তু তিনি যে যথার্থই গুরুপ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন।

পূজনীয় শ্রীগোবিন্দ মহারাজ অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির ও উদার-চরিত্র ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিলিগুড়িতে মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের রক্ষণভার প্রদান করেন। যে কেহ সেখানে যাইতেন, তাঁহাকে তিনি কিপ্রকারে আদর-যত্নে যে রাখিতেন,



তাহা যাঁহারা তাঁহার নিকট একবার গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করেন। কাহাকেও খাওয়াইতে ও নানা উপহার দিতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া যাইতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যতদিন তাঁহার কাছে থাকিতেন, ততদিন তিনি উৎসব পালন করিতেন। তাঁহার ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শ্রীল গুরুদেব দীর্ঘদিন একটানা উক্ত মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ-বিচ্যুত হইলেই তিনি ভীষণ কষ্টের মধ্যে কাল কাটাইতেন—‘মাথা খারাপের’ মত তাহার অবস্থা হইয়া যাইত।

পূজনীয় গোবিন্দ মহারাজ উক্ত শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের ভূমিপ্রদাত্রী আমাদের পরম পূজনীয়া গুরুভগ্নী ‘শ্রীকল্যাণী’ দিদির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। কল্যাণী দিদি তাঁহাকে ব্রহ্মচারী-অবস্থাতেই কাছে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সরলতা, উদারতা ও সর্বোপরি গুরুনিষ্ঠা দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূর্ববৎ স্নেহ করিতেন। তিনি শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুকে সন্ন্যাসপ্রদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসলাভের পরবৎসরই কল্যাণীয়া কল্যাণী দিদি শ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে নিজ ধামে গমন করেন।

শ্রীগোবিন্দ মহারাজ তাঁহার শ্রীমঠের পুরাতন জীর্ণ মন্দির ও নাট্যমন্দিরের স্থানে বিশাল সুরম্য দ্বিতল মন্দির ও নাট্যমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। গত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতেই উক্ত মন্দিরে তিনি শ্রীবিগ্রহের প্রবেশ-মহোৎসব সাড়ম্বরে পালন করিয়াছেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে তিনি সেই মহোৎসবের জন্য সাক্ষাৎভাবে উক্ত মঠে লইয়া যাইবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মও তাঁহার ঐকান্তিক আবেদনে সেখানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশ না থাকায় তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীল মহারাজ অন্তরে ভীষণ কষ্ট অনুভব করিতে থাকেন। তিনি শিলিগুড়িতে অনেকের নিকট পরে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—“আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, আমি এখন থেকে গুরুমহারাজের কাছে থাকব।” তিনি পরে সাক্ষাৎভাবে তাহা শ্রীল গুরুমহারাজকেও জানাইয়াছেন।

পূজনীয় গোবিন্দ মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অত্যন্ত ঘটা করিয়া পালন করিতে বিশাল এক সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি নানা সেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া লইয়া সকলের সামনে নৃত্য করিতেছিলেন। শুভ দামোদর-ব্রতের আরম্ভ হইতেই তিনি শ্রীনবদ্বীপধামে দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুমহারাজের সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সেবকগণের সহিত শ্রীল গুরুমহারাজের সাক্ষাৎসেবায় অংশগ্রহণ করিতেছিলেন। কেবল অনুকূট-মহোৎসব পালনের জন্য তিনি নবদ্বীপ হইতে শিলিগুড়িতে গমন করেন। কিন্তু এবার সেখানে গিয়া তিনি কতকগুলি অদ্ভুত আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন, “আমি আর বেশি দিন নাই। শ্রীল গুরুমহারাজ চলে গেলে আমিও চলে যাব—আমি আর থাকব না। আপনারা সকলে মিলে মঠটা দেখবেন।” তিনি পুনঃ পুনঃ জোরে জোরে সবাইকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“গুরুমহারাজের সেবক গোবিন্দ মহারাজ, গুরুমহারাজের সেবক গোবিন্দ মহারাজ।” তিনি মঠে উপস্থিত সেবকগণের নিকট শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার, অর্থ কোথায় কিরূপ আছে, এবং সমস্ত দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শুক্রা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীল গুরুমহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে সে-সংবাদ শিলিগুড়িতে উক্ত মঠে তৎক্ষণাৎ পৌঁছাইল। মঠে অন্যান্য সেবকগণ তাহা জানিতে পারিয়া গোবিন্দ মহারাজের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না, কারণ উহা শুনিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ উন্মাদ হইয়া যাইবেন। তাই তাহারা মহারাজকে বলিলেন, “মহারাজ, চলুন নবদ্বীপে যাই, গুরুমহারাজের শ্রীঅঙ্গ কুশল নয়।” শুনিয়া তিনি বলিলেন, “গুরুমহারাজের শরীর খারাপ? চল, চল, তাড়াতাড়ি চল, আমরা নিকটে গেলে আমাদেরকে দেখে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।” এইভাবে সেবকগণ মহারাজকে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে পরদিবস বৈকালে আসিয়া পৌঁছাইলেন। মহারাজ

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত কলেবর দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন—কিছুমাত্র ক্রন্দন করিলেন না। তিনি অতি স্বাভাবিক ভাবে স্বয়ং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধি প্রদান-সেবায় অংশগ্রহণ করিলেন। বিরহ-মহোৎসবও অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তিনি পালন করিলেন। সুন্দর ভাষণও তিনি প্রদান করিলেন। তাহার চলনে বলনে ধীরে ধীরে উদ্বেকজনক কিছু অস্বাভাবিকতা প্রকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও তিনি ঘৃণাক্ষরে নিজ সঙ্কল্প বুঝিতে দিলেন না—অন্তরের প্রবল বিরহ-বেদনা কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তাঁহাকে আমরা বাহ্যে কোন ক্রন্দন করিতে দেখিলাম না। অথচ অসহনীয় বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি শ্রীল গুরুমহারাজের সেবকরহিত অবস্থান মানিয়া লইতে পারিলেন না। ‘শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগুরুগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেবা কে করিবে?’—এমন চিন্তা আমরা কেহ করি নাই, করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। গোবিন্দ মহারাজের সেই ক্ষমতা ছিল, তাই তিনি পতিব্রতা রমণীর ন্যায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অনুগমন করিলেন। এমন ঘটনা কখনও পূর্বে ঘটিয়াছে কি?

পরদিবস ৩রা অগ্রহায়ণ, ইং ১৯।১১।০৪, শুক্রবার, শিলিগুড়ি হইতে সমস্ত ভক্তবৃন্দ দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে মধ্যাহ্নে সন্ধীর্জন-মুখে সমস্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ, নবদ্বীপবাসী তাঁহার পূর্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনগণ সকলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গদখালিস্থ ত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে লইয়া যান। যথাশাস্ত্র অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তাঁহাকে সমাধি প্রদান করা হইল। যাঁহারা বহু দূরদূরান্তর হইতে গুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিলম্বের দরুণ সে-দর্শন সম্ভব হয় নাই,—তাঁহারা অবশেষে গুরুপ্রেষ্ঠের ব্রজবিজয় ও সমাধি দর্শন করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র কম নহে।

পরদিবস ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০।১১।০৪, শনিবার তাঁহার ব্রজবিজয় উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। প্রচুর লোক আসিয়া তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার বিভিন্ন সেবা-নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারতি শেষে উপস্থিত সকলে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়াছিলেন।

শেষে, একটিই মাত্র সান্ত্বনা। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম একাকী নহেন—তাঁহার সেবার জন্য শ্রীল গোবিন্দ মহারাজ তাঁহার নিকটে অবস্থিত আছেন। তিনি যথার্থই যোগ্য সেবক ও ভাগ্যবান। তাঁহার চরণে নিবেদন,—তিনি দয়া করিয়া শ্রীগুরুসেবায় আমাদের অধিকার প্রদান করুন। জয় শ্রীভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ! আপনার জয় হউক, অশেষ পরিমাণে জয় হউক।



নৃগ-উপাখ্যান

একদিন সান্ধ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদব-কুমারগণ বনবিহারে বাহির হইয়াছেন। বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা খুবই তৃষ্ণার্ভ হইয়া পড়িলেন। অনতিদূরে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া গেলেন। যেই জল তুলিতে যাইবেন, সেই কূপের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাইলেন। সেটি একটি কুকলাস। তাঁহারা দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া কুকলাসটিকে কূপ হইতে তুলিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তুলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা কৃষ্ণকে এই অদ্ভুত প্রাণীর কথা জানাইলেন। কৃষ্ণ আসিয়া প্রাণীটিকে বামহস্তদ্বারা অনায়াসে কূপ হইতে উঠাইলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার কৃষ্ণ-স্পর্শে সেই কুকলাসটি কুকলাস-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব এক দেবতার রূপ ধারণ করিলেন। তিনি গৌরবর্ণ এবং সুন্দর বসন-ভূষণে সুশোভিত। তাঁহার মস্তকে মুকুট ঝলমল করিতেছে। তাঁহার অঙ্গতেজে চারিদিক আলোকিত। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ত সবই জানেন। তথাপি সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—“আপনি কে? আপনার এমন সুন্দর রূপ-লাবণ্য, তথাপি আপনি কি এমন কুকার্য্য করিয়াছিলেন যে—আপনাকে এইরূপ কুৎসিত কুকলাস হইতে হইল? আমরা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। আপনি সমূহ বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের উৎসুক্য নিবারণ করুন।” কৃষ্ণের কথায় সেই দেবরূপী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—“প্রভো! আপনি ত অন্তর্যামী। সবই জানেন। আমি আর কি বলিব? আমি ইক্ষাকুর পুত্র। আমার নাম নৃগরাজ। আমি খুব দানশীল ছিলাম। আমি অসংখ্য ধেনু দান করিয়াছি—তাহা গণনা করিবার ক্ষমতা নাই। সেইসব দুগ্ধবতী গাভীর শিংগুলি সোনার দ্বারা এবং খুরগুলি রূপার দ্বারা মণ্ডিত ছিল। বৎসসহ কপিলা ধেনু আমি যোগ্য পাত্রেই দান করিয়াছিলাম। তাঁহারা সাধারণ গ্রহীতা ছিলেন না। তাঁহারা সর্ব্ব সদগুণযুক্ত, সদাচার সম্পন্ন, বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র, তপস্বী এই প্রকার সর্ব্বগুণ বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে আমি গো, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তী, অশ্ব, রথ, গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, রত্নাদি বহু মূল্যবান দ্রব্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিয়াছিলাম। আমি অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছি। জনহিতার্থে কত পুষ্করিণী, কূপাদি খনন করিয়া দিয়াছি—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এক বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি গাভী যাহা আমি এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম—সেই গাভীটি তাহার গৃহ হইতে কখন চলিয়া আসিয়া আমার গৃহস্থিত অন্য গাভীগুলির সহিত মিশিয়া গেল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আর কি করিয়াই বা জানিব। সেই পূর্ব্বদত্ত গাভীটিকে অজ্ঞাতসারে অপর একজন ব্রাহ্মণকে দান করা হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে ঐ ধেনুটিকে লইয়া যাইতে দেখিয়া পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ আসিয়া রাগতস্বরে কহিলেন—“আমার ধেনুটি তুমি লইয়া যাইতেছ কেন?” অপর ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া

বলিলেন—“বাঃ, আমি তোমার ধেনু কেন লইতে যাইব? আমাকে ত’ নৃগরাজ এই ধেনুটি দান করিলেন। যদি বিশ্বাস না হয়—তবে নৃগরাজার নিকট চল। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে।” এইভাবে ঝগড়া করিতে করিতে দুইজনেই আমার নিকট আসিলেন। পূর্ব ব্রাহ্মণটি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কহিলেন—“মহারাজ! আপনার এ’ কি বিচার? আপনি আমাকে এই ধেনুটি দান করিয়াছিলেন। আবার সেই ধেনুটিকেই এই ব্রাহ্মণকে কি করিয়া পুনরায় দান করিলেন? আপনার কি কোন ধর্মভয় নাই?” আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। আমি তাঁহাদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম—“হে ব্রাহ্মণগণ! আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার অজ্ঞাতসারে ইহা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমাকে ঐ ধেনুটি ভিক্ষা দিন, আমি উহার পরিবর্তে অতি উত্তম লক্ষ ধেনু প্রদান করিব।” কিন্তু তাঁহারা অনড়। কেহই কোন মতেই কোন কথা শুনিতে চাহিলেন না। পূর্ব ব্রাহ্মণটি কহিলেন—“আমি ঐ ধেনুটিই চাই, অপর কোন দান আমার প্রয়োজন নাই। যদি ঐ গাভীটি না দেন, তাহা হইলে আমি চলিলাম।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরের ব্রাহ্মণটিরও একই কথা। তিনি বলিলেন—“মহারাজ! আমার লক্ষ গাভীর প্রয়োজন নাই। আমি ঐ গাভীটিই চাই। তাহা না হইলে আমি চলিলাম।”—এই বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

হে গোবিন্দ! আমার মৃত্যু হইলে পর যমদূতগণ আমাকে যমপুরীতে লইয়া গেলেন। যমরাজ আমাকে বলিলেন—“মহারাজ! আপনার পাপ ও পুণ্য দুইই রহিয়াছে। সুতরাং আপনাকে পাপের ফল ও পুণ্যের ফল উভয়ই ভোগ করিতে হইবে, বলুন আপনি কোন্টি আগে ভোগ করিতে চান।” আমি জোড়হস্তে বলিলাম—“হে ধর্মরাজ! আমাকে প্রথমেই পাপের ফল ভোগ করিতে দিন।”—এই কথা বলা মাত্রই যমরাজের আদেশে আমার পতন হইল। সেই পতন-হেতু এই ভূমণ্ডলে আমাকে কুকলাসরূপে রহিতে হইল। হে ব্রহ্মণ্যদেব! গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী মঙ্গলময় ভগবন্! আমি আপনার কৃপায় জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব বৃত্তান্ত ভুলি নাই, আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিলাম। আজ আপনার শ্রীহস্ত স্পর্শ পাইয়া কুকলাস যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। এই বলিয়া নৃগরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দনা করিতে লাগিলেন।—“হে পরমকারুণিক সর্বৈশ্বরেশ্বর গোবিন্দ! যে পাদপদ্ম যোগী, মুনি, ঋষিগণ অনন্তকাল কৃচ্ছ-সাধনার দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, বেদ-উপনিষদ সামস্বরে যাঁহার গুণগাথা-কীর্তনে অপারগ—আমার কত জন্মের কি সুকৃতির ফলে সেই অধোক্ষজ পরমাত্মারূপী শ্রীহরিদর্শন হইল—আমি নিজেই ভাবিয়া পাইতেছি না।” তিনি গদগদ স্বরে—“হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব” বলিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীপাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রার্থনা করিলেন। গোবিন্দকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি সকলের সমক্ষে বিমানযোগে স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র পরিজনবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য নৃগরাজার দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন—“যত বড় তেজস্বী, ধার্মিক, সৎকর্মী, দানবীর হউন না কেন—কোন কালে কেহই যেন ব্রহ্মস্ব অপহরণ না করেন। ব্রহ্মস্ব অপহরণকারীর কোন জন্মেই শান্তি নাই। উদ্ধারও নাই। জলের দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাগ্নির হাত হইতে অপহরণকারীর নিস্তার নাই। এমন কি তাহার পূর্ববর্তী দশপুরুষ ও পরবর্তী দশপুরুষ অবশ্যই নাশ হইয়া যাইবে। সুতরাং যাহারা অহঙ্কারপূর্বক ঐ প্রকার দুষ্কর্ম করে, তাহারা অতীব মূর্থ। তাহাদের অধোগতি অবশ্যস্তাবী। তাহাকে অনন্তকাল কুস্ত্রীপাক নামক নরক ভোগ করিতে হইবে। বিষ্ঠার কৃমিকীটরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এবং অগ্নায়ু ও রাজ্যচ্যুত হইয়া সপ্যোনি লাভ করিতে হইবে। হে স্বজনগণ! তোমরা সাবধান হও, তোমরা বিনয়ী, নম্রস্বভাব-যুক্ত হইয়া ধর্মভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করিও। অগ্ৰথায় দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী। দেখিলে ত’ ব্রাহ্মণের ধেনুই নৃগরাজের পতনের কিপ্রকার কারণ হইয়া গেল। অজ্ঞানকৃত কর্মেও যদি এইপ্রকার ফল ভোগ করিতে হয়—তাহা হইলে জ্ঞানতঃ করিলে তাহার ফল কিপ্রকার ভয়াবহ হইবে, চিন্তা করিও।” সকলকে এইপ্রকার উপদেশ দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র আপন মন্দিরে গমন করিলেন।

ভগবানের অঙ্গস্পর্শে নৃগরাজ ককলাস জন্ম হইতে উদ্ধার পাইলেন। আসুন, আমরা ভগবান্ গোবিন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করি। তাহা হইলে আর কোনপ্রকার অমঙ্গল রাশি আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না।

“ধ্বস্ত-দুষ্ট-শঙ্খচূড়! বল্লবীকুলোপ গৃঢ়!
ভক্ত-মানসাধিরূঢ়! নীলকণ্ঠ পিচ্ছচূড়!
কণ্ঠলম্বি-মঞ্জুগুঞ্জ! কেলি লব্ধ-রম্যকুঞ্জ!
কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ! পাহিদেব মাং মুকুন্দ।”

হে দেব! হে মুকুন্দ! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়ের ধ্বংসকারী। তুমি ব্রজরমণীগণ-কর্তৃক আলিঙ্গিত। তুমি ভক্তগণের মানসপটে অধিষ্ঠিত। তোমার চূড়া ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, তোমার কণ্ঠে মনোহর গুঞ্জামালা দোদুল্যমান। কেলি-বিলাসের নিমিত্ত মনোহর নিকুঞ্জ-কানন তোমার আশ্রয় ও কর্ণযুগল কুন্দপুষ্পে সুশোভিত—তুমি আমাকে পরিব্রাণ কর।

“নাস্ত্বা ধর্মো ন বহু নিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ব্যং ভবতু ভগবন্! পূর্ব-কর্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-জন্মান্তরেহপি
ত্বৎ পাদান্তোরুহ-যুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।”

হে ভগবান্! ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে আমরা কোন আস্থা নাই। পূর্ব-কর্মানুসারে যাহা ঘটিবার ঘটুক। কিন্তু সকাতির প্রার্থনা এই যে, জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্ম-যুগলে নিশ্চলা ভক্তি হউক।

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে।
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ও

নবাচার্য-অভিষেক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিস্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ), ০৩৪৭২/২৪০০৬৮

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল প্রচারকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৯ই নারায়ণ, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ; ১৯শে পৌষ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ০৪/০১/২০০৫), মঙ্গলবার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদ্বন কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৮৪তম শুভ-আবির্ভাব উপলক্ষে পৌষী-কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। তদনন্তর শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকচার্য্যের নির্দেশ-অনুসারে পরমপূজনীয় ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজকে বিভিন্ন গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের উপস্থিতিতে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্যপদে অভিষেক করা হইবে। এই মহোৎসবে শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে। ইতি— ২৭শে কার্তিক, ১৪১১

বৈয়াসিক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে শ্রীমধুসূদন মহারাজের [MOB. ০ 9434343942] নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪১১, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪

—ঃ অনুষ্ঠান সূচী :—

১৮ই পৌষ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ০৩/০১/২০০৫) সোমবার :—

ব্রাহ্মমুহূর্তে : মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

পূর্বাহ্নে : শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্তন।

অপরাহ্নে : নগর-সঙ্কীৰ্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায় : আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন এবং
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ।

১৯শে পৌষ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ০৪/০১/২০০৪) মঙ্গলবার :—

ব্রাহ্মমুহূর্তে : মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

প্রাতঃ : ৬-৩০মিঃ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্তন
ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

পূর্বাহ্নে : ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে
অঞ্জলি-প্রদান।

দিবা : ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবশংসন ; এবং
নবাচার্যের অভিষেক অনুষ্ঠান।

মধ্যাহ্নে : ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ।

সন্ধ্যায় : আরাত্রিকান্তে বর্নসভা—“শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব”
সম্বন্ধে ভাষণ।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য্য।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ম।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯ নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ
৫৬শ বর্ষ } ২৯ পৌষ, শুক্রবার, ১৪১১, ১৪-১-২০০৫ { একাদশ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাস্তকম্

[শ্রীল-সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তলস্যাঃ
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহৃৎকার-ঘোষৈঃ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ১॥

শ্রীশ্রীগৌরহরিকে জগতে প্রকট করাইবার জন্য যিনি গঙ্গাতীরে গঙ্গাজল, তুলসীপত্র ও বিবিধ পুষ্পদ্বারা প্রেম-হৃৎকার যোগে আরাধনা করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি॥ ১॥

যদ্বুৎকারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈ-
রাকৃষ্টঃ সন্ গৌর-গোলোকনাথঃ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ২॥

যাঁহার প্রেমসিদ্ধুর বিকারজনিত হৃদ্বারে আকৃষ্ট হইয়া গোলোকনাথ শ্রীগৌরচন্দ্র
শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যমণি অন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরে আবির্ভূত হন, আমি সেই শ্রীল
অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি॥ ২॥

ব্রহ্মাদীনাং দুর্লভ-প্রেম-পূরৈ-
রাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্ ।
আবির্ভাব্য শ্রীল-চৈতন্যচন্দ্রং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৩॥

শ্রীল চৈতন্যচন্দ্রকে আবির্ভাব করাইয়া যিনি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমপ্রবাহে সমগ্র
জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি॥ ৩॥

শ্রীচৈতন্যঃ সর্বশক্তি-প্রপূর্ণো
যস্যৈবাজ্জমাএতোহন্তর্দধেহপি ।
দুর্বির্ভজ্যেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৪॥

সর্বশক্তি পরিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবার যাঁহার আজ্জমাএে অন্তর্দ্বান
হইয়াছিলেন এবং যাঁহার করুণাজনিত কার্য্যসকল দুর্বির্ভজ্যেয় তথা রহস্যময় ছিল,
আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি॥ ৪॥

সৃষ্টি-স্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ
যস্য্যাংশাংশা ব্রহ্ম-বিষবশ্বরাত্যাঃ ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিশুঃ-রূপং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৫॥

যাঁহার অংশের অংশসমূহ ব্রহ্ম-বিষু-শিব নামে খ্যাত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-
প্রলয়-বিধানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই মহাবিশু-অভিন্ন শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ
গ্রহণ করি॥ ৫॥

কস্মিন্শিচ্ছদ যঃ শ্রয়তে চাশ্রয়ত্বাৎ
শম্ভোরিত্থং শান্তবনাম ধাম ।
সর্ব্বারাদ্যং ভক্তিমাত্রৈক-সাধ্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৬॥

শম্ভুর আশ্রয়তত্ত্ব অর্থাৎ আকরতত্ত্ব বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে যাঁহাকে
শম্ভু-স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে শুনা যায় এবং যিনি এক কেবলা ভক্তিদ্বারা
সাধ্য ও আরাধ্য, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি॥ ৬॥

সীতা-নানী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা
পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ-নামা ।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূর-প্রপূর্ণঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৭॥

প্রেমপূর্ণা-সীতাদেবী যাঁহার প্রেয়সী এবং শ্রীগৌর-প্রেমপ্রবাহ-পূর্ণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ যাঁহার পুত্র, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৭ ॥

নিত্যানন্দাঈততোহঈত-নামা

ভক্ত্যাখ্যানাদ যঃ সদাচার্য-নামা ।

শশ্বদেতঃ সঞ্চরদ্ গৌরথামা

শ্রীলাঈততাচার্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু হইতে অভিন্ন বলিয়া যিনি ‘অদ্বৈত’-রূপে খ্যাত ও সর্বদা ভক্তি- ব্যাখ্যানহেতু যিনি আচার্য্যরূপে পরিচিত এবং যাঁহার হৃদয়ে গৌর-তেজ নিত্যকাল সঞ্চরিত, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৮ ॥

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ

সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধ-বুদ্ধিঃ ।

সোহয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে

বিন্দন্ ভক্তিং তৎ-প্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥ ৯ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুদ্ধবুদ্ধিযোগে যিনি প্রীতিসহকারে এই সীতানাথাস্টক সম্যক্রূপে পাঠ করেন, তিনি তাঁহার পদকমলে ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয়তা অর্জন করেন ॥ ৯ ॥



ধর্ম ও বিজ্ঞান

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্রমোপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

ন্যায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে ‘বৈজ্ঞানিক-জগৎ’ বলা হইয়াছে, তাহা ডারউইনের ‘ক্রমোৎপত্তি’-সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাপ্তাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটি মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র, তাহা নয়। প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে—কোন মূল আকার হইতে আকারবৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং

তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহুপ্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্ জাতি নির্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য দেখা যায় না, একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, বহুকাল বিগত না হইলে একটা নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা হইল এই যে, প্রতিদিবসের, প্রতিঘণ্টার এবং প্রতি মুহূর্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি ‘অদৃষ্ট-ফল’ মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমের বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এইসমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটি সামান্য পক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে ও উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্মাণ সম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে সে পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য করে না। এই মতে তত্ত্ববাদী যথেষ্ট। কিন্তু সম্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন, যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয় যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্মপ্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধ্বস্ততা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্যহইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধহীন। কিপ্রকারে জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয়-সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্ব্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট, স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ‘করণাপাটব’ সম্ভূত প্রমাদবিশেষ। অপেক্ষা চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া

নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানীগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ (তাহা) দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টিয়ান মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটি কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্ব্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টানধর্মে যে একটি Soul শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদীদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যিক, কেন না জড়শক্তিগত বিধিসকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্তমান। পরন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা, তাহা নয়। বেদশাস্ত্রে ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য মন্তব্য’ ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্রজড়বাদ হইতে পৃথক্। খ্রীষ্টানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম সমস্তই খ্রীষ্টানের আত্মা। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্ব্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ মাত্রই নাই। খ্রীষ্টানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন মুক্তি পূর্ব্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সংসদ্বন্দ্বপ সুকৃতি বলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদীগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম প্রাপ্তিই ফল। “ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য” এই ভগবদ্ভাক্যই ইহার প্রমাণ। “যান্তি দেবব্রতা দেবান্” এই বাক্যদ্বারা খ্রীষ্টানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ “যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্” এই বাক্যক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজনপূর্ব্বক পরমাত্মা স্বরূপ ভগবৎসেবা লাভ করেন।

জড়বাদীগণই ভূত-পূজক—‘ভূতেজ্য’ এবং ইহাদের

সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক

জড়বাদীদিগকেই ভূতেজ্য বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড় ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনাপূর্ব্বক যত প্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয়

করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিষ্কিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া জড়শক্তি-প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এইপ্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনতা নাই। পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেইসব দেশে সুতরাং টিণ্ডল, হাক্সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভগবদ্ভীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আসুর প্রবৃত্তি-বর্ণনে “জগদাহরনীশ্বরং” “অপরস্পরসমুত্তং” ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বাদ এইসকল যে আসুর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ

এইসকল বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকারপূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্তার লীলা আলোচনা করতঃ ভগবৎপ্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নয়। প্রক্রিয়াঘেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদগণের সেবা করাই তাহাদের কর্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর-নির্ব্বাহী ব্যাপারসকলের সাধনের জন্য অন্যান্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

“আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তিচেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্নে দূর করিতে হইবে।” —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অভক্তি-মার্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪০৫ পৃষ্ঠার পর)

অনুকূল অনুশীলনের স্বরূপ

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গান্তর্ভুক্ত হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ্য ব্যতীত ‘অন্যাভিলাষ’ শব্দবাচ্য। যথেষ্টাচারী কুকর্মকারী বা অজ্ঞান-সেবী কুঞ্জানীগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণ-নুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিন্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ-আশা সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজ উপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য প্রতিভা বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ শান্তির জন্য উদ্গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মান লাভে তৎপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার কুটনীতি জীবহিংসা প্রভৃতি, ঐহিক বা স্বর্গসুখ ভোগরত, বেশ বা আশ্রমের মাহাত্ম্য-লোলুপ, মুমুক্শু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবাস্তব উদ্দেশ্যের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতায়ুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষযুক্ত ভগবৎ-অনুশীলনও অভক্তি পথে দেখা যায়।

অমল জ্ঞানের বিচার ও পঠন-পাঠনই ভক্তি

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে ‘জ্ঞান’ শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রিয় নিম্নলিখিত পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয়

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চেষঃ ত্রিক এককালঃ”। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদ্ভিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধজীবাবিমাণে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্শুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

কৃষ্ণই—অদ্বয়জ্ঞান ও কৃষ্ণেতর—দ্বৈতজ্ঞান

শুদ্ধভক্তিকে তাহার বণিক-বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্কদ্বারা তত্ত্ব-বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান-মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গু বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদ জ্ঞানে আবৃত না হয়। কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। তৎ-ইতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদ্ভিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্তমান থাকে। যে-জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে-জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈত জ্ঞান। জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্বিত মায়িক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্ম মায়ার বিক্রমহেতু অভক্তি, কিন্তু হরির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াই ভক্তি

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক (ভক্তি-আবরক)। কৃষ্ণের আবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটা বিক্রম—কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজকর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্যাাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফলভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্তি-অনুষ্ঠান। ভুক্তি পিশাচিনী, ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাশ্রে কথিত হইয়াছে—হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্বারা প্রেমভক্তি

লভ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কড়ু নহে অঙ্গ।

অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।।

ঠাকুর বিশ্বমঙ্গলও বলিয়াছেন,—

ভক্তিঙ্কয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাং

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যাকিশোর মূর্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্

ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটা চিত্ত-কাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্তি-অঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

কর্ম, জ্ঞান, তপস্যাদি অভক্তিমার্গ

ভক্তি থাকিলে কর্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কর্ম, জ্ঞান ও তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম ও জ্ঞান তপস্যার প্রয়োজন নাই, আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবাস্তব মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্মজ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না, ইহাই পঞ্চরাত্রী সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গসমূহই অভক্তিমার্গ।

অভক্ত ও অভক্তি হইতে নিরপেক্ষ থাকা কর্তব্য

বিচক্ষণ পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তিমার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি-পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তি-মার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত- বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

জগদগুরু পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুচুড়া

তারিখ—১২ই আষাঢ়, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, (ইং ২৬।৬।১৯৪৯)

আজ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের পরম পবিত্র শুভ তিরোভাব তিথি তথা বিরহ-তিথি। এই বিরহ-তিথি উদ্যাপন উপলক্ষে আমরা প্রতিবৎসর তাঁর ভুবন-পাবন জীবন-চরিত কীর্তন করে থাকি। আপনারা সকলেই এই মহাপুরুষের অতিমর্ত্য জীবনীর কথা বহুবার বহুক্ষেত্রে শ্রবণ করেছেন। একটা বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রতিবৎসর এই বিরহতিথির সমাগম হয়ে থাকে এবং প্রতিবৎসরই বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আদরের সাথে এ-তিথিতে মহামহোৎসব পালন করে থাকেন। বিরহ জীবমাত্রকেই ত' ব্যথিত করে। সুতরাং প্রতিবৎসরই ব্যথিত হবার জন্য এত আয়োজন ও ঘটনা কেন? হৃদয়-বিদারক ঘটনায় কারও উৎসাহ থাকতে পারে না। অথচ বৈষ্ণবগণের পরিভাষা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, বিরহও একটা উৎসববিশেষ। উৎসব-শব্দের অর্থ আনন্দ। তাহলে লোকের হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করিয়ে আনন্দ-লাভ করাই কি বিরহোৎসবের উদ্দেশ্য? না, তা' নয়—অথচ বিরহ-ব্যাপার আনন্দ-দায়ক বলেই বৈষ্ণবগণ বিরহোৎসব পালন করে থাকেন। কি ব্যাপার?

আমরা সকলেই “অমৃতস্য পুত্রাঃ”—অর্থাৎ আনন্দের সন্তান। নিরানন্দ আমাদের স্বরূপ নয়। আমাদের স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ-কণা, তা'তে উদ্বেগ, নিরানন্দ, দুঃখ, শোক প্রভৃতির ছায়ামাত্রও নেই। তথাপি বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘বিরহ’ একটা রস বলেই কীর্তিত হয়েছে। এই বিরহ-রসের অন্তরালে যে পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, সেটাই উৎসব। পার্থিব-শোক মানুষকে সংসারে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কিন্তু বিরহ জীবকে সংসার হতে মুক্ত করে ভগবৎ-পাদপদ্মে নিয়ে যায়। শোকাভিভূত ব্যক্তি—শূদ্র, কিন্তু বিরহকাতর ব্যক্তি—ব্রাহ্মণোত্তম, নির্গুণ ভক্ত। সুতরাং শোক ও বিরহে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-নরক পার্থক্য রয়েছে। শোক মানুষকে নিরুৎসাহিত করে হীনবীর্য্য করে ফেলে। কিন্তু বিরহ ভগবদ্ভক্তকে প্রচুর পরিমাণে সেবার উৎসাহে সঞ্জীবিত করে। সুতরাং আপনারা শোক ও বিরহ-তত্ত্বকে এক মনে করে ভ্রমে পতিত হবেন না। যদিও শাস্ত্রকারগণ বিরহ-শব্দের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে শোক-শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি এই শোক প্রাকৃত মায়া-মোহগ্রস্ত শোকের মত নয়—তা' অপ্রাকৃত বিরহ-তত্ত্বকেই লক্ষ্য করে।

বিরহের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে অব্যক্ত নিত্যানন্দের উচ্ছ্বাসই বর্তমান থাকে, তা'র আভাস আমরা প্রাকৃত জগতেও কিছু ক্ষেত্রে যাঁরা কাব্যরসের রসিক, তাঁদের মধ্যেও লক্ষ্য করে থাকি। উদাহরণ-স্বরূপে আপনাদের কাছে আমি নিবেদন করতে চাই—

যেমন, ব্যবসায়ী কীৰ্ত্তনীয়ারা যখন সুললিত-কণ্ঠে রাসলীলার করুণ-কাহিনী কীৰ্ত্তন করেন, তখন আপনারা তা শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের এমন কীৰ্ত্তন-চাতুর্য্য যে, তাতে প্রচুর করুণ-রসের উদ্বেক হয়—ফলে তখন আপনাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়, দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হতে থাকে। আবার, আপনারা এইপ্রকার কীৰ্ত্তন শুনবার জন্য সকলকে সাদরে আমন্ত্রণও করে থাকেন। কি ব্যাপার? কারণ অনুসন্ধান করলে আপনারাই বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে, করুণরস দুঃখদায়ক বটে, কিন্তু তার অন্তরালে এমন অব্যক্ত আনন্দ আছে যে, তার জন্য আপনারা সবসময় লালায়িত। শুধু তাই নয়, নিজেদের বন্ধুবান্ধবকেও সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করাতে আপনারা আহ্বান করে থাকেন—তাঁদের হৃদয় ব্যথিত করে উদ্বেগের সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই আপনাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণের ‘বিরহ-উৎসব’ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি, তা এই উপমার সাথে তুলনা করলে কিছু অনুধাবন করতে পারবেন। বিরহ উদ্বেগদায়ক, তথাপি আমরা প্রতি বৎসর বিরহের আলোচনা করে আনন্দ অনুভব করি এবং আপনাদেরকেও সেই আনন্দের অংশভাগী হতে আহ্বান করে থাকি।

বিরহের অপর নাম ‘বিপ্রলভ’। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলভ-রসকেই নিজ আদর্শের দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেছেন। তার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই সমস্ত জীবকে অনর্থমুক্ত-দশায় দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করা নয়। একদিকে যেমন পরমমুক্তগণের হৃদ্যত-বৃত্তিই হল ‘বিপ্রলভ’-রস, তেমনি অন্যদিকে বদ্ধজীবগণের পক্ষে বিরহ-উৎসবের অনুষ্ঠানও অত্যন্ত মঙ্গলজনক, তাতে জীবের অনর্থ হতে মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা—কোন অবস্থাতেই বিরহগত বৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হয় না। উপায় ও উপেয় একই তাৎপর্য্যপর ও একই পর্যায়াভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

‘বিরহ’ বা ‘বিপ্রলভ’-ভাবকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এত বহুমানন করলেন কেন—তা’ আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। মুক্তাবস্থায় যে বিপ্রলভের কথা, তা আমাদের বর্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়। সাধক-জীবনে এই ‘বিরহ’, ‘বিপ্রলভ’ই আমাদেরকে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরলভাবে অনর্থের হাত হতে নিষ্কৃতি দিতে পারে। বৈষ্ণবগণের যে বৈরাগ্য, তা এই বিরহ হতেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। যে বৈরাগ্য আমাদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করবার জন্য হয়, সে বৈরাগ্য ‘বিপ্রলভ’ বা ‘বিরহ’ নয়। ‘উদরবেগ’ সম্পন্ন ব্যক্তিদের চরিত্রে দেখা যায়, তারা অধিক ভোজনের সামর্থ্য লাভ করতে তারা উপবাস, সংযম প্রভৃতি করে থাকে। এই সংযম বা বৈরাগ্য, বিরহ বা বিপ্রলভ নয়। হৃদয়ে ভক্তবিরহ ও ভগবদ্বিরহ যত বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাবে, ততই বাহ্য-জগতের প্রতি স্পৃহা দূর হয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হবে। সেইজন্য বৈরাগ্যই প্রকৃত বিপ্রলভ। আমরা পার্থিব জগতে এইপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাই—সদ্য পুত্রহারী জননী শোককাতর হয়ে সংসারের প্রতি যে-প্রকার নিস্পৃহ হয়ে পড়েন, সেইপ্রকার নিস্পৃহভাবের সম্ভাবনা অন্য কোনভাবেই লক্ষ্য করা যায় না। মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ

করে জননী যে-সময় আর্তনাদ করেন, সে-সময় যদি কেউ লক্ষ মুদ্রাও সম্মুখে স্থাপন করে, তথাপি সেই মাতার নিকট তাহা বিষবৎ অগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। তাঁর নিকট তখন আহার-বিহার, বেশ-ভূষা সমস্তই তিক্ত বলে বোধ হয়। সেইজন্য এইজগতে ‘সন্তোগ-রস’ নয়, ‘বিপ্রলম্ব-রস’ই পরম মঙ্গলদায়ক—এটিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার সার। সন্তোগে সাধকের চিত্ত কলুষিত হয়, আর বিরহ সাধককে পবিত্র করিয়ে শুদ্ধ-বৈরাগ্যে স্থাপন করে। বিরহ-দ্বারাই সাধকের সংসার-স্পৃহা নষ্ট হয়। বিরহে ক্লেশবোধ থেকেই সাধক-জীবের ভোগবাসনা, কামনা প্রভৃতি সংসারমোচন হয়ে থাকে। আমরা সেইজন্যই প্রতিবৎসর শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করে থাকি।

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। বৈষ্ণব জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হন, আবার জগতের কল্যাণের জন্যই তিনি তিরোহিত হন। জগতের অকল্যাণ-সাধনের জন্য বৈষ্ণবের তিরোভাব নয়। “বৈষ্ণব চরিত্র সর্বদা পবিত্র”—তাতে কোন অমঙ্গলের ছায়া নেই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে আবির্ভূত হয়ে যে মঙ্গলবিধান করেছেন, তিরোহিত হয়ে তিনি তার অপেক্ষাও অধিক মঙ্গলবিধান করছেন। এটি একটি গুঢ় রহস্যময় তত্ত্ব। আমরা সাধারণ-দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য সহজে অনুধাবন করতে পারব না।

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৬)

এক সময় চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-মন-প্রণাদি সকলে পরস্পর নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-অভিমাণে বিতর্ক করে। তন্মধ্যে ‘কে শ্রেষ্ঠ’ তাহা নিশ্চয় করিতে না পরিয়া সকলেই প্রজাপতির নিকট উক্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রার্থনা করে। প্রজাপতি বলেন,—“যাহার উৎক্রমণে (নির্গত হইলে) সমস্ত শরীর পাপিষ্ঠের মত বেধা হইবে, সেই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” তখন বাক্-ইন্দ্রিয় কিছুদিনের জন্য সর্ব্বাণ্ড্রে শরীর হইতে নির্গত হইল। এক বৎসর পরে ফিরিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা আমা ব্যতীত কিরূপে জীবিত ছিলে? তাহারা উত্তর করিল,—যে রূপে বোবা লোক বাক্য ব্যতীত জীবিত থাকে, তদ্রূপ ছিলাম। তখন বাক্ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং চক্ষু বহির্গত হইল। বৎসরান্তে চক্ষু আসিয়া ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় উত্তর করিল,—যেমন অন্ধ ব্যক্তি জীবিত থাকে, আমরাও তদ্রূপ ছিলাম। তখন চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল এবং কর্ণ বহির্গত হইল। বৎসরান্তে কর্ণ আসিয়া পুনরায় ঐরূপ প্রশ্ন করিলে অপর ইন্দ্রিয়গণ উত্তর করিল,—বধির মনুষ্যের মত আমরা ছিলাম। অনন্তর মন উৎক্রমণ করিল। বৎসর-শেষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে অন্য

ইন্দ্রিয় সকল উত্তর করিল,—যাহাদের মন বিকসিত হয় নাই এরূপ শিশুগণ যেমন জীবিত থাকে, আমরাও তদ্রূপ ছিলাম। ইহা শুনিয়া মন শরীরে প্রবেশ করিল। তৎপরে প্রাণ উৎক্রমণের ইচ্ছা করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলই চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং প্রাণকে বলিল—হে প্রাণ, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি স্থির থাক।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল,—আমার অন্ন (ভোজনীয়) কি হইবে? বাগাদি ইন্দ্রিয় উত্তর করিল,—পশু-পক্ষী কুকুরাদি প্রাণীর অন্নই তোমার অন্ন। কারণ তোমার অধিষ্ঠানেই সমস্ত প্রাণীর ভোজনাতি-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অতএব সমস্ত অন্ন প্রাণেরই অন্ন অর্থাৎ ভোজ্য। পুনরায় প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল,—আমার বস্ত্র কি হইবে? তদুত্তরে ইন্দ্রিয়গণ বলিল,—জলই তোমার বস্ত্র। ভোজনকারী ব্যক্তি ভোজনের পূর্বে ও পরে জল গ্রহণ করে; সুতরাং উহাই ভোজনের আচ্ছাদন-স্বরূপ।

আরুণির পুত্র শিক্ষিতাভিমানী শ্বেতকেতু পাঞ্চল-দেশস্থ লোকগণের সভায় গমন করিলে জীবনের পুত্র প্রবাহন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করেন,—প্রজাসকল অন্তকালে কোথায় যায় এবং পুনরায় কিরূপে এখানে আসে? দেবযান ও পিতৃযানের পরস্পর বিয়োগস্থান কোথায়? পিতৃলোক পূর্ণ হয় না কেন? পঞ্চম আছতি দ্বারা হোম করিলে পর জীব ‘পুরুষ’ সংজ্ঞা কিরূপে প্রাপ্ত হয়? শ্বেতকেতু উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া নিজ পিতার নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পিতাও উত্তর প্রদানে অসমর্থ হন।

তৎপরে প্রবাহন রাজা জৈবলির সভায় গমন করিয়া উক্ত প্রশ্নসকলের মীমাংসা করেন। তাহার মর্ম—অগ্নিতে আছতি প্রদানের ন্যায় দু্য, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পঞ্চ আছতি দ্বারা পুরুষের উৎপত্তি হয়। দেহরূপ পুরীতে প্রবেশ করায় জীবের ‘পুরুষ’ সংজ্ঞা। জীবগণ কর্মফলের ভোগার্থ দু্য অর্থাৎ আকাশ, পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে কর্মভোগ-উপযোগী শরীর প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যমপুরীতে জীবের কর্মানুযায়ী বিচার হইয়া গেলে কিছুকাল যমরাজের শাসন দণ্ড লাভ করিয়া আকাশে আসে। আকাশ হইতে মেঘে উপস্থিত হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলে বারিধারা-সহ মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া শস্য-ভিতরে উৎপন্ন হয়। উক্ত শস্য পুরুষের ভোজন হইলে পর রেতঃরূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং যথাকালে পাঞ্চভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম পঞ্চাগ্নি বিদ্যা।

যাঁহারা শ্রদ্ধা ও তপঃ এই উভয়ের উপাসনা করেন অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া সংসার ত্যাগপূর্বক বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন, তাঁহাদের প্রাণত্যাগের পর তাঁহারা প্রথমে অর্চি অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তথা হইতে যথাক্রমে দিবসাত্তিমানী দেবতা, গুরুপক্ষাভিমানী দেবতা, উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন; বিদ্যুৎলোকে এক অমানব আগমন করিয়া উক্ত জীবকে ব্রহ্মসমীপে উপনীত করেন। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে “অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লযগ্নাসা উত্তরায়ণম্” শ্লোকেরও এই তাৎপর্য্য। এই মার্গের নাম দেবযান।

আর যে-সকল ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া যজ্ঞ দান ও পুষ্করিণী খনন, কুপখনাদি কার্য্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া তত্তৎকার্য্যেই আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের প্রাণনাশ হইলে প্রথমে ধূম, তৎপরে যথাক্রমে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। চন্দ্রের নাম সোমরাজ। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া কস্মিক্ষ্যান্তে ঐ মার্গদ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্ম লাভ করেন। প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে ধূম, ধূম হইতে অগ্নি, অগ্নি মেঘরূপে বর্ষণ করে। উক্ত জীব বর্ষা হইতে ধান্যাদি শস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষের ভোগ্য হয় এবং পুরুষের বীর্য্যসহ স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম ধূম্রযান। এই মার্গ অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এই সকল জন্মগ্রহণকারী জীব উত্তম আচরণশীল হইলে ব্রাহ্মণাদি উত্তম যোনি এবং নিকৃষ্ট আচরণদ্বারা কুল্লুরাদি অধম যোনি লাভ করে। এই ধূম্রমার্গে গমনশীল জীবের উন্নতির আশা কম, বারম্বার নানা যোনিতে ভ্রমণ হইতে থাকে। এই সংসার-গতিতে ভ্রমণশীল ব্যক্তি যদি সাধু-সঙ্গক্রমে নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহার বাস্তব মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

* * *

শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা

(৫-১০-১৯৯৮ তারিখে শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে ভাষণ)

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।
 চক্ষুরক্ষ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
 নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
 কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
 হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
 গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে॥
 তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
 বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥
 বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
 কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবতৌ নমো নমঃ॥
 নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্জেব নরোত্তমম্।
 দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
 তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
 অপারসংসার-সুমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥
 বাঙ্গকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

আজ আমাদের এক বিশেষ অনুষ্ঠান। আজ হতে চাতুর্মাস্যের ব্রতের মধ্যে অন্তিম মাস কার্তিক ব্রত, উজ্জ্বা ব্রত বা দামোদর ব্রত আরম্ভ। আজ দিনটী হচ্ছে শারদীয় রাসযাত্রার দিন। এই দিন আমাদের বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়, আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোভাব বা বিরহতিথি। তজ্জন্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কাছেই আমাদের সাধনভজন-বিষয়ে যাতে আগ্রহ-উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, সেইজন্য কৃপা প্রার্থনা করেই আমরা আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করছি। তিথিটি ‘বিরহতিথি’। ‘আবির্ভাব-তিথি’ ও ‘তিরোভাব-তিথি’ গৌড়ীয় গুরুবর্গের নিকট প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। তাহলেও সাধারণ মানুষের একটা চিন্তা সবসময় থেকে যায়,—যতদিন গুরুদেব প্রকট আছেন, ততদিন তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে। আর গুরুদেব যখন অপ্রকট হন বা লীলা সংগোপন করেন, তখন আমরা সব প্রায় তাঁকে ভুলে যেতে চাই। এই পার্থক্যটা ঘুচে যায়, যদি আমরা নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তৎপর থাকি। হরি-গুরু-বৈষ্ণব যদি আমাদের সব সময়ের জন্য স্মর্তব্য, তাহলে কোন সময় তাঁদেরকে ভুলা চলবে না। আর তা যদি তাৎকালিক ব্যাপার কিছু হয়, তবে অনায়াসেই ভুলে যাওয়া যাবে।

ভগবান্কে ভুলেই তো আমাদের যত দুর্গতি—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্যায়োন্মৃতিঃ” ভগবান্কে ভুলে যাওয়াটাই আমাদের দোষের কারণ হয়েছে, দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। আর গুরুবৈষ্ণবকে যদি ভুলে যাই, তবে ভগবান্কে স্মরণ করবার সুযোগ আর কোনদিন আসে না। সেইজন্য সর্ব্বাণ্ডেই গুরুবৈষ্ণবকে স্মরণ করতে হবে। তাঁদের কৃপাপ্রার্থনা করেই ভগবান্ শ্রীহরির সেবা প্রার্থনা করতে হয়—এই কথাই শাস্ত্রে বলা আছে।

গুরুদেব যতদিন প্রকট থাকেন, ততদিন সাধনভজনের ব্যাপার যতটুকু জানতে ইচ্ছে হয়, তার থেকে বেশী বোধ হয় ইচ্ছা হয়—কেমন করে বাঁচব, কেমন করে খাব, কেমন করে পরব,—এই সমস্ত সমাধান। কিন্তু যাঁরা বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃত সাধক, তাঁদের কাছে ঐ খাওয়া, দাওয়া, পরাটা বাস্তবজিনিষ নয়। সাধনভজনের জিনিষটাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বৃহদ্বস্তু। গুরুদেব বলছেন,—আপনারা সবাই হরিনাম করুন, গায়ত্রী-মন্ত্র প্রভৃতি জপ করুন, ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা করুন, ঠাকুরের পূজা-অর্চন করুন, এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাধনভক্তি থেকে আরম্ভ করে আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এখন কাকে বলে সাধনভক্তি, কাকে বলে ভাবভক্তি, আর প্রেমভক্তিটাই বা

কি, তা সম্বন্ধে বাস্তবধারণা আমাদের বোধ হয় নাই। যদি থাকত, তবে ঐ চিন্তা নিয়েই তো বাস্তব থাকতাম আমরা। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। তাহলে কি করব? “দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত। জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি’ হত।। হায় হায় নাই ভাবি অনিত্য এ সব। জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব।।”—শাস্ত্রকারগণ তো জানিয়ে দিচ্ছেন, বৈষ্ণব-মহাজনগণ তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ দেহের নশ্বরত্ব। কিন্তু আমাদের তো সাবধান হওয়ার কোনরকম অবস্থা নাই।

তথাপি চেষ্টা করতে হবে, ধৈর্য্য রাখতে হবে। তাঁদের যে বাণী, তা অনুসরণ করে চলতে হবে—এটাই বড় কথা। একই কথা তো বার বার শুনি। কিন্তু শুনেও তো মনে রাখতে পারি না। আবার মনে রাখাও তো বড় জিনিষ নয়—বাস্তবে সেটা অনুশীলন হওয়া দুরকার, অভ্যাস হওয়া দুরকার, সে-সব মনে চলা দুরকার—এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। শুনে শুনে শুনে শুনে শেষকালে আর মনে থাকে না। প্রথম প্রথম একটু আগ্রহ দেখা যায়। যারা প্রথম সাধন-ভজন পথে আসেন, তাদের প্রথম-মুখে একটু উৎসাহ থাকে। পুরোনো হয়ে গেলে সে-সব আবার ‘গায়ে সওয়া’ হয়ে যায়। তখন আর ততটা আগ্রহ থাকে না। এখন এই জিনিষটা কি ধরণের হওয়া উচিত? ‘সাধন-পথ’ তাহলে কি হবে? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট বাণী, যার নাম ‘শিক্ষাপ্তক’ তার নাম আগে ছিল ‘সাধন-পথ’। তাহলে সাধন-পথে থেকেও সাধন-পথটা ভুলে যাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সেই শিক্ষাপ্তক আমরা রোজই তো আবৃত্তি করছি, তাহলে আবার ভুল হয় কেন? তাহলে উৎসাহ-ধৈর্য্য কমে যাচ্ছে কেন? এতে প্রমাণিত হয়, সেই সব সাধন অন্তরনিষ্ঠার সাথে হচ্ছে না।

আবার যদি বেশী অভ্যস্ত হই, তাতেও ভুলে যেতে পারি। এও একটা ভুলে যাওয়ার কারণ। কিন্তু বেশী অভ্যাসের জন্য ভুলে যাচ্ছি, না কম অভ্যাসের জন্য ভুলছি—এটা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। ‘শ্রীকৃষ্ণনাম-সকীর্তন জয়যুক্ত হন’—মহাপ্রভু এইখান থেকে তাঁর শিক্ষাপ্তক আরম্ভ করলেন। আর তা কাল্পাকাটিতে শেষ হল। দুরকম। এখন কাল্পাকাটি কিরকম করব? কারও অভাবে তো কাল্পাকাটি করতে হয়—কিছু বিশেষ প্রাপ্তির বিষয়ে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে ধারণা কই আমাদের?

গুরুবৈষ্ণবকেও চাই, আবার ভগবানকেও চাই। সব থেকে বড় আশা তো পোষণ করে আছি। কেন? গুরুবর্গ বলেছেন—অল্প চাহিদা থাকলে তোমাদের হবে না। অর্থশাস্ত্র পড়তে গেলে সেখানে সীমিত আকাঙ্ক্ষার কথা বলা আছে। কিন্তু পরমার্থক্ষেত্রে সীমিত আকাঙ্ক্ষার কথা নেই। কেন নাই? “নান্নে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্”—এই কথা বলা আছে। এখানে অল্পেতে সন্তুষ্ট হলে হবে না। তাহলে ঠকে যাবো। “ভূমৈব সুখম্”—এই কথা যদি সত্য বলে মনে করি, তবে তার জন্য তো যত্ন করতে হবে। শাস্ত্র বলছেন—যদি যত্ন করেও না পেরে উঠি, তখন আমি কি করব? ‘যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ’। কিন্তু আমার যত্নটা চরম হয়েছে কিনা, সেই বিচারটা কে করবেন? কিংবা আমার সাধনভজনে কতটুকু যত্নগ্রহ আছে, সেটা

কে জানিয়ে দিবেন, কে বলে দিবেন? এগুলিই আলোচনার প্রয়োজন। কতটুকু চেষ্টা করলে আমরা প্রকৃতই সফলতা লাভ করতে পারি—সেই অনুসন্ধান থাকা প্রয়োজন।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,—প্রতি একাদশীতে হরিবাসরে ১৫ দিন পরে আমাদের সাধন-ভজন কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে, তার একটা হিসাব ও Record রাখতে হবে। কিন্তু তা তো করা হচ্ছে না। আর সেই Record কি কাগজে পত্রে থাকবে, না হৃদয়ে থাকবে? যদি হৃদয়ে থাকে, তবেই যত্নটা যথেষ্ট পরিমাণে হবে।

বিগত পক্ষে আমি কতটুকু হরিনাম করলাম, ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করলাম, কতটুকু সেবা করলাম, এগুলির হিসাব রাখার একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। তাহলেই বুঝা যাবে, আমার অগ্রগতি হচ্ছে, না কমছে। আবার এমন কতগুলি কথা আছে, যা শুনলে আমরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি। যেমন, “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধাচিঙে করয়ে উদয়।।” একথা শুনে আমার সব হয়ে গেল। নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছি। আমার হবে, কি হবে না—এসব নিয়ে সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু সন্দেহ-সংশয় থাকলে তো তত্ত্ববস্তুর লাভ হবে না। অত হরিকথা শুনলেন শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজ, কিন্তু তার ভাবধারা ঠিক আছে—কেটে যায় নি। আমাদের যদি তা কেটে যায়, তবে কি হবে? যতটুকু শুনছি, শিখছি ও করছি তারপরেও তো এগোতে হয়।

একটা কথা সবসময় চিন্তা হয়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে সব উপদেশগুলো করেছেন, সে-সবের যোগ্য কিনা আমরা? সব থেকে বড় কথা—সে সব উপদেশগুলো আমরা মনে-প্রাণে বুঝি কি না? বা বুঝবার চেষ্টা করি কিনা? ‘ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়’—একটা কথা আছে। আমাদের সকলেরই তা মুখস্থ আছে। “Where there is a will, there is a way.” কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইচ্ছা থাকলেও উপায় হচ্ছে না। সত্যিই কি তাই? আশা আকাঙ্ক্ষা যদি আমার থাকে, সরলতা থাকে—তবে তো নিশ্চয়ই হয় ও হবে। কিন্তু কতটুকু আমি চেষ্টা করছি, আর কতটুকু চেষ্টা করে আমি শেষ কর্তব্য সমাপন করছি। আমি যেটা শেষ মনে করছি—সেটা সাধনভজন-ক্ষেত্রে হয়ত আরম্ভ। তাহলে তো অত সহজ নয় ব্যাপারটা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই স্বয়ং বলছেন—“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন। দাস করি দেহ মোরে বেতন প্রেমধন।।” এই কথা মাথায় কি ঢুকবে আমাদের? শাস্ত্রে বলা হল—“পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ”—পঞ্চাশের উর্দ্ধে বাস হয়ে গেলে হরিভজনের জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে। আবার প্রহ্লাদ মহারাজের বিচারে সেই ‘পঞ্চাশোদ্ধং’ এর কোন হিসাব নাই। একশ বছর পরমায়ু ধরা হলে দিনের বেলায় ঘুমেতেই আমাদের পঞ্চাশ বৎসর পার হয়ে যাচ্ছে। আর পরমায়ু পঞ্চাশ বৎসর হলে, পঁচিশ বৎসরই নিদ্রায় চলে যাচ্ছে। অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে পঁচিশ বৎসর। সেই পঁচিশ বৎসরেই তো তাহলে আমাদের সাধনভজনে একনিষ্ঠ হওয়ার কথা আছে।

যাঁর কোনরকম প্রাপ্তি কিছু হয়েছে, তিনি কোনদিনই তা বলবেন না, বলেন না।

কেন? পরমার্থ তো। পরমার্থ—পরমধন, এ তো বলবার বিষয় নয়। আর যারা বলেন, আমাদের এত টাকা আছে, এত লাখ টাকা আছে—তারা ‘ব্যাঙের আধুলী’-সর্বস্ব। যারা বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী, তারা কখনও সেই পরমধনের কথা বলে বেড়ান না। বললে পরেই তো মুশকিল। ভাগবত তো বলছেন—অর্থ রোজগার করাও কষ্ট, অর্থ সংরক্ষণ করাও কষ্ট, অর্থ খরচ করাও কষ্ট। সেই অর্থের অর্থ নিয়েই তো ঠেলাঠেলি। কার জন্য? বললে—হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য। তাহলে আমরা? আমরা তো তাঁদের সেবক-সেবিকা। এই কথা তো শাস্ত্রে বলা আছে। কিন্তু আমরা বুঝি কই? আপনারা তো সবসময় ‘হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা’, ‘হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা’ বলেন—সে সব বলতে বলতে তো মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনাটা কই? একই কথা রোজ ভাল লাগে না মশাই। গল্প-টল্প করবেন তো একটু,—শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু শুনতে ভাল লাগা দিয়ে কি হবে? গল্প গিললে কোন লাভ হবে না। চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা, চৈতন্যচরিতামৃতের কথা, তত্ত্বসিদ্ধান্ত—এসব আগে শিখো, বুঝো। তা না হলে সাধনভজন হবে না। মানে? ভাল কোনটা, মন্দ কোনটা—আগে শিখতে বুঝতে হবে। শিখলেই হয়ে যাবে? সেটা কি জীবনে অভ্যাস করতে হবে না, সাধন করতে হবে না? (ক্রমশঃ)



আজব দুনিয়া

আজব দুনিয়ার আজব ঘটনা বর্ণিব তাহা কতই আজ।
 দুনিয়ার সব ব্যাপার যে দেখি চক্ষু হইল চড়ক গাছ।।
 নারী-পুরুষের মুখোশে জীব করছে ‘অহং’ অভিমান।
 কামের মাঝারে আছেন যেন বিশ্বের পালক ভগবান।।
 ভ্রান্ত মানব জড়সুখ লাগি ‘মরীচিকার পিছনে ধায়।
 কিবা জবাব দিবে হে তখন যখন যাবে যমের আলয়।।
 জড়কবি আর সমাজসেবীর মহামানবের পরিচয়।
 দুষ্কৃতি নর চাইছে কেবল মিথ্যার হউক সঁদাই জয়।।
 সমাজসেবীর সেবার ধাক্কা দরিদ্র আজ নারায়ণ।
 অনাথের নাথ লক্ষ্মীপতি কিনা দ্বারে দ্বারে ভিখারী হন।।
 পশু বধ করি’ কন্সী দেখায় জীবে প্রেমের নিদর্শন।
 ছাগল-মুরগী-মৎস্যাদি বুঝি জীবের ভিতরে গন্য নন?
 ঋণের বোঝা যাহাদের ঘাড়ে, তারাই নাকি মহাজন।

শমনের দূত আসবে যখন কোথায় রহিবে জড়ধন?
 জড় বিজ্ঞানে হইয়াছে নাকি পৃথিবীর যতই উন্নতি।
 (তবে) হিংসায় মেতে একদেশ কেন অন্য দেশের করছে ক্ষতি?
 মনোধর্মের তুলাদণ্ডে আজ মাপা হচ্ছে যত সাধুজন।
 গণগডালিকায় আস্তিকেরা পায় জ্ঞানীগুণী-পাদ্য মান ॥
 চার আনারই পুঁথি আজকাল হয়েছে ভাই বেদ-পুরাণ।
 যেহেতু তাহাতে উল্লেখ রয়েছে দুঃশাসনের রক্তপান ॥
 মানব না পায় সঠিক পথ অবতারের উপদ্রবে।
 নিরীশ্বরবাদী আর কত কাল খেলবে খেলা হে এই ভবে?
 হুঁকো যে টেনেও হ'তে পারে সব কলিযুগের অবতার।
 শাস্ত্র-বিরোধী আচার করেও ভাবছে বুঝি পাবে নিস্তার ॥
 ভেলকিবাজি দেখিয়ে আবার কেউ হয়েছেন অবতার।
 অবতারের জ্বালায় জ্বলে ধর্ম খুঁজে পথ পলাবার ॥
 বৌদ্ধ-কঙ্কির কেহ অবতার, কেহ সেজেছেন কৃষ্ণ স্বয়ং।
 মায়ার নফল অভাগা জীবের ব্রহ্ম হওয়ার যতই চং ॥
 'যত মত' পছন্দী উড়াইতে চায় মহাজনের অভ্রান্ত পথ।
 সমন্বয়বাদীর হস্তে পড়িয়া ধর্মের আজ যাতনা কত ॥
 তোতা কহেছেন, আউল-বাউলাদি তেরোটি অপসম্প্রদায়।
 এর বাহিরেও বহুত আছে লেখা জোখা আর কতই যায় ॥
 ভোগের চশমা চোখে দিয়ে ভোগী দেখছে "সাধু কেবল ভোগী"।
 জ্ঞানিগণ দেখে ত্যাগ-চশমায় "সাধুরা হয় সবাই ত্যাগী" ॥
 ভোগী আর ত্যাগী উভয়েই বদ্ধ শাস্ত্রে আছে বহু প্রমাণ।
 কৃষ্ণের সেবক মুক্ত কেবল জীবে দেন মুক্তির সন্ধান ॥
 সঠিক মতে শাস্ত্র বিচারিলে দেখতে পাবে যুগের হাল।
 সাধুজন বিনা অন্যান্য সবাই বৃথা কেমন কাটাচ্ছে কাল ॥
 হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণ সত্য আজব এ-দুনিয়ার মাঝে।
 এ অধম দাস তাদের চরণে কৃপা ভিক্ষা তাই সদা যাচে ॥

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

“যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।”

—প্রভুপাদের পত্রাবলী

জীবে নয়, ঈশ্বরেই প্রেম

শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ‘কেবলাদ্বৈতবাদ’ প্রবর্তন করেছিলেন, সেই উষর মরুভূমির উপর অনেকপ্রকার কণ্টকবৃক্ষই অনুকূল-ক্ষেত্র পেয়ে গজিয়ে উঠেছে। ‘জীবই ঈশ্বর, সুতরাং জীবে প্রেমই ঈশ্বর-সেবা’—এইপ্রকার মতবাদ সেই তাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশঙ্কর “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ” এই অবৈদিক ও কাল্পনিক বিচারের প্রবর্তক হলেও, তিনি নিজে কখনও ঐপ্রকার ব্রহ্মের ধ্যান পরিত্যাগ করে ‘জীবে প্রেম’-রূপ অদ্ভুত ঈশ্বর-সাধনার পথে চলেননি বা ঐপ্রকার সাধনার কথা বলেননি। তিনি সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী শ্রীভগবানের অর্চামূর্তি-পূজা, শ্রীনাম-অনুশীলন, স্তবস্ততি, ধ্যান, বৈরাগ্য, সাত্ত্বিক জীবনযাপন, আমিষাহার-বর্জ্জন, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কৃচ্ছসাধন প্রভৃতিই কঠোরভাবে অনুশীলন করেছেন এবং তা প্রচারও করেছেন। তিনি “ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ মৃত মতে” প্রভৃতি বলে জীবকে পরোক্ষভাবে হলেও শ্রীগোবিন্দকেই ভজনার উপদেশ করেছিলেন—‘জীবে প্রেমই ঈশ্বর-সাধনা’ এইপ্রকার অশাস্ত্রীয় উপদেশ করতে উদ্বুদ্ধ হননি।

শ্রীশঙ্কর স্বরূপতঃ স্বয়ং শিবঠাকুর। তিনি ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়েই কালিযুগে অসুরমোহনের জন্য ঐপ্রকার মতবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপর অপিত সেই দায়িত্বের কথা সকলকে জানিয়েছেন,—

“আচার্য্যের দোষ নাই, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।

অতএব কল্লনা করি’ নাস্তিক শাস্ত্র কৈল।।”

“তার দোষ নাই, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।

আর যেই শুনে, তার হয় সর্বনাশ।।”

শুধু তাই নয়, পদ্মপুরাণে পার্বতী-দেবীর কাছে শ্রীশিবের নিজেরই দেওয়া এক ঘোষণায় দেখা যায়,—“মায়াবাদমসংশাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমুচ্যতে। মায়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা।।” অর্থাৎ, ‘হে দেবি! আমি কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্তিতে ‘মায়াবাদ’-নামক এক অসৎ শাস্ত্র প্রচার করব। অসংশাস্ত্র এই কারণে যে, ঐ মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদ। বৌদ্ধগণ ‘বেদ’ অস্বীকার করেন—তা’রা ‘ব্রহ্ম’কে মানেন না, তারা ‘শূন্য’ থেকেই সবকিছু এসেছে এবং সেই শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি’—এইপ্রকার ‘শূন্যবাদ’-প্রচার করেন। এতে তাদের নাস্তিকতা দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝা যায়। আর, আমি বেদকে স্বীকার করব, বেদের অস্তিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠাও করব—তবে ব্রহ্মকে সরাসরি ‘শূন্য’ না বলে ঘুরিয়ে ‘নিরাকার’ বলব, ‘এক ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ বলে সেই নিরাকার ব্রহ্মেই লীন হয়ে যেতে পারলে জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সেটাই ‘মুক্তি’—এইপ্রকার প্রচার করব। মানে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৌদ্ধদের ঐ শূন্যবাদই বেদ-আশ্রয়ের ছল করে বলে বেড়াব।

তাহলে আমার প্রচারিত সেই ‘মায়াবাদ’ আসলে এক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদই হ’ল কিনা?’ যদি বল ভগবান্ শ্রীশিবকে ঐরকম একটা বাজে কাজ করতে আদেশ করলেন কেন? তা’ও বলি—অসুর-মোহনের জন্য। অসুররা যাতে পরমপবিত্র ভগবদ্ভক্তিকে কলুষিত না করতে পারে—ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ে ভগবান্কে ও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণকে বিরক্ত না করে—ভগবানের ধামে গিয়ে তা’রা যেমন স্বর্গে গিয়েও স্বভাববশে নানা উৎপাত করে, সেইপ্রকার জঞ্জাল না সৃষ্টি করে—তা’রা বরং সংসারে থেকেই ভগবদ্নিম্ন হয়ে সংসার-প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন থাকুক। সেইজন্যই ‘ভগবান্ নিরাকার, তাঁর ধাম, নাম, গুণ, লীলা, পরিকর বলে আসলে কিছুই নাই’ ইত্যাদি বলে তাদেরকে ঠকানো। আর এইপ্রকার প্রচারে একশ্রেণীর লোকেরা, যাদের মধ্যে কোন না কোনপ্রকার আসুরিকতা আছে, তারা সব লাফিয়ে উঠে—‘ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্,’ বলে বগল বাজাতে থাকে—নিজেদেরকেই ‘ঈশ্বর’ ‘ব্রহ্ম’ বলে ভেবে নিয়ে প্রকৃত ‘ঈশ্বর’কে অস্বীকার করে সংসার-কার্য্যে ডুবে থাকে।

হ্যাঁ, পাঠকগণ, ব্যাপারটা আসলে ঠিক্ তাই। আর এইভাবেই এবং এই সূত্র ধরেই ‘জীবই ঈশ্বরের বহু রূপ, সুতরাং জীবে প্রেমই ঈশ্বরপ্রেম তথা ঈশ্বরসেবা’—এইসমস্ত কথা বাজারে চালু হয়েছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তা নিশ্চয়ই এখন কিছু বুঝা যাচ্ছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে ঋষি-মুনিগণ যে-ভগবানের আরাধনা করেছেন, এবং ভগবানের আরাধনার নানা উপদেশ প্রদান করেছেন, সেখানে কোথাও ঐপ্রকার কথা উপদ্রষ্ট হয়নি। তা’রা সকলে সংসার ত্যাগ করেছেন, সন্ন্যাসী হয়ে নিভৃতে ভগবৎ-ধ্যান করেছেন। কিন্তু কলিযুগে এই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ/উনবিংশ শতাব্দীতে এ কোন্ ব্যক্তি উদয় হলেন—বাহ্যে যাঁর সন্ন্যাস-বেশ, অথচ আমিষ-ভোজী, আর মুখে বলছেন ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’, ‘সংসার ধর্ম বড় ধর্ম’ ইত্যাদি ইত্যাদি? মানে, এইগুলো সেই লোক-ঠকানো কথা—যাতে তা’রা চিরকাল সংসার-ধর্ম্মেই আবদ্ধ থাকে। এটা নিশ্চয়ই একজন সন্ন্যাসীর কার্য্য নয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য জীবের সংসারের প্রতি মোহ দূর করাতে “মোহ-মুদগর”, “মোহ-কুঠার” প্রভৃতি রচনা করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণ করে উপদেশ করেছেন—“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।” সুতরাং কোন সন্ন্যাসীই পূর্বে এযাবৎ জীবকে সংসারাসক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেননি। আবার, সংসারে ক্রম-বর্দ্ধমান হানাহানি ও হিংসা-দ্বेष পরিত্যাগ করাতেও শাস্ত্রীয় অনেক ভাল ভাল উপদেশ আছে, তার জন্য “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর”—এইপ্রকার অশাস্ত্রীয় ও মন-গড়া কথার অবতারণা করারও কোন প্রয়োজন হয় না। এর দ্বারা বরং সাধারণ জীবের জন্য প্রকৃত অনুসন্ধেয় পরমার্থের পথই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কলির প্রভাবেই এমন সব নূতন নূতন দৌরাভ্য এই ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছে। নূতন কিছু করতে গিয়ে পায়ের চপ্পল মাথায় তুলে ধরার ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলেছেন—“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ” (গীঃ ১৬।৬)—‘এইজগতে দৈব-স্বভাব ও আসুর-স্বভাব, এই দুইপ্রকার জীবসৃষ্টি আছে।’ সুতরাং ভগবানের এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জগতের সমগ্র লোক স্বভাব-অনুসারে ‘দৈব’ ও ‘আসুর’ এই পরিষ্কার দুটি ভাগে বিভক্ত। ভগবান্ এই দুই স্বভাবের লোকের বিভিন্ন লক্ষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, এক শ্রেণীর লোক স্বাভাবিকভাবেই শ্রীভগবান্কে মানেন, তাঁকে ভক্তিযোগে প্রেমের সাথে তাঁর আরাধনা করে থাকেন—এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ‘দৈব’-স্বভাবসম্পন্ন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁদের হৃদয়ে বসে ঠিক ঠিক বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, অথবা শুদ্ধ সাধুসম্প্রদায়ের মাধ্যমে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করান—যাতে তাঁরা পথদ্রষ্ট না হয়ে তাঁর কাছেই আসতে পারে—“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।।” (গীঃ ১০।১০)। সেই বুদ্ধিযোগে তখন যাবতীয় শুদ্ধ সিদ্ধান্ত তাঁরা অবগত হতে পারেন—“জীব ভগবানেরই অংশ এবং তাঁর নিত্যদাস। জীব মুক্ত হলে পর সেই নিত্যদাসত্বেরই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেটাই শাস্ত্রীয় বিচারে ‘মুক্তি’। অন্যান্য সমস্ত দেবদেবীগণ সেই শ্রীভগবানেরই ‘কন্মসচিব’। ব্রহ্মা-শিবাদিগণও ভগবৎমায়ায় মোহিত হয়ে তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না। ব্রহ্মা-শিব-দুর্গা প্রভৃতির অকপট কৃপা লাভ হলে জীব শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, কৃষ্ণভক্তির মহিমা প্রভৃতি জানতে পারেন” ইত্যাদি। এবং সাথে সাথে তাঁরা যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত থেকেও মুক্ত থাকতে পারেন,—“জীব কখনই ঈশ্বর নয়, ‘ব্রহ্ম’ কখনই পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েন না, জীব ‘ব্রহ্ম’ নয়, ‘জীবাত্মা’ ‘পরমাত্মা’ একই বস্তু নয়, ‘জীব—শিব’ বা ‘দরিদ্র-নারায়ণ’ এগুলি অত্যন্ত বাজে কথা, ভগবান্ কখনই নিরাকার নন, যেই কালী সেই কৃষ্ণ নয়, শ্রীনারায়ণের সাথে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে সমান মনে করা পাষণ্ডতা” প্রভৃতি।

আর অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা আছে, যাঁদের স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নেই, আবার অধর্ম্ম হতে নিবৃত্তিও নেই। তাঁরা দম্ভ, অভিমানে মগ্ন হয়ে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ‘কাম’-উপভোগেই মগ্ন থাকে। তাদের কাছে ঐ কাম-উপভোগই পুরুষার্থ। ‘ঈশ্বর’ বলে তাদের কাছে কিছুই নেই। এইপ্রকার লোকেরা আসুরিক-শ্রেণীভুক্ত। আর তাঁরা যখন শুনে, ‘জীবই ঈশ্বর, পৃথক্ভাবে ঈশ্বরকে খুঁজার দরকার নেই এবং জীবের প্রেম করলে সেটাই হয় ঈশ্বর-সেবা’, তখন তাঁরা ভাবে, ‘বাহ, এটা আমাদের একদম মনের মত কথা—আমরা তো এটাই চাই।’ তাঁরা এইভাবে হয় ‘ঈশ্বর নাই’ না হয় ‘আমিই ঈশ্বর’ অথবা ‘জীবমাত্রই-ঈশ্বর’ প্রভৃতি বলে ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্বই অস্বীকার করে। এইসব ব্যক্তিদের ঈশ্বর মানা আর না-মানা একই কথা।

কিন্তু কাচ কখনও মণি হতে পারে না। মণি সম্বন্ধে যাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তাদের কাচকে ‘মণি’ বলে ঠকাতে কতক্ষণ? “ঐ হ’ল, কাচই মণি”—এরকম গায়ের জোরে, গলার জোরে বা দশচক্রে কাচটাই মণি হয়ে যেতে পারে না। এর জন্য

পরীক্ষা আছে, পরীক্ষার স্থলও আছে। ঠিক সেইপ্রকার, জীবে প্রেম করলেই তা ঈশ্বর-সেবা হয়ে যায় না। জীবে প্রেম—এক নির্ভেজাল ব্যভিচারিতা। ‘প্রেম’ বিষয়টী অত্যন্ত গভীর—সাধারণ মানুষের কামাত্মক ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। জীবের পরম্পরের মধ্যে তথাকথিত যে ‘প্রেম’, সেটা শাস্ত্রীয় বিচারে প্রকৃতপক্ষে ‘কাম’। দুটো জিনিষকে বাইরে এক মনে হলেও, আসলে তাদের মধ্যে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ঐ সেই ‘কাচ’ আর ‘মণি’র মত। পরীক্ষাস্থলেই যেমন তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে, তেমনই ‘কাম’ আর ‘প্রেম’ের পার্থক্য শাস্ত্রবিচারেই মাত্র জানা যায়।—(ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবাদান্ত তপস্বী

* * * *

যোগীদের পাঠ্য “গীতার” আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভক্তি-বিরোধী

(পূর্বপ্রকাশিত ৫৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৮৭ পৃষ্ঠার পর)

“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”

এই শ্লোকে ভক্তগণের উপাস্য ভগবান স্বয়ং—“পুরুষোত্তম”—নামের সর্বোৎকর্ষতা নিজমুখে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন—আমি ‘ক্ষর’ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার অতীত, ‘অক্ষরাৎ’—অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্ম হতেও উত্তম, এবং পূর্বোক্ত ১৫।১৭ শ্লোকানুসারে ‘ক্ষর’ ও ‘অক্ষর’ এই দুইটি তত্ত্ব হতে ভিন্ন উত্তমপুরুষ যিনি ঈশ্বর (সকলের প্রভু) ও ত্রিজগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সমগ্র লোকের ধারণ-পালন কর্তা—সেই ‘পরমাত্মা’ পুরুষ হ’তেও আমি উত্তম,—সেইহেতু আমি জগতে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’-নামে প্রসিদ্ধ।

ইহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্ম-উপাসক জ্ঞানিগণ অপেক্ষা পরমাত্মা-উপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, আবার সেই যোগিগণ অপেক্ষাও ভগবৎউপাসক ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তম ভগবান—ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়স্বরূপ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন,—“অক্ষর পুরুষের তিনটি প্রকাশ, সামান্য প্রকাশ—‘ব্রহ্ম’, উত্তম প্রকাশ—‘পরমাত্মা’, ও সর্বোত্তম প্রকাশ—‘ভগবান’।” ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান—এই তিন তত্ত্বের উপাসকগণের সাধন-ভেদ ও ফলের ভেদ দর্শন হ’তে ভেদের বিচার লক্ষিত হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের উপাসকগণের সেই সেই প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। ‘পুরুষোত্তম’-তত্ত্বজ্ঞাতার কর্তব্য কি? তদুত্তরে ভগবানের উক্তি—হে ভারত! যিনি নানা মতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হ’য়ে আমাকে ‘পুরুষোত্তম’ তত্ত্বরূপে জানেন, তিনি সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) এবং সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে থাকেন।” (গীঃ ১৫।১৯) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গীতার উক্ত (১৫।১৯) শ্লোকের টীকায় যাহা লিখেছেন, তার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ এস্থলে বিবৃত করছি—“শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেও তিনি সর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রের

অর্থ-তত্ত্ব-জ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অন্যে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেও সংমুঢ় অর্থাৎ সম্যক্ মূর্খই—এইভাব। সেইরূপ যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনিই আমাকে সর্বপ্রকারে ভজন করেন। তিনি ভিন্ন অন্যে ভজন করেও আমাকে ভজন করে না—এই অর্থ।’ “শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ” (গীঃ ৬।৪৭)—“মদ্রাত্ চিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণ মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।” আলোচ্য শ্লোকে ভগবান্ যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মা হ’তেও তাঁর স্বরূপের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব তাঁর মাতাকে বলেছেন,—

“মদগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্বগুহাশয়ে।

মনোগতিবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসৌহস্বদৌ ॥

লক্ষণং ভক্তিয়োগস্য নিগুণস্য হৃদাহতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিং পুরুষোত্তমে ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব তাঁর মাতাকে জানালেন যে, তাঁর পুরুষোত্তম স্বরূপেই নিগুণ ভক্তিয়োগ প্রযোজ্য। তিনি বললেন—মাতঃ, আমার গুণশ্রবণ মাত্রই সর্বচিন্তা-নিবাসী আমার অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে যে অবস্থিতি, তা’তে সাগরের প্রতি গঙ্গা-সলিল প্রবাহের ন্যায় আত্মার তথা মনের যে অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিয়োগের লক্ষণ ; পুরুষোত্তম-স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ‘অহৈতুকী’-শব্দের অর্থ বলেছেন—“হেতু বলতে কারণ এবং (ভক্তিব্যতীত) অন্য ফলের অভিলাষ ও বর্জিতা ; স্বপ্রকাশিত্ব ও স্বাভাবিক ফলরূপত্ব-হেতু ইহা জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় নহে, এই ভাব। আর ‘অব্যবহিতা’ বলতে জ্ঞান ও কর্মাদির ব্যবধান-শূন্য যে ভক্তি (অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা-শূন্য এবং জ্ঞান ও কর্মাদির দ্বারা যাহা অনাবৃত) তাহাই নিগুণ ভক্তি—এই অর্থ।”

সুতরাং চিন্মাত্র ব্রহ্মপ্রতীতি—জ্ঞানিগণের অনুভব-বেদ্য। চিদ্বিস্তার রূপ পরমাত্মা—যোগিদের উপাস্য তত্ত্ব ; আর চিদ্বিলাসরূপ ভগবৎ দর্শন কেবলমাত্র ভক্তগুণ ভক্তির দ্বারা পেয়ে থাকেন। ভগবানের গুণ ও স্বভাবের অনুশীলন-দ্বারা তাঁর সুখ-বিধানের নাম ‘ভক্তি’, আর ভগবান্কে সুখ দেওয়ার বৃত্তিটা যাঁর মধ্যে আছে, তিনি ভক্ত। যাঁর মধ্যে বিষয়ভোগ-বাসনা,—তিনি কর্মী ; যাঁর মধ্যে মুক্তি-বাসনা—তিনি জ্ঞানী বা যোগী। ভগবানের অনন্য অপ্রাকৃত গুণ বা স্বভাব তাঁর স্বরূপশক্তি থেকে প্রকাশিত। স্বরূপ-শক্তির দ্বারা যিনি বিলসিত,—তিনি ভগবান্। ভগবানের সাথে প্রীতির ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সাথে প্রীতির ব্যবহার করা যায় না। পরতত্ত্বের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-স্বরূপটি স্বরূপানন্দী; তাহা স্বরূপ-শক্ত্যানন্দী নয়। কিন্তু পরতত্ত্বের ভগবৎস্বরূপটি স্বরূপানন্দী হয়েও স্বরূপশক্ত্যানন্দী। ভক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ভক্তি কখনই

জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি নয়। পরমাত্মায় জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বিলাস থাকায় স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভক্তির প্রকাশ তাঁতে ও তাঁর উপাসকগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। পরমাত্মার উপাসক যোগিগণের ভক্তির প্রতি নিত্যজ্ঞান থাকে না।

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করে বলেছেন,—‘তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়’ (ভাঃ ৩।৯।১৯)—“হে ভগবন্! আপনাতে ‘উপাধি’ ধর্মের সংস্পর্শ না থাকাতে আপনিই পুরুষোত্তম ; ষড়ৈশ্বর্যশালী আপনাকে নমস্কার।” “মহৎ স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, সমষ্টি জীবান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী ও ব্যষ্টি জীবান্তর্যামী পুরুষত্রয় হতেও উত্তম বলে শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম।” জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অধোক্ষজ ও অপ্ৰাকৃতের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে বলেছেন,—“ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই অনুভবনীয়। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে অধোক্ষজ বস্তু ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপাতেই ভক্তি লাভ হয়। * * * ‘অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে’— এই শাস্ত্র বাক্য হ’তে আমরা জানতে পারি, অধোক্ষজ সেবায় অনর্থ নিবৃত্তি হয়। এইজন্য অধোক্ষজ চতুর্ভুজ। তিনি তাঁর অস্ত্রদ্বারা জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি বা অনর্থচ্ছেদন করে থাকেন। অধোক্ষজ-বস্তুতে মর্যাদা-বিচার আছে, সেখানে ঈশ্বর-বুদ্ধি প্রবল। অপ্ৰাকৃত বস্তুটি বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃতবৎ, কিন্তু প্রাকৃত নয়। সেখানে ঈশ্বর-বুদ্ধি নেই— আপন জ্ঞান প্রবল। অপ্ৰাকৃতের বিচারে অনর্থ নেই। সম্যক্ অনর্থ-উপশান্তির পর অপ্ৰাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্ৰাকৃত বস্তুটি দ্বিভুজ মুরলীধর। তিনি বিশ্বজ্ঞের সহিত সেব্য।”

অতএব প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপেরোক্ষ অতিক্রম করে অধোক্ষজ ভূমিকা। অধোক্ষজ ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণু, তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানাভীত বা অতীন্দ্রীয়। সেই অধোক্ষজ—তুরীয় পূর্ণবস্তু, তিনি জীবের বিচারবুদ্ধি-দ্বারা উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তু নন। সেই ভূমিকায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা নিত্য বর্তমান—সেখানে সম্বন্ধজ্ঞান আছে, প্রীতি ও সেবা আছে। কিন্তু যোগিদের অপেরোক্ষ-বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটির বৈশিষ্ট্য নেই, তাই সেখানে সম্বন্ধজ্ঞান, প্রীতি ও সেবার কোন কথা নেই। যোগিদের অপেরোক্ষানুভব-বিচার মূলতঃ প্রাকৃত বিচিত্রতাহীন একটা স্তর মাত্র, তাতে ভগবানের কথা নেই। অধোক্ষজ-বিচারে যোগিগণ প্রবিষ্ট না হওয়ায় তাঁদের অনর্থ উপশান্তি হয় না, তাই তাঁদের বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। অপেরোক্ষ-তত্ত্বে ভক্তিলতার আশ্রয়স্থান নেই। সুতরাং যোগিদের অপেরোক্ষ-ধারণায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অবলম্বিত না হওয়ায় ও তাঁদের মতে অপেরোক্ষবাদই চরম কথা বলে নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাহা ভক্তি-বিরোধী হ’তে বাধ্য। (ক্রমশঃ)

(৪) গীতার ৭।৭ শ্লোক—“মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।” “হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা সর্বোত্তম বা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ; সূতা আশ্রয় করে যে রূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই বা আমার আশ্রয়ে এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে, অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে

আমাতে সংলগ্ন রয়েছে।” “সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।” (গীঃ ৯।৭) অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে ভূতসমূহ আমার প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াতে লীন হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে আমি বিশেষভাবে সৃজন করি।” উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের সহজ সরল অর্থ গ্রহণ না করে যোগিদের নিত্য পাঠ্য ‘গীতার’ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় লেখা রয়েছে ;—“চিন্তা অন্যমনস্ক হ’লেই মায়ায় মুগ্ধ হয়, সেইজন্য ক্রিয়া বেশী করে করতে হয়, করলে নেশা হয়, তখন আর চিন্তা অন্য বস্তুতে যায় না ; সুতরাং আর কল্প বা কল্পনা সৃষ্টি হয় না। এইরূপে চিন্তা যখন চিন্ততেই থাকে, অন্য কোথাও যায় না, তখন উহা “চিন্মাত্র” হ’য়ে যায়। এই চিন্মাত্ররূপই ভগবদ্রূপ, ইহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা। ইহাকেই চিন্তে চিন্তা রাখা বা মনে মন রাখা বলে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিন্তে চিন্তা মিলে যায়, ঐ অবস্থায় যিনি থাকেন, তিনিই সদাশিব। তখন ভিতরে ভিতরে শ্বাস চলে ও ভ্রম মধ্যে দৃষ্টি থাকে, প্রাণ ও অপান সমানরূপে অবস্থিতি করে, বায়ু নাসিকার মধ্যে ধারণ করে ; ইহাই নিষ্ফল অবস্থা। ক্রিয়া করতে করতে এই অবস্থা আপনাআপনি হয়। সদা চিৎস্বরূপ কূটস্থে থাকতে থাকতে ব্রহ্মতে থাকে এবং ব্রহ্মে থাকায় ব্রহ্ম হয়ে যায় ; সব ব্রহ্ম হ’লে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হলেন। ইহা জানার নাম কৈবল্য। সর্বদা ক্রিয়া করলে কৈবল্য লাভ হয়। কৈবল্য-পদ যাঁর লাভ হয়, তাঁর পক্ষে আর সৃষ্টি বা লয় নেই। এই অবস্থাপন্ন সাধকই জীবন্মুক্ত পুরুষ।”

—এক্ষণে যোগি-প্রণীত গীতার উক্ত মন্তব্যে যে চিন্মাত্রের কথা প্রকাশ পায়, তাহা চেতনের বিলাস-রহিত অবস্থা। জড়ের অতিরিক্ত বিশেষ-রহিত চেতনসম্বন্ধীয় বস্তুই ‘চিন্মাত্র’। চিন্মাত্র-বাদে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের অস্তিত্ব থাকে না। অবিদ্যা বা অতিবিদ্যার অনুশীলন-কারীগণই চিন্মাত্রবাদী বলে পরিচিত হ’ন। যোগিদের মতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীব সদাশিব হ’য়ে যায়। প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসে সমতা আসায় মন সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে জোর করে বিষয়ে নিবিষ্ট হ’তে না দিয়ে তাৎকালিক চঞ্চলতা থেকে মুক্ত করলেও মনের প্রকৃত বিশুদ্ধতা আসে না, কারণ মন অবিদ্যা বা অতিবিদ্যার অনুশীলনে নিরত থাকে ও পূর্ব সংস্কারেও আকৃষ্ট থাকে। তখন যোগিদের মনে অহংভাব ও শুদ্ধতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব বর্তমান থাকায় যোগিগণ সদাশিব হ’য়ে যাবার বৃথা অহঙ্কার পোষণ করে। ‘সদাশিব’—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ’, তিনি ঈশ্বর-কোটি, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিত্যসেবক ক্ষেত্রপালরূপে বিরাজমান। আর জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ ও সনাতন। সদাশিব—শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি,—পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইহার নিত্য স্থিতি ;—ইনি নিগুণ। বিভিন্নাংশ জীব কোনও অবস্থাতেই সদাশিব হতে পারে কি? জীব অনর্থযুক্ত থাকাকালে বদ্ধজীব ; জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হ’লেও আশ্রয় বা বিষয়জাতীয় উপাস্যে কখনই পরিণত হ’তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত হতে জানা যায়—প্রচেতাগণ আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শিবের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণের সেবা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা

কেহই শিব বা সঙ্কর্যণ হ'বার কুবুদ্ধি পোষণ করেন নি। যোগিরা পর-অবস্থায় থাকাকালে সদাশিব হয়ে যায়,—এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হওয়ায় তাহা কাল্পনিক ও অবাস্তব মতবাদ। জীবকে জগদগুরু শিব বলা, শিবের চরণে মহা অপরাধ ও নাস্তিকতা।

ভজনীয় ভগবান্ নিত্য, ভজনকারী ভক্ত নিত্য, এবং উভয়ের সম্বন্ধরূপা ভক্তি নিত্য। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে লিখিত আছে—“ওঁ তদ্বিশেষে পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূর্যঃ দিবীং চক্ষুরাততম” —এক্ষণে ‘সদা পশ্যন্তি’—এই বাক্যদ্বারা দর্শনীয় বিষয়ের পরমপদের নিত্যত্ব ও দর্শনকারী সূর্যগণের (ভক্তগণের) নিত্যত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছে, নতুবা দর্শন যে নিত্য, তাহা সম্ভব হয় না। ‘পশ্যন্তি’—বর্তমান কাল ও বহুবচনান্ত পদ। তাই জীব ভগবান্ নহে ও কোন অবস্থাতেই ভগবান্ হয় না। জীব অণু চিৎস্বরূপ হয়ে যদি মুক্ত-অবস্থাতেও নিজেকে ‘বিভু’ ভগবান্ বলে, তবে তাহা কাল্পনিক অবস্থামাত্র লাভ করবে, বাস্তব মঙ্গল হ'তে চিরবঞ্চিত হবে। জীব ‘তৎ’ নহে—‘তদীয়’। তস্য ত্বম্—তৎত্বম্—এই অর্থে তুমি তাঁর অর্থাৎ ভগবানের। “তত্ত্বমসি”—অর্থে ‘তুমি পূর্ণব্রহ্ম’—এরূপ বুঝায় না। তদীয়ত্ব-বোধে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কি তাঁকে (ভগবান্কে) ভক্তি করা যায়? ভগবানের সাথে জীবের সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস—কৃষ্ণের পরাশক্তির অংশ। সুতরাং কৃষ্ণের সেবাই হচ্ছে জীবের স্বরূপগত কর্তব্য। শাস্ত্রে কথিত হয়,—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস” (চৈঃচঃ)। জীবের সম্বন্ধে মায়া আগন্তুক বস্তু, স্বরূপগত বস্তু নয়। জীব কৃষ্ণ-দাস হ'য়েও অনাদি কাল থেকে স্বরূপ-বিভ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার দাসত্ব করছে, তা'লে জীবের কৃষ্ণ-দাসত্ব অন্তর্হিত হয়ে যায় কি? মায়ার দাসত্ব করলেও সে কৃষ্ণেরই দাস থাকে। কারণ একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কারও সঙ্গে জীবের স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ নেই,—ইহা গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হয়েছে।

উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়, কোন পতিব্রতা মহিলা বিদেশে বসবাসকারী নিজ পতির সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যদি পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে যায়, তা'লে পতির সাথে তার সম্বন্ধ কি নষ্ট হয়ে যায়? তাহা কখনই সম্ভব নয়। তাবার কোন শিশুপুত্রকে তার মা'র কাছে রেখে পিতা দূর দেশে যায় ও পুনরায় ফিরে এসে পুত্রের সাক্ষাতে হাজির হ'লে পুত্র তার পিতাকে চিন্তে না পারলেও মা চিনিয়ে দিলে পুত্র পিতাকে চিন্তে পারে। আমরাও তেমনি অনাদিকাল হতে ভগবান্কে ভুলে মায়ার রাজ্যে এসে মায়াকে আপন করে তার দাসত্ব করছি। তাই ব'লে কি আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস হয়েও কৃষ্ণের সহিত সম্পর্ক ভুলে যাবো? কোন ভাগ্যে যদি সাধু-গুরুর দর্শন ও তাঁর অহৈতুকী কৃপায় আমাদের অনাদি কৃষ্ণ-বিশ্মৃতি দূর হয়ে কৃষ্ণের সাথে আমাদের বাস্তব সম্বন্ধ জানতে পারি, তখন আমরা অন্য কারও দাস না হয়ে স্বরূপতঃ কৃষ্ণেরই দাস—ইহা জানতে পেরে বিমল আনন্দ ও সুখ অনুভব করব।

তাই শাস্ত্রে ধ্বনিত হয়,—“দাসভূতো হরেরিব নান্যসৈব কদাচন।”—(পদ্মপুরাণ) সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক, অন্য কারও দাস নয়। গীতায় ১০।৮ শ্লোকে ভগবানের উক্তি,—“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃসর্বং প্রবর্ততে”—আমিই সকলের উৎপত্তির হেতু ও আমি হ'তেই সকলে ভক্তি-জ্ঞান-তপ-কর্মাতির সাধন ও সর্বপ্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। আমিই সকলের একমাত্র প্রভু ও চালক ব'লে সকলেই আমার সেবক। জীব সর্বাবস্থাতে পরমুখাপেক্ষী ;—পিতা, মাতা, পরিবার, সমাজ, দেশ, বায়ু, জল, মাটি, অগ্নি প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্র হ'য়ে কখনও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণদাসাধিকারী, কবিভূষণ



তদন্তে জিয়াযোগ

তন্ত্র—তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। এই তন্ত্র তিন প্রকার। যথা—সাত্ত্বত তন্ত্র, রাজস তন্ত্র, ও তামস তন্ত্র। যখন পুরান ও শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যের যোগ্যতার জন্য বিশেষরূপে বিস্তারিত হয়—তখন তাহা ‘তন্ত্র’ নামে অভিহিত হয়। তামসিক ব্যক্তিগণ তামস-তন্ত্রে এবং রাজসিক ব্যক্তিগণ রাজস-তন্ত্রে যোগ্যতালাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। মানুষের দেহে তন্ত্রভাবনার ষট্চক্র-ভেদের ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুমা, চিত্রিণী নামে পাঁচটি নাড়ী আছে। উপরোক্ত তাত্ত্বিকগণ পঞ্চ সাধন বলতে পঞ্চ ম-কার সাধন (অর্থাৎ মদ্য, মৎস্য, মাংস, মূদ্রা, মৈথুন) করিতে গিয়া রাজসিক ও তামসিক দ্রব্যগ্রহণে তৎপর হইয়া সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্মে অবস্থান করিয়া ভ্রমপূর্ণ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন এবং রজ-তমো গুণে অপবিত্রতা ও জড়তায় আবদ্ধ হইয়া যান। মানব-স্বভাব যে পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক থাকে, সে পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই মনুষ্য স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, আমিষ-ভোজন, মদ্যপান প্রভৃতি তামসিক কার্যে রত থাকে। তামস ও রাজস ব্যাপারসমূহ শুদ্ধ সত্য পথের খুবই বিঘ্ন ঘটায়। তজ্জন্য সাত্ত্বত শাস্ত্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবার উপদেশ করিয়াছেন।

সাত্ত্বত তন্ত্র হরিভক্তির প্রণালী কীর্তন করিয়াছেন। সেই সাত্ত্বত-তন্ত্রই “পঞ্চরাত্র” নামে অভিহিত। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সেই সাত্ত্বত তন্ত্রের অন্তর্গত। কলিকালে সেই সাত্ত্বততন্ত্র বা পঞ্চরাত্রের বিধানই জীবের মঙ্গলের পথ। এবং ঐ তন্ত্র-বিধানই একমাত্র গ্রহণীয়।

“পঞ্চরাত্রে ভাগবতে একই কথা কয়।” পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত একই ভগবদ্ভক্তির কথা উপদেশ দিয়াছেন। বিষুয়ামল, তত্ত্বসাগর, ভরদ্বাজসংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, প্রভৃতি সাত্ত্বত স্মৃতি ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্র। কলিকালে সাত্ত্বত পঞ্চরাত্র বা সাত্ত্বত তন্ত্র ব্যতীত অন্য প্রণালীতে শুদ্ধি নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসের প্রারম্ভে বিষুয়ামলে বলিয়াছেন—

“কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।।”

সত্যযুগে শ্রুতি, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি হইবে না। ইহাতে তথাকথিত তান্ত্রিকগণ আশ্লাদে উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—“এই ত! হরিভক্তিবিলাসে কলিযুগে তন্ত্র-সাধনা ব্যতীত উপায় নাই বলিয়াছেন।” কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত তন্ত্রসাধন যে কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—“তথা চৈকাদশস্কন্ধে নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধর-স্বামীপাদাঃ। নানাতন্ত্র-বিধানেন ইতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ইতি।”—অর্থাৎ, কলিযুগে যে-তন্ত্রমার্গের কথা বলা হইয়াছে, সে-তন্ত্রমার্গ কিপ্রকার, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে “নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু”—এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। উক্তশ্লোকের দ্বারা কলিযুগে তন্ত্রমার্গের প্রাধান্য দেখায়াছেন।

রাজসিক ও তামসিক তন্ত্রবিধান স্বভাবতঃ ভোগপরায়ণ বহিস্মুখ মনুষ্যকে মদ্য-মাংস-লোলুপ ও নানাপ্রকার ব্যাভিচারপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু জীবের প্রতি অশেষ করুণা পরবশ হইয়া সাত্ত্বত তন্ত্রবিধানে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে এই জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন।

সাত্ত্বত তন্ত্র নারদ-পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত একই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

“সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্মলম্।

হৃষিকেন হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে।।” (নারদ পঞ্চরাত্র)

—অর্থাৎ ভক্তি কাহাকে বলে? কায়-মনো-বাক্যে ভগবৎপর হইয়া সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি ‘হৃষিকেশ’কে যে-সেবা, যাহা সকলপ্রকার জড়-উপাধি হইতে বিশেষভাবে মুক্ত এবং সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগরূপ মল রহিত, তাহাকেই ‘ভক্তি’ বলা হয়। ইহা সাত্ত্বততন্ত্র ‘নারদ-পঞ্চরাত্রের’ অভিমত। আর শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

“মদুগ্ধ-শ্রুতিমাত্রেন যয়ি সর্বগুহ্যশয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্রোতস্বধৌ।।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুণস্য হৃদাহতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমৈ।।

সালোক্য-সান্ধি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা।।

স এব ভক্তিযোগস্য আত্যন্তিক উদাহতঃ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্বাবায়োপপদ্যতে।। (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহৃতিকে বলিতেছেন—পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) সগুণ। এতদ্ভিন্ন নিগুণ শুদ্ধভক্তি আছে, আমার গুণ শ্রবণ-মাত্র

সর্বচিহ্ননিবাসী আমাকে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী মতি উদয় হয়, তাহাই নিগুণ ভক্তিয়োগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধান-রহিতা ও দ্বিতীয় অভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণ-রহিতা। আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সান্তি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান রূপতা), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সায়ুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্য সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনা নাই। ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিয়োগ বলা যায়। এই ভক্তিয়োগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

“নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়াসা।

ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেন নিত্যশঃ।।” (ভাঃ ৩।২৯।১৫)

ক্রিয়াযোগের অর্থ পঞ্চরাত্রাদিতে কথিত পূজা-প্রকরণ। এখানে ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতার নিকট বেদতন্ত্রে ক্রিয়াযোগের কথা পরিস্কারভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—“মাতঃ! ভক্তের সাধনসমূহ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ফলাভিসন্ধান-রহিতা ভক্তির অনুকূল নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মের সম্যকরূপ যাজন, নিত্য শ্রদ্ধাযুক্ত চিন্তে নিষ্কাম ও হিংসাদি-রহিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র-কথিত পূজা, স্তব, বন্দনা, সর্ববভূতে আমার ভাবচিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহতের সম্মাননা, দীনের প্রতি কৃপাপ্রকাশ, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা, বাহ্য ও অন্তরেन्द्रিয়ের বশীকরণ, সাধু-গুরুর নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব-শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীৰ্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ, নিরহঙ্কার—এই সকলের দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবৎধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্ত বিশেষরূপে নিৰ্ম্মল হয়। এবং সেই নিৰ্ম্মল চিন্তে আমার গুণশ্রবণ মাতেই অনায়াসে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হন।”

“তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্য মহারাজোপলক্ষণম্।

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ।।” (ভাঃ ১১।৫।২৮)

হে রাজন! তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মনুষ্যাগণ ছত্র, চামর প্রভৃতি মহারাজলক্ষণ-যুক্ত সেই পরম পুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি-অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন।

‘বেদতন্ত্র’-শব্দে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্থাৎ আগম ও সাত্ত্বত পঞ্চরাত্র-বিহিত মার্গে উভয় পদ্ধতিদ্বারাই মর্য্যাদা বোধে পূজা বিহিত হইয়াছে। পার্থিব অহঙ্কার প্রবল থাকিলে সেবার পরিবর্তে নানাপ্রকার স্পৃহা আসিয়া জীবকে অন্যাভিলাষী, কস্মী বা জ্ঞানী করিয়া তুলে। শ্রুতি ও পঞ্চরাত্র মানবকে ভগবদ্ভক্তির কথাই শিক্ষা দেন। পঞ্চরাত্রোক্ত বিধান-অনুসারে দ্বাপর-যুগের ন্যায় ভগবানের পূজা বিহিত হয়।

“ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।

নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।” (ভাঃ ১১।৫।৩১)

হে রাজন! দ্বাপরযুগে এইপ্রকারে মানবগণ জগদীশ্বরকে আরাধনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধান-অনুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।

“নানাতন্ত্র-বিধানেন”—শব্দে কলিযুগে তন্ত্রমার্গের অর্থাৎ সাত্ত্বত পঞ্চরাত্র-বিহিত মার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে। সেই তন্ত্রবিধানে কলিযুগে ভগবৎআরাধনাটি কিপ্রকার, তাহাই পরবর্তী শ্লোকে জানাইতেছেন—

“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

যজ্ঞেঃ সঙ্কীৰ্ত্তনং প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।” (ভাঃ ১১।৫।৩২)

যিনি ‘কৃষ্ণ’ এই বর্ণদ্বয় কীর্তনপর, কৃষ্ণেপদেষ্টা, অথবা “কৃষ্ণ” এই বর্ণদ্বয় কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান তৎপর, যাঁহার “অঙ্গ”—শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুদ্বয়, এবং “উপাঙ্গ”—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তগণ, যাঁহার “অস্ত্র”—হরিনাম শব্দ, এবং “পার্ষদ”—শ্রীগদাধর-স্বরূপদামোদর-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে “অকৃষ্ণ” অর্থাৎ পীত (গৌর)—সেই অন্তঃকৃষ্ণ ও বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীৰ্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ সেই শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত নববিধা ভক্তিয়াজনের কথাই বলিয়াছেন—

“শ্রবণং কীর্ত্তনং বিশেষঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাম্বনিবেদনম্।।” (ভাঃ ৭।৫।২৩)

“শ্রীবিশেষঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে

প্রহ্লাদ স্মরণে তদস্তিতভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।।

অত্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতিদাস্যেহথ সখ্যেহজ্জুনঃ

সর্বস্বাম্বনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্।।”

(ভঃ ৪ঃ সিঃ পৃঃ ২।১২৯)

“অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ, নতি।

অভ্যুত্থান, অনুরজ্যা, তীর্থগৃহে গতি।।

পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীৰ্ত্তন।

ধূপ-মাল্য, গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন।।

আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্তিদর্শন।

নিজপ্রিয়, দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন।।

তদীয় তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।

এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।

সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীৰ্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।

সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।”

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১৭-১২৫)

এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীৰ্ত্তন দ্বারাই সৰ্বদুঃখের সৰ্ববিধ পুরণার্থ লাভ হইয়া থাকে। “নাম সঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায়”।—এই নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইতেই পরম শান্তিলাভ হইবে। এবং সংসার-দুঃখ অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সঙ্কীৰ্ত্তন অপেক্ষা অন্যান্য সাধনপ্রণালী কোনমতেই লাভজনক নহে।

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নিবন্ধ।।

ইহা হইতে সৰ্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সৰ্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।”

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী



শ্রীল গুরুপাদপদ্মে বিবর্ত-পুষ্পাঞ্জলি

দামোদর মাসে, শুক্লা তৃতীয়াতে,

ওগো গুরুমহারাজ!

এ জগৎ হতে, অপ্রকট হলে,

সবারে কাঁদায়ে আজ।।

যেদিকে তাকাই, শূন্য দেখি তাই,

চারিদিকে হাহাকার।

মন বলে আছ, অন্তর মাঝারে,

তবাপ্রিত সবাঁকার।।

তব যশ-গাথা, কত গুণকথা,

বলে মহারাজগণ।

শিহরণ জাগে, হৃদয় মাঝারে,

অশ্রু ঝরে সারাক্ষণ।।

যত ভাবি তাই, কুল নাহি পাই,

তুমি সে ভক্তির সাগর।

তাহে স্মান করে, আশা মিটে না যে,

খুঁজে ফিরি নিরন্তর।।

সুবৃহৎ যজ্ঞ, আরস্তিয়া তুমি,
 অপ্রকট হলে পরে।
 সেবার দায়িত্ব, দিয়ে সবারে,
 রহিলে সদা অন্তরে।।
 তোমার নিষ্ঠায়, ত্যাগ ও বৈরাগ্যে,
 মহান সেবার পথ।
 সবার জীবনে, পাথেয় হউক,
 গুরুই আদর্শ রথ।।

—দাসানুদাস, শশধর দাসাধিকারী, নামখানা

সদাচার

‘আচার’ শব্দটি ইহ জগতে নিত্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহা সং এবং অসং বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইলে পর, একই শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়। ঐহিক ও পারত্রিক যে-কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ের আচরণ অথবা বারংবার আবৃত্তি করিতে হয়। আচার শব্দে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহারকেই লক্ষ্য করি, সং শব্দে নিত্য বা সাধু—অর্থই স্বীকার করি, যে আচরণ দ্বারা নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর এবং পরমাত্মতত্ত্ব শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের অসমোদ্ধৃত্ত উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করা যায় এবং যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীগুরু, কৃষ্ণ ও কার্ষগণের নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রসাত্মক সেবা-সুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সদাচার নামে অভিহিত হয়। সাধুগণ কর্তৃক উপদিষ্ট, আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের পূর্ণাঙ্গ যাজনের নামই সদাচার। অনুরাগ ও বিরাগ সমস্তই আচরণ দ্বারা লাভ করা যায়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্তরের বা প্রকৃতির তাহা তাহার আচরণের দ্বারা জানিতে পারা যায়। সং শব্দে যদি একমাত্র সত্য, নিত্য ও সনাতন বস্তুকে বুঝায়, তবে যিনি সেই সনাতন পরম পুরুষের তত্ত্ব বা সনাতনত্ব প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত করাইয়া দিতে পারেন, তিনিও সেই সনাতন পুরুষের প্রকাশবিগ্রহ স্বরূপ সনাতন বস্তু।

“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ”—এই শাস্ত্রবাণীদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, অদেবতা যদ্রূপ দেবতার অর্চনে অধিকারী নহেন, তদ্রূপ বিষয়-বিগ্রহরূপ সনাতন বস্তুকে, আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ সনাতন বস্তু ছাড়া অন্য কেহ জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব পতিত-পাবন পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবও সং শব্দবাচ্য। শ্রীগুরুদেব-কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মই সদাচার নামে অভিহিত

হয়। সদাচার শিক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রথম শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। নিত্য গোলোকবন্দাবন-বিহারী গোপীজনবল্লভ অনাদি-আদি সর্বকারণ-কারণ দ্বিভূজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর, মদনমোহনের সেবার যোগ্যতা সদাচারিগণই লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণই সদাচারী শব্দবাচ্য। সেইজন্য ভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,—

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মন্তুস্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।”

ভগবদ্ভক্তগণ সৎ বলিয়া ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন। যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন সাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা।। (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—প্রদীপ্ত ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, সাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা কিস্বা দান-দ্বিত্যা তদ্রূপ মৎপ্রাপক হয় না। কঠোপনিষদ বলেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।

(কঠ-১।২।২৩)

এই পরমাত্মা-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না, যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং তাঁহার নিজ তনু প্রকটিত করেন।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। নামের সেবা দ্বারাই নামীর সেবা স্বতঃই সম্পাদিত হয়। সেবোন্মুখ অবস্থায় নামের সেবা করিলেই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে পারা যায়,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহমিদ্ভিত্যৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মুরত্যদঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।১০৯)

সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারাই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করা যায়। পরিদৃশ্যমান জগতে যে-কোনও বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন সেই জ্ঞানোপদেশক গুরুর অনুগত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, তদ্রূপ পরজগতের পরাৎপর পরম পুরুষের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আদৌ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বেদজ্ঞ সদৃগুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার উপদেশক্রমে ভজন-পন্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা আচরণ করা কর্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।। (মুণ্ডক)

সেই ভগবদ্বস্তুর প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উত্তম শ্রেয়ঃ পিপাসু ব্যক্তি সমিধ্বেষ্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট কিভাবে গমন করিলে উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি দ্বারাই তত্ত্ববস্তুকে জানিতে পারা যায়। এই ত্রিবিধা বৃত্তিদ্বারা সমুপ্ত হইয়া শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্যমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণপথে সেই চেতনবাণী অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করে। তাই শাস্ত্রে অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গে সদাচার পালন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যথা—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার ।

স্ট্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অসাধুগণ অসদাচারে রত। অসৎ শব্দে যাহা অনিত্য ও বিনশ্বর ; যদ্বারা কেবলমাত্র ইহ জগতের ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় ও অনন্ত নরকের দিকে প্রাপঞ্চিক জীবের মনকে ক্রমে ক্রমে টানিয়া লইয়া যায়। যাহা দেহত্যাগে জীবের সঙ্গে যায় না, সবই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহা অসৎ বা অনিত্য। স্ট্রীসঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ—এই দুইই অসদাচার বলিয়া কথিত। সাধুর নিকট হইতে সদাচার শিক্ষা করা যায়। অসাধু ব্যক্তিগণ যে সদাচারের ভাণ করে, তাহা গ্রাম্যাচার বা অসদাচারের নামান্তর মাত্র। আমরা বন্ধাবস্থায় থাকিয়া মনে করি, কতই না শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতেছি, কতই না কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছি, কতই না ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতেছি—আমরা না জানি কৃষ্ণের কত প্রিয় কার্য্য করিতেছি ; কিন্তু আমাদের এই সকলই কন্মকাণ্ডের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। আমরা অসাধুকে সাধুজ্ঞানে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যে ভক্তির অভিনয় করিতেছি, তাহা কখনই কৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারে না। সাধুগণই একমাত্র কৃষ্ণের প্রিয়। তাই তাঁহারা শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। শাস্ত্র বলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়স্ত্বহম্ ।

মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অসদ্বস্তুর আচরণ সাময়িক সুখলাভে জীবকুলকে মত্ত করিয়া তোলে, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে মত্ত থাকিয়া যখন পুনঃ পুনঃ ঐহিক দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, তখনই আমরা এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সৎসঙ্গে সদাচার

পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, অসৎসঙ্গের মোহে পতিত হইয়া আত্মার কি মহা-অকল্যাণই না সাধন করিয়াছি। বহুরূপিনী মায়া পিশাচীকে কত ভাবেই না হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছি। কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ পাইয়াছি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনাময় ব্যবহার। অসদাচারে প্রবৃত্ত হইয়া যখনই মায়াকে ভোগ করিতে ধাবিত হইতেছি, তখনই মায়া আমার দুর্বুদ্ধিতার পুরস্কার-স্বরূপ আমাকে সংসাররূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আমার চেতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সংসার যে কেবল অসার, ইহার মধ্যে কোন সারত্ব নাই, ইহা যে জ্বালাময়ী ও দুঃখপ্রদ—তাহা বিমুখমোহিনী মায়ার চেষ্টায় আমরা প্রতি পদে পদে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। দৈবী, গুণময়ী, দুপ্পারা মায়ার কি মোহিনী শক্তি! আমি জড়ের সহিত এইরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, চেতনকে ‘আমার’ না বলিয়া অনিত্য জড়বস্তুকে ‘আমার’ বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হায়! কে আমায় এই মোহান্ধ-কূপ হইতে উদ্ধার করিবেন? কে আমার এই দুর্দশায় দুঃখী হইবেন? কে আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দিবেন? জগতের জীবগণ আমারই মত দুপ্পারা মায়ার কবলে কবলিত। আমি যেরূপ ত্রিতাপক্লিষ্ট, তাহারাও তদ্রূপ, আমি যেরূপ অজ্ঞান তাহারাও সেইরূপ এবং আমারই ন্যায় তাহারাও বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থিত। সুতরাং এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে অসমর্থ, সেইরূপ পরতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতসম্মান্য কেবলমাত্র গুরুব্রহ্মসমূহ কখনও জীবসমূহকে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। বর্তমান যুগে দৈনিক লক্ষ লক্ষ জীব হরি-বিমুখতাবশতঃ বৃথা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। পতিতপাবন পরম দয়াল নিত্যানন্দাভিন্ন কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অন্যথায়,—

তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গী ৯।২১)

অতএব সদগুরু চরণাশ্রয়ে সদাচার গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণ-সেবাসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

—শ্রীরাবিবহারী দাসাধিকারী

“শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট বাক্যই তাঁহার ‘শ্রীঅঙ্গ’, কালে কালে তাঁহার বাণীর প্রচারকগণই তাঁহার ‘উপাঙ্গ’, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই ‘অঙ্গ’, শ্রীচেতন্য-বাণীতে অবস্থিত শ্রীহরিজনগণই তাঁহার ‘পার্যদ’।”

—শ্রীল প্রভুপাদের ‘আমার কথা’

স্বধামে শ্রীক্ষিরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ১৫।১২।২০০৪) বুধবার, সকাল ৯।৪৪ মিনিটে গঙ্গার পশ্চিম তটে শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরম পূজনীয় শ্রীক্ষিরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অশীতি (৮০) পূর্ণ হইতে কিছু মাস বাকী ছিল।

পূর্বাশ্রম মেদিনীপুর জেলায় চাঁদিবেনিয়া নামক কোন পল্লীগ্রামে তিনি পিতা ভীকনচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্তানরূপে আবির্ভূত হন। তখন তাঁহার নাম ছিল ক্ষুদিরাম। সামান্য কিছু বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি পশ্চাৎ কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইয়া সংসার-ধর্মে প্রবেশ করেন। গোস্বামী-বংশজাত মৎস্য-মাংসভোজী কোন কুলগুরু নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেও তিনি নিজ সহজাত সাত্ত্বিক স্বভাববশতঃ কোনরূপ আমিষ গ্রহণ না করিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতেন। অবশেষে উক্ত অঞ্চলে



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারিত শ্রীচৈতন্য বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি প্রায় (ইং) ১৯৬৪ সালে সঙ্গীক শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য জগদগুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমন্তজিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। তদবধি তিনি 'শ্রীক্ষিরোদশায়ী দাসাধিকারী'-নাম প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ গৌরাঙ্গভক্তের আচরণীয় আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করিতেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র শ্রীপাদ নবকুমারও সেইসময় কিছুকাল শ্রীধাম নবদ্বীপে উক্ত মহাভাগবতোত্তমের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্বক তাঁহার নিকট বসবাসের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে পিতাকে সাহায্য করিতে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবার পরেও বেশকিছু কাল গৃহে অতিবাহিত করিয়া শ্রীক্ষিরোদশায়ী দাসাধিকারী মহাশয় পুত্রকে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া মঠে যোগদান করেন। সমিতির নবদ্বীপস্থ মূলমঠে কিছুকাল শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। পশ্চাৎ 'শ্রীক্ষিরোদশায়ী ব্রজবাসী' নামে 'বানপ্রস্থ'-আশ্রম অবলম্বনপূর্বক তিনি সমিতির অপর শাখামঠ মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ও বৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার পরিপাটি ও নিষ্ঠা দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ চমৎকৃত হইতেন। অবশেষে পুনরায় তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৪০৫ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৯৮) গৌরপূর্ণিমা-বাসরে সমিতির সভাপতি-আচার্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদগুরু

শ্রীশ্রীমন্ত্তজিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়া “শ্রীক্ষিরোদশায়ী বাবাজী মহারাজ” নামে পরিচিত হন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত ভজনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে বৃথাবাক্য ও বৃথাকার্য্যে কখনই কালক্ষেপ করিতে দেখা যাইত না। সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, শ্রীগর্গসংহিতা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, কখনও বা অষ্টকালীয় লীলা কীর্ত্তনমুখে স্মরণ, অথবা হরিকথা কীর্ত্তন—এইপ্রকার কোন না কোন কার্য্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে নিমগ্ন থাকিতে দেখা যাইত। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেরও পূর্বে তিনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্ব্বিশেষে প্রতিদিন মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতেন। মধ্যে মধ্যেই তিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে রাত্রিযাপন করিতে চলিয়া যাইতেন। কিছু অর্থসঞ্চয় হইলেই তাহা শ্রীযোগপীঠে বা আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের কিছু সেবায় তিনি ব্যয় করিতেন এবং সেই স্থানের প্রসাদ-নির্ম্মাণ্য নিজ মঠে আনিয়া সমস্ত বৈষ্ণবগণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিতেন। তাঁহার শিশুসুলভ সরল ব্যবহার একবাক্যে সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিত। এইরূপ একজন নিক্ষিপ্ত ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের ভজনমুদ্রা পুনরায় চাক্ষুষ হইবে না ভাবিয়া তাঁহার বিচ্ছেদে আমরা বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি তাঁহার নিত্যধাম হইতে নিত্যকাল আমাদিগকে গভীর অকপট আশীর্ব্বাদ করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট বিশেষ নিবেদন এই যে, আপনাদের কাহারও নিকট আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্তজিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের প্রেরিত পত্র থাকিলে, অথবা কাহারও নিকট তাহা আছে, এইরূপ জানিলে তাঁহাকে জানাইয়া উক্ত পত্র বা পত্রের পরিষ্কার জেরক্স কপি শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে বিশেষ অনুরোধ। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে কোন অলৌকিক অনুভূতি কাহারও হইয়া থাকিলে, অথবা তাঁহার শ্রীচরণকমলে কোন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে চাহিলে, পদ্যাকারে বা গদ্যাকারে পরিষ্কার লেখনীতে তাহা নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্যালয়ে পাঠাইতে সকলকে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি।—ইতি কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

© ০৩৪৭২-২৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসম্মারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১৮ শ্রীগৌরান্দ; ১৫ই ফাল্গুন, ১৪১১ সাল (ইং ২৭।২।২০০৫) রবিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী ৫ই গোবিন্দ, ১৭ই ফাল্গুন, (ইং ১।৩।২০০৫) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা হোম প্রভৃতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে উক্ত মঠে শ্রীব্যাসপূজাদি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগুস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সেবানুগত্যে বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবাসূচী :—

১৪ই ফাল্গুন, ১৪১১, (ইং ২৬।২।২০০৫) শনিবার—

সায়াহ্নে আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস।

১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।২০০৫) রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন।

তদনন্তর ৭টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা, মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরু-চরিতাবলী পাঠ।

পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি। ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন মঠ হইতে আগত সাধু-সন্ন্যাসিবৃন্দ-কর্তৃক শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-দ্বারা বৈষ্ণব-সেবন।

অপরাহ্নে—মহাজন পদাবলী কীর্তন। তদনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্তন এবং ধর্মসভা; বিষয়—শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব।

১৬ই ফাল্গুন, ১৪১১ (ইং ২৮।২।২০০৫) সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি কীর্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি-কীর্তন।

সায়াহ্নে—সন্ধ্যারতি অন্তে মহাজন পদাবলী-কীর্তন ও বিভিন্ন ভক্তগণ-কর্তৃক প্রেরিত ভক্তি-কুসুমাঞ্জলিরূপ প্রবন্ধাদি আবৃত্তি ও বক্তৃতা।

১৭ই ফাল্গুন, ১৪১১ (ইং ২৯।২।২০০৫) মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি ও মহাজন পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী পাঠ। পূর্বাহ্ন ১০টা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং মধ্যাহ্নে ভোগারতি কীর্তন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্তন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্যচরিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ এবং কীর্তনান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে “সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ), পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া”—এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ভ। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি-বিঘ্নশূন্য॥	অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥
--	---

১৮ মাঘ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫১৮ শ্রীগৌরাদ	৫৬শ বর্ষ }	২৯ মাঘ, শনিবার, ১৪১১, ১২-২-২০০৫	{ দ্বাদশ সংখ্যা
শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা			

সানুবাদঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ-বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিঃ স্ফুরদমল-কান্তিঃ গজগতিং

হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিতমুখম্।

সদা ঘূর্ণনৈত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদ্ং

ভঞ্জে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ১॥

যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের অতিশয় শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহররূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত হস্তীর ন্যায় মৃদু-মধুর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার শ্রীকলেবর বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, শ্রীমুখ মন্দমধুর হাস্যযুক্ত, নয়ন-যুগল সদাই চঞ্চল, যাঁহার হস্তে বেত্র শোভা পাইতেছে, যিনি কলির ধ্বংকারী, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি॥ ১॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবা-পতিম্।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ২॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি
যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর
প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি সমুদ্রভারুপে পাষাণগণের দলন-কর্তা,
সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা
ভজনা করি॥ ২॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিস্তং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জী বোধারণ-করণোদ্যম-করণম্।
হরব্যখ্যানাদবা ভব-জলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৩॥

যিনি শ্রীগৌরাস্তের অতি প্রিয়, যিনি সর্বজগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি
পরমসুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার
অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ণন-প্রচারদ্বারা দুস্তর ভব-সুমুদ্রের গর্ভ খর্ব
করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান
করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি
সর্বদা ভজনা করি॥ ৩॥

অয়ে ভ্রাতৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি হ্রামিখং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৪॥

“হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কৃপা করিয়া
ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে
পারে”—এইরূপে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও যুক্তি পরামর্শ
করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি
ভজনা করি॥ ৪॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরি-হরি ধ্বনমনিশং
ততো বঃ সংসারান্মুখি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটটরতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি॥ ৫॥

“হে ভাই সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহা
হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার দায় আমাতেই রহিল”—এইরূপে

বলিতে বলিতে যিনি বাহু আশ্ফালনপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন,
শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা
করি।। ৫।।

বলাৎ সংসারান্তোনিধি-হরণ-কুন্তোদ্রবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিদ্ধিরতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতম্।
খলশ্রেণী-স্বফুর্জ্জৎতিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৬।।

আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কলস হইতে জাত
অগস্ত্যঋষি-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন,
যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্য পূর্ণরূপে উদিত চন্দ্র-স্বরূপ
অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জ্জনগণের পাপাশ্রকার
বিনাশ করিতে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন,
শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা
করি।। ৬।।

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুব্ধন্তং সন্তং সক্রুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৭।।

যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীৰ্ত্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে
ও শ্রীহরিনাম-কীৰ্ত্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে পথে পথে
বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ-নেত্রে দর্শন করিতেন,
শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা
ভজনা করি।। ৭।।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতৃঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বজ্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৮।।

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল হস্ত-কমল ধারণ করিয়া পরস্পরের মুখচন্দ্র
দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আহা মরি! যিনি নগরবাসিগণকে
স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-
কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।। ৮।।

রসানামাধানং রসিক-বর-সদৈষ্যবধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।

পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি য-

স্তদাশ্চি-দ্বন্দ্বাজং স্মরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে।। ৯।।

যিনি সমূহ ভক্তিরসের প্রদাতা, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁহার স্মরণে পাপিগণেরও পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই অতুল্যম ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তদীয় সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর স্ফুর্তি প্রাপ্ত হউক।। ৯।।



শ্রীগুরু-ভক্তি

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সুবিভূত সংসার-জালে আবদ্ধ, মায়ামোহে অন্ধজীবগণ সুখাশায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান সকলের সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু কোনও ক্রমে আপনাকে সুখী করিতে পারে না। এইরূপে জীবের অনেক জন্ম গত হয়। বহু জন্মার্জিত সুকৃতিপুঞ্জের ফলে যখন জীব-হৃদয়ে ভগদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তখনই তাহার সুখলাভের সূচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, জীবগণ তাঁহার নিত্য কিঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সর্বক্লেশ দূর হইয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম “শ্রদ্ধা”। শ্রদ্ধাবান্ জীব স্বল্পকালেই সদগুরুচরণ আশ্রয় করেন, শ্রীগুরুকৃপা-বলেই তাহার সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

অপার কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই জগতের পরম বন্ধু। তাঁহারা জীবগণকে কৃষ্ণ-বহির্মুখ জানিয়া তাহাদিগের নিকট নিরন্তর ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। আবার যখন তাহারা ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুরূপে তখন তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন। ভজনবিজ্ঞ অনন্যচেতা উপযুক্ত শিষ্যকে আবার কৃপা সঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাণ্ডার দর্শনে শক্তি প্রদান করেন। এইরূপ বৈষ্ণব-কৃপার অবধি নাই। কত শত অনর্থ-পরিপূরিত, নানারূপে মায়-বিড়ম্বিত, সংসার-সাগরে নিপতিত অতিক্ষুদ্র অধম জীবকে যিনি

শ্রীগুরুরূপে চরণে স্থান দেন, তাহার ভজনবিহীন জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করেন, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সুদৃঢ় ভজনে তাকে মুক্ত করিয়া তদ্বারা শক্তিসংগর করিয়া তাকে ভজনমার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর করান, তাঁহার অপার কৃপার বাস্তবিকই কোন সীমা নাই, তাহা অনন্ত এবং অদ্ভুত। এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম-জন্যর বন্ধু, ‘লোকনাথ’ লোকের জীবন।

হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘৃষক ত্রিভুবন॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ। যাঁহার নিকট মন্ত্র লাভ হয়, তিনি দীক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট ভজন-শিক্ষা করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু। উভয়কেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন; উভয়কেই কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোন ভেদভাব থাকিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করা অপরাধের কার্য্য, যেহেতু তাহাতে জীবে ঈশ্বরে সমতা জ্ঞানরূপ মায়াবাদ মত হয়। তবে শ্রীগুরুকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষ বা শ্রীভগবানের শক্তিরূপে ভক্তি করিলে কোন দোষ থাকে না। প্রেমময় ভগবান্ই শ্রীগুরুদেবে প্রকটিত হইয়া দীক্ষা দিতেছেন,—শিষ্যের মনে এই ভাব থাকিলেই মঙ্গল হইবে ; শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে।

শ্রদ্ধাবান্ জীব বহুযত্নে সদগুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবাব্যাস্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিবিধ শাস্ত্র হইতে শ্রীগুরুলক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ স্থায়ী হরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইসমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য এই,—দৃঢ়চরিত্র, বিশুদ্ধ ভক্ত ভাগবতোত্তমই জীবের গুরু ; এবং নিষ্পাপ, শুদ্ধশ্রদ্ধা বিনীত শিষ্যই শিক্ষার উপযুক্ত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অনর্থ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য এই যে, “যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়”; এবং “গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।” প্রভুর শ্রীমুখবাক্য সর্বত্রই সত্য হইয়া থাকে, তাহাতে কেন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গুরু বহুদিন যাবৎ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন, এবং শিষ্যও শ্রীগুরু-চরিত্র সন্দর্শন করিবেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের শুদ্ধতা জানিতে পারিলে তবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ দু'দিনের জন্য জীবনের পরেও তাহা বর্তমান থাকে। শিষ্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিয়া সৎগুরু আশ্রয় না করিতে পারিলে নানা কারণে গুরুদেবের প্রতি অচলাভক্তি রাখিতে পারেন না এবং গুরুর প্রতি অবজ্ঞা-দোষে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। গুরু যদি অযোগ্য হন, তবে শিষ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সৎগুরু স্বীকার করিবেন। শিষ্যও যদি পতিত হন, এবং শ্রীগুরু তাহাকে সংশোধন করিতে অপারগ হন, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেরূপ আঞ্জা করেন, দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত শিষ্যের তাহাই পালন করা উচিত। তাহা না করিয়া নানা জনের নিকট গিয়া নানা প্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে লৌল্য-দোষে তাহার ভজন হইবে না। তবে দেখিতে হইবে, শ্রীগুরুদেব যাহা আঞ্জা করেন তাহা সংশাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না। যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বোধ হয়, তবে সরলভাবে শ্রীগুরুচরণে তাহা জ্ঞাপন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সহিত সমন্বয় করিয়া লইবেন। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আঞ্জা দেন, বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সহিত তাহা পালন না করিলে কোন প্রকারেই গুরু-কৃপালাভ করা যায় না।

ভাগবতোত্তম গুরুদেব ইচ্ছা করিলে শিষ্যকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া পরমভাগবত করিতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য শিষ্যকে সেরূপ করিতে শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। জীব যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করিয়া অচিরকালেই গুরুকৃপা-ধনে অধিকারী হন। শ্রীগুরুকৃপা কি বস্তু, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন; যতদিন ভজনে অনর্থ থাকে, ততদিন যত্ন-সহকারে শাস্ত্র-বিধিনিষেধগুলি পালন করিয়া শ্রীগুরু-উপদিষ্ট ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শিষ্য যখন অনর্থ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্ঠা এবং তদনন্তর রুচির রাজ্যে উপস্থিত হন, তখনই শ্রীগুরুকৃপা প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। শ্রীগুরুদেব তখন জীবনের ধন হইয়া থাকেন। তাঁহার উপর শিষ্যের মমতা জন্মে, এবং ক্রমশঃ ভজন-সৌখ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ মমতা পরিপাক হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপূর্ব দাস্য-রস বিস্তার করে। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদে অতিযত্নে আপন জীবন সমর্পণ করেন।

যতদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হয় ততদিন শ্রীগুরুকৃপা-লাভের জন্য তাঁহার সেবা করা শিষ্যের একান্ত অবশ্যক। যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করাই তাঁহার প্রধান সেবা। অনেকে শ্রীগুরুদেবের বাক্য আচরণে তত যত্ন প্রকাশ করেন না, কিন্তু কোন-প্রকারে শ্রীগুরুদেবের পদ-সেবন বা বায়ু-বীজন করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হন। যদি সাহজিক প্রীতির সহিত তাহা কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা অতি উত্তম; কিন্তু যদি অন্তরে কপটতা থাকে বা এইরূপ

সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হইব—এই আশা থাকে, তাহা হইলে তাহা তত ভাল নহে। তাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হওয়া যায় না। তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) আজ্ঞা পালনে তিনি বড় সন্তোষ লাভ করেন। ঐরূপ সেবন অবশ্য মন্দ নহে। উহার ফলে শ্রীগুরুবাক্য প্রতিপালনের শক্তি জন্মে, এবং তাহা হইতেই শ্রীগুরুপ্রসাদ লাভ হয়। সাহজিক প্রীতি-জনিত সেবা-ফলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।



শ্রীগুরু-স্বরূপ

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিচরণ বাবুর পত্র

নোয়াখালি বিজয়নগর হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল লিখিয়াছেন—
“শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করায় আপনি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বারা আমার আশা ও পিপাসা নিবারণ না হওয়ায় অদ্য এই দীনহীন ভজন-বিহীন অজ্ঞান নিতান্ত বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে শরণাগত হইল। আপনি যে একজন দয়াল, পরদুঃখ-কাতর, পাপীর সহায় ও দরিদ্রের বন্ধু, তাহা আপনার ভূত ও বর্তমান কার্য্যদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এই নরাদম ও ঘোর পাপীর উদ্ধার-সাধনে বাঞ্ছা হয়, তবে নিজ-কার্য্যের একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিম্নলিখিত প্রশ্ণটির বিস্তৃত মীমাংসা জানাইয়া প্রতিপালিত, উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটে আমরা আপনার আদেশ, উপদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইব বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছি; তাহাতেই এই প্রশ্নের বিস্তৃত মীমাংসা (বিরুদ্ধ-বাদ খণ্ডনপূর্বক) জানিবার জন্য মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। এইক্ষণ আপনার স্নেহ ও দয়ার উপর নির্ভর।

“শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুই পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি মত ও বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বড়ই বিপদ ঘটিয়াছে।

কোন পথ সত্য, সুতরাং কোন পথ অবলম্বন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ধর্ম-গ্রন্থ ব্যাখ্যাকারগণের ভাব ও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং যাই কোথা? কাঁহার কথা বিশ্বাস করি?

“কেহ বলেন—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলেই বাঞ্ছিত কার্য সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন—তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিলে অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীভগবানের পার্যদ বা প্রিয়তম ভক্ত জ্ঞান করিয়া ভজন করিতে হইবে।

উভয়পক্ষই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত বহুতর শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আমি এপর্যন্ত শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছি না।

“এইক্ষেণে মহোদয়ের নিকট নিতান্ত বিনয় ও কাকুতিভরে প্রার্থনা এই যে, এ সম্বন্ধে আপনার বিশুদ্ধ মতটী (যাহা আমরা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য্য করিয়া লইব) বিস্তৃত মীমাংসা-সহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যের সাহায্যে জানাইলে পরমোপকৃত হইব। তর্ক করিয়া বিরুদ্ধবাদীকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রার্থী হইলাম। শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বারা বিরুদ্ধবাদ খণ্ডিয়া কাহাকেও কিছু প্রবোধ দিতে পারি না।

সুতরাং, এইবার আর ঐরূপ গ্রন্থ দেখিবার আদেশ না দিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেকগুলি মূর্খ ও সন্দিক্ত ব্যক্তির অপার উপকার করা হইবে।

এপত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এস্থানের অনেক লোকই বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ-পানে চাহিয়া রহিল। অতএব কৃপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।”

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত) সদুত্তর :-

অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত অশুদ্ধ

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কন্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তু-মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তিমার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুতত্ত্বসহ ষট্‌তত্ত্বাঙ্ক

শ্রীমহাপ্রভুর মতে, তত্ত্ব—অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথক্ ধর্মবিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টি ভিন্নতত্ত্বে প্রকাশমান। ১) গুরু-তত্ত্ব, ২) শ্রীবাসাদি ভক্ত-তত্ত্ব, ৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, ৪) স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ৫) গদাধরাদি নিজ শক্তি-তত্ত্ব, ৬) শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১১, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

৬) স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ-স্বরূপ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ, প্রিয়তম ভক্ত,

সুতরাং তদপেক্ষা বড়

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্বতা করা হয়।

“কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য-আস্বাদন।”

“কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ।”

“ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।

সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।”

“নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।”

“আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।”

“সেই অভিমানে-সুখে আপনা পাশরে।”

“কৃষ্ণদাস-অভিমান যে আনন্দসিদ্ধি।

কোটা ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু।”

“মুই সে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।

দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ।”

“সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।

অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর।”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই সকল পদ্য, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুতত্ত্ব বিচার

ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না—উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্য বুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম

জানেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।” অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টিব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমরাদিকে আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই—

“বয়স্তু সাক্ষাদভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যঃ ক্ষণসঙ্গমেন।

সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্ তমং ত্বাদ্যগতিং গতঃ স্ম ॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্ তমং সদ্ভেদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেযা। শ্রীশিবো হ্যেযাং বঙ্কুণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥” (ভক্তিসন্দর্ভ—২১৩)

প্রাচীনবর্হি-তনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন, “হে ভগবন্, আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।” এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয় সখা বলিয়া নির্দ্বারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিচার

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসুনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥

(মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই সাধন কর। শ্রীশচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম সর্ব্বদা জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষুত্তত্ত্বের মূলবস্তু হইল্যে দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম ‘প্রার্থনা’র মধ্যে লিখিয়াছেন—

“সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পুরি,
দৌহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব।”
“হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দড় করি ধর নিতাই পায়।।
সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।” (প্রার্থনা)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“সাক্ষাৎকারিত্বেন সমস্তশাস্ত্রে-

রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সঙ্টিঃ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তস্য

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।” (গুরুবাক্য—৭)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বিবেচিত হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিক্ষা

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তৎশিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রহে লিখিয়াছেন—“শ্রীমহাপ্রভুশেষ-নির্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুরুবান্ ভক্তিতঃ।” অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তিসহকারে পূজা করিবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘হরিনাম-চিন্তামণি’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।

গুরু, কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু।।

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত; শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক-ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দুষিত করিবে।”

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ২৯মাঘ, ১৪১১, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

(শ্রীল প্রভুপাদের) নিজ উপদেশ

এসম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এইপত্র সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপন লিখিত হইয়াছে—“ইহা পূর্বাচার্য্য. গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ।” অত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটী আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—“সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।” কিন্তু কার্য্যার্থ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাসবাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তিবিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ দ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দঃখ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ॥

যেই কষতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক গুরু তিন প্রকার

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার। শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু, এবং মন্ত্রগুরু। বস্তুপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণগুরু, অনেক স্থলে ভজনশিক্ষাগুরু একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্রকুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্বক ভগবদ্ভক্ত গুরুর চরণাশ্রয় কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুর্তে বিশেষ নাই, স্বীকার করেন না। শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

“তস্মিংশ্চিন্মাত্রেহপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা
বর্তন্তে তাংস্তে বিবেকুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনী জ্যোতিষি জ্যোতিস্মাত্রেহপি
যে মণ্ডলান্তর্বহিঃশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্ ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষান্তাং-
শ্চ স্মৃচ্ছুধী ন ক্ষমন্তে ইত্যম্বয়ন্তদ্বৎ। পূর্ববচ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিত
ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিঃ ভবেৎ।” শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদবুদ্ধিতে দর্শন
করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা)
মহৎকৃপা-বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি

হয়। তখন ‘বন্দে গুরুন’ প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যভিলাষে রুচি হয়। কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।

শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাসে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

এই মহাবাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গুরুতর পুরস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সূতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন কিন্তু শ্রীভগবদ্দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে।

তাজ্য গুরুর পরিচয়

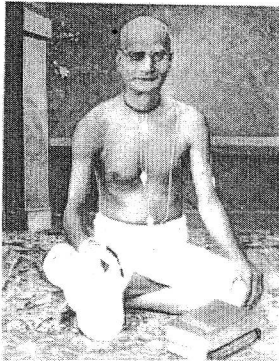
গুরুকে দুনৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছবান, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীবহিংসাপর লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মদ্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ অমর্ত্য অপ্রাকৃত গুরুবাশ্রয় অবশ্য কর্তব্য। চতুর্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমুরগণানুগ বর্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি, স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনই সুফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরম প্রিয় ; সূতরাং মুকুন্দ নহেন।

আচার্য্যবর্গের মতের পুনরালোচনা

শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনায় ‘নিতাই-পদকমল’ প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রাই বুঝিতে পারেন যে গুরুদেব সঙ্ঘিনী, হ্লাদিদীনী বা সঙ্ঘিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান, কেবল সঙ্ঘিৎ-শক্তি পরিচয় তাঁহার স্বন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্ব্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে। যথা—

“শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তত্ত্তজ্ঞান্ শ্রীগুরুবাদীন ভক্তিতঃ।” এইসকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে স্বার্থান্ধ

হইয়া শ্রীগুরু সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এইপ্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্বেষণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।



শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

জগদগুরু পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রদ্ধাঙ্গন কেশব
গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুচুড়া

তারিখ—২৪শে মাঘ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ৭।২।১৯৫০

প্রতি বৎসরই আপনাদেরকে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আহ্বান করে থাকি এবং এ-সম্বন্ধে বহু বিষয়ই আপনাদের নিকট নিবেদন করেছি। শ্রীব্যাসপূজা কি—সেটা সর্বপ্রথম আমাদের জানা কর্তব্য। ‘শ্রীব্যাসপূজা’ অর্থে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসেরই পূজা নয়—শ্রীব্যাসের অনুগত গুরুবর্গের পূজাকেও তা লক্ষ্য করে। প্রায় ৪৫০ বৎসর আগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্গনে এই ব্যাসপূজার প্রচলন করেছিলেন। তারপর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ সমগ্র ভারতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বিশুদ্ধ ব্যাসপূজার পুনরায় প্রবর্তন করেন।

শাক্ত-সম্প্রদায়েও আমরা ব্যাসপূজার প্রচলন লক্ষ্য করে থাকি। কিন্তু সেটা ব্যাসপূজার ভাগ মাত্র। কারণ, পূজ্যবস্তুকেই ত’ আমরা পূজা করে থাকি এবং সেই পূজ্যবস্তু ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়-শূন্য—সেটা জেনেই তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ আমরা নির্বিচারে নিষ্কপটে পালন করি। কিন্তু যেখানে তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষে দুষ্ট—এইপ্রকার বিচার বা সংশয় এসে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে তাঁর প্রতি পূজ্যবুদ্ধি থাকল কোথায়? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আচার্য্য শ্রীশঙ্করের সেই সংশয়ের কথা জ্ঞাপন করেছেন,—

“ব্যাস ভ্রান্ত বলি” সেই সূত্রে দোষ দিয়া।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭২)

আমি ব্যাসকে মানবো, তাঁর পূজা করবো, অথচ তাঁর বিচার স্বীকার করবো না—এমন কথা অসম্ভব। শ্রীগুরুদেবে ও শ্রীব্যাসদেবে এইপ্রকার মর্ত্যবুদ্ধি এবং সংশয়ই জীবের অধোগতির কারণ—এতে জীবের নরকগমন অবশ্যভাবী। তাই শাস্ত্র বলছেন,—“ন মর্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ”, “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”। শ্রীশঙ্কর স্বয়ংই শ্রীল বেদব্যাসকে ভ্রান্ত বলেছেন।

সুতরাং ব্যাসের বিচারকে যাদের ভ্রান্ত বলে ধারণা, তাদের পক্ষে ব্যাসপূজা বিড়ম্বনা মাত্র। এটা “ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া” বা “খড়জাঠিয়া”র মতো ব্যাপার। সুতরাং আমাদেরকে প্রথমেই শ্রীব্যাসের অনুগত হতে হবে এবং তাঁর বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ করে জগতে তার প্রচারে ব্রতী হতে হবে। বিগুহভাবে শ্রীব্যাসপূজাকে প্রচলন করতে আমাদেরকে সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আপনারা সকলে শ্রীব্যাসের অনুগত হন, শ্রীব্যাসপূজায় আত্মনিয়োগ করুন। দেখবেন, এতে কোন প্রকার অভাব অসুবিধা থাকবে না। সংসারে যাবতীয় অমঙ্গলরাশি এতে বিদূরিত হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন—ধর্মনীতির সাথে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির কোন সম্বন্ধই নাই, সুতরাং ধর্ম পালন করলে তাতে সংসারের অভাব-অভিযোগ কিভাবে মিটবে? সেখানে আমার বক্তব্য যে, আপনারা শ্রীব্যাসের লিখিত শাস্ত্র-অনুযায়ী ধর্ম আচরণ করুন, ধর্মপথে চলুন—দেখবেন, এতে সমস্ত অভাব অভিযোগের সমাধান হয়েছে। প্রকৃত ব্যাসানুগত্য ছাড়া অন্য কোনপ্রকার খেলালী ধর্মের দ্বারা কোনও মঙ্গল হবে না, হতে পারে না। ধর্ম অর্জ্জন করতে গেলে তাতে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি কোনটাই বাদ পড়বে না—বরং এইগুলি আপনারদের অনুকূল হয়ে যাবে।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন—প্রাচীন শাস্ত্রপুঁথি এখন আর চলবে না, মশাই। ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্রগ্রন্থ সমস্তই এখন যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীব্যাসদেব—ভগবানের শক্ত্যবেশ-অবতার, তিনি ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকার। সুতরাং তাঁর রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বপ্রকারের নির্দেশই আছে। তিনি সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত বিষয়েই পারঙ্গত ছিলেন এবং তাঁর সেইসব শাস্ত্রগ্রন্থে তিনি ঐ বিষয়গুলি প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করেছেন এবং সে-সম্বন্ধে অনেক উপদেশও দিয়েছেন। বর্তমানে বৃটিশ বা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনগুলি সমস্তই প্রাচীন সংহিতা হতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও হিন্দু, ব্যাকরণ, কল্প, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি আমাদের সনাতন শাস্ত্রেরই দান। আজও

যার বলে আমরা প্রতিদিন জোয়ার-ভাটা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি নিরূপণ করতে পারছি ; বিভিন্ন লতা-গুল্ম হতে ভৈষজ্য প্রস্তুত করে প্রাণরক্ষা করছি, তার সকলই আর্থ্যাথিগণের দান। পাশ্চাত্যদেশে বর্তমানে যে বিজ্ঞানের নানা উন্নতি দেখা যাচ্ছে, এবং বিজ্ঞানের নানা বই প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি ব্যাসের পুরাতন পুঁথিরই ভাষান্তর মাত্র। তাতে যাঁরা গৌরব বোধ করছেন—পুরাতন কথা নূতনভাবে বলতে পারলে যেটুকু কৃতিত্ব, তাঁরা ততটুকুই সম্মান পেতে পারেন। আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রে কোনটারই অভাব নেই। আমাদের শাস্ত্রকার মহর্ষি রাজর্ষিগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্যও পালন করতেন—তাঁদের কোন বিদ্যারই অভাব ছিল না।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সব নাস্তিক, পণ্ডিতাভিমानी হয়ে পড়ছেন এবং নিজদেশ-শ্রীকাতর হয়ে তাঁরা সেই পাশ্চাত্যশিক্ষার বহুমানন করছেন—এটাই তাঁদের পরাধীনতা। তাঁরা বলে থাকেন—‘ধর্ম’ ‘ধর্ম’ করলে চলবে না, ধর্মের দ্বারা আমাদের কোন অভাব মিটবে না—বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের কোন স্থান নেই—বর্তমান ভারতকে মুক্ত করতে হলে উপযুক্ত কম্বীবীরের প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রের নৈতিক অধঃপতন হলে সেই ধর্মহীন, নীতিহীন, দুর্নৈতিক রাষ্ট্র কখনই চলতে পারে না, ধর্মহীন রাষ্ট্রে কখনই সুখশান্তি সম্ভব নয়—এটাই তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে না। ধর্মই ভারতের অস্তিত্ব, ধর্মই ভারতের গৌরব, ধর্মই ভারতের শাস্তিদাতা। সেই সর্বোত্তম সনাতন ধর্মশাস্ত্রের যিনি প্রণেতা, সেই শ্রীব্যাসদেবই আমাদের সর্বকালে সর্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক—এটা ভারতবাসী যেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে, সেইদিন হতে তাদের শৃঙ্খল হতে প্রকৃত মুক্তিলাভ আরম্ভ হবে, এবং পরাশান্তির সন্ধান পাবে।

ধর্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য। তাই খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী Reverend Bishop স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—“India guided by God can lead the whole world back to sanity.” তাই আপনাদের অনুরোধ করছি, আহ্বান জানাচ্ছি—আপনারা সকলে শ্রীব্যাসের আনুগত্যে সনাতন ধর্মের অনুসরণ করুন। শুধু আপনাদেরকে কেন, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই এই সনাতন ধর্মগ্রহণ করে নিত্যশান্তি লাভের জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীব্যাসদেবই এই সনাতন-ধর্মপদ্ধতির মূল নিয়ামক। তিনি সারা পৃথিবীর জন্য লক্ষ লক্ষ শ্লোক রচনা করে গেছেন। আমার গুরুদেব পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ, যাঁর জন্মদিনে আমরা এখানে সকলে সমবেত হয়েছি, তিনি ব্যাসপূজার এই পদ্ধতিখানা সংগ্রহ করেছিলেন। পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার সংশোধন করেছেন। বর্তমানে এর বহুল প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে কোন কারণেই হোক, তাঁদের প্রকটকালে সেটি প্রচলিত হয়নি, অনুষ্ঠিত হয়নি।

বৎসর দুই আগে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেই সেই পদ্ধতি অনুসারে সর্বপ্রথম পূজাপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজার প্রচলন হয়েছে। আমরা এই ব্যাসপূজা পদ্ধতি টীকাটিপ্পনী ও অনুবাদ-সহ সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্য করে প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটা কার্য্যে পরিণত করতে পারিনি।

শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিতে অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের সেবার সুন্দর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়েছে। অধোক্ষজ-সেবকের অন্তরনিষ্ঠা আর মায়াবাদীর অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। মায়াবাদীর সঙ্গ ও কবল হতে পরিত্রাণ পেয়ে অধোক্ষজ বস্তুর সেবালাভের জন্যই শ্রীসনাতন ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান—সেটাই শ্রীল প্রভুপাদের আচারে ও প্রচারে প্রকাশ পেয়েছে। ‘প্রত্যক্ষ’ ‘পরোক্ষ’ ও ‘অপরোক্ষ’-জ্ঞান পর্য্যন্তই মনোধর্ম্মের রাজ্য—আর, ‘অধোক্ষজ’ সিদ্ধান্ত হতেই আত্মধর্ম্মের আরম্ভ। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তে ইতর-ব্যোমের কথা বা নির্বিশেষ্য ভাব নিরস্ত হয়ে সেখানে পরব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। এই অধোক্ষজ-বস্তু পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত হয়ে থাকেন—১) অর্চা, ২) অন্তর্য্যামী, ৩) বৈভব, ৪) বুহ ও ৫) পর—এই পাঁচ প্রকার তাঁর ক্রমবিকাশ। পঞ্চোপাসকেরা মনে করেন,—নির্বিশেষ্য ব্রহ্মের বহুরূপ কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হতে শ্রবণের সৌভাগ্য হলে জানতে পারা যায় যে, ব্রহ্মের বহুরূপ হতে পারে না—একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেরই বহু অধোক্ষজ নিত্যরূপ ও স্বরূপসিদ্ধ রূপ বর্ত্তমান আছেন। নির্বিশেষ্য ব্রহ্মের বহুরূপ কল্পনা করলেই তাতে পঞ্চোপাসনা, মায়াবাদ এসে উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় অধোক্ষজ-পূজাপঞ্চকই জীবকে এই মায়াবাদ ও পঞ্চোপাসনা হতে রক্ষা করেন।

পূজাপঞ্চক বললে স্মার্ত্তের পঞ্চোপাসনা বুঝায় না। পঞ্চোপাসনা কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত। জ্ঞানমার্গীও পঞ্চোপাসনা ও পূজাপঞ্চক স্বীকার করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল পূজাপঞ্চকেই ব্যাসানুগত্য বলে মান্য করেন। সেখানে ‘কৃষ্ণপঞ্চক’ের পূজার কথা দেখতে পাওয়া গেলেও তাতে পাঁচজন কৃষ্ণ বুঝায় না—কৃষ্ণতত্ত্ব-পঞ্চকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে। ‘কৃষ্ণ-তত্ত্বপঞ্চক’ বলতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে—এঁরা সকলেই তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ। ‘তত্ত্বপঞ্চক’ের পূজা সম্বন্ধে শ্রীমত্তত্ত্বপ্রভুর অনুগত সকলেই পঞ্চতত্ত্বের পূজাপদ্ধতির সংবাদ রাখেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ব্যাসপূজা-পদ্ধতির মধ্যে কৃষ্ণপঞ্চকের পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেব্যতত্ত্বের পূজা ছাড়া কেবলমাত্র সেবকতত্ত্বের পূজা শাস্ত্রবিহিত নয়। আবার সেবকতত্ত্ব ছাড়াও কেবল সেব্যের পূজা শাস্ত্র অনুমোদন করেন না। কৃষ্ণপঞ্চক শ্রীব্যাসের উপাস্য বা সেব্য, সেজন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ও তা মেনে নিয়েছেন। আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চোপাসনার কথা প্রচার করলেও ব্যাসপূজার ক্ষেত্রে কৃষ্ণই যে শ্রীব্যাসের

উপাস্য, তা তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছেন। এতেই বুঝা যায়—ব্যাস শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ ও মূলপুরুষ বলে প্রচার করেছেন—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্”।

বর্তমানে হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে। কিন্তু ‘সংস্কৃত’ রাষ্ট্রভাষা হলে, কি রাজনৈতিক, কি ধার্মিক, কি সামাজিক কারও অসুবিধা হত না ; পক্ষান্তরে সকলের সুবিধাই হত। সকলেই তখন বাধ্য হয়ে শ্রীব্যাস-প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করতেন—এতে তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি সংশোধন করতে পারতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন তথ্য ও কৃষ্টি উদ্ধারেরও সুযোগ পেতেন। সংস্কৃতভাষাকে সুষ্ঠুরূপে আলোচনা না করায় আমরাই তাকে Dead Language করে দিয়েছি এবং এর ফলভোগও আমরা প্রচুর পরিমাণে করছি। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা সংস্কৃত শিক্ষায়-শিক্ষিত হয়ে জাহাজে করে ভারত হতে যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থরাজি তাঁদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আজ তাঁরা বহু বিষয়ে উন্নত। আর ভারতবাসী তার নিজস্ব সম্পদ হতে দূরে থেকে সে-সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে এখনও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারি।

মায়াবাদীদের জন্য হিন্দীভাষা কিন্তু একপ্রকার প্রমাদবিশেষই, বলতে হবে। কারণ, হিন্দী-ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গের স্থান নেই। তাতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ মাত্র আছে। সুতরাং হিন্দীভাষায় ব্রহ্মের লিঙ্গ নিরূপণ করতে মায়াবাদীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। তাঁরা নির্বিশেষ ক্লীব-ব্রহ্মের উপাসক—কিন্তু এখন তাঁরা রাষ্ট্রের চাপে পড়ে হিন্দীভাষা-অনুসরণে ব্রহ্মের পুরুষ-লিঙ্গ স্থির করতে বাধ্য হবেন। আর, ‘ব্রহ্ম’ পুরুষ হলেই মায়াবাদীদের পক্ষে বিশেষ বিপদ জানতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস সনাতন-ধর্মের মূল পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁর আনুগত্যেই আপনারা সকলে সনাতনধর্ম যাজন করুন। আমার বিশ্বাস, সমগ্র বঙ্গদেশ, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতের প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে যেদিন শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন হবে এবং তা সমাদর লাভ করবে, সেদিন হতেই ভ্রান্তবাসী তার লুপ্তগৌরব ফিরে পেতে সমর্থ হবে এবং তার ফলে পরাশান্তি লাভ করবে।

পরিশেষে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীব্যাসপূজা-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি—
“শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেরই বিহিত অনুষ্ঠান। তবে তুর্যাশ্রমিগণ (চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিগণ) ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্তে (শ্রীভারতবর্ষে) শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ‘ব্যাসানুগ-সম্প্রদায়’-নামে প্রসিদ্ধ।

তঁাহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষ স্ব-স্ব জন্মদিনে পূর্বগুরুবর্গের পূজা বিধান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তঁাহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহ স্বধর্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক-দিবস।”

—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)



শ্রীমৎ তুর্য্যশ্রমী মহারাজের আশীর্বাদ-পত্র*

শ্রীপাদ বামন মহারাজ সমীপেষু—

স্নেহ, দৈন্য, ভক্তিপূর্ণ প্রীতি-পত্র তব।

পড়িয়া পাষণ-প্রাণ হৈল কিছু দ্রব।

সহজ সরল মৃদু মঞ্জুবানী সব।

বৈষ্ণবে বসতি করে মানদ স্বভাব॥

তোমার হৃদয়খানি জানি পত্র-দ্বারে।

পত্রখানি সেইহেতু পড়ি বারে বারে॥

মিত-বাক্যে সার-কথা বর্ণিতে সমর্থ।

সিদ্ধান্ত-সম্মত সব, নাহি কিছু ব্যর্থ॥

বাগ্মীতা বলি তারে বলে বুধগণ।

তোমার বাণীতে আছে সে সব লক্ষণ॥

বয়সে নবীন তুমি বুদ্ধিতে প্রবীণ।

সেবাতে সোৎসাহী সদা অভিমান-হীন॥

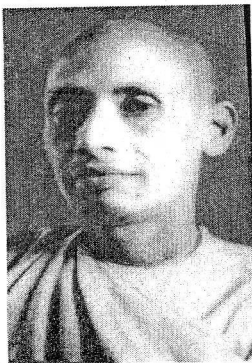
দারুণ দেহ-পীড়া তোমায় না কৈল ক্লিষ্ট।

অল্লান-বদনে সহি সেবিলে যে ইষ্ট॥

*এই কবিতাটি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় (৩১ আশ্বিন, ১৩৬২, ইং ১৮।১০।১৯৫৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। আশীর্বাদক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যশ্রমী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত জন এবং তিনি যঁাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তঁাহার আপন পিতৃব্য পরমপূজনীয় ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের তিনি বাল্যবন্ধু।

সেবকের সেবা-ব্রত, দেহ-মনোধর্ম।
 টলাইতে নাই পারে শিখালে সে-মর্ম॥
 কৃষ্ণের যতেক গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চারে।
 লেখক-লেখনী তাহা বর্ণিতে না পারে॥

গৌর-বাণী প্রচারিতে মৃদঙ্গ মুখ্যঙ্গ।
 বিষ্ণু-বার্তাবহ প্রেস বৃহৎ-মৃদঙ্গ॥
 জীবন্ত মৃদঙ্গ স্বরূপ ত্রিদণ্ডি-যতি।
 এই কথা শিখাইল প্রভু সরস্বতী॥
 (সেই) জীবন্ত মৃদঙ্গের মূর্তি ত্রিদণ্ডীর বেশে।
 বৃহৎ মৃদঙ্গ মুদ্রা যন্ত্র অনায়াসে॥



নীরব সেবা তোমার প্রতিষ্ঠাশা-হীন।
 প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী তুমি, বয়সে নবীন॥

শব্দ-ব্রহ্মে রেখা বন্ধে (আর) কীর্তন প্রবন্ধে।
 দুইরূপে কৃষ্ণ-কথা জীবের কর্ণরন্ধ্রে॥
 প্রদানিতে পত্রিকা পাঠাও দ্বারে দ্বারে।
 সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা কার্য জীবের উদ্ধারে॥
 পরোপকারের এই মহান বারতা।
 মহাপ্রভুর বাণী যাহা ভোগ-মোক্ষ-ব্রাতা॥

নারসিংহ মহারাজ সঙ্গামৃত হৈতে।
 তোমাদের প্রতি স্নেহ ছিল পরোক্ষেতে॥

(এবে) তোমাদের ভক্তি দেখি তাহা পুষ্ট হইল।
নিখুঁত আদর্শে তাহা থাকে যেন অটল॥
সেবিও সেই মহারাজে সতত সন্তোষে।
তঁাহার সন্তোষে সিদ্ধি লভিবে বিশেষে॥
চৈতন্য-মঠের বার্তা শুনি তঁার মুখে।
দণ্ডবন্থতি আমার জানাইও তাঁকে॥

সমিতির সর্ব্বময় সেবাধ্যক্ষ* যিনি।
মাদৃশ বরাকে তাঁর কৃপা-দৃষ্টি আনি॥
প্রগতি জ্ঞাপন করি' জানাইও তাঁহায়।
কেশবে অচলা ভক্তি যেন মোর হয়॥
সেবাবীর যুধিষ্ঠির শ্রীমথুরা ধামে।
স্থাপিলেন 'কেশবজী মঠ' কেশব-জন্মস্থানে॥
তাঁর কৃপাদেশ তুমি পালিছ যতনে।
দেখিয়া শুনিয়া সুখ পাইনু বড় মনে॥

নীরব সেবা তোমার প্রতিষ্ঠাশা-হীন।
প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী তুমি, বয়সে নবীন॥
বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষ্ণু ভগবান্।
'বলি'রে ছলিতে প্রভু হইল বামন॥
তাঁর পদে প্রতিপদে, বাড়ে যদি রতি।
তবে ত সকল সেবার হৈল সঙ্গতি॥

বৈষ্ণবের গুণ গাণে ঘুচে সর্ব্বপাপ।
সেই আশে মুই কিছু করিনু প্রলাপ॥
পত্রখানি মুদ্রিত হলে হবে মনে সুখ।
সম্পাদক সম্পাদনে না হন বিমুখ॥

—ত্রিদিগ্‌শ্রমী শ্রীশ্রীমন্ত্তিসম্বন্ধ তুর্য্যশ্রমী মহারাজ।



(*)—জগদগুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১১, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫



শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমস্বামী বামন গোস্বামী মহারাজের
শুভাবির্ভাব-তিথিতে
শ্রীল ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী
মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, পুরী (উড়িষ্যা),

তারিখ—২১-১২-১৯৮৯

আগন্তুক শ্রোতৃমণ্ডলী! আমার স্নেহের * * * গতকাল আমাকে গিয়ে বলল যে, ‘মহারাজ! আগামীকাল আমাদের গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি। আপনি অসুস্থ, তথাপিও যদি গিয়ে কিছু হরিকথা পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা খুব খুশী হব। তাই আমি আজ এখানে এসেছি।’ বর্তমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য—পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমস্বামী বামন গোস্বামী মহারাজ। আমি যতটা জানি—যদিও সেখানে প্রত্যক্ষ আমি ছিলাম না, যখন শ্রীল কেশব মহারাজ অসুস্থ লীলাভিনয়কালে এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য নির্ণয় করে যান, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ আমাকে বলেন যে, —মহারাজ! কেশব মহারাজের শারীরিক অবস্থা সুবিধার নয়। তিনি শেষ সময়ে বলে গেছেন যে, ‘বামন মহারাজ শ্রীসমিতির আচার্য হবেন।’ এখন সমিতির আচার্য শ্রীপাদ বামন মহারাজ। আমরা দুজনে একসঙ্গে বছবৎসর মায়াপুরে কাটিয়েছি। তখন আমরা ছিলাম ছেলেমানুষ। মায়াপুর তখন জঙ্গল। নরহরি দাদা এবং বিনোদ দাদা ছিলেন আমাদের অভিভাবক। তাঁদের কথামত উঠেছি, বসেছি। আজ তাঁরা নাই। তাঁরা প্রকট না থাকলেও নিত্যধাম থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন। আমাদের মত নন তাঁরা।

অধুনা কতকগুলো লোক ‘গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত’ বলে পরিচয় দিয়ে বহু অসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা বলছেন। তাদের অন্ততঃ প্রভুপাদের শিষ্য আমরা যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন স্বীকার করব না। যেমন তারা বলছে,—আচার্যের জন্মতিথি প্রতিপালিত হবে না, যেদিন দীক্ষা নিয়েছেন সেদিন প্রতিপালিত হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত, কখনই হতে পারে না। শাস্ত্রে বলছেন,—“ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র। বৈষ্ণবের জন্মতিথি সে হেন পবিত্র।” জন্মটা হচ্ছে কর্মফলবদ্ধ জীবের। ভগবান বা বৈষ্ণবগণ জগতে যে আসেন, সেটা তাঁদের

জন্ম নয়—আবির্ভাব। আর যখন তাঁরা চলে যান, তখন সেটা তিরোভাব। তাঁরা যে তিথিটাকে অবলম্বন করে আসেন, সে তিথিটা শিষ্যদের কাছে পরম পবিত্র এবং সেটা পালন-যোগ্য। সেই তিথি পালন করলে হরিভক্তি হবে, না করলে অন্যথা করা হবে। ‘আবির্ভাব-তিরোভাব—বেদে মাত্র কয়।’ সূর্য্য উদিত হচ্ছেন মানে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করছেন—এটা বলা ভুল। আবার সূর্য্য অস্তাচলে চলে গেছেন বলতে তিনি মারা গেছেন এটাও—ভুল সিদ্ধান্ত। আমাদের নিকট এসে যখন উপস্থিত হন, তখন সেটা আবির্ভাব; যখন চলে যান সেটা তিরোভাব। তাঁরা আমাদের মত জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না। এইজন্য গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন॥

আমার জন্ম এবং কৰ্ম্ম দিব্য। দিব্য মানে অলৌকিক, ব্যবহারিক নয়। একটা লৌকিক—ব্যবহারিক, আর একটা পারমার্থিক। ব্যবহারিক ও লৌকিকের সঙ্গে পারমার্থিকটাকেও এক করে ফেললে অপরাধ হয়ে যাবে।

আজ শ্রীপাদ বামন মহারাজের আশ্রিত যারা আছেন, তারা ভাগ্যবান। গুরুত্বটা কি? সেটা বুঝে নিয়ে চলবার চেষ্টা করবেন, যে যাহাই বলুন না কেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, চোখে দেখি না, অনেক সময় জানা জিনিস মনে আসে না। সেজন্য আজকের আলোচনা করবার জন্য আমি পরপর কয়েকটা Point লিখে এনেছি। সেইটা পড়ে আপনাদের কাছে বলবার চেষ্টা করছি। জিনিসগুলো বুঝবার চেষ্টা করবেন। শাস্ত্র বলেছেন,—

আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষণম্।

বিশ্রুন্তেন গুরোঃ সেবা সাধু-বৰ্ণানুবৰ্ণনম্॥

পরমার্থ-পথের পথিক হতে গেলে, ভগবানের কাছে যেতে গেলে ‘আদৌ গুরুপাদাশ্রয়’। ‘আশ্রয়’-শব্দের অর্থ কি? —আশ্রয়-শব্দের অর্থ হল দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষা নিতে হবে। শুধু দীক্ষা নিলে হবে না, শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাছ থেকে। আর কি? বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করতে হবে। হ্যাঁ, আমি এঁর সেবা করলে পরে আমার কল্যাণ হবে—এই বোধটা রাখতে হবে। লৌকিক-ব্যবহারিক নয়, পারমার্থিক বিশ্বাসটা রাখা প্রয়োজন। ‘বিশ্বাস’-শব্দে কি বলেছেন—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকৰ্ম্ম কৃত হয়॥

—একেই বলেছেন বিশ্বাস। ‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস। বিশ্বাসটা কিরকম? তাঁর আদেশ প্রতিপালন করলে আমার কল্যাণ হবে—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে শিষ্য চলবে, তার আত্মকল্যাণ হবেই। কিরকম?—‘বিশ্রুন্তেন গুরোঃ সেবা সাধু-বৰ্ণানুবৰ্ণনম্’।—আমরা যে সৎপথে চলব, সেই সৎপথের দৃষ্টা হচ্ছেন

তিনি। তিনি দেখিয়ে দেবেন পথ। এই হচ্ছেন গুরুতত্ত্ব। এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে।

আর কি বলছেন,—‘তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিহ্বাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্’। কেন গুরু করব? গুরুকরণটা কি লৌকিকতা, ব্যবহারিকতা?—না, এটা লৌকিকতা নয়। ‘জিহ্বাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্’—এখানে শ্রেয় এবং উত্তম দুটো শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিরকম শ্রেয়?—উত্তম শ্রেয়। শুধু শ্রেয় বললে হবে না। উত্তমশ্রেয়—বাস্তবকল্যাণের জন্য গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে। সেই গুরু কেমন?—‘শাব্দে পরে চ নিষগতম্’—তিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিষগত। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম একটাই জিনিস—Identical। এই জগতের যে শব্দ, সেটা Material Sound, সেটা শব্দব্রহ্ম নয়, শব্দসামান্য। আর পরজগতের যে শব্দ, সেটা Transcendental Sound—অপ্রাকৃত শব্দ। সেইটাই হল শব্দব্রহ্ম। অতএব তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষগত। আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তিনি ভগবানের নিকটেই রয়েছেন। এই উপলব্ধিটুকু থাকবে—এইজন্য গুরুপদাশ্রয়। তা না হলে আর কিছুর জন্য নয়। সেই গুরুর লক্ষণ কি?—গুরুর লক্ষণ বহু আছে। আমি কিছুটা আলোচনা করব। তিনি কিরকম?—তিনি কৃপাসিদ্ধ, কৃপার সমুদ্র, দয়ার সাগর। তিনি সুসম্পূর্ণ। সেখানে কোন অভাব আছে, অসম্পূর্ণতা আছে—এই বোধ যেন শিষ্যের না হয়। তিনি সম্পূর্ণ, সর্বসত্ত্বোপকারক—সকল সত্ত্বার উপকারক। তাঁর কাছে যে যাবে, তারই কল্যাণ হয়ে যাবে। চেতন জীব তাঁর সংস্পর্শে গেলেই কল্যাণ লাভ করবেই করবে, এমন কি জড়বস্তু পর্য্যন্তও। গুরুর যে পাদুকাটি, সেটা জড় না চেতন? কিন্তু সেটাকে আমরা প্রণাম করছি। কেননা পাদুকাটি গুরুদেবের সংস্পর্শে গিয়ে প্রণম্য হয়েছে। শ্রীগুরুদেব হলেন নিঃস্পৃহ। তাঁর কোন স্পৃহা নাই, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সর্বতোসিদ্ধ, সর্ববিদ্যাবিশারদ। সর্ববিষয়ে পারদর্শী তিনি। তিনি সর্বসংশয়চ্ছেত্তা—শিষ্যের যাবতীয় সংশয় ছেদন করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। শিষ্য একটা প্রশ্ন করল, গুরু উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি গুরু নন। গুরুদেব অনলস—তাঁর কোন অলসতা নাই। তাঁকে বলা হয়েছে গুরু, তিনিই গুরু। সকলেই গুরু হতে পারেন না।

অনেকে বলেন,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সমান। আমি বলছি না, শাস্ত্র বলছেন। হ্যাঁ, সমান বলেছেন, কি বিচার আছে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানবেন,—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তুবশে

ব্রহ্মাযুযাপি কৃতমুদ্রমুদঃ স্মরন্তঃ।

যোহন্তর্বহিস্তনুভূতামশুভং বিধুধ-

ন্নাচার্য্য-চৈতন্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

যিনি চৈতন্তগুরুরূপে আমার ভিতরে রয়েছেন, তিনিই মহাশুগুরুরূপে জগতে প্রকটিত। শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

অন্তর্যামিরূপে চৈতন্তগুরু আর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মহাশুগুরু অর্থাৎ দীক্ষাগুরু। এই দুটো রূপ তাঁর। যিনি অন্তর্যামিরূপে রয়েছেন, তিনিই আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে জগতে প্রকটিত রয়েছেন, তিনিই হলেন দীক্ষাগুরু। অতএব তাঁকে যদি অন্য কোনরকম বোধ করা যায়, তাহলে সুবিধা হবে না। কেউ কেউ বলছেন, দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরু অধিক পূজনীয়, প্রণম্য। এটা ভুল সিদ্ধান্ত। কেন? ভাল করে জিনিসটা বুঝতে হবে। শাস্ত্রে বলেছেন,—

মন্ত্ৰগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।

তঁাহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥

প্রথমে দীক্ষাগুরুর কথা বলেছেন, পরে শিক্ষাগুরুর কথা বলেছেন। দীক্ষাগুরুর একত্ব এবং শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারেন। সকলকে কি শিক্ষাগুরু স্বীকার করা যাবে?—না, কখনও নয়। শিক্ষাগুরুর মধ্যে গণ্য হচ্ছেন কে?—যিনি গুরু-বৈষ্ণব এবং ভগবানের সেবাসিক্ষা দিচ্ছেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবাসিক্ষা দিচ্ছেন না, তিনি শিক্ষাগুরুর মধ্যে গণ্য নহেন। তাঁর অভিমান আছে মাত্র, কার্যতঃ তাঁর দ্বারা কোন কল্যাণ হবে না।

শাস্ত্রে বলেছেন,—দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। তিনি যখন দীক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনি শিক্ষাও দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে দীক্ষা-শিক্ষাগুরু অভিন্ন। আর যেসব শিক্ষাগুরু তাঁহারা শিষ্যের নিকট দীক্ষাগুরুর ন্যায় সমান সম্মানের পাত্র নহেন। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়ে বসে আছেন। দীক্ষাগুরু আগে প্রণম্য, শিক্ষাগুরু পরে। বাবা ও কাকা দাঁড়িয়ে আছেন, আগে গিয়ে কি কাকাকে প্রণাম করবে ছেলে? তা কখনও হয় না। আগে পিতাই প্রণম্য, তারপর কাকা—এই হল শিক্ষা। এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। শাস্ত্র সেইজন্য বললেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

গুরুতত্ত্বটা কি? আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানবে। 'মাং বিজানীয়াত্'—আমার মত জানবে, 'নাবমন্যেত'—তাঁকে অবমাননা করবে না, নিন্দা করবে না। কেন?—'সর্বদেবময়ো গুরুঃ'—সমস্ত দেবতার যে শক্তি, সেই শক্তি গুরুর, যেটা দেবতাদেরও নাই। ভগবৎকৃপায় করুণাশক্তি, সর্বশক্তি সমন্বিত হচ্ছেন তিনি। কেন?—সর্বশক্তিমান্ ভগবান্কে তিনি দিতে পারেন। এরূপ আর কেউ পারেন না—দেবতারাও পারেন না। তাঁদের ঐ ক্ষমতা নাই। এই বিচারে তাঁকে দেখতে হবে। অতএব দীক্ষাগুরুরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘আদৌ গুরুপূজা’। কার পূজা হচ্ছে? আগে দীক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে, না শিক্ষাগুরুর পূজা হচ্ছে? আদৌ দীক্ষাগুরুর পূজা করতে হবে, শিক্ষাগুরুর নয়। দীক্ষাগুরুই সর্বপ্রথম পূজ্য। শ্রীগুরু এবং গোবিন্দ দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে প্রণাম করব আগে?— আগে গুরুকে প্রণাম করব, তারপর গোবিন্দকে প্রণাম করব। যদি এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষাগুরু আগে কি করে প্রণম্য হবেন? এরূপ বিচার সুষ্ঠু হতে পারে না। দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য অধিক হতে পারে না। যেখানে বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, সেখানে দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু—এই বিচার জানতে হবে। গুরুতত্ত্বটা এই রকম জিনিস।



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকাচার্য্য
জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রভঞ্জন কেশব গোস্বামী মহারাজ
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে পর
পরবর্তী সভাপতি ও আচার্য্য-পদে অভিষেক-কালে



জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের
বক্তৃতা

স্থান :—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ, নদীয়া
তারিখ :—২রা কার্তিক ১৩৭৫ (ইং ১৯।১০।১৯৬৮)
অঙ্গান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।
চক্ষুরান্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
 কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
 হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
 গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোহস্ত তে॥
 তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
 বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥
 বাঞ্ছাকল্পতরুভাষ্য কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
 পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরমপূজনীয় সভাপতি মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হাষিকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, অন্যান্য ত্রিদিগ্‌পাদবৃন্দ, সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ, আমার পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ (-----অস্পষ্ট)

আজ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ তিথি। আমার পূর্ববর্তী গুরুবর্গ সকলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করেছেন। তাঁদের শ্রীমুখ থেকে আপনারা শ্রীল গুরুদেবের মহিমার কথা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রবণ করেছেন। এমতাবস্থায় নূতন করে কিছু বলবার বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তাঁদের বিষয়াসী ভূত হিসাবে তাঁদেরই চর্কিতচর্কণ করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রকাশ করবার মত ভাষা বা ক্ষমতা, কোনটিই আমার নাই। তথাপি বৈষ্ণবগণের আদেশ পালন করতে গুরুপাদপদ্মের মহিমা ২/১টি কথায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। এ তাবৎকাল আমরা বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ থেকে গুরুপাদপদ্মের যে মহিমা শ্রবণ করেছি, তার মধ্য থেকে দুটি-একটি বিষয় আমরা বিশেষভাবে প্রণিধান করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি তাঁর পরমোপাস্যদেবের মনোহীষ্ট প্রচার করেছেন, তাতে যেটি তাঁর জীবনে খুব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটি দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে মহাজনগণের চরিত্রের মধ্যে দুইটি ভাগ দেখতে পাই—

“বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥”

“বজ্রাদপি কঠোরাণি”—এই ধর্মই তাঁর চরিত্রে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আবার “মৃদুণি কুসুমাদপি”—এটিও তাঁর মধ্যে সমভাবে দেখা গেছে। তিনি যে আদর্শ ও সত্যের নিভীক প্রচারক ছিলেন, তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমরা গুরুবর্গের মুখে শ্রবণ করেছি। এবং তিনি কত দয়াল ছিলেন, কত মৃদু ছিলেন, তারও প্রমাণ আপনারা যথেষ্ট পেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের বলবার বিষয় হচ্ছে এই যে, গুরুপাদপদ্ম আমাদের নিত্যকালের বান্ধব। যাঁরা সকলপ্রকার সাংসারিক বিষয়সুখ পরিত্যাগ করে, সাংসারিক মায়া-মমতা সবকিছু পরিত্যাগ

করে গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়গ্রহণ করেছেন, পারমার্থিক শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে এই ভজনপথে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের গুরুপাদপদ্মই হলেন একমাত্র গতি। সুতরাং সেই গুরুপাদপদ্মের আদর্শ, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ সেইটিই আমাদের একমাত্র জীবাতু হোক। আজ গুরুপাদপদ্মের বিরহবাসরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা যেন তিনি অলক্ষ্য থেকেও অশেষ আশীর্বাদ করেন, যাতে তাঁর কথা, তাঁর আদেশ-নির্দেশ, আমরা সর্বতোভাবে পালন করে সুষ্ঠুভাবে এ জগতে তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এবং তাঁর উপাস্য দেবতা যে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউ, তাঁরও মহিমা জগতে বিস্তার করতে পারি। আমার পরবর্তী বক্তৃমহোদয়গণ রয়েছেন, সুতরাং আমার সময় অল্প। আর তা ছাড়া আমার বলবার সামর্থ্য নেই, তা আমি জানিয়েছি।

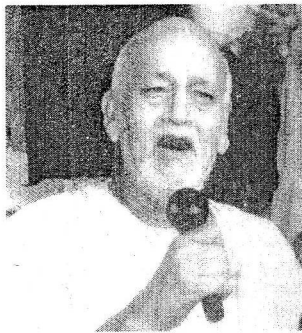
আমি সর্বশেষে এই নিবেদন জানাচ্ছি—এখানে আমার পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, ও স্নেহময় গুরুবর্গ সকলে উপস্থিত আছেন। বর্তমানে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আমি এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমার উপর যে গুরুভার অর্পিত হয়েছে, আমি তা জেনে উঠতে পারছি না, বুঝে নিতে পারছি না। তবে শ্রীগুরুদেবের আদেশ—তাই এটি আমাকে তা শিরোধার্য করতে হচ্ছে। এখন আমি যোগ্য কি অযোগ্য, তিনি সেটা বিচার করুন এবং অপরাপর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ তা বিচার করুন।

তবে তাঁদের কাছে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি, এই প্রতিজ্ঞা নিতে পারি, যে, আমি সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্মের আদেশ পালন করব। সেইজন্য সে-বিষয়ে তাঁদের সাহায্য, সহানুভূতি, আশীর্বাদ সবকিছুই প্রার্থনা করি। তাঁদের কৃপাশীর্বাদে হয়ত আমি সে সমস্ত কাজে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করব। এবং পরিশেষে আমি আমার সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণের শ্রীচরণে নিবেদন জানাই যেন তাঁরাও আমাকে অকপটে নিষ্কপটে সহায়তা করেন—তাঁদের সাহায্য সহানুভূতি সহযোগিতা ব্যতীত আমার এক পা-ও চলবার উপায় নেই।

আর গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা যেন তিনি অদৃষ্টে থেকেও যেন আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যেন তাঁর শেষ যে বাণী, সেই বাণীর যেন সার্থকতা সম্পাদন করতে পারি এবং তাঁর আদেশ পালন করে যেন আমাদের জীবন ধন্য করতে পারি। আর বৈষ্ণবগণের নিকটও আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা—তাঁরা যেন আমার উপর প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যাতে গুরুদায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। আজ এই পর্য্যন্ত বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥



শ্রীগুরু-পদাশ্রয়

—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

“কৰ্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।

পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥” (ভাঃ ১১।৩।১৮)

উক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রীপ্রবুদ্ধ ঋষি আমাদেরকে জানাইতেছেন—মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দুঃখ নাশ করতঃ সুখলাভের জন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু ফলকালে বিপরীত ফলোদয় ঘটয়া থাকে, অর্থাৎ দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখলাভ না হইয়া অধিকতর দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। ইহা যে অতীব সত্যকথা তাহা দু’-একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয়। যথা—অবিবাহিত যুবক বিবাহরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে সুখলাভই উদ্দেশ্য করেন। এই কৰ্ম্মদ্বারা দুঃখলাভ হউক—এরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু হয়! কৰ্ম্ম স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না। স্বাস্থ্যবতী ও রূপবতী ভার্য্যা বিবাহের অনতিকাল পরেই কোন ব্যাধি-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শীর্ণকায় চিররুগ্মা-রূপে পরিণত হইলেন, অথবা অল্পকাল মধ্যে সংসার পুত্র-কন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাভাব ও কন্যাদায় প্রভৃতি নানাবিধ অভাব ও দুঃখের সৃষ্টি করিল, অথবা নয়নমণি-স্বরূপিণী গৃহিণী আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ একটি না একটি বাধা আসিয়া কৰ্ম্মী-ব্যক্তিকে সুখের পরিবর্তে দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন), নাসাতে পশিল কীট।

‘ইক্ষুদণ্ড’ ভাবি’ কাষ্ঠ চুষিলি (মন), কেমনে পাইবি মিঠা॥

‘হার’-বলিয়া, গলায় পরিলি (মন), শমন কিঙ্কর-সাপ।

‘শীতল’ বলিয়া, আগুন পোহালি (মন), পাইলি বজর-তাপ॥

সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাজ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা।

ইহ-পরকাল, দু’কাল খোয়ালি (মন), খাইলি আপন মাথা॥

(মনঃশিক্ষা)

কৰ্ম্মলভ্য সমুদয় বস্তু মায়িক, তজ্জন্য পরিবর্তনশীল। ইহাতে আসক্তি ও অনুরাগ স্থাপন—দুঃখ-লাভের হেতু। কৰ্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব

যখন— “নিত্যার্জিদেন বিভেন দুর্লভেনাত্ম-মৃত্যুনা।

গৃহাপত্যাগুপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥” (ভাঃ ১১।৩।১৯)

অর্থাৎ—নিত্যকাল দুঃখপ্রদ, অত্যন্ত আয়াস-দ্বারা লভ্য, আত্মমৃত্যুজনক এই বিজ্ঞদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে-সকল অনিত্যবস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের দ্বারা মানবের কিঞ্চিৎশ্রান্ত ও সুখলাভ হয় না—এই ভাগবতীয় শ্লোকটি যথার্থ-রূপে বুঝিতে পারে, তখনই তাহার প্রকৃত সদগুরু-পদাশ্রয়ের যোগ্যতা লাভ হয়। তখনই সে “এবং লোকং পরং বিদ্যামশ্বরং কৰ্ম্মনির্মিতম্” বাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া—

“তস্মাদগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষগতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥” (ভাঃ ১১।৩।২১)

—এই ভাগবতীয় নির্দেশ পালন করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্মে নিষগত রাগাদিশূন্য গুরুপাদপদে শান্ত কল্যাণ জানিবার উদ্দেশে শরণ গ্রহণ করে। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত-দর্শনেও চরম কল্যাণের জিজ্ঞাসু ও অধিকারী নির্ণয় করিতে গিয়া এই বিচারই সর্বপ্রথম কীর্তিত হইয়াছে। যথা—

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। ‘অথ’ শব্দের অর্থ ‘অনন্তর’ অর্থাৎ কৰ্ম্মের দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল বা শান্তি লাভ করা সম্ভব নহে—এইরূপ অভিজ্ঞান হইলে পর জীব ব্রহ্ম-বস্তুর বা নিত্য-বস্তুর অনুশীলনে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

যতদিন না জীবের এরূপ অধিকার লাভ হয়, ততদিন তাহার প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় অসম্ভব। গুরুদেবের কৃপায় আমি কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব, আমি রোগমুক্ত হইব, আমার মামলায় জয়লাভ হইবে, আমার অর্থাভাব দূরীভূত হইবে, আমার সংসারে সুখ বিরাজ করিবে—ইত্যাদি চিন্তাশ্রোত-বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুপদাশ্রয়ের প্রকৃত ফল-লাভের যোগ্যতা-অর্জনে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেব যদিও এই সমস্ত অভীষ্ট বস্তু প্রদানে সক্ষম, তথাপি শিষ্যের কল্যাণের জন্য তিনি শিষ্যকে এবিষয়ে প্রশ্ন না দিয়া “সন্ত এবাস্য হিঙ্গন্তি মনোব্যাসঙ্গম উক্তিভিঃ”—বাক্যের আচরণ-কর্তা-স্বরূপে তাহার বিষয়-বাসনারূপ আসক্তিগ্রস্তি-গুলি শাস্ত্র-বাক্যের কুঠার-দ্বারা ছেদন করিয়া তাহাকে নির্মল করতঃ নিজ শ্রীপাদপদে স্থান দেন। কোন কোন প্রচুর সুকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ চিন্তাবৃত্তিযুক্ত হইয়াও সদগুরুর কৃপা পাইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ সুকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি বিরল। সাধারণতঃ তাহারা নিজ নিজ রুচি-অনুসারে কামনা-পূরণকারী কৰ্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী প্রভৃতি ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিয়া প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন।

অসদ্বস্ততে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, জগতে কি আর সদগুরু আছেন! সদগুরু এখন আর মিলে না। তাহাদের এইকথা কোনও প্রকারে সমর্থনযোগ্য নহে ; কারণ এই দুঃখময় সংসারে জীবগণকে চিরদিনের জন্য মায়া-কর্তৃক ত্রিতাপ ভোগ করানই ভগবানের উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু স্নেহবশে শাসন করতঃ তাহাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিনি সর্বকালই তাঁহার নিজজনকে এ-জগতে বর্তমান রাখেন। তাহা না হইলে জীবের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় হয়। পরন্তু আমরা অসৎগ্রাহী বলিয়া সৎ বস্তুর প্রতি বিরুদ্ধ স্বভাব-বিশিষ্ট ; সুতরাং সদাশ্রয় না করিয়া অসদাশ্রয়ে রুচিবিশিষ্ট হই। কিন্তু সদগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত নিত্যা পরা শান্তি লাভ করার আর অন্য উপায় নাই—ইহাই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণাদির সর্ব্বতোমুখী অভিমত।

শ্রীল-ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি- মহারাজ-প্রণত্যষ্টকম্

যতি-কেশরি-কেশব-শিষ্যবরং

যতিধর্ম্ম-ধুরন্ধর-মুক্তকরম্।

বরসৌম্য-বপুর্বিনয়াদিবিদং

প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ১ ॥

স্মৃতিপণ্ডিত-নৈগমযুক্তি-পরং

সততঞ্চ সতাং শুচিমার্গচরম্।

প্রণতেষপি বৎসল-সদ্বরদং

প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ২ ॥

প্রভুপাদ-কৃপাশিষ-ধন্যকুলং

সুধীবৃন্দ-সুকীর্তিত-শীলদলম্।

উপধর্ম্ম-তমস্তপনং বিশদং

প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ৩ ॥

খলু সজ্জনসেবক-নাম-গতং

সহজাদ্ভুত-বৈষ্ণবতাভিরতম্।

পরমার্থ-সতীর্থ-সুসখ্যসদং

প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ৪ ॥

গুরুগৌর-কথামৃত-বারিধরং
 গুণধর্ম-বিমুক্ত-বিরক্তিভরম্।
 গুরুদেব-পরাস্ব-পরার্থবদং
 প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ৫ ॥
 গুরু-সেবকসত্তম-দিব্যগুণং
 গুরু-কীর্তি-বিমণ্ডিত-কাব্যধনম্।
 প্রতিমান্যজনাদৃত-শান্তমদং
 প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ৬ ॥
 ভগবত্তাতিবিৎ-প্রতিপাদ্য-কৃতং
 ভবসাগরকর্ণধরং সুহিতম্।
 বৃষভানু-কিশোরি-বিনোদহৃদং
 প্রণমামি চ বামনদেব-পদম্ ॥ ৭ ॥
 প্রকটাহনি-পূজ্য-তবাস্ত্রিযুগং
 কুসুমাজ্জলিভিস্তনুতাপ্ত শুভম্।
 জয়তাং প্রতিজন্মানি সেব্যগুণে
 রমতাং-মন উজ্জ্বল-ভক্তিধনে ॥ ৮ ॥

—শ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারী

আচার্য্যকেশরী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন শ্রীব্যাসদেব বলা হয়। সেইজন্য শ্রীগুরুপূজা তথা গুরুমহিমা-কীর্তনই শ্রীব্যাসপূজা। সেই উপলক্ষে এক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কিঞ্চিৎ কীর্তন করিতেছি।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎসহ সমগ্রবিশ্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম পরমকারুণিক ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজীউর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তিনি শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয়তমা নয়নমণি মঞ্জুরী ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় ও তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য তথা কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মদীয়

পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহারই পরম অন্তরঙ্গ পার্শ্বরূপে এই পৃথীতলে আবির্ভূত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনন্ত মহিমা—অনন্তদিন অনন্তমুখে বলিলেও তাঁহার মহিমা শেষ হইবে না। এক্ষণে আমি তাঁহার মহিমার একটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। সে দিকটি হইল “শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বেদান্ত-দর্শন”।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থগণ তাঁহাকে বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে একসময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর



আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ যোগপীঠে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতে বিষয়বস্তু ছিল ‘বৈষ্ণব মহিমা’। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গুরুপাদপদ্মকে (তখন তাঁহার ব্রহ্মচারী অবস্থায় নাম ছিল শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন) শ্রীপরমানন্দ প্রভুর মহিমা-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে বলিলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবের সকল গুণগানের সহিত শ্রীভগবানও যে পরমানন্দস্বরূপ তাহা, সুন্দররূপে বৈদান্তিক যুক্তি ও প্রমাণসহ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এবং সতীর্থগণ সভার শেষে

‘বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীশ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুকী জয়’ বলিয়া শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা অশেষবিশেষভাবে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র লইয়াই বিশেষ আলোচনা করিতেন। বেদান্তসূত্র—ব্রহ্মসূত্র বা শারীরকসূত্র, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ণসূত্র উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। চতুরধ্যায়ী ষোড়শপাদবিশিষ্ট সূত্র-আকারে গ্রথিত-গ্রন্থ, বেদের চরম উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বেদান্ত। বেদকে সুষ্ঠুরূপে জানিবার জন্য মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই বেদান্ত-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আবার বেদান্তকে সুষ্ঠুরূপে জানিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্গয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃহিতঃ॥ (শ্রীগরুড়পুরাণ)

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম আরও বলিতেন যে, শ্রীল শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনকে “জ্ঞানশাস্ত্র” বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ উহা ভক্তিশাস্ত্র—জ্ঞানশাস্ত্র নহে। বেদান্তের

তাৎপর্য্য ভক্তি, জ্ঞান নহে—উক্ত দর্শনের ৫৫০টি সূত্রের মধ্যে কোথাও জ্ঞান-শব্দের উল্লেখ নাই। জীব ভক্তির দ্বারাই পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। সেই ভক্তির কথাই বেদান্তে পর্যালোচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নামকীর্ত্তনমূলক ভক্তিযোগকেই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ যোগরূপে বলিয়াছেন। সেইজন্য বেদান্তের ৪র্থ পাদে ২২নং সূত্রে বলা হইয়াছে—

“অনাবৃতিঃ শব্দাদনাবৃতিঃ শব্দাৎ॥” ২২॥

অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক শব্দব্রহ্মের অর্থাৎ শ্রীহরিনামের অনুশীলনের দ্বারা বা উপাসনার দ্বারা পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করা যায় এবং শ্রীপরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলে জীবকে এ জগতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

শ্রীল শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা দ্বারা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থাপন করতঃ কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জীবকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী আর পরব্রহ্মের চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে মায়িক বলায় তিনি মায়াবাদী।

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম এই কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ খণ্ডনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কোন একসময় যখন তিনি মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেইসময় জনৈক মায়াবাদী তাহার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপস্থিত হন এবং ‘সর্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ বলিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিলেন যে, সবাই কে ব্রহ্ম বলা আর ব্রহ্ম নাই বলা একই কথা। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তদুত্তরে সে যদি বলে, আমার বাবা ত সকলেই। এইরূপ উত্তর যথাযথ হইল না। সে যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার পিতামাতা নিশ্চয়ই আছে, এবং তাহাদের নাম পরিচয়ও অবশ্যই আছে। পিতামাতার নাম পরিচয় বলিলে বা মানিলে তাহাদের সেবা করিতে হইবে। সেইজন্য সেবা করিবার ভয়ে ঐ সব ব্যক্তি সকলকে পিতামাতার পরিচয় জানে না বা বলে না। তদ্রূপ, ঈশ্বরের পৃথক্‌স্বরূপ বা সত্ত্বা মানিলে তাহার সেবা করিতে হইবে। সেইজন্য সেবার ভয়ে অদ্বৈতবাদিগণ সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু সকল শাস্ত্রেই জীব, ঈশ্বর ও মায়ার পৃথক্‌ সত্ত্বার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ম্মতি॥ (গীঃ ১৫।৭)

অর্থাৎ আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ-জ্ঞেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

দেবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

আমর এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রম্যা অর্থাৎ অতিক্রম করা যায় না। তথাপি যাহারা আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করেন, তাহারা এই দুরত্যা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

উক্ত প্রমাণসমূহের দ্বারাই সব বস্তুই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রমাণ হইতেছে না। যাহারা সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বলেন, তাহারা শাস্ত্র-বিষয়ে অজ্ঞ বুঝিতে হইবে। সেই সব কথা শুনিয়া উক্ত মায়াবাদী কেবলাদ্বৈতবাদের অসারতা উপলব্ধি করতঃ প্রস্থান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥”

“তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥”

অর্থাৎ জীব মাত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস। জীব যদি সদগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজন ও গুরুসেবা করে, তাহা হইলে জীব মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবালাভ করিতে পারিবে।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরু-প্রণামঃ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-দায়িনে।

শ্রীমতে ভক্তিবাদান্ত-বামন-ইতি নামিনে॥

শ্রীসরস্বতিপাদ-কেশব-মতানুগাচার্য্যঃ।

শ্রীচৈতন্য-কথা-প্রচার-মন্ত-প্রভবে নমঃ॥

গৌরসুখানুসন্ধান কারক-শুদ্ধ-ভক্তিদ-।

পতিতাত-দয়ার্দ্র-মূর্ত্তিধরায় নমোস্তুতে॥

ভক্তসঙ্গ-সুখানন্দি-বিদ্বদ্রায় বাগ্মিনে।

রূপসিদ্ধান্তদক্ষায় শ্রীগুরু-প্রেষ্ঠ-রূপিণে॥

নামকূপৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশা-বিবর্জিনে।

সেবক-তাপ-দক্ষায় বরদাভয়দায়িনে॥

নমো শ্রীগুরুদেবায় সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।

গৌরশক্তি-স্বরূপায় চৈতন্য-প্রেমদায়িনে॥

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

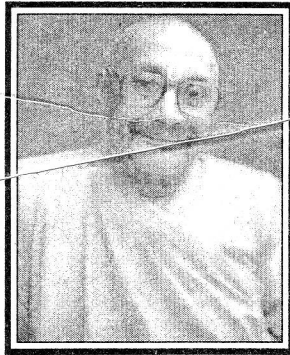
—ঃ—

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

৮৪তম শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

ওহে গুরুদেব! আজিকে তোমার শুভ আবির্ভাব দিন।
তাই কি গো হেরি ধরিত্রীর মুখে পরমানন্দের চিন?
বনে বনে কত ফুটিয়াছে ফুল, তা'তে খেলে মধুকর।
দূর হ'তে কানে ভেসে আসে মধু পাখি-পাখালির স্বর॥
শরতের রাণী হেমন্তেও খুলে রেখেছে ঘোমটা তার।
শুধু সে তোমার বদন-কমল নিরখিবে একবার॥
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকে আর, তৃণেতে শিশির রেখা।
তোমার মধুর স্মৃতিগুলো যত দেখা যায় তাতে আঁকা॥



ভক্তগণের হৃদয়ে বহিছে আনন্দের স্রোতধারা।
বাঁচার সন্ধান পাইল তাহারা দীন-হীন হয় যারা॥
মায়াঘুম ভাঙ্গার জিয়ন কাঠি রয়েছে তোমার হাতে।
তাই দেখি বুঝি মায়া পিশাচী হঠে যায় পশ্চাতে॥
গোলোকের ধন শ্রীহরির নাম বিলাইলে দ্বারে দ্বারে।
সেই নাম ল'য়ে কত জীব গেল ভব ছাড়ি' পরপারে॥
তোমা' লঙ্ঘিয়া জগতের কেহ নাহি পায় নিস্তারে।
গোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে ঘোড়া কি কখনো পারে?
ভিখারী ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখটাকা দেখে স্বপ্ন।
তোমার গুরুত্বে সন্দেহ তাদের যাহারা বিষয়ে মগ্ন॥
আপন গুরুর চরিত-সুধা প্রকাশিলে স্বল্পকালে।
'গুরুদেব হন শিষ্য প্রাণধন' সেইক্ষণে জানাইলে॥

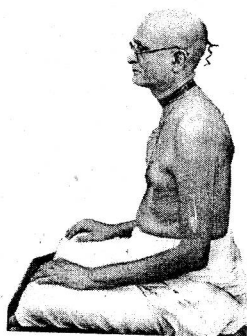
‘মায়াবাদীদের গুরুপূজা শুধু ছলনার নামান্তর।’
 বেদান্তের এই গূঢ়কথা তুমি জানায়েছ বারেবার।।
 ‘অহংগ্রহোপাসক’ শ্রীকৃষ্ণসেবার কভু নহে অধিকারী।
 কখনো কি ইহা জানিতাম যদি না জানাতে কৃপা করি’।।
 নানা স্থানে স্থানে বেদান্তের কথা করিয়াছ প্রচারণ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের যে হয়, চরম প্রয়োজন।।
 গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দীপ দিকে দিকে প্রজ্বলিত।
 সিদ্ধান্ত রূপ তৈলধারা তাহে দিয়াছ যে অবিরত।।
 জনক-জননী তনয়ে তাদের কতটুকু স্নেহ করে।
 তব স্নেহশীঘ্র শিষ্যগণ-শিরে পড়িছে সদাই ঝরে।।
 শিষ্যরা তোমার করুণার বারি পান করি’ থাকে জীয়ে।
 শরণাগতের কভু কি থাকয়ে মরণের কোন ভয়ে?
 কস্মীর-সুখ জড়ভোগে আর জ্ঞানীর সুখ যে ত্যাগে।
 ভকতগণের সুখ যে কেবল তব পদে অনুরাগে।।
 সেবকগণের মাঝে কতবার হইয়াছে রেশারেশি।
 তপ্ত অনল শাস্ত করিয়েছে তব কাছে তারা আসি’।।
 মেঘ যেমনি আচ্ছাদিতে নারে সুনির্মল দিবাকরে।
 তোমার মহিমা তেমনি ব্যাপ্ত আছে বিশ্ব চরাচরে।।
 আজকের দিনে ভয়েতে কোথায় পলায়ে গিয়াছে কলি।
 তব পদে শ্রদ্ধা দেয় ভক্তগণ হৃদয়ের ডালা খুলি’।।
 মো-অধমের দেহতরণীর তুমি যে গো কর্ণধার।
 কৃপা করি’ আজ তোমার চরণে দাও সেবা-অধিকার।।

—শ্রীভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

“খোল-করতলাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল
 কীর্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ
 হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজনপ্রণালীর
 মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।”

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত
 ‘কলিকাতায় কীর্তন’

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী



গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন—

“আমি বহু লোককে উদ্বিগ্ন দিয়েছি—অকৈতব সত্যকথা বলতে বাধ্য হয়েছি ব’লে, নিষ্কপটে হরি-ভজন করতে ব’লেছি ব’লে অনেক লোক হয় ত’ আমাকে শত্রুও মনে করেছেন। অন্য্যভিলাষ ও কপটতা ছেড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবার উন্মুখ হ’বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বিগ্ন দিয়েছি। এ কথা তাঁরা কোনও না কোনও দিন বুঝতে পারবেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু’দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবননির্ব্বাহ ক’রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না।

জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ’বেন না—নিজ-ভজন, নিজ-সর্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ’য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করবেন।

আমাদের এই জরদাব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্বদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ণ-যজ্ঞে আছতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। আমরা কোনপ্রকার কন্মবীরত্ব বা ধন্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব।

ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ’বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহরীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ’বেন। আপনারা মধ্যে বহু যোগ্য

ও কৃতী ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

“আদানান্তুং দন্তুরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদ্রূপ-পদান্তোজ-ধূলিঃ স্যাৎ জন্মজন্মনি॥”

সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহুমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকা-কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যিক। এখানে যত রকম ধরনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদের আকৃষ্ট করবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়।

কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই Startling ও Perplexing। যে আগন্তুক ব্যাপারসমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে, তাহা eliminate করবার জন্য মনুষ্য-নামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাদিক struggle করছে। দ্বন্দ্বাতিত হ'য়ে সেই নিত্যপ্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতে সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্বা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ণন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।”

“নির্জনভজনের ছলনায় সর্বদা অলস জীবন-যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ণনে বাধা দেওয়া আবশ্যিক নহে। প্রচুর ভোগের অভিসন্ধিতে ‘কুটীর-বাস’ জন্মজন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য।”

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীগুরুচরণে পুষ্পাঞ্জলি

যাঁর হাসিতে মধু ঝরে চলন সুধীর।
 বাণীতে কৃষ্ণ-পূর্ণ, মান গভীর॥
 হেন প্রভু দিলা মোরে বিধাতা কৃপায়।
 শতকোটি নির্ভর গুরুদেবে রয়॥
 সতত শ্রীগুরু-আজ্ঞা শিরে করি ধারণ।
 ত্রিদণ্ড অঙ্গিকার আর পতিত-তারণ॥
 হেন প্রভু দিলা মোরে বিধাতা কৃপায়।
 শতকোটি নির্ভর শ্রীবামনে রয়॥
 (যাঁর) অশেষ কল্যাণ গুণ পরতেক করি'।
 সরস্বতী-প্রিয় কেশব দিলা চরণতরি॥
 হেন প্রভু দিলা মোরে কৃষ্ণ দয়াময়।
 শতকোটি নির্ভর শ্রীবামনে রয়॥
 অজস্র কলি-কদন যাঁহার কটাক্ষে।
 ভব জয় পাপক্ষয় কৃষ্ণ রহে বক্ষে॥
 হেন প্রভু দিলা মোরে কৃষ্ণদয়াময়।
 শতকোটি নির্ভর শ্রীবামনে রয়॥
 (যাঁর) শ্রীরাধামাধব চিন্তা নিকুঞ্জ সেবা।
 বৃন্দাবন কেলি সদা হয়ে রূপানুগা॥
 হেন প্রভু দিলা মোবে কৃষ্ণ দয়াময়।
 শতকোটি নির্ভর শ্রীগুরুদেবে রয়॥

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীভক্তিবাদান্ত হৃষিকেশ



শ্রীগুরুপূজায় গুরু-কীর্তন

যিনি শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপনে, শ্রীল প্রভুপাদের লীলাকথা-কীর্তনে সকল জীবের
 অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিয়া আনন্দবর্ধন করতঃ দ্বিতলে আরামকেদারায় বসিয়া
 বেদান্তের নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নব নব রসাস্বাদন করিতেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের
 শারদীয় রাসযাত্রায় শ্রীউজ্জৈশ্বরীর ব্রতারণ্য-দিবসে যখন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে
 সমস্ত জগজ্জীব হরিসঙ্কীর্ণনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিল, সেই অবসরে
 যিনি তাঁহার নিজ অনুগতগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সায়াংকালীন

নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিই অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদগুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। সেই অতিমর্ত্য পুরুষের আবির্ভাব-তিথি-পূজায় তাঁহার দু'একটি কীর্তিগাথা কীর্তন করিয়া আত্মশোধন করিতে যত্ন লইতেছি।

তিনি মাঘী কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিকে আশ্রয় করিয়া এই মর্ত্যলোকে বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা-পরিবারকে ধন্য করিয়া প্রকটিত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারত-বন্ধন মুক্তির আন্দোলন, সর্বধর্ম-সমন্বয়-



বাদের ঢেউ, পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের আলোড়ন, ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভাব, মায়াবাদের অজ্ঞানান্ধকার প্রভৃতি যখন সন্ধর্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, তখন অপরদিকে সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজ জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-ব্যথায় আকুল হইতেছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৭৬ বৎসর কাল লোকলোচনের সমক্ষে প্রকটিত থাকিয়া বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়ীয়ের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারীর সায়ংলীলায় প্রবেশ করেন। তখন হইতে

তাঁহার অত্যন্ত নিজজন জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তিরাজ্যের পঞ্চরস-সেবাশিক্ষা প্রদীপ্ত করিয়া ঝটিকা-বেগে ভারতের সর্বত্র শুদ্ধগৌরবাণী আচরণ-মুখে প্রচার আরম্ভ করেন।

মদীয় গুরুদেব সেইকালে (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে) গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দর্শনলাভ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে প্রচার করিলেন—“Back to God and back to Home is the message of Shri Goudiya Math.”

শ্রীল গুরুমহারাজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ‘শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী’ নামকরণ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি গুরুসেবায় রত হইলেন। তিনি বহুপ্রকার সেবাভার গ্রহণের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন এবং তাঁহার আদেশে তিনি প্রধান সেবকসূত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের সকল ভূসম্পত্তির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ষবাদ গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীধামের সেবায় রত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে শ্রীগৌরজন্ম-ভিটায় বাংলার সু-উচ্চ মন্দির ‘শ্রীযোগপীঠ’ প্রকটিত করেন। তাঁহার সেবাচাতুর্য্যে ও মধুর ব্যবহারে তাঁহার সকল সতীর্থই তাঁহাকে আদর করিয়া ‘বিনোদ দা’ বলিয়া

ডাকিতেন এবং শ্রীমায়াপুরে সর্বসাধারণের নিকট তিনি ‘বিনোদবাবু’ নামে খ্যাত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘কৃতিরত্ন’-উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শাক্তদর্শনের ভয়াবহতা দেখাইতে প্রায়শঃই বলিতেন,—“যতদিন পৃথিবীতে শাক্তদর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে।” শ্রীল প্রভুপাদের এইবাণী স্মরণ করিয়া তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীল গুরুমহারাজ ১৯৪০ সালে বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ স্থাপন করিয়া “শ্রীমন্নহাপ্রভুর নামপ্রেম-ধর্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়” বলিয়া বিশ্বে প্রচার করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়ায় ত্রিদিগ্বিযতিবর প্রপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদিগুসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ‘শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব’ এই অমৃতমাখা ভুবনমঙ্গলময় নাম স্বীকার করিলেন। তাহার পর তিনি আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতে শ্রীমন্নহাপ্রভুর অমল প্রেমধর্ম আবেগময়ী কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

১৯৪৯ সালে সমিতির মুখপত্র-রূপে তিনি ‘শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা’ প্রকাশ করিয়া নানাবিধ ভাবে ভাগবত-ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু মূল্যবান গ্রন্থ পুনর্মুদ্রন করিয়া অত্যন্ত গভীর হইতেও সুগভীর তত্ত্বসমূহ সরলভাষায় ব্যক্ত করেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রকাশের জন্য তাঁহার যত্নের কোনরূপ কার্পণ্য ছিল না। তিনি বলিতেন,—“মাদৃশ ভবানুকূপ-পতিত জীবের একমাত্র উদ্ধার-কর্তা পরমহংসকুলগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁহার গুণাবলী যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণের অভিনয় করিয়া সেই ধারায় ঠাকুরের গুণাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি।”

শ্রীল গুরুমহারাজ শাক্তদর্শনের ভ্রান্তমত প্রকাশ করিতে ‘মায়াবাদের জীবনী’ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পৌছাইয়া দিয়া মায়াবাদ-সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের অবৈদিকতা দেখাইতে তিনি বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকারের বহু ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—“ভগবানের আদেশ-পালনকারী আচার্য্যের পাদপদ্মে আমি অপরাধ না করিয়া তিনি যে ভগবদাদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শূন্যবাদকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞগণ-সমন্বিত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি।”

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করি না। তিনি

আমাদের গুরুস্থানীয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ছিল বিশ্বয়জনক। শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধনাম দূরীভূত করিয়া ভারতের কিয়ৎ পরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে ক্ষয়িস্থ আর্য্যসমাজ আর্য্যগ্রন্থে তাঁহার বিচারপদ্ধতি দর্শন করিয়া মনের গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কার্য্য সিদ্ধির জন্য শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব, উহার তত্ত্বকথা তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ না বুঝিয়া ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’—এইকথা প্রচার করিয়া ধর্ম্মজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। আচার্য্যের আগমনের মূলকারণ শাস্ত্রে পাই—

“মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্খিনা॥

স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদিমুখান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরষোত্তরোত্তরা॥”

শ্রীল গুরুমহারাজ এইসকল কথা বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন। তাঁহার ‘মায়াবাদের জীবনী’ গ্রন্থটি শুদ্ধভাবে আলোচনা করিলে, শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত প্রশমিত হইয়া জীব ভক্তিপথে নিৰ্ব্বিঘ্নরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে, ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। শ্রীল প্রভুপাদের বহু ঘোষিত বাণীকে তিনি নিজের জীবন দিয়া সেবা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা যে কত দৃঢ় ছিল, তাহা তাঁহার সাহচর্য্যে আসিবার সৌভাগ্য যাঁহারাজ অর্জন করিয়াছেন তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের তেজোদীপ্ত বাণী অসৎ আচরণশীল জনগণের নিকট সাক্ষাৎ যমসদৃশ। এমনকি তাঁহার সতীর্থগণও বক্তৃতামধ্যে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিলে অনেক সময় ভয় পাইতেন। কারণ তাঁহার বক্তৃতায় কোনরূপ তোষামোদ ছিল না। তিনি সর্বদা শুদ্ধ সত্য কথাই প্রকাশ করিতেন। আমরা তাঁহার মুখে মাঝে মাঝেই শুনিতে পাইতাম—“Half truth is no truth at all.” ধর্ম্মালোচনায় তিনি জুগুপ্সিত ধর্ম্মকে প্রশংসা না দিয়া ‘নিরস্তুকুহক’-শব্দে যে বাস্তব সত্য বস্তু প্রকাশ পায় তাহা তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন,—ধর্ম্মজগতে কোন Co-operation চলিতে পারে না। Co-operation শব্দের অর্থই হইল সতের সহিত অসতের মিলন। এই মিলনের দ্বারা ধর্ম্মজগতের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। শ্রীগুরুদেবের এই গভীর ভাব দর্শন করিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে ‘পাষণ্ডদলন গজেকসিংহ’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভয় কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। তাঁহার বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী ছিল সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য-দুর্গ। ইহারই কিছু নমুনা তাঁহার লেখনী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

“আজকাল আসুরিক জগতে ধার্ম্মিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসুরিক ধর্ম্ম-প্রচারার্থ অনেককে বিবেকহীনের ন্যায় গীতার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কটুক্তি

করিয়া বিশ্বে বিচরণ করিতে দেখা যাইতেছে। আমরা এইরূপ মত-প্রচারকারীকে ধর্মধ্বজী, প্রতারণ ও হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করি। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহারাই আসুরিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের স্বরণ রাখিতে হইবে, সন্ন্যাসি-বেশ হইলেই আমাদের পক্ষে আদর্শ নহে। ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ, রাবণ সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণপূর্বক সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল। রাবণের সন্ন্যাস আসুরিক সন্ন্যাস। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অসুরগণের প্রবৃত্তি মূলবস্তু হইতে শক্তিকে অপহরণ করা। ভগবান্ নিঃশক্তিক থাকুন,—ইহাই অসুরগণের চেষ্টা। মায়াবাদ-দর্শনে ইহাই সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম কেবল যে নিরাকার, নির্বিশেষ, তাহাই নহে—তিনি নিঃশক্তিকও বটে, তাঁহাকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে আমরা ব্রহ্মের উপর যথেষ্টাচারিতা চালাইতে পারিব—ইহাই আসুরিক ধর্ম।”

সেই পাষণ্ডদলন-গজৈকসিংহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, যিনি কলিযুগকে ধন্য করিয়া কলিহত জীবকে কৃপাপূর্বক আশ্রয়দান করতঃ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-অবতারী শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর বাণীর মূর্তিময় বাহক-স্বরূপ, যাঁহার বক্তৃনির্ঘোষ কণ্ঠ সমস্ত অপসম্পদায়ের কালান্ত সদৃশ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় তত্ত্বকথার প্রকাশক, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার আবির্ভাব-তিথিবাসরে আমার অনন্তকোটি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ



শ্রীশ্রীল বামন গোস্বামী প্রভুবরের শুভাবির্ভাব-তিথিতে এ-দীনের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব, বামন গোস্বামী বর,
মম প্রণাম তব শ্রীচরণে।
দীনে যদি কৈলে দয়া, দিয়া তব পদছায়া,
শরণ রাখিহ নিজ মনে॥
সাদ বিষয়েতে মতি, ভজনে নাহিক প্রীতি,
দুরাচার করিলুঁ আপনে।
অশোক অভয় পদ, ত্যজিয়া সে সম্পদ,
জ্বলিতেছি ত্রিতাপ আগুনে॥
ভক্তির অভাবে প্রভু, ভজিতে পারি না কভু,
নীচসঙ্গে সদা থাকে মন।

অসৎ-সঙ্গ ছাড়াইয়া, সদা নামে রুচি দিয়া,
 দয়াময় কর পরিত্রাণ ॥
 পূর্ব দুষ্ট কর্মফলে, কুবিষয় তাপানলে,
 মরিতেছি জ্বলিয়া পুড়িয়া।
 ওহে করুণার সিদ্ধ, দিয়া তব কৃপাবিন্দু,
 উদ্ধারহ কৃপা বিতরিয়া ॥
 সহিতে পারিনা নাথ, মায়াদেবীর কষাঘাত,
 বুঝি প্রাণ যায় অবশেষে।
 বিলম্ব না কর প্রভু, তুমি বাঙ্ক্ষকল্পতরু,
 পড়ে আছি তুয়া কৃপা আশে ॥
 তোমার শ্রীচরণে নাথ, হয় যদি প্রণিপাত,
 মায়াবন্ধ দুরিত তক্ষণে।
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে মন, তার হয় অনুক্ষণ,
 পদাশ্রয়ে ভজিতে আপনে ॥
 দূর দূর দেশ হতে, পুষ্পমালা লয়ে সাথে,
 ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী-গণ।
 কত আসে কত যায়, মুখে তব গুণ গায়,
 ভক্তিদ্বারা পূজে শ্রীচরণ ॥
 শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে, আনন্দ করিছে সবে,
 মহানন্দ করে ভক্তগণ।
 আমি অতি নরাধম, দিয়া অভয় শ্রীচরণ,
 মনোবাঙ্ক্ষ্য করহ পুরণ ॥

—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী



আমার প্রভুর মহিমা

“গুরুন্ স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
 পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
 দৈবং ন তৎ স্যাম্ পতিশ্চ স স্যাৎ
 ন মোচয়েদ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক আলোচনা করলে দেখা যায়, জগতে সাধারণ মানুষ ‘গুরু’, ‘স্বজন’, ‘পিতা’, ‘মাতা’, ‘দেবতা’, ‘পতি’, ইত্যাদি বলতে যা যা বিচার করে থাকেন, সকলই কেবল ভুল আর ভুল। ‘গুরু’ বলতে তারা বুঝেন,

যিনি মস্ত্র দিয়ে আমার হাতের জল শুদ্ধ করেন, অথবা যিনি আমার হস্তরেখা বিচার করে কর্মফল-নির্দিষ্ট সাংসারিক অসুবিধাগুলি দূর করতে ভাল ‘বারফুক’ দিতে পারেন। ‘স্বজন’ মানে—যিনি কাকা, জেঠা, মাসতুতো-পিসতুতো ভাই, শালা, ননদ প্রভৃতি, আবার যিনি ঘরে আশ্রয় লাগলে জল দিতে এগিয়ে আসেন, যখন তখন ‘ধার’ দেন, শ্মশানযাত্রী হন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ‘পিতা’র অর্থ ত’ পরিষ্কার—যাঁর গুঁরসে আমার জন্ম। আর, যাঁর গর্ভে আমাকে দশ মাস দশ দিন থাকতে হয়েছে, যাঁর বুকের দুধের মূল্য জগতে কিছু দিয়ে শোধ দেওয়া যায় না, তিনিই হলেন আমার ‘মাতা’। ‘দেবতা’ মানে যাঁর নামে ‘মানৎ’ করে, যাঁর ‘পাঁচালী’ গান করে অন্যায় আবদারও সিদ্ধ করিয়ে নেওয়া যায়। আর ‘পতি’—যিনি সমস্ত জৈবিক চাহিদাগুলি পূরণ করেন। কিন্তু শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যায়, এইপ্রকার গুরুত্ব, স্বজনত্ব, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, দেবত্ব, পতিত্ব সকলই অবৈধ, তাই একটিও প্রকৃত কাজের নয়। দেখা যায়, আমার ধারণার ঐপ্রকার পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, স্বজনত্ব, পতিত্ব পশুজন্মেও একইপ্রকারে সিদ্ধ হয়। বর্তমানে এই মানব-জন্মেও তাঁদের সেই ভূমিকাগুলি একই স্তরে অবস্থিত থাকলে, তবে মানবজন্মের শ্রেষ্ঠত্বই বা কোথায়, আর সার্থকতাই বা কোথায়?

তাই শাস্ত্র বলেছেন—জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে উদ্ধার-কার্যে যিনি প্রকৃত ভূমিকা অবলম্বন করেন, তিনি ইহজগতে গুরু, পিতা, মাতা, স্বজন, দেবতা, পতি প্রভৃতি যে যে সংজ্ঞায় অবস্থিত থাকেন, সেই সেই সংজ্ঞা সার্থক হয়, বৈধ হয়। ‘সমুপেত-মৃত্যুম্’—নিকটস্থ ‘মৃত্যু’ অর্থাৎ যম অবস্থিত আছেন, তাঁর হাতের ভীষণ ‘পাশ’ হতে মুক্তি দিবার সাধ্য কার? আমরা একটা কীর্তনে সর্বদা শুনতে পাই,—

“কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।

পলাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে।।”

শ্রীমদ্ভবদ্বীতাতেও দেখতে পাই,—

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মর্য্যাবেশিতচেতসাম॥ (গীঃ ১২।৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন,—‘আমার প্রতি যারা আবিষ্ট চিত্ত, আমি অবিলম্বে তাদেরকে মৃত্যু-সংসার হতে উদ্ধার করে থাকি’। গীতার অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন,—‘আমার মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না—ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণও নয়। কেবল আমারই যে শরণাগত হয়, সে-ই আমার ইচ্ছায় মায়াপার হতে পারে।’ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ছাড়া ‘সমুপেত-মৃত্যুম্’ কে এড়াবার কোন রাস্তাই নাই। দেবতাগণের যত যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, মৃত্যু-সংসার-সাগর পার করবার ‘চাবিকাঠি’ একমাত্র ভগবানের হাতে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে। মহারাজ খট্টঙ্গ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তা

বুঝেছিলেন, এবং তখন দেবতাগণের তোষণ ছেড়ে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। এইজন্য শিবঠাকুর দেবির কাছে সেই অত্যন্ত গোপনীয় কথা প্রকাশ করলেন,—“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্।” (পদ্মপুরাণ) —হে দেবি, যত যত আরাধনা জীবগণ করে থাকে, সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ।

পাঠকগণ, আপনারা হয়ত ভাবছেন,—শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুই আমার প্রভু, আর আমি তাঁদেরই মহিমা কীর্তন করতে আগ্রহী হয়েছি। কিন্তু তাঁরা আমার প্রভু নন,—তাঁরা আমার প্রভুর প্রভু। দয়ার সাগর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ‘শ্রীকৃষ্ণ যে আমার প্রভুর প্রভু’ সেই বুদ্ধিটা তিনি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ নিব্বুদ্ধি আমার মাথায় পদাঘাত করে সঞ্চার করেছেন,—“আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। সেই তো ভরসা মোর চিত্তে নিরন্তর॥” তাতেই বুঝলাম, আমার প্রভু প্রকৃতপক্ষে আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী দেব, শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি। আর শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী তথা পঞ্চতত্ত্বায়ক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রভুর প্রভু।

কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, আমার ‘প্রভুর’ মহিমা ‘প্রভুর প্রভু’ অপেক্ষাও বেশী। সে কি! হ্যাঁ,—এটাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক কথা। শ্রীহরির যে হরিতত্ত্ব তা আমার প্রভুকে নিয়েই। শ্রীহরি যেস্থলে সূর্য্য-স্বরূপ, আমার প্রভু সেস্থলে সে-সূর্য্যের ‘প্রকাশ’। কস্তুরী ও তাঁর গন্ধ, দুগ্ধ ও তাঁর ধবলতা, অগ্নি ও তাঁর উত্তাপ—এককে যেমন অন্য হতে ভিন্ন করে নেওয়া যায় না, ঠিক তেমনই আমার ‘প্রভু’ এবং ‘প্রভুর প্রভু’। আমার ‘প্রভু’—Predominated Absolute, সেখানে আমার ‘প্রভুর প্রভু’—Predominating Absolute. তিনি স্বয়ং ‘রস’-স্বরূপ। উপনিষদ্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—তিনি “রসো বৈ সঃ”। আর আমার প্রভু হলেন—সেই রসের ভাণ্ডারী।

আমার ‘প্রভু’র মহিমা বুঝতে চাইলে, ‘প্রভুর প্রভুকে’ বুঝতে হয়। তিনি—‘ভগবান্’, ষড়ৈশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধিপতি—‘ব্রহ্ম’ ও ‘পরমাত্মা’ তাঁর আশ্রিত তত্ত্ববিশেষ। তিনি কেবল ভক্তিদ্বারা লভ্য—‘জ্ঞান’ বা যোগাশ্রয়ে তাঁর ধারে-কাছেও যাওয়া যায় না। ‘বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।’—আর বুদ্ধি যতদিন শুদ্ধ না হয়, ততদিনই ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগে’র আস্থালন। আসল কথায় আসি—উপনিষদ আমার ‘প্রভুর প্রভু’ সম্বন্ধে বলছেন, তিনি “রসো বৈ সঃ”। কিন্তু এই ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্য অশুদ্ধ-বুদ্ধির লোকেরা কিছুতেই ধরতে পারে না। ‘রস’ বলতেই রসের ‘আস্বাদক’, ‘আস্বাদ্য’, ‘বিষয়’-‘আশ্রয়’—ব্যাপারগুলি থাকবেই। দুধকে মছন করলে মাখন বেরিয়ে আসে—কিন্তু নির্বিশেষ-বুদ্ধিতে

বুঝতেই পারা যায় না যে, ঐ মাখন দুধের সাথেই লেপটে আছে। ঠিক তেমনিই রসের 'বিষয়'-'আশ্রয়' অঙ্গাঙ্গিভাবে তারা এমন জড়িয়ে থাকে যে, 'নেতি' 'নেতি'-বুদ্ধির আশ্রয়ে বা 'যম' 'নিয়ম' 'প্রাণায়াম' দ্বারা একের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত বহুত্বকে, বৈচিত্র্যকে বুঝতেই পারা যায় না।

'অগ্নি' ও 'অগ্নির উত্তাপ'—দুটিকে নিয়েই সম্পূর্ণ একটি অগ্নি। ঠিক তেমনি রসের 'বিষয়' ও রসের 'আশ্রয়'—উভয়কে নিয়েই সম্পূর্ণ একটি 'রসতত্ত্ব'—'রসো বৈ সঃ'। আমার প্রভু—রসের 'আশ্রয়' এবং প্রভুর প্রভু হলেন—রসের 'বিষয়'। যিনি 'বিষয়', তিনি হলেন সেব্য বস্তু Enjoyer। আমার প্রভু—তাঁর সেবক, Servitor। কিন্তু তা হলেই বা কি হয়, সেই সেব্য বস্তু 'বিষয়বিগ্রহ' (বা 'বিষয় ভগবান')—'আশ্রয়বিগ্রহ' আমার প্রভুর ভক্তির সম্পূর্ণ অধীন। সেই অধীনতাকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা বিষয়বিগ্রহের একটুও নাই। আমার প্রভু যখন-তখন ও যাকে তাকে তাঁর অধীন সেই বস্তুটিকে শ্রদ্ধামূল্যে বিক্রয় করে দিতে পারেন। তথাপিও সর্বজগতের যিনি আকর্ষক, ও সর্বসেব্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভুর আকর্ষণে তাঁর নিকট সর্বদা বাধা থাকেন। আমার প্রভুর এতই মহিমা—এইজন্যই তাঁর পূজার বিধান সর্বপ্রথমে। তাঁর পূজা প্রথমে না হলে আমার প্রভুর প্রভু ভীষণ অসন্তুষ্ট হন,—এমনকি তিনি সেই পূজাকর্তাকে দাস্তিক-জ্ঞানে পরিত্যাগও করেন।

আমার 'প্রভুর' আরাধনা, আমার 'প্রভুর প্রভু'র আরাধনা অপেক্ষাও অধিক মহিমাযিত। সেটি স্বয়ং শিবঠাকুরও ঘোষণা করেছেন—“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষেগারাদনাং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥”(পদ্মপুরাণ) —শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তা অপেক্ষাও বড় 'তদীয়'গণের আরাধনা। সেই তদীয় বস্তুই হলেন আমার 'প্রভু'। স্বর্গ লোক হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাঁদের বাস—তাঁরা সূর্যের বহির্মণ্ডলের মতোই 'বহির্জ' জাতীয়। কিন্তু আমার প্রভু—অন্তর্মণ্ডলের মধ্যেও অন্তরতম প্রকোষ্ঠের সাক্ষাৎ 'স্বরূপশক্তি'রই 'বৈভব'। তাঁর মহিমার সীমা স্পর্শ করে, কার সাধ্য?

আমার প্রভুর অফুরন্ত দয়া—আমার মতো দাস্তিক, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ও কপট ব্যক্তিকেও তিনি তাঁর দয়ার পাত্র বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর অসীম সামর্থ্য—আমার মত ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত অপহতচিত্ত বজ্র-হৃদয়ের ব্যক্তির মধ্যেও সুকোমল ভক্তিলতার বীজ বপন করেছেন। তিনি স্বপ্রকাশ সূর্য্যস্বরূপ, তথাপি নিজেকে গোপন রাখতে তাঁর চতুরতার সীমা ছিল না। তিনি পূর্ণ গুরুতত্ত্ব—যুগপৎ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু, উভয়ই। তিনি অমানী—‘গুরুপূজা’-কালে নিজেকে সংগোপন করতেন। তিনি মানদ—সতীর্থকে শিষ্যগণের শিক্ষাগুরুত্বে মর্যাদা দান করতেন। তিনি নিঃস্পৃহ—শিক্ষাগুরু-অভিমানী যখন নিজেকে দীক্ষাগুরু হতে অভিন্নত্বের শাস্ত্রীয় বিচার দেখিয়ে পক্ষান্তরে শিষ্যগণের কাছে দীক্ষাগুরুর

সমান মর্যাদা দাবী করতেন এবং পরে এমনকি ‘দীক্ষাগুরু অপেক্ষাও শিক্ষাগুরুর অধিক মহিমা’—এইপ্রকার কষ্টকল্পনা ব্যাখ্যার দ্বারা সেই শিক্ষাগুরু যখন সেই শিষ্যগণকে পক্ষান্তরে দীক্ষাগুরুকে লঘু জ্ঞান করবারই পরামর্শ দিতেন, তখনও আমার প্রভু ‘নিজমানে স্পৃহাহীন’ হওয়ার শিক্ষাই হাতে কলমে দিয়ে গেলেন।

আমার প্রভু গম্ভীর—তঁার গাম্ভীর্যের সামনে প্রতিষ্ঠাশার ‘স্বপচ-রমণী’ নৃত্য করা দূরে থাকুক, বরং বিলজ্জ্বলমান হয়ে তাঁর দৃষ্টিপথে তিষ্ঠাতে পারত না। বরং তিনি প্রতিষ্ঠাকামীকে প্রতিষ্ঠা প্রদানদ্বারাই উপেক্ষা করতেন। শিক্ষাগুরু-অভিমানী কেউ যখন প্রতিষ্ঠানের নিয়ামকাচার্যের প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেই দীক্ষাগুরু হওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন, এমনকি তিনি সর্বসমক্ষে “আমার গুরুদেবকে কে গুরু করে দিয়েছিল, প্রভুপাদকে কে গুরু করে বানিয়েছিল? কেউ কাউকে গুরু বানিয়ে যায় না, গুরুত্ব আপনা আপনিই ফুটে উঠে”—এই প্রকার ঘোষণা করেছিলেন ও পরে নিজে ‘Autocrat Spiritual Master’ (স্বয়ং গুরু) সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন আমার প্রভু ‘সুমেরু’-পর্বততুল্য অসীম ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

আমার প্রভুর যে গুরুত্ব, তা কিছু আরোহ-পস্থায় লব্ধ ‘নিজে নিজে ফুটে উঠা’ গুরুত্ব নয়। শ্রীকেশব হ’তে ‘অবরোহ-পস্থা’ ক্রমেই সেই গুরুত্ব আমার প্রভুর উপর অপরিণত হয়েছে—অর্থাৎ এতে ‘তুমি যাকে শিষ্য (শাসনাধীন) বলে অঙ্গীকার করবে, সে আমার দ্বারাও অঙ্গীকৃত হবে’, এইপ্রকার ইঙ্গিতই সূচিত আছে। নিজে নিজে ফুটে উঠা গুরুত্ব সেইপ্রকার অঙ্গীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং আমার প্রভুর শাসনাধীন শিষ্য হতে পারলে আমার ‘প্রভু’ ও ‘প্রভুর প্রভু’ উভয়েই আমাকে অবশ্যই অঙ্গীকার করবেন—এমন দৃঢ় ও ন্যায্য আশাবন্ধ অন্যত্র আর কোথায় সম্ভব?

আমার প্রভু মৌনী—মহাভারতে ‘শেষ-পর্বে’ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের পূর্বে যেমন মৌনাবলম্বন করেছিলেন, তেমনই আমার প্রভু। তিনি যখন নিজ কিছু তথাকথিত শিষ্যগণকে পাশ্চাত্য অর্থের কাছে বিক্রয় হয়ে যেতে দেখলেন, নিজ পিতৃ-প্রতিষ্ঠানকে কাহারও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার যুপকাঠে যখন বলি হতে উদ্যত দেখলেন, তখন তিনি জড়ভরতের মতো মৌনাবলম্বন করলেন—“ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।” আমার প্রভুকে মৌনাবলম্বন করতে দেখে কেউ যেন ভুল না বুঝেন। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন—শিষ্যের প্রকৃত স্বরূপ কিপ্রকার, সেইটিই তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়।

আমার প্রভু নিত্য বস্তু। আমরা সর্বদা অনিত্য-ভূমিকায় অবস্থিত বলেই তাঁর নিত্যত্ব অনুভব করতে পারি না। কিন্তু প্রভু শ্রীল নরোত্তম বলেছেন,—“নিতাইয়ের

চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি।” আমার অল্প বুদ্ধি, অধিকার আরও কম—তাই ভজনের গূঢ় কথায় প্রবেশ লাভ সুমেরু অতিক্রম করার চেষ্টার মত। কিন্তু একটা দৃঢ় আশাবন্ধ—আমার প্রভু যে দয়ার বশবর্তী হয়ে এতদূর অতিক্রম করে এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, সে দয়াতেই আমার মতো অযোগ্যকে তাঁর দাসত্বে অধিকার প্রদান করুন। এইটাই আমার একমাত্র সাধ্য ও সাধন।

যে কথা দিয়ে প্রবন্ধের সূচনা হয়েছিল—আমার এহেন যে প্রভু, শাস্ত্র-বিচারে তাঁর মধ্যেই বিরাজিত সর্ব গুরুত্ব, সকল স্বজনত্ব, সমস্ত পিতৃত্ব, সমগ্র জননীত্ব, সমূহ দেবত্ব ও সমুদয় পতিত্ব। তাই আমার এমন অনন্তকালের সম্বন্ধিত সেই প্রভুর চরণাশ্রয় যাঁরা প্রকৃতই গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোনদিন গুরুহীন, স্বজনহীন, পিতৃহীন, মাতৃহীন, দেবতাহীন ও অনাথ হতে হয় না, তাঁদের প্রকৃতই কোন অভাব নেই।

—শ্রীভক্তিবেদান্ত তপস্বী

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী পরমহংসস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
শুভ আবির্ভাব তিথি-বাসরে
দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় গুরুদেব জয়, পরম কল্যাণময়,
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন।
পৌষী কৃষ্ণা নবমীতে, আবির্ভূত অবনীতে,
ভগবৎপ্রেরিত মহাজন ॥১॥
শ্রীমতীর প্রিয়তম, শ্রীকেশব প্রাণসম,
অতিমর্ত্য তোমার প্রভাব।
অপ্রাকৃত তর তত্ত্ব, কেবা জানে সে মহত্ত্ব,
বদ্ধজীবে নাহি অনুভব ॥২॥
অদ্য তব শুভ স্মৃতি, শুভ আবির্ভাব তিথি,
গুরুপ্রেষ্ঠ-হৃদে অগুরুক্ষণ।
মিলনে বিরহ-তিথি, বিরহে মিলন-স্মৃতি,
অপ্রাকৃত স্মরে পরিজন ॥৩॥

নিত্যানন্দের স্বরূপ, ব্যাসাভিন্ন গুরুরূপ,
 বন্দি সেই শ্রীগুরুচরণ।
 কৃষ্ণ হয় নিত্য তত্ত্ব, দেখাইলে সে মহত্ব,
 বিলাইলে সেই ভক্তিধন ॥৪ ॥
 গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, যোগ্য আচার্য্য সভাপতি,
 ধর্মসভা করি' নানা স্থানে।
 বেদান্তের সার ভক্তি দেখাইলে শাস্ত্রযুক্তি,
 নাম-মন্ত্র দিলে ভক্তজনে ॥৫ ॥
 স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজ্ঞাতা অতিমর্ত্য হরিকথা,
 হংকর্ণ হয় রসায়ণ।
 স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব জীবে হিতে রত,
 গুরু অভীষ্ট কৈলা সাধন ॥৬ ॥
 সর্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত, বচন তার অমৃত,
 সর্বসংগুণের আকর।
 ভক্তিতে ভূষিত অঙ্গ, দেবতাদি মাগে সঙ্গ,
 দীর্ঘতনু অতি মনোহর ॥৭ ॥
 আমি অতি মুঢ় মতি, তব পদে করি নতি,
 স্ফূট হও হৃদয়ে আমার।
 অহৈতুকী কৃপা করে, এ অধমের কেশে ধরে,
 তব পদে কর অনুচর ॥৮ ॥

—শ্রীভক্তিবেদান্ত নিরীহ



শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-আলোচনা

শুদ্ধকৃষ্ণ-কীর্তন-দুর্ভিক্ষপীড়িত বিশ্বে সৎ-সিদ্ধান্তামৃত-ধারার প্লাবন আনয়ন
 করিয়া,—“সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম”—এই শ্রুতিগাথার মর্যাদা স্থাপন
 করিতে, এবং রূপানুগ ভক্তিবিনোদের নাম-প্রেম-প্রচারের ভিত্তির উপর
 বিজয়-বৈজয়ন্তী-বিভূষিত মহা-চিৎসম্বয়ের এক অপূর্ব সৌধ প্রকটিত করিতে
 বর্তমান-যুগে বিপ্রলম্ববিগ্রহ-শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণনুসন্ধান-লীলা-ক্ষেত্রে—“উৎকলে
 পুরাণোত্তমাং”—বাণী-নীরাঞ্জিত-ক্ষেত্রে,----নীলাচল-সিদ্ধু তটে ঈশপ্রেষ্ঠ

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীসরস্বতী—
 শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম-প্রকটিত “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”—এই বাণীর
 মূর্ত-প্রকাশ। বর্তমানযুগে শ্রীচিৎলাস সরস্বতীর আবির্ভাব না হইলে
 শ্রীচেতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়াকাদম্বিনী—যাহা শ্রীরূপাদি ষড়্গোস্বামি, রূপানুগ
 শ্রীকবিরাজ-শ্রীমন্নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব ও তৎপরে শ্রীভক্তিবিনোদখাতের মধ্যে
 পুনরুচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এই মরীচিকাত্রান্ত, কীর্তন-
 দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতে আজ কাহারও প্রাপ্তির আশা ছিল না। শ্রীচেতন্যকৃপানিধির
 ‘ভক্তিবিনোদ’ দয়া কল্যাণকল্পতরুর সুকল্যাণফলের পূর্ণ পসরা লইয়া জগতে
 আবির্ভূত হইলেও আজ কেহই তাঁহার সন্ধান পাইতেন না। এই প্রভুবর
 আবির্ভূত হইয়া আজ দুঃখী জীবের দ্বারে দ্বারে এই রূপানুগা ভক্তিবিনোদা দয়াই
 অযাচিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে তাঁহারই সেই প্রচার
 বেশিষ্টা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ব্রতী হইয়াছি।



১। এই আচার্য্যবর যেন শুদ্ধসনাতন-ধর্মের ইতিহাসের একটি পরিবর্দ্ধিত
 বিরাট নূতন-সংস্করণের প্রকাশক এবং কৈতবাচ্ছন্ন নাস্তিকতার যুগে অকৈতব
 আস্তিকতার প্রবর্তক। তাঁহার চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণচেতন্য-মনোহীষ্ট স্থাপনকারী-শ্রীরূপ-
 সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব আনুগত্যে জীব-মঙ্গলবিধান চেষ্টারই বিবৃতি বা পূর্ণ
 বিকাশ। আজ-কাল কেহ কেহ মনোধর্মের বশীভূত হইয়া মানুষকে, মায়াকে
 ভগবান্ হইতে ‘বড়’ সাজাইতে চান!! কোন কোন উন্মত্ত ধার্মিক বলেন,
 —মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ হইতে আমাদের গুরুদেব বড় ;—মহাপ্রভু মানুষকে
 নাচাইয়াছিলেন, আর আমার গুরুদেব তৃণ-লতাকে নাচাইতে পারেন, মহাপ্রভু
 কেবল ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমার গুরুদেব পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন!
 কেহ বা বলেন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সহিত যুক্ত হইলে মহাপ্রভু পূর্ণতত্ত্ব হন,

কিন্তু আমার প্রভু একাধারে গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের অবতার, সুতরাং মহাপ্রভু হইতেও আমার প্রভু ‘বড়’ বলিয়া তিনি ‘মহামহাপ্রভু’ ইত্যাদি। কেহ বা বলেন, —আমাদের আচার্য্যের আগমনে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস দুইশত-বৎসর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সকল উন্মত্ত ধার্মিকগণের কথা মায়াকে মায়াধীশ অপেক্ষাও ‘বড়’ বলিয়া ‘স্থাপনের’ ধৃষ্টতা-মাত্র।

তাহারা এই বড়-ছোট লইয়া তাহাদের উপযুক্ত গন্তব্যপথে চলিয়া যাউক, —ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাহারা সাধারণ লোকগুলিকেও এমন একটা আফিমের নেশায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, জগতের ইতিহাসটা কোন্-দিকে অগ্রসর হইয়াছে,—এই অগ্রসরটা কি প্রত্যঙ্মুখী, না পরাঙ্মুখী—এই অগ্রসরটা কি অধোক্ষজ-সেবার দিকে, না অক্ষজ-সেবার দিকে, তাহা কাহাকেও ভাবিতে দেয় না। জড়জগতের ইতিহাস কিন্তু চিরদিনই সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই জগৎ কেবল অক্ষজ-সেবার দিকেই অগ্রসর হইয়াছে—পুরাণ-কথিত কলির ভবিষ্যচারগুলি —যাহা অন্ততঃ আরও চারিলক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত বৎসর পরে উদ্ভিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা এখনই দেখা যাইতেছে! ইহারই নাম—‘অগ্রসর’! মানুষ এক কথা বুঝিবে না—বিচার করিবে না,—খাঁটা কথা শুনিবে না,—অথবা মোহিনী মায়া কিছুতেই শুনিতে বা বুঝিতে দিবে না—‘এক’ বুঝিতে ‘আর এক’ বুঝাইয়া দিবে; নতুবা মায়ার হাট যে থাকে না!

আমরা সেরূপ কোন কথা বলিতেছি না; আমরা জানি,—এই আচার্য্যবর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি ভবনমঙ্গল-বিধাতা-গণের অভিন্নবিগ্রহরূপে তাঁহাদেরই কথার—তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যের—তাঁহাদেরই মনোহভীষ্টের বিস্তারকারী। তিনি কৈতবাচ্ছন্ন নাস্তিকের যুগকে কৈতবতার দিকে—সাময়িক উত্তেজনার দিকে—বিরাট্ তমোভাবের সমষ্টিকে একটা সাময়িক রজোভাবের মাদকতার দিকে—পাঁচশত বৎসর বা হাজার বৎসর অগ্রসর করাইয়া কলিরাজের মনোহভীষ্ট পূরণ করিবার আদৌ পক্ষপাতী নহেন;—তিনি অকৈতব আন্তিকযুগের প্রবর্তক।

যে যুগে কলির দোৰ্দণ্ড প্রতাপ,—যে-যুগে মায়া-রঙ্গিনীর অবাধ-কুনাট্য—যে-যুগে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, কৰ্ম্মজড়তা ও মৎসরতার উদগু নৃত্য ও আত্মফালন,—যে-যুগে অদৈব-সমাজরূপ কালাপাহাড় সজ্জনগণের হৃদয়ে আতঙ্ক তুলিয়া বিকট-হাস্যে নৃত্য করিতেছে,—যে-যুগে কৰ্ম্মজড়বাদরূপ তৃণাবর্ত সকলেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—যে-যুগে চিহ্নজড়-সম্বন্ধরূপ পূতনা ধর্ম্মরাজ্যের কোমল-মতি শিশুগণের সর্বনাশ সাধন করিতেছে,—যে-যুগে কপটতাই আদর্শ-সরলতা ও সভ্যতারূপে আর উদ্দাম অসংযত ভাবই উদারতার নামে বাজারে বিকাইতেছে, সেই যুগে জগতের সকলের ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া—উল্টা-জগতের সকলের সকল প্রকার ধর্ম্মের ধারণা ও বিচারের নিরর্থকতা দেখাইয়া—

অন্যাভিলাষ-পীড়িত জগতের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া প্রোঞ্জিত-কৈতব ভাগবত-ধর্মের দুন্দুভি বাজাইয়াছেন—আমাদের এই যুগ-প্রবর্তক আচার্য্য।

২। এই আচার্য্যের প্রচারের ফল—এই সার্বভৌমিক ধর্ম-সুর-তরঙ্গ প্রপঙ্ক ফল সকলেই পাইবেন—“বিনা-বৈষ্ণবনিন্দুক দুরাচার।” মরীচিমালী তাঁহার কিরণ সমভাবে সকল স্থানেই বিলাইয়া দেতে চান, সেই কিরণ যেমন কোন আধারে অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হন, আবার যখন আমরা ঐ মহোদার সমবর্ষী সৌর কিরণকে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রবেশ করিতে দেই না, তখনও সেই কিরণ অতিথির ন্যায় আমাদের গৃহের দ্বারে প্রবেশকামী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, —যে স্থানটুকু উন্মুক্ত পায়, সেই স্থানটুকুকেই মণ্ডিত করিয়া থাকে। জগতের প্রতি আমাদের আচার্য্যের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণও সেইরূপ। তিনি ঈশপ্রেমহীন কৃপণ, দীন, কর্মজড় জগতের কাছে যেন অমন্দোদয়দয়ার পসার লইয়া উপস্থিত, —অযাচকে বিনামূল্যে তাহা বিতরণ করিতে প্রস্তুত। “বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়ন্মানভিস্পৃশমক্শম্”—বাক্যের যাথার্থ্য তাঁহাতেই দেখা যায়। মানুষ হরিকথা শুনিতে চাহে না, তথাপি তিনি জোর করিয়া শুনাইবেন। মানুষ গৃহমেধের চতুর্দিকে দিবানিশি পরিভ্রমণ ছাড়া আর কিছু চাহে না, কিন্তু ইনি জোর করিয়া ভগবানের ধাম-মন্দিরাদি পরিক্রমা করাইবেন ;—“দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম”—এই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি এই আচার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাই। চর্ক্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়-লোভে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ তথাপি সাধুসঙ্গ করুক, হরিকথা শুনুক, ধামপরিক্রমা করুক,—তৎফলে তাহার কোন অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপন্ন হউক—তাহার দুর্বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হউক। যাহারা গৃহের চতুর্দিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুহকিনী মায়ার বিলাস পালঙ্কে অনাদিকাল হইতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, তাহারাও এই আচার্য্য-কেশরীর নিনাদে একদিন না একদিন জাগিবে ; কিন্তু যাহারা জাগিয়া ঘুমাইবার ভান দেখাইতেছে—“অতিথিকে কিছুতেই গৃহের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিতে দিব না” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই বৈষ্ণবাপরাধিগণই কেবলমাত্র এই আচার্য্যের প্রচারের ফল হইতে বঞ্চিত হইবেন। কনিষ্ঠাধিকারী—শব্দব্রহ্মের উপাসনা বা অপ্রাকৃত শব্দের শক্তিবিশয়ে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ, সেইজন্য এই আচার্য্যবর তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া তদনুযায়ী কিছু স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবৎসেবনাধিকার-প্রদানের ব্যবস্থা—যেমন, শ্রীবিগ্রহ-অর্চনা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, হরিসেবানুকূল বিভিন্ন শারীরিক অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য—ক্রমে তাহাদিগকে শব্দব্রহ্মের উপাসনায় আকৃষ্ট করা। মধ্যম অধিকারিগণকে তিনি হরিকথা-কীর্তনে নিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক ভক্তকে ভগবান্নন্দির-রূপে উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধসত্ত্বে পরম-অক্ষরাকৃতি বাসুদেবের অবতারণ করিবার শিক্ষা দিতেছেন

এবং স্বয়ং ভাগবতোত্তমরূপে—গোষ্ঠানন্দী গুরুবররূপে, সর্বত্র গোষ্ঠ অর্থাৎ পরবিদ্যা ভক্তিগীঠ বা কৃষ্ণের পাদচারণস্থলী ও লীলা বিহারভূমিকার উদয় করাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার আচার ও প্রচারের ফল নিখিলচেতনবর্গের আনন্দের বিষয়।

৩। তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য—জগতে অকৈতবসত্য সংস্থাপনের জন্য নির্জর্ন-ভজনের ছলনায় আত্মশক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রেমিকতা-রসিকতা-ভাবুকতা-ফল্গুবৈরাগ্যের ছলনায় জগতের প্রদত্ত ভক্তপ্রতিষ্ঠা মলবৎ বিসর্জন করিয়াছেন ; কারণ, তিনি আত্মগৌরব-বৃদ্ধির বিনিময়ে জগৎকে হিংসা করিতে আসেন নাই। তাঁহার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—কোটি-ইন্দ্রিয়ে, কোটি-জিহ্বায় কৃষ্ণসেবার লালসা—অতৃপ্ত। পরিপূর্ণরূপে বৈষ্ণবতার আদর্শে—হরিভজনের শতকরা শতমাত্রায় সর্বক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার সেই লালসার তৃপ্তি নাই। তাঁহার এই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি অঙ্কুরোদ্ভিজাত ধারণার কাছে অন্যপ্রকার প্রতিভাত হইয়া ঈশবিমুখকে বঞ্চনা, আর ঈশ-সেবোন্মুখকে অধিকতরভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাস্যে নিযুক্ত করিতেছে।

৪। এই আচার্য্যবর কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যান্যভিলাষী গুরুব্রহ্মগণের ন্যায় নিজ শিষ্যে কোন-দিনই ভোগবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যেক প্রপন্ন হৃদয়কে ‘গোষ্ঠ’ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়া থাকেন,—বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও শিষ্য করেন না,—তিনি সর্বত্র গুরুর প্রকাশ-বৈভব দর্শন করেন ; তবে বৈষ্ণবাচার্য্যের শিষ্য-করণ-লীলা কিরূপ? তাহার উদাহরণে তিনি মহর্ষি ভৃগুর দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন,—

“মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহতে।

করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥

জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কৰ্ম্ম কভু নয়।

কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥”

(চৈঃ ভাঃ ৯ম অঃ ৩৮৩-৩৮৪)

এরূপভাবে শিষ্যগণকে শিষ্য না ভাবিয়া তাঁহাদের সহিত সর্বদা মিলিয়া মিশিয়া—বিচরণ করিয়া—সর্বদা সঙ্গপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করিয়া—অবিরাম হরিসেবার আদর্শ দেখাইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্্তন করিয়া আর কেহ শিষ্যগণের কল্যাণের জন্য এরূপ অক্লান্ত যত্ন করিয়াছেন কি না, আমরা জানি না।

৫। আমাদের প্রভুপাদের জ্বলন্ত আচার ও প্রচার-সেবোন্মুখ-জনগণকে, অপ্রাকৃত সহজ-পরমহংস শ্রীরায়-রামানন্দের দেব-দাসীর গুহ্যঙ্গ-স্পর্শনাদিতেই তাঁহার সর্বোত্তম হরিভজন, আর স্বয়ং প্রভুর সেবনোদ্দেশ্যেই পরম-বৈষ্ণবী বৃন্দা মাধবী-দেবীর নিকট বৈরাগ্যাভিনয়কারী ছোট-হরিদাসের ভিক্ষা বা তণ্ডুল-

আনয়নচ্ছলে অপকৃষ্ট অপরাধের অনুষ্ঠান প্রভৃতি তত্ত্বোপলব্ধি যেন হাতে কলমে দিয়াছেন।

৬। “কস্মীর কাণাকড়ি” কোন দিনই তাঁহার নিকট আশ্ফালন দেখাইতে পারে নাই। একবার তিনি বিশেষভাবে আহূত হইয়া হরিকীর্তনের জন্য বৈষ্ণব-নামে প্রচারিত কোন রাজার প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। রাজার আদেশমত ব্রাহ্মণ-পূজারী প্রতিদিন নানাবিধ চৰ্ক্য-চূষ্য-লেখ্য-পেয় প্রসাদ তাঁহার জন্য রাখিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি হরিকীর্তনের জন্য সেই স্থানে যে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই তিন দিবসই সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর একমাত্র হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তথায় বিভিন্নস্থান হইতে বহু বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই আচার্য্যের ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলেও—প্রসাদাদি প্রাপ্তির জন্য অধিক সুবন্দোবস্ত থাকিলেও তিনি ঐ তিন দিবসের মধ্যে একদিন মাত্র একটা তুলসী গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

৭। মায়ার খেলার বিচিত্রতা—কপটতার বিলাস-বৈচিত্র্য, এই আচার্য্যবর যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা অন্যত্র আর শুনি নাই। এই আচার্য্যের হরিকীর্তন ও বিশ্লেষণ-প্রণালী যেন একটা পরার্দ্র-কোটিশক্তির অন্তর্ভেদী তড়িতালোক—যাহা এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে কপটতা-বিষসর্পের যত গর্ত রহিয়াছে, সেই গুলির সুগভীর দুর্ভেদ্য অন্তঃস্থলে তাঁহার সেই অদ্ভুতশক্তির আলোক প্রবেশ করাইয়া পাতালস্থিত-গর্তের এক-কোণে গোপনে লুকায়িত, সুপ্তপ্রায় বিষধরকে অতি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতেছে।

৮। ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ পরিত্যাগ করিয়া কেহই মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। বর্তমানকালে অনেকেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ধার না ধারিয়াও গৌরভক্ত বলিয়া ডক্কা বাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। “অন্যাভিলাষিতা শূন্যম্”, “অনাসক্তস্য বিষয়ান্” “প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা”, “ধনশিষ্যাভির্দ্বারৈঃ” “ব্যতীত্যভাবনাবত্ন” প্রভৃতি শ্লোক উল্লঙ্ঘন করিয়াও অনেকেই ‘ভক্ত’ ও ‘রসিক’-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। কিন্তু আমরা এই আচার্য্যবরের আচরণ হইতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ঐ শ্লোকগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। এইরূপ আদর্শ আচরণের নিকট সমুপস্থিত হইবার পূর্বে আমরা অনেকেই ফল্গু-বৈরাগ্যকে সাধুত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতাম ; কখনও বা ‘জীবমুক্ত’ পুরুষ বলিতে একটা কি জানি কিরূপ অস্বাভাবিক মূর্তি নিজ নিজ-কল্পনার চিত্রে অঙ্কন করিতাম। অনেক সময় মনে করিতাম জীবমুক্ত পুরুষের বোধ হয়, দশ হাত, দশ পা থাকে, কিংবা তিনি, বোধ হয়, উর্দ্ধনেত্র হইয়া সকল সময় যোগাসনে বসিয়া থাকেন, কিংবা তিনি রুদ্ধবাক্ হইয়া সমাধিস্থ থাকেন, কিংবা

তিনি দশ-পাঁচ হাত উঁচু হইতে পারেন, কিংবা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারেন, কিংবা মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, কিংবা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিংবা ফুঁ দিয়া শারীরিক ও মানসিক অশান্তি দূর করিতে পারেন ; কখনও বা অভিশাপাদি প্রদান করিয়া কাহারও ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারেন, কিংবা মায়ায় হাত দিয়া তাহাকে রাতারাতি কোটিপতি করিয়া দিতে পারেন, অথবা তিনি গঞ্জিকাসেবনের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন, কিংবা তিনি কাহাকেও কোন প্রকার বিরক্ত না করিয়া অজগর-বৃত্তি অবলম্বনে সভ্যসমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তুষারাবৃত হিমালয়ের গহ্বরে নগ্নদেহে অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচয়িতা স্বয়ং শ্রীরূপের শ্রীহস্তাঙ্কিত চিত্র আমাদের প্রভুপাদের মূর্ত্ত আচরণসমূহে সমভিব্যক্ত হইয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা কল্লিত পুতুলগুলিকে চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া সেস্থানে জীবন্মুক্ত-পুরুষের এই জ্বলন্ত আলোখ্য স্থাপন করিয়াছেন,—

“ঈহা যস্য হরেদর্দাস্যে কন্মর্গা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥”

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ।

নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥”

কায়মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে হরিদাস্যের অনুসন্ধান কতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সেই আদর্শ আমরা জ্বলন্ত মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে এই আচার্য্যে দেখিয়াছি। ‘যুক্তবৈরাগ্য’ কাহাকে বলে,—তাঁহার নিত্য আচরণই উহার বিবৃতি রচনা করিয়াছে।

৯। আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এই আচার্য্যে লক্ষ্য করি। তাঁহার নিকট ‘অসম্ভব’ বলিয়া কোন শব্দ কেহ উপস্থাপিত করিতে পারেন না। ‘অসম্ভব’ বলিয়া কোন কথা তাঁহার কাছে নাই। তিনি—সত্যসঙ্কল্প। তিনি একবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যতই বাধা-বিপত্তি অপর লোক-লোচনের দৃষ্টিতে তাঁহার সঙ্কল্পের কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হউক না কেন, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প সাধন করিবেনই করিবেন। যেটা অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণের বিচারে খুবই অসম্ভব, সেটা তিনি অবশ্যস্তাবিরূপে দর্শন করিতে পান। যেখানে আমরা সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া নিরাস হইয়া পড়ি—অবশ্যঙ্গ হইয়া পড়ি সেই অসম্ভাবনার মেরু-মন্দারগুলি আনিয়া সেই অসম্ভবতা-শৈল-শ্রেণীকে যেন পরম সম্ভবতা-হেমাঙ্গিরূপে মণ্ডিত করিয়া তোলেন,—ইহাই তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তিনি যতবার যত সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কখনও অসম্পন্ন থাকিতে দেখা যায় নাই। তিনি যেন একটা সুন্দর বিপুলান্ধ-সেবা-বিগ্রহের উর্ব্বর উত্তমাস্, —সর্বদাই সেই উত্তমাস্‌টী নব-নবায়মান সেবা-সঙ্কল্পের অঙ্কুররাজীর উদ্গাম

করিয়া দিতেছে। যাঁহারা এই উত্তমাস্কের সেবাসঙ্কল্পসমূহকে বিকসিত করিতে অসমর্থ হইলেন বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন, তাঁহাদের যেন ঐরূপ উত্তমাস্কের অঙ্গে সংলগ্ন থাকা উচিত নহে,—ঐরূপ সর্বোত্তম উত্তমাস্ককে যে-সকল অঙ্গ ধারণ করিতে অসমর্থ, তাহারা ঐরূপ উত্তমাস্কের সহিত কখনও একত্র অবস্থান করিতে পারে না,—ইহাই তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প-নৈপুণ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রাকৃত কোন বস্তু অপ্রাকৃতের সহায়তা করিতে পারে,—কর্ম্ম, ভক্তির সহায়তা করিতে পারে,—ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার হয়,—কর্ম্মবীরের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয়,—ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন,—একমাত্র সেবাবৃত্তির দ্বারাই সর্বসাধ্য সাধিত হইতে পারে। যেখানে সেবাবৃত্তির অভাব, সেখানে অর্থের মূল্য—কাণা-কড়ি-মাত্র, যেখানে অধোক্ষজ-সেবাৎসাহের অভাব, সেখানে কর্ম্মবীর—মৃতকের তুল্য। তিনি বলেন,—যতদিন যাঁহার সেবাবৃত্তি উদিত থাকিবে, ততদিন তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার সম্ভব হইবে ; কিন্তু ভগবৎসেবা-বৃত্তির অভাবে বিপুল সৌধরাজী আর মঠ-মন্দিররূপে না থাকিয়া গঞ্জিকা-সেবী লম্পটের আড্ডায় পরিণত হইবে।

তিনি বলেন, শ্রীমঠ একমাত্র শুদ্ধসংকীর্ণনস্থলী। যেখানে শুদ্ধকীর্তনরূপা নিগুণ-সেবার অভাব, সেখানে হয় মিশ্র-সত্ত্বগুণ নিগুণ মঠের পরিবর্তে তাহাকে প্রচ্ছন্ন-ভোগপর সেবাহীন ইন্দ্রিয়-প্রসাদক তপোবন বা কাননরূপে পরিণত করিবে, এমন নয় রজোগুণের প্রাবল্য ‘গ্রাম’ বা মিথুন-ধর্ম্মের যজ্ঞস্থলীতে পর্য্যবসিত করিবে, নয় তমোগুণের প্রাবল্যে উহা দ্যুতক্রীড়া বা গঞ্জিকা-সেবন-ব্যসনাদির গুহারূপে পরিণত হইয়া পড়িবে। এই জন্য তিনি কোন মঠে অর্থ-সঞ্চয়াদি করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, অযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরবর্তিকালে মঠ নিগুণ-কীর্তনস্থলী না থাকিয়া অচিহ্নিলাস মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কোনও না কোন একটি স্থানে নিশ্চয়ই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

১০। তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ‘ভাব’ হইতে ‘ভাষার’ উৎপত্তি। ভাবই ভাষারূপে পরিণত। যাঁহার হৃদয় সর্বদা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া সন্তোজ্জ্বল-সেবাভাবে বিভাবিত—কৃষ্ণসুখৈক-তৎপর্য্যই যাঁহার ভাবভরকে নিত্য বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার ভাষাও তদনুরূপই হইবে। বর্তমান জগতের ভাষার সহিত এই আচার্য্যের ভাষায় যে পার্থক্য, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। বর্তমান জগতের চিন্তা-স্রোত, ভাবনার গতি—ভোগের দিকে। সেই ভোগটা দ্বিবিধভাবে, (ক) প্রকৃতিকে—সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুকে অন্নয়্যভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা, (খ) প্রকৃতিকে ব্যতিরেকভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা—এই দ্বিবিধভাবে ভোগপ্রবৃত্তি

বর্তমান- জগতের সাহিত্যে আকারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্তমান কালের ভাষার স্রোত যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—সেই ভাষার সাহায্যে ভাষাবিদগণ যেন প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগ করিবার জন্য উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছেন। বিরাট প্রকৃতিরই একটা ক্ষুদ্রতম অংশরূপা যোষিৎ ভোগ করিয়া যে অতৃপ্ত ভোগ-কামনা রহিয়া যায়, সেই অতৃপ্ত ভোগ-তৃষ্ণানলের লেলিহান কোটী জিহ্বাকে মহা-মোহিনী প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করিয়া পিপাসা-শান্তির জন্য যে প্রয়াস, তাহাই বর্তমান জগতের ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করিবার বাসনাটুকু নহে,—সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হইয়া রাবণের সীতা-হরণ-চেষ্টার ন্যায় ভগবচ্ছক্তি-ভোগের দুৰ্ব্বুদ্ধিও পোষণ করিতে বসিয়াছে। এখন সাহিত্য-রচনা আর শুধু জড়-জগতের ভাব-ভাবনায় আবদ্ধ থাকিতেছে না, এখন বৃন্দাবন-লীলা, রাই-কানুর পিরীতি, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতিকেও প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। বজ্রাঙ্গজী-মহারাজ যেরূপ বীর-দর্পে রাবণের দুৰ্ব্বুদ্ধির বাধা দিয়াছিলেন—রাবণের সীতা-হরণকে ‘মায়াসীতা-হরণ’ বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ এই আচার্য্যবরও বর্তমানকালের প্রকৃতি-ভোগ-প্রবণ সাহিত্যজগতে স্বীয় গুরু-গভীর ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আমাদের দুৰ্ব্বুদ্ধি-গ্রন্থিসমূহকে ছেদন করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কোন প্রকার প্রকৃতি-ভোগ-কামীর ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না ; সুতরাং সে এই ভাষাকে ‘দুর্বোধ্য’ ও ‘শুদ্ধ’ বলিয়া দুইরকম থাকে। কিন্তু এই ভাষার এমন একটা সৌন্দর্য্য যে, তাহার এক একটা শব্দ যেন এক-একটা অফুরন্ত-সুসিদ্ধান্ত-সম্মগ্নি-খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চরমকাষ্ঠার দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয়। এই ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোনও কদর্থকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে না,—তাহার গতি সহজ ও সরল। দুইদিকে এমনভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হইতেই কোন খল আসিয়া সে কৃষ্ণ-পাদচারণ-ভূমিকাকে কোন ভাবেই বিন্দুমাত্রও দূষিত করিতে পারে না।

তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা-স্বগদী তখনই জগতে প্রবাহিত হয়—তখনই বজ্রনির্ঘোষী শব্দরাজির সহিত সুসিদ্ধান্ত-সৌদামিনী-মালা অবিশ্রান্ত প্রকটিত হইতে থাকে, যখনই কোন প্রতীপজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব বা শ্রীতপন্থাকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। আরও একবার তাঁহার অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্য-নৈপুণ্যের সহিত কোটি-সিদ্ধান্ত-প্রসবগমুখ উন্মুক্ত হইতে দেখা যায়, যখন সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট পরিপূরণকার্য্যে নিম্পটে সর্বস্ব ঢালিয়া দেয়। তাঁহার অকৃত্রিম শব্দবিন্যাস যেন বৈকুণ্ঠের রত্নালঙ্কার-সজ্জা-পরিপাটি—সেই এক একটা শব্দের যেন এক একটা অখণ্ড-অলঙ্কার-কৌস্তুভ।

১১। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটী অক্ষজ-জ্ঞানের নিকট ভীম-হস্তস্থিত ভীষণগদা-সদৃশ। দুর্যোধনরূপী অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার চরিত্রের সম্মুখে বিন্দুমাত্রও আশ্ফালন দেখাইতে চাহিলে গদার সাংঘাতিক আঘাতে উহার উরুভঙ্গ হইয়া যায়। অক্ষজ-জ্ঞানের আশ্ফালন করিয়া যখনই কেহ এই অধোক্ষজ-সেবকপ্রবরের চরিত্র বিচার করিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার সহস্রমুখী কৃষ্ণানুসন্ধান-লালসাকে—তাঁহার অতৃপ্ত সেবা-বাসনাকে—তাঁহার সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শকে ধারণা করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়াছে।

১২। সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জনেও তাঁহার সমগ্র-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। আজীবন দুঃসঙ্গ-বর্জনে করিয়া বাস্তবসত্য কৃষ্ণের অনুসন্ধানই তাঁহার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। অসৎসঙ্গ-বর্জনে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহার প্রকাশ ; “প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।”—এই মহাজন-বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রে মূর্তিমান হইয়া প্রকাশিত। তাঁহার নিকট সৎ ও অসতের সমন্বয় বা গোঁজামিল দিবার উপায় নাই,—তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত কথিত ‘খড়’ ও ‘জাঠিয়া বেটার’ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০পঃ ১৮৪) আদর্শ—যাহা বর্তমান কপট-সমাজের একটা নিত্যধর্ম হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি সৎ ও অসতের মধ্যে, সজ্জন ও দুর্জনের মধ্যে, বৈষম্য ও অবৈষম্যের মধ্যে এমন একটা পরিখা কাটিয়া দিয়াছেন—এমন একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার অনুগ বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। এইরূপ সতের নিকট হইতে অসৎকে অনন্তকোটি যোজন দূরে রাখাই তাঁহার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। তিন অসৎকে সৎ হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি প্রলম্বাসুরকে বা ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সকে কখনও তাঁহার নাট্য-মন্দিরে নৃত্য করিতে দেন না। তাঁহার এমনই প্রভাব যে ঐরূপ অন্যাভিলাষিগণ—কপটগণ—প্রলম্বাসুরগণ তাঁহার চিত্ত্বলের প্রভায় অচিরেই স্ব-স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ বিবরে লুকাইয়া পড়ে।

১৩। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই দান্তিক—যত বড়ই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রমত্ত—যত বড়ই তार्কিক তাহাদের সমস্ত দান্তিকতা, অহমিকা, দুর্বুদ্ধি, ঔদ্ধত্য ও বিরোধের দোকান লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সকলেই তাঁহার অমানুষি তেজের নিকট তাহাদের ভগ্ন-প্রবণ কাচ-দ্রব্যগুলির মূল্য যে অতীব অল্প, অন্তরে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উন্নত-শির নত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাহারা কপট, তাহারা অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়া মুখে প্রকাশ করিয়া স্বীয় লঘুতা প্রচার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের পরিপ্লান-বদনমণ্ডল নিজ-নিজ-অন্তরের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

১৪। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সকলকে পূর্ণ বস্তু

দান করিতে চান। “অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্”—এই উক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপে তিনি যেখানে অপূর্ণতা—যেখানে আংশিকভাব, সেখানেই কোন না কোন-ভাবে মায়ার অবকাশ লক্ষ্য করেন ; তাই তিনি পরিপূর্ণ বস্তু প্রদান করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সর্বদা সকলের নিকট পূর্ণ হরিভজনের কথাই কীৰ্ত্তন করেন,—আংশিক হরিভজনের কথায় তাঁহার মন উঠে না,—সকলকেই সার্বকালিক হরিভজনের কথা বলিয়া থাকেন,—পূর্ণবস্তু-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মানবকে, স্ব-স্ব-পূর্ণ আধার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলেন—সকলকেই তাহাদের যথা সর্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে বলেন। সার্বকালিক হরিভজনের কথা এত দাগ বসাইয়া, এত জোরে, অনুক্ষণ আর কেহ কখনও প্রচার করিয়াছেন কিনা—আমাদের জানা নাই। সাধারণের ধারণায় সারাদিন সংসারের নানা-কাজের পর একটি নির্জর্জন-স্থানে বসিয়া সম্ব্যাহিক করা বা খানিকটা গান করা, কিংবা কিছুক্ষণ নাসা বন্ধ করিয়া ধ্যান করা, দিনের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট-সময়ে কয়েকবার ঘণ্টা নাড়া, অথবা কিছু-সময়ের জন্য কোন একটি সভায় বা বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইয়া কীৰ্ত্তনাদি করা, সদালাপ বা গ্রহাদি পাঠ করা প্রভৃতিই ‘হরিভজন’। কিন্তু চব্বিশ-ঘণ্টাই সকল কার্য্যে—প্রতি-পদবিক্ষেপে—প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে—এমন কি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার বৃথা সময় না দিয়া—জগতের অন্য কোন কথা ভাবিবার সময় না দিয়া এত অধিকসংখ্যক লোককে সর্বস্ব সমর্পণ-দ্বারা একসঙ্গে হরিভজন কে করাইয়াছেন? বিশেষতঃ জড়ভোগোন্মত্ত কৰ্ম্ম-কোলাহল কেলি-পরায়ণ যুগে ইহা কতদূর আশ্চর্য্যজনক, তাহা আমরা ভাবিয়া অত্যাশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া পড়ি।

১৫। তাঁহার চরিত্রের আর একটি-বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার হৃদয় ‘বজ্রাদপি কঠোর’, আবার ‘কুসুম হইতেও সুকোমল’—তিনি রত্নাকরের ন্যায় গুরু-গভীর, আবার সুরধনীর ন্যায় সর্ববিশোধক। সাগরের কাছে যেমন কেহ যাইতে সাহস করে না,—দূরে—অতিদূরে—সভয়ে—সচকিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ কপট ব্যক্তিও তাঁহার গুরু-গাভীর্য্যের নিকট আসিতে পারে না,—ভীত ও লজ্জিত হইয়া দূরে অবস্থান করে ; আবার অত্যন্ত পাপা-তাপীও যেমন অবাধে পতিত-পাবনী গঙ্গার ধারা স্পর্শ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার নিকট যায়, সেইরূপ পাপ-তাপ-সন্তপ্ত-ব্যক্তি নিক্ষপটতা সম্বল লইয়া তাঁহার পাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। কঠোরতার অন্তরালে তাঁহাতে যে কত কোমলতা রহিয়াছে—কচি নারিকেল-শস্য যেরূপ কঠোর আবরণ-দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ তাঁহার পরদুঃখকোমল এবং সত্ত্বোজ্জল-কোমল-হৃদয় বহিঃস্থের নিকট আবৃত রাখিবার জন্য বাহ্য কঠিন আবরণে আবৃত।

১৬। সর্বশেষে আর একটা বক্তব্য বিষয় এই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্বশ্রেষ্ঠতা, সর্বপ্রাধান্য ও উজ্জ্বলতম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই এই আচার্য্যের

একটি সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমার্থিকতা ও নিত্য-সেব্যতা শাস্ত্রে ও গোস্বামিগণের শিক্ষায় থাকিলেও বর্তমানকালে সদ-গুর্বানুগত্য-বিমুখ যুগে এরূপ পরিস্ফুট ও বিস্তারিত-ভাবে হাত-কলমে ধরিয়া গুরুর নিত্য-সেব্যতা ও পারমার্থিকতা আর কেহ শিক্ষা দিয়াছেন কি না জানি না। বর্তমান যুগে গুরুবরণাদি ব্যাপার একটা সামাজিক ও নৈতিক প্রথারূপেই প্রচলিত। ; কোথাও বা তাঁহাকে উন্নত ধার্মিকতার উর্বর-কল্পনা-ভূমিকায় বিষয়-তত্ত্বের একটি বিকৃত আদর্শরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অনেকস্থলে “তোমার গুরু”, “আমার গুরু”, “তাহার গুরু”—এইরূপ গুরুতে খণ্ডবিচার-বুদ্ধির প্রদর্শনী সাজাইয়া গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার সহিত স্ব-স্ব-চিন্তাবৃত্তির পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেকস্থলে আবার গুরুকে আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠা-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের একটি পশ্চাদ্ভূমিকা বা স্বীয় চরিত্র-চিত্রের একটি অপাশ্রিত অংশে কোনওরূপে স্থান প্রদান করিয়া আপনাকেই ‘প্রধান নায়ক’ বলিয়া স্থাপন করা হয়, কোথাও বা কেহ কেহ আপনাকে নিজগুরু হইতেও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন, কেহ বা স্বীয় কপটাচার সমর্থন করিয়া লোকসমীপে ‘ধার্মিক’ বলিয়া খ্যাতি পাইবার জন্য মুখ্যতার আদর্শকেই গুরু-প্রতিমারূপে গঠন করিয়া উহাকে ত্রিরাত্র ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পূজা-উৎসব এবং অন্তিমিে বিসর্জন করিয়া থাকেন। এইরূপ গুরুব্রত ও শিষ্যব্রতগণের বিবিধ মনোহারী দোকান এই মায়ার রঙ্গ-মঞ্চের দ্বারে সজ্জিত থাকিয়া লোকের চিত্ত-বিন্ত নানাভাবে হরণ করিতেছিল।

এই আচার্য্য কেশরী এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া গভীর মেঘমন্ড্রে জানাইয়া দিলেন জানাইয়া দিলেন,—গুরুপাদপদ্ম পারমার্থিক ও নিত্যবস্তু, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। ‘তোমার গুরু’, ‘আমার গুরু’—এই খণ্ডবিচার লৌকিক- গুরুনামধারিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও পারমার্থিক গুরুদেব সেরূপ খণ্ডিত বস্তু নহেন ; তিনি অদ্বয়-জ্ঞানেরই প্রকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ জগদ্গুরুই—গুরু, অপরে ‘গুরু’-নামের অযোগ্য। সেই গুরুদেবের নিত্য-আনুগত্যই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। যেখানে ‘গুরু’ গৌণভাবে অঙ্গীকৃত হন বা গুরু হইতে বাড়িয়া ‘অতিবাড়ী’ হইয়া যাইবার অভিলাষ, সেখানে গুরুপাদপদ্ম নাই, কেবলমাত্র ‘লঘু’র তাণ্ডব নৃত্য।

১৭। বর্তমান-যুগের পণ্ডিত-সমাজে ‘বেদান্ত’ বলিতে নির্ভেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক বিচার-গ্রন্থই নির্দিষ্ট হইত ; কিন্তু এই আচার্য্যবর তাহার অসামান্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাইলেন যে, ভক্তিই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতামৃতই সহজ বা অকৃত্রিম বেদান্ত-নির্যাস। শ্রীচৈতন্যদেব, তাহার পার্শ্বভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-আল্লায়ে যাবতীয় ভক্তগণের চরিত্র যেন একটি স-ভাষ্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত। এরূপ কথা এই যুগাচার্য্য ব্যতীত

এরূপ পরিষ্কারভাবে সকলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া আর কেহ বলিয়াছেন কিনা,—আমরা জ্ঞাত নহি।

১৮। বর্তমান যুগে পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থ বেদের পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম আধুনিক—কিন্তু এই যুগাচার্যই এই যুগে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-পুরাণ-প্রতিপাদ্য ‘বিষয়’ ও ‘ধর্ম’, সংহিতাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থেরও পূর্ব হইতে অনাদি-সত্যরূপে প্রচারিত রহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্-সংহিতার প্রকাশ কালেরও বহুপূর্বের কথা। পুরাণের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালক্রমে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে।

১৯। এই আচার্য্য বর্ত্তমান ভাগবতবিমুখ যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের যেরূপ সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোদ্ধ আসন সংরক্ষণের জন্য ভাগবত-অপরাধী ব্যবসায়িগণের দুর্বুদ্ধিতে গদাঘাত করিয়াছেন। তিনিই জানাইয়াছেন, ‘ভাড়াটিয়া কখনও ভক্ত নহে’। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিতে হইবে—শ্রীমদ্ভাগবতকে দিয়া নিজের সেবা করাইতে হইবে না। শ্রীশালগ্রাম প্রভুর সেবার জন্য বাদাম ভাস্কিতে হইবে, কিন্তু নিজে বাদাম খাইবার জন্য শালগ্রাম প্রভুকে বাদাম ভাস্কিবার যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে না।

২০। এই আচার্য্যদেব প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিকট ‘মূর্ত্তিমান যমরাজ’, কপটব্যক্তিগণের নিকট ‘অব্যর্থ গাণ্ডীব’, অন্য্যভিলাষীর নিকট ‘ভীষণ দণ্ডধূক’, কুদার্শনিকের নিকট ‘মূর্ত্তিমান সুদর্শনচক্র’, অসচ্চরিত্রের নিকট ‘অরসিক’, রসভাসকারী ও সিদ্ধান্তবিরোধীর নিকট ‘নিরস জ্ঞানী’, বৈষ্ণবব্রতের নিকট ‘দান্তিক’ আর নিষ্কপট সজ্জনের নিকট একমাত্র নিহেতুক-পরদুঃখদুঃখী ; মহাবদান্য-শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া-শক্তির প্রকাশ ও দুঃখী দুর্বল জীবের একমাত্র আশ্রয়।

২১। তাঁহার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বর্ত্তমান অভিজ্ঞতাবাদের যুগে এমন একটা নূতন কথা বলিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত পরাক্রমবর্ণ পণ্ডিতসম্ম যেন নিব্বাকের ন্যায় তাকাইয়া সেই গঙ্গোত্রীধারার কূলকিনারা পাইতেছেন না। এই গঙ্গোত্রী কৃষ্ণপাদপদ্মহিমালয় হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থল-ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন। এই জলে অবগাহন করিলে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের সর্বাপ্স সুশীতল এবং শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ-

সুধাসারের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকেই এই আচার্য্যপ্রবর ‘ত্রৌতপস্থা’ বা ‘অবরোহবাদ’ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

২২। এই আচার্য্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই তार्কিক, সার্বভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, কেহই তাঁহার সদ্যুক্তি সিদ্ধান্তের সহিত যুক্তিসঙ্গত বিচার করিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বিপথে যাইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিতা সদ্যুক্তির নিকট অনিবার্য্য পরাজয়ের ভয়ে যুক্তিসঙ্গত বিচার পথ ছাড়িয়া অন্য কোন দুরভিসন্ধিকে আশ্রয় করিতে যান, তাঁহারা উন্মার্গগামী হইয়া নিশ্চয়ই কুসিদ্ধান্ত-গর্ভে পতিত হন। অনেক সার্বভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তিগণও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আচার্য্যের যুক্তির সহিত কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা নাই। এই আচার্য্যের শ্রীমুখপদ্মবিনির্গত যুক্তি-যুথিকা সৌরভ সর্বসজ্জনানন্দ-বর্দ্ধক।

২৩। বর্তমান আনখ-কেশাগ্র-বিষ্ণু-বিরোধযুগে অপভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায়, বাস্তবসত্য বিষ্ণুর অনুকরণে যখন সর্বত্রই পাষণ্ডতার অবতারসমূহ নূতন নূতন আকারে সৃষ্টি হইতে থাকিল, তখন এই আচার্য্যকেশরীই ঠাকুর বৃন্দাবনের বাক্য প্রতিধ্বনি করিয়া আরও উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

“কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন।

আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।

কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রবিনে অন্যেরে ঈশ্বর।

যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥”

যখন গৌর-বিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুরাগের পরিবর্তে নূতন নূতন তত্ত্ববিরুদ্ধ রসাতাসদুপ্ত ছড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকিল, যখন দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণ ঐ সকল নব-প্রবর্তিত কুবিষয়-কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিত এবং ঐরূপ অপরাধিগণকে ভীষণ নামাপরাধিজ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন, তখন অহৈতুক জীবদয়াময় এই আচার্য্যবর শুদ্ধগৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনপরিচয়গী অর্থাৎ গুরুত্যাগিগণের তত্ত্ববিরুদ্ধ-রসাতাসাদি দোষসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া জগতে শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তনের মন্দাকিনীধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন।

২৪। বর্তমান কৃষ্ণবিমুখ যুগে সকলেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুকে—কৃষ্ণসেবার উপকরণকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। এই সংক্রামক রোগ সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া দুর্বল জীবগণকে অনর্থ-সাগরে পাতিত করিতেছিল। এই আচার্য্যবর ঐরূপ যুগে উদিত হইয়া জানাইলেন, ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু

তোমার ভোগের বস্তু নহে। অপ্রাকৃত সাহজিকগণ—অনর্থমুক্ত পুরুষগণ চিল্লীলা-মিথুনের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণকর্ণোৎসব-স্বরূপ যে-সকল গীতি কীর্তন বা অপ্রাকৃত সহজ-সেবা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনর্থযুক্ত অনধিকারী ‘গাছে না উঠিতে এক কাঁদি’—এই ন্যায়ানুসরণে কৃত্রিমভাবে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুকরণ করিতে গেলে অনর্থ হইতে মহা-অনর্থ সাগরের গভীর অতলজলে ডুবিয়া যাইবে। বর্তমান বৈষ্ণবব্রহ্ম-সমাজে, ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে, আত্মহিতবিমুখ জনসম্মে, হাটে-বাজারে, সাহিত্য-সভায়, আনন্দোৎসবে, রঙ্গমঞ্চে, যাত্রালয়ে “রাইকানুর গান” না হইলে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞটি পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু এই আচার্য্যকেশরী সিংহের হুক্মারে সেই শুকদেবের বাণী বিবৃত করিয়া বলিলেন,—

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ।

বিনশ্যত্যাচারশ্চৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহন্ধিজং বিষম॥”

২৫। তাঁহার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রতি জীবকেই কীর্তনের অধিকার প্রদান করিয়া কাককে গরুড় করেন—মুককে বাচাল করেন—পশু দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান। ইহ শুধু গল্পের কথামাত্র নহে। জগতের উচ্চপাদপীঠে আরুঢ় অনেকে নীচকে কিঞ্চিৎ উচ্চ অধিকার প্রদানের লোভ দেখাইয়া আপনাদিগের উচ্চপীঠ নীচের আক্রমণ হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিষেধক উপায় উদ্ভাবন করেন বটে; কেহ বা গীতায় কথিত “পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ” বাক্যের আদর্শ কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারিলে ‘মহা উদার’ বলিয়া জগতে খ্যাত হন বটে; কিন্তু কাককে ‘গরুড়’ করিতে পারেন, সর্বজীবকে গুরুর বৈভব-প্রকাশরূপে দর্শন করিতে পারেন,—একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াশক্তি। আমরা এই আচার্য্যে এই বৈশিষ্ট্যটির পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

২৬। তিনি অবশ্যক হইয়াও বঞ্চনা-কামীর নিকট পরমবশ্যক ;—তিনি অমায়ায় করুণার ধারা অজস্ররূপে বর্ষণ করিলেও বঞ্চনাকামিগণের নিকট মায়ী। নিষ্কিঞ্চন ভাগবতবর মহাত্মা বংশীদাসবাবাজী মহারাজ এ-কথার আভাস কাহাকেও ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। তাই বিদ্বৎপরমহংস হইয়াও তিনি কৃষ্ণ-চৈতন্য-বিরোধীগণের মোহনার্থ দণ্ড ও বিলাস-বৈভবাদি প্রদর্শনপূর্বক নানাপ্রকার ছলনা বা বঞ্চনাময়ী ক্রিয়া-মুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ত্রিদণ্ড-কাষায়বস্ত্রাদি তুর্য্যশ্রমলিপ্ত গ্রহণপূর্বক আপনাকে বৈষ্ণবদাসরূপে পরিচিত করিয়া আত্মদণ্ড-বিধান প্রদর্শন দ্বারা কৃষ্ণচৈতন্য-বিরোধী প্রাকৃত-সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন। অক্ষজ নীতিবাদীর নিকট উদ্ধুরেতা এবং বিমল নৈতিকচরিত্রবান্ প্রভৃতিরূপে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকেও নিজ গৌর-মুকুন্দ-প্রেষ্ঠস্বরূপ বুঝিতে দেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে তিনি সেইরূপ ভাবেই ভজন করেন। যাঁহারা তাঁহার শাসন-দণ্ডকে ‘দয়া’ না বুঝিয়া ‘হিংসা’ বলিয়া জ্ঞান

করেন বা যাঁহারা তাঁহার আদর-প্রদর্শনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সুযোগে তাঁহাকে আরও বঞ্চনা করিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই বঞ্চিত হন। যাঁহারা তাঁহার মনোভীষ্ট-পূরণ ব্যতীত নিজের তহবিলে পৃথগ্ভাবে কোন অন্য্যভিলাষ লুকাইয়া রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। তাঁহার পরবিদ্যাপীঠ-সংস্থাপন প্রভৃতি দেখিয়া যাঁহারা পরবিদ্যা বা ভক্তি-বিনোদ সাধন করিবার পরিবর্তে আত্মবিনোদ সাধনের অভিলাষ পোষণ করেন—স্বতন্ত্র হইয়া নিজের তহবিলে কিছু ‘জমা’ করিতে যান, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা স্বরূপ-বৃত্তিতে—শোকরহিত বৈষ্ণবদাস্যরূপ ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ না হইয়া—অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিরন্তর দগুিত করিবার নিষ্কপট অভিলাষ না লইয়া জাগতিক কোন অভ্যুদয়ের কামনায়—কোন প্রতিষ্ঠার কামনায় সূত্র-দণ্ডাদিগ্রহণের অভিনয়মাত্র দেখান, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা ষড়্গোষামী, ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর এবং এই আচার্য্যবরকে অভিন্নবিগ্রহরূপে না জানিয়া অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী হন, তাঁহারা মায়ায় ছলনায় পড়িয়া নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। আমরা যেন নিষ্কপট হইয়া এই অবঞ্চক জগদগুরু পূজার উপায়নসংগ্রহ করিতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

মক্ষিকা যেরূপ আপন মুখে মেরু ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও এই মহাপুরুষের অনন্ত গুণবৈভবের মহা-মহিমা-রাশির কিয়দংশও এই মুখে ধারণ করিতে পাবিব না। তথাপি প্রভুপাদের এই অফুরন্ত কীর্তি কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলে জিহ্বায় যেন কীর্তন-কণ্ঠ্যন উপস্থিত হয়। মহাপুরুষ-কীর্তি-কীর্তন-রসিকা জিহ্বা সেই মহাত্ম্য-সঙ্কীর্ণনে অতীব চঞ্চলা হইয়া আপনার হৃদয়-মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন চতুর্দিকের উন্মুক্ত অফুরন্ত ভাণ্ডারের কোন রত্নটি আহরণ করিব, কোনটাই বা পরিত্যাগ করিব,—এই বিচারে অধীর হইলে কেবলমাত্র আদি কবির এই কথাটাই মর্মে মর্মে মুচ্ছনা দিতে থাকে,—

“লাগ বলি’ চলি’ যায় সিঙ্কু তরিবারে।

যশের সিঙ্কু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে।।”

হে আচার্য্যবর! আপনার অনন্ত মহিমা-বৈভব-সিঙ্কুর তীরের একদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের কেবল আপনার শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আমাদের আপনাকে আপনার অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করুন।

“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।”

—সাপ্তাহিক গৌড়ীয়



শ্রীগুরুচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় জয় গুরুদেব দয়াময়।
 তব শ্রীগুণ-মহিমা স্মরুক হৃদয়॥
 ওহে গুরুদেব তুমি দয়া কর মোরে।
 শ্রীবিনোদবিহারীজী সদা চিন্তে স্মুরে॥
 আমি ত' মুখ অতি কোনো যোগ্যতা নাই।
 শ্রীগুরু যে বলাইবে বলিব তাহাই॥
 কৃপাকর ভক্তগণ দিয়া পদধূলি।
 তোমাদের কৃপাতে ফুটিবে মোর বুলি॥
 কবে হেন দিন মোর হইবে উদয়।
 শ্রীগুরু-পদতলে হৈবে নিত্যশ্রয়॥
 ভূত, প্রেত, পিশাচাদি যে-জন উদ্ধারয়।
 মোদের উদ্ধারিবে এতে কি বিস্ময়॥
 আমরা জগতে না থাকিব বেশি দিন।
 গুরুসেবা করিয়া দূর করিব ষট্ ঋণ॥
 গুরুসেবা করিলে সংসার হয় ক্ষয়।
 মায়াজাল ছুটে সেই কৃষ্ণভক্তি পায়॥
 অতএব গুরু ইষ্ট, গুরু বন্ধু হন।
 গুরু হইতে মিলে কৃষ্ণ, পায় প্রেমধন॥
 শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, মুক্তি, যেই যাহা চায়।
 গুরুর চরণ ধ্যানে সকলি মিলয়॥
 গুরুভক্তি বিনে যদি শত যুগ ধ্যায়।
 সেবা-প্রেম না হলে সব ব্যর্থ হয়॥
 ভজনের মূল বস্তু গুরুসেবা হয়।
 সে-সেবা না হৈলে বল কি হৈবে উপায়॥
 গুরুনিষ্ঠ-জনের চরণ করি ধ্যান।
 শ্রীগুরুচরণে যাতে থাকে মোর মন॥
 ওহে শ্রীল গুরুদেব করি নিবেদন।
 কৃপা কবি মোব মাথে দেহ শ্রীচরণ॥
 সদা আমি ভাবি যেন তোমার শ্রীমূর্তি।
 জীবনে না ভুলি তোমার অতুল কীর্তি॥
 শ্রীগুরুর বশ কৃষ্ণ-সর্বশাস্ত্রে কয়।
 এইসব জানি ভজ তাঁহার নিশ্চয়॥

প্রাতে উঠি করে যেবা গুরুর কীর্তন।
 শাস্ত্রে কহে দেবতুল্য হয় সেই জন॥
 গুরুর স্মরণ যদি গৃহে বসি' করে।
 সদ্য সে জীবনমুক্ত সেবা রহু দূরে॥
 এহেন গুরুকে যেই অবজ্ঞা করে।
 শত শত অপরাধ সে পাপীবে ধরে॥
 যার হতে গুরুদেব লভে কোন কষ্ট।
 জন্মার্জিত সুকৃতি তার সব হয় নষ্ট॥
 গঙ্গা-যমুনা করি যতেক তীর্থ আছে।
 নিরন্তর থাকে তারা শ্রীগুরুর কাছে॥
 সর্বশাস্ত্রে গায়, গুরু শ্রীহরির স্বরূপ।
 ভক্তগণ ভাবে তাঁরে সেই অনুরূপ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত যত শ্রীগুরু প্রধান।
 তাঁহার চরণে আগে করহ প্রণাম॥
 যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
 তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
 আমি যে অবোধ শিশু, জানহ তোমার।
 কৃপাদৃষ্টি হলে তব মঙ্গল আমার॥
 কিসে মোর হবে ভাল বল গুরুদেব।
 তুমি প্রভু দয়াময় তুমি বলদেব॥
 তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই।
 অধম চরণে দেব পড়িয়াছে তাই॥
 আমি তো দুর্ভাগা অতি শ্রীগুরু না চিনি।
 মোরে কৃপা করিবেন শ্রীগুরু আপনি॥
 শ্রীগুরু চিনিতে নারে দেবেব শক্তি।
 মুই কোন জন হউ মুঢ় অল্প অতি॥
 দীন দুঃখী দরিদ্রাদি যত ভক্তগণ।
 তোমার দর্শনে সব জুড়াইত প্রাণ॥
 যে-চরণ পূজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
 সেই গুরুপূজা হৈতে বড় আর নাই॥
 হরি-গুরু-ভক্ত পাদপদ্ম করি আশ।
 শ্রীগুরু-মহিমা গায় এ অধম দাস॥
 আর কবে গুরুদেব দিবে মোরে দেখা।
 আশা করে তব ভূত্যের ভূত্য সুবলসখা॥

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

শ্রীগুরুদেবে পাদ্য-অর্ঘ্য

“হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥” হরি, গুরু ও বৈষ্ণব তিনটি তত্ত্ব একটি সরলরেখায় অবস্থিত। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি হয় না। তবে বিচার করলে দেখা যায় যে, গুরুতত্ত্বটি এই তিন তত্ত্বের মধ্যমাণি হয়ে আছেন। কারণ শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের কাজও করেন, আবার বৈষ্ণবের কাজও করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ, নাবমন্যেত কহিচিৎ” অর্থাৎ আচার্য্যকে আমি বলেই জানবে, কোনরকম কম মনে করবে না। লক্ষ্য করার বিষয়, ‘আমিই আচার্য্য’ একথা কিন্তু তিনি বলেন নি। গুরুদেব সাক্ষাৎ হরিত্ব অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়ত্বহেতু কৃষ্ণের সমস্ত গুণ তাঁহাতে বর্তমান। “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে”।—ঠিক যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে লোহা চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, বিদ্যুতের সংস্পর্শে অন্য তারও যেমন বৈদ্যুতিন হয়ে যায়।

“যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোহপি”। অর্থাৎ “কৃষ্ণ রুপ্ত হইলে গুরু রাখিবারে পারে, কিন্তু গুরু রুপ্ত হইলে কৃষ্ণ রাখিবারে নাৱে।” গুরু রুপ্ত হলে আর কোথাও তার পরিত্রাণ নাই। এ জগতে কৃষ্ণের সব কাজ গুরুদেব করতে পারেন, কিন্তু গুরুদেবের কাজ কৃষ্ণ করেন না। “কর্তুন্ম অকর্তুন্ম অন্যথা কর্তুন্ম ইতি ঈশ্বরঃ”—ঈশ্বর সব কিছুই করতে পারেন, কিন্তু গুরুর কাজটি তিনি করেন না। প্রমাণ দেখুন, ধ্রুব মহারাজ প্রচণ্ড তপস্যা করে সিদ্ধ হলেও শ্রীভগবান্ সেখানে আসতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়েই শ্রীনারদকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুরূপে। তারপর তিনি ধ্রুব মহারাজকে বর দিতে পারলেন। আর শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু কিছুতেই শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে গ্রহণ করতে পারলেন না, যতক্ষণ না তিনি সাক্ষাৎ গুরুতত্ত্ব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করেছেন। শ্রীহরি হলেন Power House, যেটা হল সমস্ত শক্তি ও আনন্দের উৎস; আর গুরুতত্ত্ব হল Transformer, যেখান থেকে শক্তি বিলি বন্টন হয়। Power House থেকে সরাসরি শক্তি বিলি-বন্টন করা যায় না। Transformer কিন্তু সব শক্তির বেগ বুকে ধারণ করতে পারেন এবং যার যেখানে যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনভাবে তাকে সেখানে তিনি শক্তি জোগান দেন। কত তাঁর করুণা দেখুন।

শ্রীগুরুদেব আবার বৈষ্ণবও বাঁটে, তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবকেও গুরু বলা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—“যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।” কিন্তু প্রকৃত পারমার্থিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রে ‘স্বজাতীয়-আশ্রয়-লিঙ্ক’ ও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সঙ্গের কথা বলা হয়েছে। বিচারটা হল—শুদ্ধবৈষ্ণব মানেই সাধারণ-বিচারে ‘স্বজাতীয়’, অতএব আশ্রয়স্থল। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয়

আশ্রয়স্থল সকলেরই কাম্য। কিন্তু দেখতে হবে তিনি স্নিগ্ধ কিনা। অনেক বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গ করলেই যে সবাই বড় বিদ্বান হবে, এমন নয়। দেখতে হবে তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল কিনা, আমার প্রতি তাঁর মমতা আছে কিনা! ঠিক পিতার মত। পিতার পিতৃত্বহেতু সকল বালককে তিনি স্নেহ করেন, কিন্তু নিজের সন্তানটির প্রতি তাঁর যে স্নেহ ও মমত্ব, এমনটি কি আর কোথাও থাকে? থাকে না, সম্বন্ধের অভাব-হেতু। শিষ্যর প্রতিও গুরুর সেইরূপ মমত্ববুদ্ধিতে স্নিগ্ধ সম্বন্ধ থাকে। ‘এ আমার নিজজন’—এইরূপ ‘মদীয়’-সম্বন্ধ। এটা গুরু ছাড়া আর কোথাও থাকে না।

বৈষ্ণবের উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদ-বিচার আছে। গুরুর কিন্তু এরূপ কোন Gradation নাই। বর্জ্যপ্রদর্শক গুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, চৈন্তগুরু, নামগুরু বা ভজনগুরু, প্রভৃতি পাঁচ প্রকারের গুরুর কথা থাকলেও গুরু একটি অখণ্ড তত্ত্বস্বরূপ। যেমন রাম, নৃসিংহ, বামন, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি নানা বিষ্ণু-অবতারে বিভিন্ন রসবিচার থাকলেও তত্ত্বতঃ সকলেই এক বিষ্ণুতত্ত্ব। গুরুতত্ত্বটিও ঠিক তেমনি। আবার ‘এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্, গুরুতত্ত্বের তেমন নানা প্রকাশ থাকলেও নিত্যানন্দ প্রভুই স্বয়ং গুরু।

এজগতে যেমন জন্মদাতা, দীক্ষাদাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা বা পালয়িতা ও বৈবাহিক সূত্রে পিতা প্রভৃতি পাঁচপ্রকার পিতার কথা থাকলেও জন্মদাতা পিতার বৈশিষ্ট্য যেমন অধিক, পরমার্থ জগতেও তেমনি উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের গুরুর মধ্যে দীক্ষাদাতা গুরুর বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাধিক হওয়া সম্ভব। এজগতের জন্মদাতা পিতা নিম্নরেতঃ, তিনি স্থূল শরীরের জন্ম দেন। পারমার্থিক পিতা তথা দীক্ষাগুরু উদ্ধরেতঃ, তিনি শব্দরক্ষ-দ্বারা দিব্যজ্ঞানরূপ দিব্যশরীরের জন্ম দেন।

তবে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ বলতে যেমন প্রতি চতুর্যুগের কলিযুগাবতার কৃষ্ণকে বুঝায় না, তেমনি সব দীক্ষাগুরু মাঝেই গুরুতত্ত্ব নয়। শুধু গুরু সেজে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু মন্ত্ররূপ শব্দ বলে দিলেই তাকে ঠিক দীক্ষাগুরু বলা যায় না। গুরু হবেন শব্দরক্ষ স্নাত, বেদ-পারঙ্গত, মন্ত্রদ্রষ্টা। শাস্ত্রবাক্যদ্বারা তিনি শিষ্যের হৃদয়ের সমস্ত সংশয় ছিন্ন করে দিবেন। “দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেইকালে গুরু তারে করে আত্মসম।” ভগবান্ শ্রীহরি চিন্তামণি সদৃশ যাঁর স্পর্শে বৈষ্ণব কৃষ্ণ হন না, অমূল্য রত্ন-গুরু হন। কিন্তু গুরুর স্পর্শে জীব গুরুরূপ স্পর্শমণি হয়ে যায়। এই হল ‘আত্মসমর্পণ’। সেই গুরুর স্বরূপ হল ‘কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি’ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের একান্ত প্রেয়সী কৃষ্ণকেও আনন্দ দেন এবং কৃষ্ণের আনন্দে তিনি নিজেও আনন্দিত হন। দুই হাতের মাঝখানে তাঁর অবস্থান। একহাত তাঁর চিঞ্জগতে, সেখান থেকে তিনি ঐ জগতের আনন্দ আহরণ করেন আর অন্য

হাতে তিনি এই জীবজগতে সেই অফুরন্ত সম্পদ উদারভাবে, নিষ্কপটভাবে বিলি করেন।

বৈষ্ণব মাত্রই দয়ালু। জীবের দুঃখে বৈষ্ণবের হৃদয় বিগলিত হয়। তাই তিনি শ্রীগুরুদেব হতে প্রাপ্ত বৈকুণ্ঠবার্তা তাঁরই আদেশে প্রচার করে বদ্ধজীবকে গুরুমুখী করেন। গুরুদেব সেইসব জীবকে উদ্ধার করে গোলোকে পৌঁছে দেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের এইভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন, ‘কবে জীব দয়া হইবে উদয়, নিজ সুখ ভুলি সুদীন হৃদয়। ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়, শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার।’

খরস্রোতা নদীতে কোন নিমজ্জমান ব্যক্তিকে দেখে কার না দয়া হয়? তবু সকলে কি তাকে উদ্ধার করতে পারে? সুদক্ষ সন্তরণ-কৌশলী ব্যক্তি অতি সাবধানে তাকে হয়ত বাঁচাতে পারে, কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি উদ্ধারকর্তাকে যদি একবার ধরতে পারে তবে উভয়েরই মৃত্যু অনিবার্য। সাঁতার পটু ব্যক্তি কোনক্রমে কোন বিশাল নদী পার হতে পারে। নৌকাগুলি কয়েকজনকে নিয়ে সুদক্ষ নাবিকের সাহায্যে পার হয়। স্টীমারগুলি নিজেও পার হয় আবার অনেক নৌকাকেও পার করে। গুরু এই স্টীমার-স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি—

একদা কোন ব্যক্তি অন্ধকারে জঙ্গলে পথ হারিয়ে এক অন্ধকূপে পড়ে যায়। সেখানে মশা, মাছি, কাঁটা, বিছা প্রভৃতির দ্বারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’ বলে সে চীৎকার করতে থাকে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটাল, অবশেষে ভোরবেলা কয়েকজন কাঠুরিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে তার সেই আর্ত চিৎকার শুনেতে পেল। তারপর খোঁজ করে তাকে সেই কূপের মধ্যে দেখতে পেল। সেই অবস্থায় দেখে দয়াপরবশ হয়ে তারা তাকে উদ্ধার করতে গেল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা কৃতকার্য হতে পারল না। তখন তারা দুঃখ করে বলল “দেখ ভাই, তোমাকে দেখে আমাদের দয়া হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বেলা হয়ে গেল, আমাদের কাজে যেতে হবে। আমরা চলে যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, তুমি যেন কখনো তোমার ওই চীৎকার থামাবে না। আমরা পারলাম না, তবে তোমার ওই চীৎকার শুনে আমাদের অপেক্ষা কোন ক্ষমতাবান ও দয়াবান ব্যক্তি এসে তোমাকে উদ্ধার করতে পারেন।” এই কথা বলে কাঠুরিয়ারা চলে গেল। আর সেই ব্যক্তি সেইভাবে কূপমধ্যে চীৎকার করতে লাগল।

অনেক বেলায় সেই দেশের রাজা সেই জঙ্গলে মৃগয়া করতে এসে সেই ব্যক্তির আর্ত চীৎকার শুনে তার লোকজনদের তাকে উদ্ধার করে আনতে বলল। তারাও প্রত্যেকে সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই কৃতকার্য হল না। অবশেষে রাজা তখন নিজে হাতির পিঠ থেকে নেমে তাঁর মুকুট, রাজপোষাক সব খুলে সেই কূপে নেমে সেই পতিত ব্যক্তিকে ধরে বলল, ‘এই আমাকে শক্ত

করে ধর, দেখিস্ যেন ছাড়িস্ না।’ তখন রাজা অর্থাৎ পতিতপাবন ও পতিত ব্যক্তি এক ভূমিতে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আপাত দৃষ্টিতে দুজনের মধ্যে তখন কোন ভেদ চোখে পড়বে না। রাজাকে পতিত ব্যক্তি জড়িয়ে ধরল। উপর থেকে ফেলা শক্ত দড়ি ধরে রাজা সেই পতিত মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে নিয়ে উপরে উঠল। উপরে উঠে লোকটি অত লোকজন, হাতি, ঘোড়া দেখে হতচকিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে সে আশপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা কে? আমাকে যিনি উদ্ধার করলেন তিনি কে? কোথায় গেলেন তিনি?” ততক্ষণে রাজা তার রাজবেশ ধারণ করে হাতির পিঠে চড়ে বসলেন।

এইপ্রকার, গুরু-হলেন দয়াবান্ এবং ক্ষমতাবান্—উভয়ই। তিনি নিজে আচরণ করে প্রচার করেন। তিনি গোলোক হতে পরম্পরারূপ কৃপারজ্জ্ব অবলম্বন করে জগজ্জীবকে উদ্ধারের নিমিত্ত তাদের মত এক ভূমিতে নীচে নামেন। শুধু তাই নয়, বলেন, ‘হে জীব! আমাকে শক্ত করে ধর, যেন কখনো ছেড়ো না, ছাড়লেই বিপদ।’ কিন্তু হতভাগ্য জীব তাঁকে তখন চিনতে পারে না। ভাবে আমারই মত একজন সাধারণ মানুষ। শাস্ত্র তাই সাবধান করেছেন ‘নাবমন্যেত কহিচ্চিৎ’। অপরদিকে সাধারণ মানুষের গুরু সাজার দুর্বাসনা হলে, ওই কুপে পড়া ব্যক্তির মত গুরু শিষ্য উভয়েরই অচিরাৎ পাতালে প্রবেশ অনিবার্য।

নিজে নিজে গুরু সাজা যায়, গুরু হওয়া যায় না। শিক্ষক হতে গেলে যেমন ছাত্রকে আগে সুবোধ হয়ে শিক্ষকের সাথে লেগে থাকতে হয়, শিক্ষককে ত্যাগ করলে আর হল না। তেমনি গুরুকে ত্যাগ করে গুরু হওয়া যায় না। গুরু হতে গেলে শিষ্যকে সর্বদা গুরুর তৈলবাট হয়ে লেগে থাকতে হবে। এ জগতে শুধুমাত্র ব্যাঙের ছাতা (fungus) আর ‘মাফিয়া ডন’রাই আপনা আপনি গজিয়ে উঠে। বৈষ্ণব জগতে Autocrat গুরু হয় না, গুরুত্ব হয়। তার অজস্র উদাহরণ আছে।

গুরুর গুরুত্ব হরি ও গুরু থেকেই সঞ্চারিত হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর সাক্ষাৎ গুরুতত্ত্ব হলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন, “আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।” এই আজ্ঞা পাবার পরেই তাঁরা জীব উদ্ধার করতে গিয়েছেন। তাই তাঁরা সব শিষ্যের সন্তাপ হরণ করেন, পরন্তু শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন না।

পিতার সম্পত্তিতে সুযোগ্য সুবোধ পুত্রের উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই অধিকার লাভ হয়। কিন্তু অযোগ্য বিদ্রোহী ত্যজ্যপুত্র ও সুবিধাবাদীদের উৎপাতের আশঙ্কাতেই প্রিয়পুত্রের জন্য আদর্শপিতার লিখিত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়। যাঁরা বলেন, ‘আমাদের পিতা অপরের সন্তানকে তাঁর সব সম্পত্তির অধিকার দিয়ে গেছেন’—এই মিথ্যাবাক্য যদি সত্যও হয়, তাহলেও এই কথা বলার সঙ্গে

সঙ্গে নিজেদের অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই একই সঙ্গে নিজ পিতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে তাঁর অবিবেচনা, অযোগ্যতা দেখিয়ে তাঁর প্রতি দ্রোহাচরণ ও অপরাধ করা হয়। এই সাধারণ বোধটুকু না থাকলে তাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক নয় কি? সেই প্রিয় পুত্রের যখন যেখানে জন্ম হয়, এইরূপ মাৎসর্য্য-পরায়ণ সন্দেহবাদিগণ তখন কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? সেইরূপ গুরুর গুরুত্ব অনুযায়ী তাঁর সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব তাঁর প্রিয় শিষ্যের উপর অর্পণ করে গুরুদেবও নিশ্চিত হন। গুরুর বিষয়টি এমনই গুরুতর।

গুরুর বিষয়টি কেমন? কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মূর্তি সর্বদা ‘যোগমায়া সমাবৃত’। প্রাকৃত সবকিছুই তাঁর থেকে বহুদূরে অবস্থিত। আবার “কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।” তিনি যখন এই প্রপঞ্চে লীলা-হেতু অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর অচিন্ত্য কৃপাশক্তির প্রভাবে সকলেই তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারে। এটি তাঁর বিশেষ করুণা শক্তি। অপবিত্র পুতনা রাক্ষসী, বিভিন্ন অসুর সকল, কালিয় নাগ, কন্যাদায়গ্রস্ত লোভী ব্রাহ্মণ, কংস, অভিমানী দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই তাঁর দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ পেয়ে উদ্ধার হয়েছে। এদের কোন সাধন-ভজনের অপেক্ষা ছিল না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলায় পড়ুয়া-পাষাণীরা, ঝাড়িখণ্ডের পথে বাঘ, সিংহাদি হিংস্র ইতর প্রাণীসকল এমনকি লতা গুল্মাদি পর্য্যন্ত সাক্ষাৎভাবে ব্রজপ্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাদেরও কোন ভজন-সাধনাদির প্রয়োজন হয় নাই।

‘বৈষ্ণব-শরীর অপ্রাকৃত সদা স্বভাব বপুর্ ধর্ম্মে’। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব শরীরও অপ্রাকৃত ও নিত্য। তাই তিনিও যখন জগজ্জীব উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, তখন আমরা সকলেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে কৃত-কৃতার্থ হই। সেখানে কোন সাধন-ভজন থাক বা না থাক। ‘দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ’। অর্থাৎ যে কোন উপায়েই হোক, সেই মহাত্মার সংস্পর্শে এলেই মঙ্গল অনিবার্য্য। এখন এই চর্ম্মচক্ষের দ্বারা তাঁকে আর দেখা যাবে না। ‘রহ’ শব্দে নিজ্জনে বুঝায়। ‘বিরহ’ শব্দে এখন তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে বিশেষ নিজ্জনে-নিভৃত কুঞ্জমধ্যে অবস্থান করছেন। অযাচিতভাবে আর তাঁর কৃপাকটাক্ষ পাওয়া যাবে না। তবে ‘অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।’ সেই লীলা নিত্য বর্ত্তমান হলেও এখন সেই লীলা দর্শন করতে হলে ভাগ্যবান হতে হবে অর্থাৎ সাধন-ভজন করতে হবে। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও নিত্য, কিন্তু এখন তাঁকে পেতে হলে তাঁর প্রেষ্ঠজনের মাধ্যমে বিশেষভাবে নিজ্জনে শ্রবণ, কীর্ত্তনরূপী সাধন-ভজনের অপেক্ষা করতে হবে। এটাই হল আমাদের বিরহ, এটাই হল বিপ্রলভ।

কলি কাল! নরকে যাবার জন্য অজস্র প্রশস্ত পথ নানাভাবে হাতছানি দিয়ে সর্বদা ডাকছে। আমরা অনেক ভোগ করেছি, অনেক সম্পদ জমিয়েছি। এসব জঞ্জাল কিছুই সঙ্গে যাবে না। দিন দিন চোখের আলো কমে আসছে। সব বুঝতে পারছি। তবে আর কেন? আসুন আজ এই শুভলগ্নে আমরা সকলে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি “আমরা সকলে মিলে আমাদের গুরুবর্গের নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথে তাঁদের কাজ সমাধা করব। আর যদি গুরুসেবা নাও করতে পারি, অন্ততঃ যেন গুরুনিন্দা, গুরুদ্রোহিতা, গুরুঘাতকতা-রূপ গুরুতর অপরাধ না করি।” শ্রীগুরুদেব তাঁর নিভৃত সেবাকুঞ্জ থেকে আমাদের সকলকে অজস্র কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করুন। সকলে আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন তাঁর কৃপাকটাক্ষ থেকে কখনও বঞ্চিত না হই। কখনও কোন একদিনও যেন তাঁর নিভৃত সেবাকুঞ্জে একটু সেবাধিকার লাভ করতে পারি, এই প্রার্থনা। “যৎ কিস্করীষু খলু বহু কাকুবাণী, নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলে। তস্যা কদা রসনিধে বৃষভানুজায়াঃ তৎকেলিকুঞ্জ-ভবনাঙ্গন-মাজ্জনী স্যাম্।।”

—শ্রীবীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

গুরু-গরিমা

জয় জয় গুরুদেব পতিত-পাবন।

ভক্তিদ্বন্দ্ব শিখাইতে ধরায় আগমন॥

শ্রী—শ্রীকৃষ্ণ পরমদাতা তাহা হ’তে গুরু।

কৃষ্ণধিক কৃপাশীল হন কল্পতরু॥

শ্রী—শ্রীগুরু-প্রসাদে হয় সংসার-মোচন।

তাঁর স্থানে অপরাধে মরে অনুক্ষণ॥

ম—ময় যে রচিল সভা তা বিচিত্রময়।

তাদৃশ সংসারে জীব ত্রিতাপ ভোগয়॥

দ—দণ্ড দিয়া গুরুদেব বলে জীব প্রতি।

ছুটিবে সকল জ্বালা কৃষ্ণে কর মতি॥

ভ—ভকতি তাহার নাম কৃষ্ণে মতি যাহা।

ভকতির ফল কৃষ্ণ বেদে কহে তাহা॥

ক—কর্ম-জ্ঞান বিরহিত সেই ভক্তি সার।

গুরু বিনা সেই ভক্তি দিতে শক্তি কার॥

তি—তিনিই লইয়া যান গোবিন্দ-চরণে।

“আদৌ গুরুপাদাশ্রয়” তাই শাস্ত্র ভনে॥

বে—বেদশাস্ত্রে গুরুমহিমা নিরন্তর ঘোষে।
 দান্তিকেরা নাহি বুঝে নিজ মূর্খদোষে॥
 দা—দাতা মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বর্ণন।
 কৃষ্ণ রূপে গুরুত্বাতা এই সে কারণ॥
 ন—নহিল নহিবে ত্রাতা গুরুর সমান।
 নিষ্ঠা করি ভজ ভাই গুরু বরীয়ান॥
 ত—তবে ত' পাইবে তুমি আপ্রাকৃতানন্দ।
 ইহা ব্যতিরেকে তোমায় বাধিবে কৃতান্ত॥
 বা—বাসনা করি যে আমি শ্রীগুরু-চরণে।
 সেবি যেন ঐপদ কায়-বাক্য-মনে॥
 ম—মনে প্রাণে গুরুসেবা জীবের নিত্য ধর্ম।
 পতিত পাষণ্ডী মুই না জানিলুঁ মর্ম॥
 ন—নহিল নহিল মোর তব পদে মতি।
 কৃপা করি শুভদৃষ্টি কর মম প্রতি॥
 গো—গোস্বামী শব্দার্থে কহে সর্ববেগ জয়ী।
 সর্বত্র বলেন তাই হইয়া দিগ্বিজয়ী॥
 স্বা—স্বাচ্ছন্দে জগতে আস জীবোদ্ধার লাগি'।
 মায়াধীনে কর কৃপা হইয়া স্বার্থত্যাগী॥
 মী—মীনরূপ জীবে খসাও মায়াজাল হতে।
 এ তব স্বভাব বিজ্ঞে বুঝে ভালমতে॥
 ম—মহা-পরাক্রমশালী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন।
 লীলায় সিদ্ধান্ত-পূর্ণ হানে বাক্যবান॥
 হা—হারিয়া তখন মায়া জীবে ছাড়ি যায়।
 প্রপীড়িত জল তবে শুদ্ধপথ পায়॥
 রা—রাত্রি-দিনে সদা তুমি কৃষ্ণসেবা রত।
 সেইমত শিক্ষা দেও অনুগতে যত॥
 জ—জগতে তোমার নাহি উপজয় বৈরী।
 অজাতশত্রু নাম তোমাতেই ধরি॥
 কি—কি কহিবে শাস্ত্র সব তব গুণগ্রাম।
 তোমার গুণের অন্ত না পায় সন্ধান॥
 জ—জয় জয় গুরুদেব তুমি সর্বসার।
 ভবান্ধি-তারণে তুমি দক্ষ কর্ণধার॥
 র—যখনে জীবের হয় কর্মবন্ধ ক্ষয়।
 প্রভুরূপে তুমি তার একান্ত আশ্রয়॥

আমি বড় ভাগ্যহীন তব কৃপা হনে।
 বঞ্চিত হইয়া ভ্রমি নানা স্থানে স্থানে॥
 কৃপা অসি ধরি দুষ্টমতি কর নাশ।
 ভৃত্য করি দেহ মোরে সেবা উপদেশ॥
 আমি অতি দীন হীন পতিত অসার।
 তব শ্রীচরণে গুরোঃ প্রণাম আমার॥

—শ্রীভজহরি ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে শ্রীব্যাসপূজা ও নবাচার্য্য-অভিষেক

ব্যাসপূজা গুরুপূজারই নামান্তর, তথাপি ‘ব্যাসপূজা’-শব্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যাসানুগত্যকারী শ্রীগুরুর পূজাই ব্যাসপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সকল গুরুপূজাই ব্যাসপূজা নহে। “পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥” এই ‘যত কথা’র আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতারূপে বিভিন্ন ‘ধর্ম’ জগতে অবস্থিত আছে। সেই সমস্ত ধর্মে সেই সেই গুরু আছে এবং সেখানে গুরুপূজার রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সব গুরুপূজাকে কখনও ‘ব্যাসপূজা’ বলা যাইবে না। যে ধর্মে কেবল ‘ভাগবত-কথা’ আছে, সেই ধর্মেরই মাত্র অনুষ্ঠিত গুরুপূজা শুদ্ধ ব্যাসপূজা’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ‘ভাগবত-কথা’—‘যত কথা’ নহে, এবং যাহা ‘যত কথা’ তাহা ‘ভাগবত-কথা’ নহে।

এই ‘ভাগবত-কথা’র মূল উৎস স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মাকে সর্বপ্রথম সেই কথা বলিয়াছিলেন—“ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যায় মদাত্মকঃ॥”(ভাঃ ১১।১৪।৩)। ব্রহ্ম তাহা ‘শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীব্যাসদেব সেই ‘ভাগবত-কথা’ প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নচিত্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীব্যাস-প্রণীত সেই ‘শ্রীমদ্ভাগবতম্’কেই অমল ‘প্রমাণ’ এবং সেই ভাগবত-প্রতিপাদ্য কৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগতগণকেও উপদেশ করিয়াছেন—“ইহা বই আর না বলিবা, না বলাইবা।” সুতরাং প্রকৃত ব্যাসানুগত্য বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্যই লক্ষিত হইতেছে।

কালে কালে সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘শ্রীব্যাস’-শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া এই ভুলোকে অবতীর্ণ হন। তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর ও ষড়্গোস্বামীর স্বীকৃত ভাগবত-বিচারধারা প্রচুর পরিমাণে জগতে বিস্তার করিয়া পরমনির্মলা ভক্তির প্রবাহ সংরক্ষণ করেন। তাঁহারই উত্তরসূরী-রূপে আবির্ভূত জগদগুরু পরমহংসকুলতিলক শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত জগতে শ্রীচৈতন্যবাণী-সঞ্চারের দ্বারা “পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥”—মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করেন।

সুতরাং ব্যাসপূজায় যে-ব্যাসানুগত্যে গুরুপূজার কথা বলা হয়, সেই ‘ব্যাসানুগত্য’ বলিতে প্রকৃতপক্ষে ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তানুগত্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই আনুগত্য বিনা গুরুপূজা নিষ্ফল—সেই গুরুপূজা ‘ব্যাসপূজা’-শব্দবাচ্যই নহে। কিন্তু বর্তমানে গৌড়ীয় সারস্বত বংশে সেই আনুগত্য শিথিল হইয়া প্রচলিত রীতি-অনুসারে কেবল নিজ নিজ গুরুপূজা-রূপা তথাকথিত ‘ব্যাসপূজা’র অনুষ্ঠান হইতেছে মাত্র। ইহাতে ব্যাসপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্যেই হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতে হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিতগণ শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য জগদগুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর প্রিয়তম জন জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামীর ৮৪তম শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সকলে শ্রীব্যাসপূজায় ব্রতী হন। বর্ষের প্রথম হইতেই সকলে এই ব্যাসপূজা সমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে পালন করিবার জন্য সংকল্প লইয়াছিলেন। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম দৈবাৎ উজ্জ্বলিত চলাকালে উজ্জেশ্বরীর কি এক ইঙ্গিতে ব্রজবিজয় করিলে সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই তাৎপর্য্যপর জানিয়া সমিতির সকল আশ্রিতগণ পুণ্যবরা ঐ পৌষী কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা পালন এবং একই সাথে সমিতির পরবর্ত্তী সভাপতি-পদে অভিষেকের অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করেন।

তদনুসারে সমিতির আশ্রিত সকল মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হন। শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস ১৮ই পৌষ ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ইং ৩।১।২০০৫), সোমবার বৈকালে নবদ্বীপ-শহরে বিশাল এক নগর-সঙ্কীর্ণনের আয়োজন করা হয়। পশ্চাৎ সন্ধ্যারতির পর ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ,

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ, গোস্বামী মহারাজ, পরমহংস মহারাজ, সাধু মহারাজ, শিখি মহারাজ, যাচক মহারাজ, নিরীহ মহারাজ, ন্যাসী মহারাজ, নিক্ষিপন মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা-কীর্তন সহ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব আলোচনা করেন। এই আবির্ভাব-তিথিতেও সকলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। প্রকৃত অনুভবী ব্যক্তির আবির্ভাব-প্রসঙ্গেও বিরহানুভূতি হইয়া সেই বিরহ-মধ্যেই প্রকৃত মিলন হইয়া থাকে। ভজনোন্নতি-ক্রমে এই বিরহ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া যখন তাহা তীব্র উৎকণ্ঠায় পর্য্যবসিত হয়, তখনই হরি-গুরুর অন্তর্দর্শন লাভ হয়।

পরদিবস ১৯শে পৌষ (ইং ৪।১।২০০৫), মঙ্গলবার উষঃকাল হইতেই পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় ব্যাসপূজার অঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, গুরুপঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম হইতে থাকে। বলা বাহুল্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কর্তৃক সংশোধিত এই পূজা-পদ্ধতি শ্রীসমিতিতে অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজায় প্রতিবৎসর যথাযথ পালিত হইয়া থাকে। ইতোমধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ উপস্থিত হইতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বর্দ্ধমান হইতে পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীসন্তগোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশন হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ, শ্রীরুদ্ৰদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, স্বরূপগঞ্জ হইতে শ্রীশ্যামদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কোলেরগঞ্জ হইতে শ্রীল অরণ্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ গৌড়ীয় মঠ, দমদম হইতে শ্রীমদ্ভক্তিজীবন পরিব্রাজক মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত হন।

অতঃপর উপস্থিত সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ সুশৃঙ্খলভাবে একে একে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীসমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকেন। তদনন্তর শ্রীনাট্যমন্দিরে পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজের পরিচালনায় শ্রীসমিতির পরবর্ত্তী সভাপতি ও আচার্য্য-পদে অভিষেকের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক আচার্য্য জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন কেশব গোস্বামী মহারাজের নির্দেশানুসারে সমিতির পরবর্ত্তী সভাপতি-আচার্য্য হিসাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের নাম ঘোষণা করা হয়। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্যের প্রদত্ত নির্দেশ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এস্থলে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

“আমার একান্ত ইচ্ছা আমার পরলোকগমনের পর আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট-আচার্য্য হইয়া শ্রদ্ধালু জনতাগণকে শ্রীহরিনাম-দীক্ষাদি প্রদান করিবেন এবং তাহার অপ্রকটের পর শ্রীমান্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ঐ দীক্ষাদি প্রদানের কার্য্য করিবেন। উভয়ের অপ্রকটের পর উক্ত পরিচালক সভ্যবৃন্দ যাহাকে দীক্ষা দিবার অধিকারী বলিয়া যোগ্য মনে করিবেন, তিনি দীক্ষা দান করিবেন।”

সমিতির প্রতিষ্ঠাতাচার্য্যের নির্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বস্তিবাচন যোগে প্রচুর শঙ্খ, ঘণ্টা, উলুধ্বনির মধ্যে মাঙ্গলিক বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সমিতির পরবর্ত্তী সভাপতি-আচার্য্যের অভিষেক কার্য্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হয়। মহাপুরুষের সিদ্ধবাক্য—তাহা সিদ্ধ হইতেই বোধ করি ভগবৎ ইচ্ছায় কোন বিশেষ আলোড়ন সৃষ্ট হইয়া কাহাকেও মধ্যস্থল হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। জয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ কি জয়!

তৎপর ধর্ম্মসভা আরম্ভ হয়। ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত সন্ন্যাসিবৃন্দ ও সমিতির বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ সকলে পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মের পরমপবিত্র ও আদর্শ জীবনচরিত্র উল্লেখ করিয়া ব্যাসতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব আলোচনা করেন। গুরুবর্গের নির্দেশ যথাযথ পালনই শিষ্যগণের একমাত্র কর্তব্য। কেবল সহস্রবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেই শিষ্যত্ব বা বৈষ্ণবতা প্রমাণিত হয় না। তজ্জন্য গৌরপার্বদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—“গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।।” গুরুপাদপদ্মকে বাহ্যতঃ বহু সন্মান করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার আদেশ-নির্দেশ না পালন করিলে বা লঙ্ঘন করিলে তাহা গুরুদেবকে ‘জাঠি’-মারা তুল্যই হইয়া থাকে। শ্রীমন্নহাপ্রভু ঐপ্রকার ব্যক্তিগণকে ‘খড়-জাঠিয়া’ নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহারা অন্যের কল্যাণ-সাধন দূরে থাকুক, নিজেরই কল্যাণ বিধান করিতে পারে না। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার দাস বহু মায়িক বৈভব-সম্পন্ন হইতে পারেন—তদ্বারা অঙ্গগোষ্ঠীর সহজে প্রতারিত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু জীবের প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র গুরুপাদপদ্মের বিষয়াসী ভৃত্যের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে—“জন্ম সার্থক করি’ কর পরোপকার”।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীপরমগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারী জীউর ভোগারতি সম্পন্ন হয়। সমিতির বর্তমান সভাপতি-মহারাজ বহিরাগত সকল সন্ন্যাসিগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করেন। নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত প্রায় ত্রিসহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। সন্ধ্যায় আরাট্রিকান্তে পুনরায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়—সন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সকলে ব্যাসপূজায় নিজ নিজ অনুভূতিসহকারে গুরুপাদপদ্মে কথা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। জয় নিত্যলীলাপ্রবিন্ত জগদগুরু পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কি জয়! তদীয় শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব কি জয়! তথায় অংশগ্রহণকারী সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়!



শ্রীগুরুচরণে পুষ্পାঞ্জলি

জয় গুরু প্রাণধন, ভক্তিবেদান্ত বামন,
মায়াপুরে লভিলা নিবাস।
অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে, শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রমে,
নরহরি স্নেহ পরকাশ।।
শ্রীবিনোদের কৃপামন, লভিলেন শ্রীসজ্জন,
প্রভুপাদ নিকটে গমন।
তিনি অতি প্রীত হৈয়া, নিজ পাশে বসাইয়া,
হরিনাম দিলা মহাদান।।
ভক্তিবিনোদ-বিদ্যালয়ে, শ্রীবিনোদ-শিক্ষাশ্রয়ে,
পরা বিদ্যায় হৈলা অভিধান।
নবদ্বীপ অন্তঃপুরে, কোলদ্বীপ আশ্রয়ে,
শ্রীমন্দিরে সেবা অনুক্ষণ।।
শ্রীগুরুচরণ সেবা, প্রাণঢালা নিশি দিবা,
ধন্য ধন্য জনম সকল।
গৌড়ীয় প্রকাশনে মতি, জগত জনের প্রতি,
স্থাপিলা আদর্শ উজ্জ্বল।।
রাধাঠাকুরাণী হরি, কৃপাশক্তি সঞ্চারি',
রাখিলেন মহত চরণে।
অলৌকিক গুণ-ধারা, অনন্ত প্রতিভা ভরা,
তলনাবিহীন এ-ভুবনে।।

শ্রীগৌর-চরণ নীর, তৃষিত চাতক প্রায়,
 পিয়ে পিয়ে ভরি তনু মনে।
 পতিত-পাবন হয়ে, কৃপারাশি বিতরণে,
 অধম পতিত অভাজনে॥
 আজানুলব্ধিত ভুজ, দগুধর মহারাজ,
 ভক্তিভাবে সদা গরগর।
 রূপানুগ-ধারা লয়ে, সাধু শিক্ষা প্রচারয়ে,
 আচার-প্রচারে তৎপর॥
 সাধুসেবা সদা নিষ্ঠা, মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা,
 ভজন-আদর্শ জগমাঝে।
 পতিতপাবন মূর্তি, স্থাপিলা অক্ষয় কীর্তি,
 ভক্তবাৎসল্য সদা রাজে॥
 সেবা-কার্য্যে সুনিপুণ, ভজন-পাণ্ডিত্য গুণ,
 সদা হাস্য মৃদু মৃদু ভাস।
 সভামধ্যে বক্তাশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণ-ধর জ্যেষ্ঠ,
 লেখনীতে শাস্ত্রের নির্য্যাস॥
 পরম করুণ মূর্তি, ভকত ভাবের স্ফূর্তি,
 সুমিষ্ট মধুর ব্যবহার।
 অধম পতিত জনে, আপন সন্তান জ্ঞানে,
 করিলেন ভবসিন্ধু পার॥
 গৌরাঙ্গ-আদর্শ গুণে, বিভূষিত তনু মনে,
 ভক্তিশাস্ত্র সেবা পরচার।
 যার ভাগ্য না হৈল, দর্শন নহিল ভেল,
 মন্দ কপাল কিবা আর॥
 কত দেশে কত গ্রামে, সকল হৃদয়ে হানে,
 গৌরাঙ্গ বাণীর সুধাসার।
 দলে দলে সবে আসি, পরমার্থ লভে হাসি,
 চরণাশ্রয় করিলেন আর॥
 দেখিয়া সাধুর ভাব, ভাগ্যবান্ যত সব,
 মুখে কয় হরে কৃষ্ণ হরে।
 মঠ মন্দির আশ্রম, কত কত স্থাপিলেন,
 ভকতি প্রচার কার্য্যতরে॥
 শ্রীগৌরাস্তের ইচ্ছা যবে, তারিয়ে জগৎজীবে,
 চলিলেন নিত্যলীলা ধামে।

ললাটে তিলক ধরি', অন্তরে হরিরে হেরি,
 ব্রজের মাধুরী-পথপানে ॥
 ধূপ-দীপ-চামরে যতি, আরতি করেন মাতি,
 অচ্চনে গোবিন্দ করে নৃত্য।
 দূর হৈতে অভাজন, করে সাক্ষ দরশন,
 প্রেম-প্রদীপ দাস এক ভৃত্য ॥

—প্রেমপ্রদীপ ব্রহ্মচারী



শ্রী গুরুপাদপদ্মের আরতি

জয় গুরুদেব ভক্তিবদাস্ত বামন।
 অভিন্ন-কেশব রূপ পতিত-পাবন ॥
 আশ্রয়-বিগ্রহ তুমি সর্বদেবময়।
 কৃষ্ণকৃপা-শক্ত্যে তব আবির্ভাব হয় ॥
 সুদীর্ঘ কোমল অঙ্গ পরম সুন্দর।
 ত্রিদণ্ড-মণ্ডিত শোভা হাস্য মনোহর ॥
 শ্রীরূপের 'নয়নমণি', তাঁহার 'বিনোদ'।
 তুমি তাঁর প্রিয়তম নিত্য পারিষদ ॥
 গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে তুমি পূর্ণ অভিধান।
 সারস্বত কেশবীয় বাণী-মূর্তিমান ॥
 অপ্রাকৃত উপচারে তব নীরাজন।
 শ্রীচৈতন্য-বাণী ধূপে ভক্তি-বিনোদন ॥
 শ্রীপ্রজ্ঞান-দীপ, শঙ্খ—সারস্বত-ধারা।
 রূপপদাভোজ-পুষ্পে বিশ্ব মাতোয়ারা ॥
 সগণে সঘনে বাজে বৃহত মৃদঙ্গ।
 কীর্তন করেন 'যতি' মৃদঙ্গ জীবন্ত ॥
 আনন্দে 'গোবিন্দ' করে চামর ব্যজন।
 দেখিয়া আকুল হয় সেবা-লুপ্ত মন ॥

—তপস্বী



শ্রীগুরু-কৃপা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১০১)

তাৎপর্য্য এই যে, জীবসকল দুষ্কৃতিফলে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং নব নব কর্ম্ম বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে-কোনরূপে অজ্ঞানক্রমেও এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইয়া যায়, তবে সেইপ্রকার কর্ম্মফলে সুকৃতি সঞ্চয় হয় এবং ঐ সঞ্চিত সুকৃতির উদয়ে গুরুকৃপা লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। ভোগোন্মত্ত জীবের স্বভাব এই যে, তাহারা নশ্বর বস্তুর সেবা করিবে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করিবার অভিলাষ তাহাদের হইবে না।

গৃহমেধী জীবের কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। যাহারা ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর ইচ্ছন যোগাইয়া দেয়, তাহাদিগকেই উপদেষ্টা, হিতকামী বা গুরুরূপে বরণ করে এবং তাহার ফলে পরিণামে বাসনাময় সংসারই বৃদ্ধি হয়। পরন্তু যদি কোন জীবের সৌভাগ্যক্রমে ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তবে ঐ সুকৃতিফলে তাহার সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ হয়। সেই সুকৃতিশালী জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্য নিখিল কল্যাণের একমাত্র খনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেষ্ঠজনকে মহাস্ত গুরুরূপে এ জগতে প্রেরণ করেন, ইহাই কৃষ্ণ-কৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই গুরুকৃপা। ইহার অপর নাম ভক্তিলতা-বীজ। ভক্তিলতা-বীজ লাভই যে ভজনের পরিপক্ক অবস্থা, তাহা নহে, এজন্য শ্রীমদ্বাহপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণপূর্ব্বক তাহার অনুকীর্ত্তনই হইল সেই জল-সেচন কার্য্য। শ্রদ্ধাবান্ জীব সদগুরুর চরণাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া শিষ্যের যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করেন। এইপ্রকার সেবাফলে তাহার ক্রমাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিলাভের সহজ ও সুগম পন্থা।

কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে বাদ দিয়া যে কৃষ্ণভজনের ছলনা, তাহা “ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার” ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভাশা সুদূরপর্য্যাহত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“ক্রয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত”। শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ অর্থাৎ বিশ্রান্ত শিষ্যকে পরম গুহ্য বস্তুর উপদেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে ‘অকপট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ ঋষির বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

“তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাস্মৈ দৈবতঃ।

অমায়য়ানুবৃত্তা যৈস্ত্যেষ্যদাত্ত্বাদো হরি।।” (শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্যতম হরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমনে ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে হইবে। তদ্বারা আত্মা হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মোটকথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করাই কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় ভোগোন্মত্ত চিত্ত নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া অজ্ঞ বিষয়ীর সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করায়। তখন আমরা নিজ বিচারে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশক কঠোর আদেশ-বাণী সমূহের বাছাই করিয়া লইয়া বলিয়া বসি—‘ইহা আমি পালন করিতে পারিব না, আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিলে এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেন না।’ এইরূপ বিচার গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করে, অথবা পরম বিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অজ্ঞ মনে করাইয়া থাকে। অনেক সময় তিনি বাহ্যিক অজ্ঞের ভান করিলেও অন্তর্যামীসূত্রে তিনি আমার প্রতি-কার্য্যের প্রতি-পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন—যাহাতে আমি অন্যাত্মিলাষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে সেবায় নিমগ্ন থাকিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করেন। অতএব বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা সুলভ হয়। আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে সংসার ভোগের পথস্বরূপ নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ বিষয়ের জলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূল অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম ঈশ্বরপুরীপাদ ‘গুরোরাজ্ঞা হবিচারণীয়া’ এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া নিবির্বিচারে নিষ্কপটে নিরন্তর ‘বিশ্রান্তেন গুরোঃ সেবা’ অর্থাৎ প্রীতি ও অনুরাগের সহিত গুরুর সেবা করিতেন, এমন কি স্বহস্তে গুরুদেবের মল-মূত্রাদিও মার্জ্জন করিতেন। যথা :—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
 স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥
 নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
 কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥
 তুষ্ট হএগ পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
 বর দিলা,—‘কৃষ্ণ তোমার হউক প্রেমধন’ ॥
 সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী ‘প্রেমের সাগর’।

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬-২৯)

আর শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবে অবজ্ঞা ও নিজে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করার ফলে চিত্তবৃত্তি নিম্নগামী হইয়া সর্ববৈষয়বের নিন্দা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিন্দা ও পরিশেষে শ্রীগুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রকটকালে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহারও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন।

পূর্বের যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দান।
 রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥
 পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ণন।
 ‘মথুরা না পাইনু’ বলি’ করেন ক্রন্দন ॥
 রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
 শিষ্য হএগ গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥
 “তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
 ব্রহ্মবিৎ হএগ কেনে করহ রোদন?
 শুনি’ মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
 ‘দূর, দূর, পাপী’ বলি’ ভর্ষসনা করিল ॥
 কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু ‘মথুরা’।
 আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইলা জ্বালা ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।১৬-২১)

—শ্রীদীনার্তিহর ব্রহ্মচারী



“আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তি-চেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্নে দূর করিতে হইবে।”

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের

তিরোভাবে বিভিন্নস্থানে বিরহ-মহোৎসব পালন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ গত ২৮শে কার্তিক, ১৪১১বঙ্গাব্দ (ইং ১৪।১১।২০০৪) শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উজ্জ্বলিত পালন- কালে সহস্র ভক্তগণ-সম্মুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোভাবে সমিতির আশ্রিত সকল ভক্তগণ কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ সকলেই বিরহকাতর হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে বিরহ-মহোৎসব পালনের দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি ও অশেষ মূল্যবান শিক্ষা-সম্বলিত তাঁহার বিভিন্ন লীলা স্মরণ করেন। গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, (৫।১২।০৪), বৈদ্যবাটীস্থ শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে শ্রীসমিতির সাধারণ-সম্পাদক মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক মহারাজ ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে শ্রীবিরহ-মহোৎসব পালিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অশেষ কৃপায় শ্রীগঙ্গা-তটস্থিত এই মঠ প্রকাশিত হয় এবং তিনি গত ২৬ৎসর যাবৎ এইস্থানে অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেন।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯।১২।০৪), বৃহস্পতিবার, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-মহোৎসব ও উক্ত মঠের প্রাক্তন মঠরক্ষক নিত্যলীলাপ্রবীষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের প্রথম বিরহ-বার্ষিকী পালিত হয়। শ্রীসমিতির সাধারণ-সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, পরিচালক কমিটির সদস্যগণ, অন্যান্য সকল সন্ন্যাসিগণ ও শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ উক্ত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিবস ২৪শে অগ্রহায়ণ (ইং ১০।১২।০৪) শুক্রবার, শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ হইতে অপরাহ্নে সমগ্র শহরে বিশাল নগর-সঙ্কীর্ণনের আয়োজন দ্বারা সমস্ত নগরবাসীকে শ্রীবিরহ-মহোৎসবের আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরদিন ২৫শে অগ্রহায়ণ (ইং ১১।১২।০৪) শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও তৎপ্রেষ্ঠ-সেবক এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সকল সন্ন্যাসিগণ সহিত শিলিগুড়ি শহরের অগণিত ভক্তবৃন্দ পালন করেন।

শ্রীসমিতির আশ্রিত গৃহস্থভক্তগণও নিজ নিজ স্থানে উক্ত বিরহ-মহোৎসব পালন করেন। গত ৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৪।১১।০৪) বুধবার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার বয়াল গ্রামে শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে স্থানীয় গোপালচক, মনুচক গ্রামের ভক্তবৃন্দ বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করেন।

গত ১৭ই পৌষ (ইং ২।১।০৫) রবিবার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার অন্তর্গত বেণুণাবাড়ীতে ব্যাসদেব-মন্দির-প্রাঙ্গনে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোভাব উপলক্ষে বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই অঞ্চলে বিশিষ্ট স্বনামধন্য ব্যক্তি শ্রীমণিভূষণ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল মাইতি, অধ্যাপক শ্রীশশধর দাস, শ্রীদুর্গাপদ আচার্য, ডঃ নিমাইচরণ দাস, অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী জানা, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও পরমগুরুপাদপদ্ম জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পরমপবিত্র জীবনী আলোচনা মুখে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন।

বর্ষান্তে বিবেচন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র ‘শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা’ দীর্ঘ ৫৬ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল। ৪৬২ গৌরব্দের (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীপত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। পরমহংসকুলগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদেব জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ উক্ত পত্রিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। সেইসময় তাঁর নিত্যসঙ্গী পরমারাধ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ (তৎকালে শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী) পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক-রূপে তাহার রক্ষক ও ধারক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাঁহার বিংশতি (২০) বৎসর বয়ঃক্রম কালে মূল-প্রতিষ্ঠাতাকে হারািয়াছিলেন। কিন্তু “কেশব-ধৃত-বামন-রূপ”-স্বরূপ পরবর্তী সভাপতি-আচার্য্য জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পরিচালনায় শ্রীপত্রিকা পূর্ব্ব মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই শ্রীশ্রীগুরুগৌর-বাণী-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ৫৬শ বর্ষে শ্রীপত্রিকা তাঁহার আদি ‘প্রকাশক ও মুদ্রক’কে হারািয়া যেন মাতৃহারা হইবার যন্ত্রণায় বহুবর্ষ পূর্ব্বের পিতৃহারা হওয়ার বেদনাটিও জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিরহকাতর করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীপত্রিকা যেন এই প্রথম অভিভাবক-হীনতার দুঃখ অনুভব করিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর ‘পিওন’। কিন্তু তজ্জন্ম সেই ‘বাণীবপু’র প্রয়োজন। সেই বাণীবপুগণের ক্রমশঃ অন্তর্দ্বানে ‘পিওন’ যেন হতবাক হইয়া পড়িতেছে। গৌড়ীয় সাহিত্যে যে বিরহতত্ত্বের আলোচনা আছে—তাহা দেহধর্ম্মি-মনোধর্ম্মিগণের জন্য দুর্ব্বোধ্য। আত্মধর্ম্মের সহিত যাঁহার সংশ্রব হইয়াছে, তিনিই মাত্র বিরহতত্ত্বের মহিমা অবগত হইতে পারেন। বিরহতত্ত্বে প্রবেশ না হইলে অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত মিলন অসম্ভব।

সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী গোস্বামী, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী প্রভৃতি হইলেন মূর্ত্ত শ্রীচৈতন্যবাণী। আর সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর অক্ষর-স্বরূপই হইলেন শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা। শ্রীচৈতন্যবাণী নিত্যা। কিন্তু জড়ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধারণ ও রক্ষণ সঠিকভাবে না হইলে কালক্রমে তাঁহাও চক্ষুর অগোচর হইয়া যান—“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়াং বেদ সংজ্ঞীতা।” (ভাঃ ১১।১৪।৩) জীবের ভাগ্যাকাশে ইহা অপেক্ষা দুর্যোগের ঘনঘটা আর কি থাকিতে পারে? সুতরাং শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহগণের অন্তর্দ্বানে শ্রীচৈতন্যবাণীর সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সেই কার্য্যটি অব্যাহত রাখিতে প্রতিনিয়ত তাঁহার মূল-‘প্রতিষ্ঠাতা’ ও আদি ‘প্রকাশক-মুদ্রক’ অভিভাবকদ্বয়ের

অজস্র শুভাশীর্বাদ ও শুভদৃষ্টি-নির্ভর হইয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিত্য ধাম হইতেই সকল প্রকার শক্তি সঞ্চর করিয়া শ্রীপত্রিকাকে উজ্জীবিত রাখুন।

শ্রীচৈতন্যবাণী সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব। সেই শ্রীচৈতন্যদেব ‘সাক্ষোপাস্ত্র-পার্ষদ’ হইয়া কিরূপে নিত্যকাল জগতে অবস্থান করেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের ‘আমার কথা’ নামক প্রবন্ধে অতীব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে—“শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট বাক্যই তাঁহার ‘শ্রীঅঙ্গ’, কালে কালে তাঁহার বাণীর প্রচারকগণই তাঁহার ‘উপাঙ্গ’, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই ‘অঙ্গ’, শ্রীচৈতন্যবাণীতে অবস্থিত শ্রীহরিজনগণই তাঁহার ‘পার্ষদ’।” সেইবিচারে ‘সাক্ষোপাস্ত্র-পার্ষদ’ শ্রীচৈতন্যবাণী-রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা ও সঙ্গলাভের সুযোগ সর্বকালেই বর্তমান। ইহা অত্যন্ত আশার কথা।

শ্রীচৈতন্যবাণী তাই বলিয়া কিছু ব্যবসায়ী-মুখে কীর্তিত হন না। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী গোস্বামীর নিকট গিয়া কোন এক ভাগবত-উপজীবী একসময় খুব গৌরকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—“লোকটা কিছুমাত্র ‘গৌর’ ‘গৌর’ বলে নাই, সে সর্বক্ষণ ‘টাকা’ ‘টাকা’ বলিল।” ইহাতেই প্রমাণিত হয়—শ্রীচৈতন্যবাণী বৈষ্ণব-ব্রহ্মবাদের মুখে প্রকৃতপক্ষে কীর্তিত হন না। কথায় আছে—“Devils can quote scriptures.”—অথর্ব বাঘের সেই সোনার চুড়ি দেখাইয়া মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কত শত পথিকের প্রাণ সংহারের গল্প কে না জানে? কিন্তু জগতে প্রতারণিত হইবার লোকের অভাব নাই। বঞ্চনা-লিপ্সু, সুবিধাস্বেষী, চাকচিক্য-বশ হতভাগ্য জীবগণ অনায়াসেই বহুশ্রমসাধ্য বস্তু পাইতে চাহে, এবং তাহাতে যে তাহারা ভীষণ বিপদই মাত্র আবাহন করে, তাহাও সহজে তাহারা বুঝিতে চাহে না। অবৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণবব্রহ্মবগণের জীবহিংসা কিছু কম নহে।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা অবিমিশ্র চৈতন্যবাণীর ধারক। যাহারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যবাণীকে ব্যাখ্যা করে বা কিছু অংশ প্রকাশ করিয়া অপর অংশ গোপন করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভীষণ জীবহিংসক। প্রকৃতই যাহা জীবের মঙ্গলজনক, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অনর্থগ্রস্ত জীবগণের নিকট হৃদয়বিদারক হইয়া থাকে। কিন্তু সদ্বৈদ্য রোগীকে চিকিৎসা করার সময় যন্ত্রণায় কাতর হইতে দেখিলেও যেরূপ তাহার মঙ্গলের জন্য তথাপি আপাত যন্ত্রণাদায়ক সেই চিকিৎসাই অব্যাহত রাখে, তদ্রূপ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীকেশব-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই ভবচিকিৎসার যে রীতি-নীতি এয়াবৎ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে এক কেশাগ্র ভাগও বিচ্যুত হইবে না। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ‘কেশবের আমি’ বলিয়া পরিচয় দিয়াই মাত্র ক্ষান্ত হন না, তাহা যথার্থই কেশবের আচার ও কেশবের বিচারের ধারক ও বাহক।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিস্টার্ড)

© ০৩৪৭২-২৪০০৬৮

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ, পিন-৭৪১৩০২

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃত ধারায় ও সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে এবং সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ৬ই চৈত্র ১৪১১ (ইং ২০।৩।২০০৫) রবিবার হইতে ১২ই চৈত্র ১৪১১ (ইং ২৬।৩।২০০৫) শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্যকীর্তন এবং নগর-সঙ্কীৰ্তনমুখে ষোলকোশ শ্রীধামপরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্তি-উনুখী সূকৃতি অর্জিত হইবে। ইতি—১০ অগ্রহায়ণ, ১৪১১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির “সভাপতি-আচার্য্য” অথবা “সাধারণ সম্পাদক”—এর নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

□ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ২৯ মাঘ, ১৪১১, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৬ই চৈত্র, (ইং ২০।৩।২০০৫) রবিবার :—(১) শ্রীগোক্রমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য) —গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, সুরভি-কুঞ্জ, সানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য) —মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৭ই চৈত্র, (ইং ২১।৩।২০০৫) সোমবার :—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি; এবং (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর। আমলকী শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস।।

৩। ৮ই চৈত্র, (ইং ২২।৩।২০০৫) মঙ্গলবার :—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জাহ্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট) ; এবং (৬) শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অঙ্গাতবাস)। পূর্বাহ্ন ৯-৪৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।

৪। ৯ই চৈত্র, (ইং ২৩।৩।২০০৫) বুধবার :—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়মায়াস্থান)।

৫। ১০ই চৈত্র, (ইং ২৪।৩।২০০৫) বৃহস্পতিবার :—(৯) অন্তদ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন।

৬। ১১ই চৈত্র, (ইং ২৫।৩।২০০৫) শুক্রবার :—শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও সঙ্কীর্তন-মহোৎসব।

৭। ১২ চৈত্র (ইং ২৬।৩।২০০৫) শনিবার :—সাধারণ মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)। পূর্বাহ্ন ৯-৪১ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রতোপবাসের পারণ।

জ্ঞাতব্য :—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রীগণ হাঙ্কা থালা ও ঘটি এবং মসারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ৫ই চৈত্র, (ইং ১৯।৩।২০০৫) শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমা ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।২০০৫) রবিবার প্রাতঃ ৫টা হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। সাধারণ ডাকযোগে শ্রীপত্রিকা গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৫০.০০ টাকা, বাৎসরিক ২৮.০০ টাকা ও আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১.০০ টাকা এবং বাংলাদেশবাসীপক্ষে বার্ষিক ৬৫.০০ টাকা, বাৎসরিক ৩৫.০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১,৫০১.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ডি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য। চেক অথবা ড্রাফট "SHRI GOUDIYA-PATRIKA" নামে প্রদেয়।
- ৩। যে কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোস্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দ্বির্ঘামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সমালোচনা সর্বদা আদরণীয়া।
- ৭। কোন কিছু জানিতে বা গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ), ৩। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৪। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাপটক, ৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৬। মায়াবাদের জীবনী, ৭। শরণাগতি, ৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৯। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী, ১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ১১। জৈবধর্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১২। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৫। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৬। শ্রীদামোদরাস্তকম্, ১৭। অর্চন-দীপিকা, ১৮। শ্রীগৌরঙ্গ, ১৯। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ২০। শ্রীগৌর-কথামালা, ২১। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দর্শন-প্রসঙ্গ, ২২। সাংখ্য-বাণী, ২৩। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ২৪। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২৫। শ্রীহরিনাম-চিত্তামণি, ২৬। উদ্ধারের পথ, ২৭। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৮। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৯। শ্রীউপদেশামৃতম্, ৩০। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ৩১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ৩২। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ৩৩। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ৩৪। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৫। প্রেম-প্রদীপ, ৩৬। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্ন-মালা, ৩৭। মাধুর্য-কাদম্বিনী, ৩৮। তত্ত্ববিবেক, ৩৯। ভক্তিতত্ত্ববিবেক, ৪০। শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, ৪১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী, ৪২। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৪৩। The Bhagavat, ৪৪। Nam-Bhajan, ৪৫। The Vedanta, ৪৬। Vaishnavism, ৪৭। Rai Ramana, ৪৮। Relative Worlds, ৪৯। A Few Words on Vedanta, ৫০। Life Story of Impersona-lism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ। ৩০৪৭২/২৪০০৬৮
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, পোঃ চুঁড়া (হুগলী) পঃ বঃ। ৩০৩০/২৬৮০-৭৪৫৬
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) উঃ প্রঃ। ০৫৬৫/২৫০-২৩৩৪
- ৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ০৫৬৫/২৪৪-৩২৭০
- ৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ০৫৬৫/২৪৪-৪৯৬১
- ৬। শ্রীভক্তিবাদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্কাল (হরিদ্বার) উঃ প্রঃ। ০১৩৩৪/২৪২৪৩৮
- ৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা। ০৬৭৫২/২৩১৪৭৪
- ৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৪। ৩০৩০/২৫৪৩-১২৪৭
- ৯। শ্রীকেশব গোষাঈ গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)। ৩০৫৩/২৪৬-২৮৩৭
- ১০। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — পোঃ রাণিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা। ০৬৭৮৪/২৪১৭৪৪
- ১১। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জিলিং) পঃ বঃ। ৩০৫৩/২৪৬-৮৫৯৬
- ১২। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার) পঃ বঃ। ৩০৫৮৩/২৫৬১৩৪
- ১৩। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্ধমান) পঃ বঃ। ৩০৪৩০/২৫৬-৮৫৩২
- ১৪। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ — রংপুর, শিলচর-৯ (কাছাড়) আসাম। ৩০৮৪২/২২৩৩৩৭
- ১৫। শ্রীদুর্বারীনাথ গৌড়ীয় আশ্রম — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ০৫৬৫/২৪৫-০৫১০
- ১৬। শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ — ১/১ কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)। ৩০৩০/২৬৩২-৫৮৩৮
- ১৭। শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ — ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)। ৩০৩০/২৬৩২-৯৫৯৪
- ১৮। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — পোঃ তুরা (ওয়েস্ট গারো হিলস) মেঘালয়। ৩০৬৫১/২২৩৬৯১
- ১৯। শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ — জহরলাল নেহেরু রোড, (ধুবড়ী) আসাম। ৩০৬৬২/২২১৮৩০
- ২০। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
- ২১। শ্রীপিচ্ছলা গৌড়ীয় মঠ — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর) পঃ বঃ।
- ২২। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্ধমান) পঃ বঃ।
- ২৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — পোঃ বাসুগাঁও (কোকড়াবাড়) আসাম। ৩০৬৬১/২৮১৪৫৩
- ২৪। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, (কোচবিহার) পঃ বঃ। ৩০৫৮২/২২৯৪৪১
- ২৫। শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ — ভাস্করগঞ্জ, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)। ৩০৬৭৮২/২৩৬৭২৫৬
- ২৬। শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ — রেলওয়ে স্টোর গেট, পোঃ পাণ্ডু, গৌহাটী-১২। ৩০৬৬১/২৫৭৩৪৮০
- ২৭। শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ — কৈলাস মার্গ, পোঃ বলদেও (মথুরা) উঃ প্রঃ। ৩০৫৬১/২৫৩১৬৫
- ২৮। শ্রীগিরিধারী গৌড়ীয় মঠ — দশবিশা, রাধাকৃষ্ণ রোড, গোবর্দ্ধন (মথুরা) উঃ প্রঃ। ৩০৫৬৫/২৮১৫৬৮
- ২৯। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ সম্মিতি আশ্রম — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
- ৩০। Shri Giriraj Govardhan Goudiya Math-54 Brisbane St. Murwillimbah N.S.W. Australia
- ৩১। Shri Binode Behari Goudiya Math-22 Mundaring Wier Rd. Kalamunda, Perth, Australia
- ৩২। Shri Gour.Gobinda Goudiya Math-32 Handsworth Wood Road, Birmingham (U.K.)

BOOK POST	SL.NO.	TO
		Ramanshu Ganguly A1/210, Mayur Apartment, Sector-9 Rohini, Delhi-85
	8018	
From :	৩ 2555-8973	
SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH 28, HALDER BAGAN LANE KOLKATA-700 004 E-Mail : vedantasamiti@vsnl.net		